সমাজ-বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

এবং

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, শ্রীহরিদাস পালিত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী,
শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত,
শ্রীসুশীলেন্দু দাশগুপ্ত, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, অধ্যাপক
দেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী,
ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমন্মথনাথ সরকার,
অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
১৯৩৮

মূল্য ৩৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এস্‌-সি
চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৯৩৮ খৃঃ

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস, লিঃ
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এস-সি

"সমাজ-বিজ্ঞান" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের প্রস্তাব ছিল যে, "সমাজ-বিজ্ঞান" নাম দিয়া তাঁহারা একখানা পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, দ্বৈমাসিক বা মাসিক) বাহির করিবেন। কিন্তু পরিষদের সভাপতি ও গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার ১৯২৬ সন হইতে "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের সম্পাদক হিসাবে বুঝিয়াছেন যে, বাংলা দেশে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সম্পাদন করা (বাংলায় অথবা ইংরেজিতে) এখনো অতি-কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব। এই কারণে সমাজ-বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা কিছুকাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিল। তাহার পরিবর্ত্তে ডক্টর সরকার সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত রচনাবলী গ্রন্থাকারে সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমভাগের প্রণালীতেই দ্বিতীয় ভাগও যথা-সময়ে প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থের লেখকেরা প্রায় সকলেই বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক, পরিচালক, বা সহযোগী। দু'একটা বাদে সবকয়টা রচনাই এই পরিষদের অথবা "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের কিংবা বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পরিষদগুলাকে বিনয় বাবুর "টোল" বলা হইয়া থাকে। এইসকল টোলের গবেষক ও গবেষণাধ্যক্ষ সকলেই অবৈতনিক বা অবৃত্তিক। অধিকন্তু তাঁহারা কেহই কোনো নির্দ্দিষ্ট মত মানিয়া চলিতে বাধ্য নহেন। প্রায় প্রত্যেক লেখকই "গ্রন্থকার"রূপে সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত।

কোনো লেখকের নিকট প্রুফ পাঠাইবার সময় ছিল না। সুতরাং প্রুফ দেখিবার সময় লেখকেরা ভাষা সংশোধনের এবং বক্তব্য বিষয়ক অদল-বদলের যেসকল সুযোগ পাইয়া থাকেন সেইসকল সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। এইজন্য পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা
সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ

সমাজ-বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

সূচী

(ক) বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সূত্রপাত ও আবহাওয়া

(খ) সামাজিক প্রণালী, সামাজিক লেন-দেন ও সামাজিক গড়নের বিশ্লেষণ

(গ) দেশী-বিদেশী সমাজ-চিন্তার ইতিহাস

(ঘ) পরিশিষ্ট

(ক) বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সূত্রপাত ও আবহাওয়া

বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞান

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এম্‌-এ (কলিকাতা),
বিদ্যাবৈভব (কাশী), ডক্টর (তেহারাণ)

সমাজ-চিন্তায় বঙ্গ-সাহিত্য (১৮০১-১৯০০)

বাংলা সাহিত্যে সমাজ-বিজ্ঞানের ঘর নেহাৎ ছোট নয়। বাংলা ভাষায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীরা যাহা-কিছু চিন্তা করিয়াছে তাহার এক মোটা অংশকে সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যার অন্তর্গত করা চলে। অধিকন্তু ইংরেজি ভাষায়ও বাঙালীর রচনাবলীর ভিতর সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চ্চার বহর উল্লেখযোগ্য।

লোকে-লোকে লেন-দেন লইয়া সমাজ। আন্তর্মানুষিক সম্বন্ধ সামাজিক সম্বন্ধ। যেখানে-যেখানে দুই ব্যক্তির বা বহু ব্যক্তির যোগাযোগ সেইখানেই সমাজ। কাজেই সমাজের ভিতর পড়ে হাজার রকমের কাজ ও চিন্তা। সমাজ-বিষয়ক বিদ্যাও বহরে যার পর নাই বড়।

সম্প্রতি সমাজ-বিজ্ঞান শব্দটা অতি-বিস্তৃত অর্থে লইতেছি। জীবন-চরিত সাহিত্যকে এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া লইলে রাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (১৮০১) আধুনিক বাঙালীর সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। রাজীবলোচন ১৮০৫ সনে "কৃষ্ণ-চরিত্র" (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত) লিখিয়াছিলেন। এই বইও সমাজ-বিজ্ঞানের কোঠে স্থান পাইতে পারে। তাহা ছাড়া গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের "বেঙ্গল গেজেট" (১৮১৬-১৮), রামমোহন রায়ের "সংবাদ কৌমুদী" (১৮১৯), আর ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকর" (১৮৩০) সমাজ-বিজ্ঞান

বিষয়ক পত্রিকার তালিকায় আসিবে। একালে যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যায় পঠন-পাঠন আর অনুসন্ধান-গবেষণা চালাইতে ঝুঁকিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এইসকল সেকেলে বঙ্গ-চিন্তার স্তম্ভগুলাকে কুর্নিশ করিয়া কাজে নামা উচিত।

বাঙালী জাতের মগজের দৌড় বুঝিতে হইলে পত্রিকাসমূহের ফিরিস্তি লইতেই হইবে। কেননা বাঙালীর কপালে বইয়ের লেখক হওয়া যার পর নাই কঠিন। আজও পত্রিকার প্রবন্ধ-লেখক হিসাবেই বাঙালী মনীষীরা প্রধানতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কাজেই বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানের ধারাটাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পত্রিকাসমূহের ভিতরই ঢুঁটিতে হইবে।

অক্ষয়কুমার দত্তের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" (১৮৪৩) বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম বড় খুঁটা। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিদ্যাকল্প-দ্রুম" (১৮৪৬-৪৯) একখানা বিশ্বকোষ। কাজেই ইহার ভিতর সমাজ-বিজ্ঞানের ঠাঁই আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানের বিপুল স্তম্ভ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১৮৫১)। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "বিধবা বিবাহ" (১৮৫৫) সমাজ-চিন্তায় বাঙালী ব্যক্তিত্বের বিপুল নিদর্শন। পরবর্ত্তীকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "এডুকেশন গেজেট" (১৮৬৮) আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গদর্শন" (১৮৭২) বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞানের স্রোত জোরের সহিতই বহাইয়াছে। এইসকল পত্রিকার মারফৎ অন্যান্য বিদ্যাও বাংলায় ঘর বসাইতে পারিয়াছে। বঙ্কিম-মণ্ডলের উমেশ বটব্যাল, রমেশ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি লেখকগণ সকলেই অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানেরও সেবক। এই ফিরিস্তিতে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দী

ছাড়াইয়া বিংশ শতাব্দীর গৌরবময় ১৯০৫ বা স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত, এমন কি তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায়ও আসিয়া ঠেকিলাম।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতর মির মোশারফ হোসেন প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধু" (১৮৮০-৮৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌলবী তসলিমউদ্দিন আহম্মদ সম্পাদিত "ইসলাম" আর সৈয়দ এমদাদ আলি সম্পাদিত "নবনূর",—এই পত্রিকা দুইটা বাংলা ভাষায় সমাজ-চিন্তার খোরাক জোগাইয়াছে। পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ, কবি কৈকোবাদ, মজম্মল হক্, সাহিত্য-বিশারদ আবদুল করিম আর কাজি ইমদাদুল হক্ প্রণীত বাংলা গ্রন্থাবলীতে সমাজ-বিজ্ঞানের মাল পাওয়া যায়। প্রায় সমস্তগুলাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা।

স্বদেশী যুগের সমাজ-সাহিত্য (১৮৯৩-১৯১৪)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক্‌টা আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড় দশক বাংলার নরনারীর পক্ষে মহত্ত্বপূর্ণ যুগ। এই যুগে "বাঙালী বিপ্লব" মূর্ত্তি গ্রহণ করে। মোটের উপর সহজে বৎসর বিশ-একুশ ধরিয়া লইতেছি। প্রথম খুঁটা ১৮৯৩ সনে ফেলিতেছি। সেই বৎসর বাঙালী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো সহরে বঙ্গচিন্তার জন্য দিগ্‌বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়াইতে সমর্থ হন। শেষ খুঁটা ফেলিতেছি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজে (১৯১৩)। ইয়োরোপে বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সুরু হয় তাহার পর বৎসর (১৯১৪)।

১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রবাসী"। বাঙালী বিপ্লবের যুগে এই পত্রিকাটা অন্যতম "বঙ্গদর্শন" স্বরূপ। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে (১৯০৪) মোটা খুঁটা গাড়িয়া জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছে। ১৯১১ সনে লণ্ডনে "ইউনিভার্স্যাল রেসেজ কংগ্রেস" (বিশ্ব

জাতি সম্মেলন) আহুত হয়। তাহাতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রধান সভাপতি ছিলেন। এই ঘটনাকে স্বদেশী যুগের বাঙালী সমাজ-বিজ্ঞানের বিশেষরূপে মহত্বপূর্ণ তথ্য সমঝিতে হইবে। বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় দিগ্‌বিজয়ের ইহা অন্যতম ধাপ বিশেষ।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সমাজ-বিজ্ঞান ইস্কুল-কলেজের বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তবে পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য দেশে ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়ায় সমাজ-বিজ্ঞান জবরদস্ত বাস্তুভিটা কায়েম করিয়া বসিয়াছে। এই কথাটা মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সম্বন্ধে প্রধানভাবে খাটে। বর্ত্তমানে বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক যে, ইয়োরামেরিকা ও জাপানের মত ভারতবর্ষেও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাহিরেই সমাজ-বিজ্ঞানের জন্ম। আর একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। বাহিরের সমাজ-চিন্তাধারা হইতে ভারতীয় এবং ইয়োরামেরিকান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি চিরকালই সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা-গবেষণার জন্য নানা প্রকার হদিশ ও বিষয়-বস্তু পাইয়াছে। আমাদের বাংলা দেশেও সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা-গবেষণায় এই দুই অবস্থাই দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ইস্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কতকগুলা প্রতিষ্ঠানই বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চার বনিয়াদ গড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়ায় বাহির হইতে সমাজ-চর্চ্চার প্রভাব আসিয়া জুটে। বর্ত্তমানে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সমাজ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণা আস্তে-আস্তে উন্নত হইতেছে। এই সবের গোড়ায় যে বহুসংখ্যক বাহিরের এবং প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান-গবেষণা পূরু বহরে অবস্থিত তাহার কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে

সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক এবং অন্যান্য আরও নানাপ্রকার গবেষণার পক্ষে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানরূপে সমঝিতে হইবে। এই পরিষদের পত্রিকাখানি (১৮৯৩ সনে স্থাপিত) প্রাচীন উপকথা, সমাজ-প্রথা, সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার মুখপত্ররূপে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হরিদাস পালিত প্রভৃতি লেখকের রচনাবলী শিক্ষিত বাঙালীদের হৃদয়ে সমাজতত্ত্বের স্পৃহা অনেকখানি জাগ্রত করিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর (১৮৬৪-১৯২২) এক দিকে বৈদিক যুগের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক রীতিনীতি, অপর দিকে মানবচরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কর্ম্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাবলীর সমান মূল্যবান। শিক্ষাদর্পণের (১৮৬৪) ও এডুকেশন গেজেটের (১৮৬৮) সম্পাদক ভূদেব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পরিবার, সমাজ, লোকাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একালে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজ-চিন্তায় রামেন্দ্র সুন্দরের রচনাবলী উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "ডন" (১৮৯৭ সনে স্থাপিত) নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার আর একটা বড় রকমের উৎস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার কোলাকুলির ফলে এই উভয় জগতের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে সে সমস্যাটার উপর "ডন" মাসিকের

বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সমাজ, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কীয় সমস্যা-সমূহের আলোচনার জন্যই এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্ত্তী কালে "ডন সোসাইটী" জন্ম গ্রহণ করে। ১৯০৩ সনে সতীশ বাবু এই সোসাইটি স্থাপন করেন এবং পত্রিকাখানিও "ডন সোসাইটি ম্যাগাজিন" নামে পরিচালিত হয়। এইরূপে 'ম্যাগাজিন'টা তিন বৎসর চলে। ১৯০৫ সনে বাংলায় যে বিপুল "স্বদেশী আন্দোলন" মূর্ত্তি গ্রহণ করে তাহার অন্যতম জন্মদাতা ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশ বাবু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ। এই গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লবের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল "ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন" (জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ)। ১৯০৬ সনে এই শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হয়। তখন হইতে "ম্যাগাজিন"টা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উহার আদর্শের মুখপত্র স্বরূপ পরিচালিত হইতে থাকে। ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত পত্রিকাটা চলিয়াছিল।

মাপ-জোকমূলক এবং সংখ্যা-ও-তথ্যসম্বলিত রিপোর্টসমূহের, বিশেষতঃ সরকারী আদমশুমারী বিভাগের বিবরণীগুলার গবেষণা ডন সোসাইটীর প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে মুখ্য স্থান গ্রহণ করিত। পল্লীসমাজ, কুটীর-শিল্প, পেশাগত শ্রেণীর বিভিন্নতা, বর্ণ (জাত-পাঁত) ও সম্প্রদায়ের উপর সোসাইটীর বিশেষ দৃষ্টি পড়িত। পত্রিকাখানি সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির দিক্ হইতে নৃতত্ত্ব এবং জাতীয় ভাবধারা ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সতীশ বাবুর ছাত্র এবং সহযোগিরূপে অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (রিপণ কলেজ, কলিকাতা), বর্ত্তমান লেখক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আরও অনেকে

সমাজ-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রাথমিক গবেষণাকার্য্য শুরু করেন। সগোত্র এবং বন্ধু হিসাবে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়) ডন সোসাইটির অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

"১৯০৫ সনের ভাবধারার" প্রভাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তদ্বিরে অথবা অনুকরণে বাংলার জিলায় জিলায় কতকগুলা গবেষণা-সমিতি গড়িয়া উঠে। এই উপলক্ষে রংপুর, ঢাকা, গৌহাটী প্রভৃতি স্থানের সাহিত্যপরিষৎসমূহ এবং রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় এই সমস্ত পরিষদের উদ্যোগে আহূত সাহিত্য-সম্মেলনসমূহের ফলে মফঃস্বলের নানা স্থানে সামাজিক সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা-গবেষণার রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৭ সনে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি ঠিক এই ধরণেরই একটা প্রতিষ্ঠান। ইহার একটা বিশেষ বিভাগের উপর পল্লীগাথা, গ্রাম্য কারুকার্য্য, কুটীরশিল্প, সার্ব্বজনিক নাচ-গান-বাজনা, পালাপার্ব্বণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার অর্পিত ছিল। রাধেশচন্দ্র শেঠ, বিপিনবিহারী ঘোষ, হরিদাস পালিত, কুমুদনাথ লাহিড়ী, বিধুশেখর শাস্ত্রী, কৃষ্ণচরণ সরকার, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি লেখকগণ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করিয়াছেন। "অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় (১৯১২)। প্রধানতঃ হরিদাস পালিতের "আদ্যের গম্ভীরা"র (১৯১২) উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহার "ফোক এলিমেণ্ট ইন্ হিন্দু কালচার" (হিন্দু সভ্যতায় জনসাধারণের দান) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হয় (লণ্ডন, ১৯১৭)। হরিদাস পালিত ও নগেন চৌধুরী ১৯২৬ সন হইতে "আর্থিক

উন্নতি" পত্রিকার এবং ১৯৩২ সন হইতে "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৩৭ সনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সহিতও তাঁহাদের যোগ আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্ব হইতেই এই মিশন সমাজ-চিন্তার অন্যতম কেন্দ্র। কাজেই সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৭ সনে বিবেকানন্দ ইয়োরামেরিকা হইতে স্বদেশ ফিরিয়া আসেন। সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম; কিন্তু ১৯০৯ সনে ইহা বর্ত্তমান আকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা ১৮৯৫ সনে স্থাপিত হয়। পত্রিকাখানি মূলতঃ দর্শন-সংক্রান্ত, এবং বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ধর্ম্ম, নীতিকথা প্রভৃতি ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু সামাজিক লেনদেনসমূহও আলোচিত হয় এবং সমাজগঠনমূলক প্রবন্ধাদিও প্রায়ই ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। চিত্তবিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন জাতির আদান-প্রদান বিষয়ক অনুসন্ধান-গবেষণা এই পত্রিকার পুষ্টি সাধন করে। অধিকন্তু লেখকেরা কোনো এক বিদ্যার বা দলের লোক নহেন। তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-চিন্তায় এই পত্রিকা অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৯৮ সন হইতে মিশন "উদ্বোধন" নামক একখানি বাংলা মাসিকও পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী ফোন ভীজে তাঁহার প্রণীত "একালের সমাজশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণা" সম্বন্ধীয় জার্ম্মাণ প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান-সেবকগণের প্রণীত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। প্রবন্ধটা জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী টোন্নীসকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সঙ্কলিত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে (লাইপৎসিগ্ ১৯৩৬)। বইয়ের নাম "রাইনে উন্ট্ আঙ্গেভান্টে সোৎসিওলোগী"। "প্রবুদ্ধ ভারত" ও বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভীজে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানসেবিগণ প্রাচীন বেদোক্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের মধ্যে সংযোগ-সেতু নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

আক্রাম খাঁ-প্রণীত "সমস্যা ও সমাধান" গ্রন্থের "এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার", "সুদ সমস্যা", সঙ্গীত-সমস্যা" এবং "চিত্র কলা ও এছলাম" অধ্যায়গুলা স্বদেশী যুগে তাঁহার "মোহম্মদী" সাপ্তাহিকে বাহির হইয়াছিল। সেই সময়ে এই রচনাসমূহ মুসলমান সমাজে "গুরুতর বিপ্লব" সৃষ্টি করে। এই সংস্কার-আন্দোলনকে "আলম" বলা হয়। সে বোধ হয় বৎসর সাতাইশ-আটাইশ পূর্ব্বের কথা (১৯১০)। এই সংস্কার-কার্য্যে মনিরুজ্জামান ইস্‌লামবাদী সম্পাদিত "আল-ইস্‌লাম" পত্রিকার প্রভাবও বেশ ছিল। স্বদেশীযুগের বঙ্গ-সাহিত্যে মজম্মল হক্ কর্ত্তৃক অনূদিত ফির্দাউসির শা-নামা বঙ্গচিন্তায় এশিয়া-চর্চ্চার নিদর্শন। তাঁহার "তাপস-কাহিনী"ও হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজেরই খোরাক জোগাইয়াছে। এই যুগে "সৌভাগ্য-স্পর্শমণি" নামক ফার্সী হইতে তর্জ্জমা-গ্রন্থের প্রকাশ সুরু হয় (১৯১০)।

লড়াইয়ের পরবর্ত্তী যুগ (১৯১৪-১৯৩৮)

এইবার একদম একালের অর্থাৎ মহা-লড়াইয়ের (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্ত্তী সিকি-শতাব্দীর সমাজ-চিন্তার কথা বলিব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় জানিয়া রাখা ভাল যে, বাঙালীর নৃতত্ত্ব

বিষয়ক প্রথম পত্রিকা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাহিরেই জন্ম লাভ করিয়াছে। ১৯২০ সনে শরৎচন্দ্র রায় রঁাচী সহরে (বিহার) "ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের মানুষ' নামক পত্রিকা বাহির করেন। ঐ সময়ে তিনি ওরঁাও ও মুণ্ডাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও পরলোকগত পঞ্চানন মিত্র এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের চেষ্টায় পত্রিকাখানি শিক্ষাব্রতীদের মুখপত্রেও পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতাও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব্ সাইকলজী" অর্থাৎ ভারতীয় চিত্ত-বিজ্ঞান পত্রিকার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইজন্য কৃতিত্বের অধিকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামূলক চিত্ত-বিজ্ঞান বিভাগ। ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রের গবেষণা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, গিরীন্দ্রশেখর বসু, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, গোপেশ্বর পাল প্রভৃতি লেখকগণ শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি সমাজ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে আলোচ্য সমস্যাসমূহের বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। সংখ্যার এবং মাপজোকের সাহায্যে বৈচিত্র্যসমূহকে ফুটাইয়া তোলাও হয়।

সমাজ-বিজ্ঞান বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ১৯৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদে অনুসন্ধান-গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু। ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠিত "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকা এই পরিষদের মুখপত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তবে পত্রিকায় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের আলোচনাসমূহই প্রধানতঃ প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্ম-প্রণালীর মতন ব্যবস্থায়ই "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদ

পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দুই পরিষদেরই আলোচনার বাহন বঙ্গভাষা।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের সমাজবিজ্ঞানবিভাগে বাড়্‌তির পথে জাপান, গুজরাটের সমাজ-জীবন, বর্ত্তমান যুগের কারাগার, ফাশিস্ত ইতালির সমাজ ও অর্থনীতি, পশ্চিম বঙ্গের আদিম জাতি, পারস্য (ইরাণ) ও স্পেনের সামাজিক অবস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার ভারতবাসী, ডিউয়ীর সমাজ-দর্শনে শিল্পশিক্ষার স্থান, ১৯০৫ সনের চিন্তারাশি, ইবন খাল-দুনের "মোকদ্দমা", আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি, বলিদানের নৃতত্ত্ব, বিলাতী শিক্ষা-ব্যবস্থার সামাজিক আদর্শ, বাংলার জাতিভেদ-প্রথা, দেশবিদেশের নগরশাসন-প্রণালী, অপরাধ ও শাস্তি, ফ্রয়েডের মতামত প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। হরিদাস পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সরসীলাল সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রমোহন মৌলিক প্রভৃতি লেখকগণ গবেষণা-সম্পদ দ্বারা এই পরিষদের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন (১৯৩২-১৯৩৭)।

বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ১৯৩৮ সনে স্থাপিত "বঙ্গীয় এশিয়া পরিষৎ" অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানেরও চর্চ্চা করিয়া থাকে। মিশরের জগ্‌লুল পাশা ও চীনের সুন ইয়াৎ-সেন, ইরাণের সৈয়দ জামালুদ্দিন, বঙ্গচিন্তায় এশিয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১৯৩৩ সনে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয় জার্ম্মাণ বিদ্যা সংসদ"ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় অন্যতম স্থান অধিকার করে। এই প্রতিষ্ঠানে আলোচিত বিষয়াবলীর মধ্যে টোন্নীস, ফোন ভীজে ও ফ্রায়ার প্রণীত গ্রন্থসমূহের টীকাটিপ্পনী, চিত্তের "গেষ্টাল্ট্" (গড়ন) বিষয়ক মতবাদ, শীতকালের সমাজসেবা, সুপ্রজনন-বিদ্যা প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নিখিলবঙ্গ-শিক্ষক সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত "টীচার্স জার্ণাল" পত্রিকাতেও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা স্থান পাইয়া থাকে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাসিক পত্রিকাখানির (প্রতিষ্ঠা ১৯২২) কলেবর ও বিষয়বস্তু দুইয়েরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। পত্রিকাটা দ্বৈভাষিক।

মহাবোধি সোসাইটী কর্ত্তৃক আন্তর্জ্জাতিক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মুখপত্ররূপে পরিচালিত "মহাবোধি" পত্রিকা (১৮৯২ সনে স্থাপিত), এবং হিন্দু-মিশনের (১৯২৫ সনে স্থাপিত) মুখপত্র "হিন্দুরিভিউ" পত্রিকাতেও বিস্তর সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সমসাময়িক বাংলার সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-সাহিত্যরূপে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি" (১৯২৬), ও ডক্টর বিমলাচরণ লাহা সম্পাদিত "ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার" (১৯৩৪) নামক প্রত্নতত্ত্বমূলক পত্রিকা দুইখানি স্থান পাইবার যোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন "জাত্" (বর্ণ)সমূহের আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত হইয়া থাকে। ১৯০১ সনের সরকারী আদমশুমারীর বিবরণী "জাতপাঁত"গুলাকে সচেতন করিয়া তুলে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-জাতিই সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত হইয়া আপন-আপন সমিতি ও মুখপত্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২১ সনের ভারত গবর্ণমেণ্ট বিষয়ক আইন এবং বিগত ষোল-সতের বৎসরের সমাজসংস্কারমূলক চিন্তাধারা ও আইন-কানুন এই আন্দোলনকে আরও বেশী শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, তিলি, সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত্ত, বৈশ্য-সাহা, তন্তুবায়, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বহুজাতি আপন-আপন মুখপত্র দ্বারা বিশেষভাবে সুরক্ষিত। সমস্তরে অগ্রগতি এবং স্তরে-স্তরে ঊর্দ্ধযাত্রা এই সকল জাতি-পত্রিকার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সমস্ত পত্রিকায় প্রচারিত তথ্য ও ব্যাখ্যাসমূহ জাত্-পাঁত্গুলার অর্থ-নৈতিক, রাজ-নৈতিক

এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক গতিশীলতারই পরিচায়ক। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-চিন্তার জন্য এগুলা পহেলা নম্বরের রসদ জোগাইতে সমর্থ।

বর্ত্তমান আলোচনায় সমাজবিজ্ঞান বিদ্যাকে অতি বিস্তৃতরূপে চৌহদ্দি দেওয়া হইয়াছে। কাজেই নানা প্রকার রচনা এই বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর আসিয়া পড়িতেছে। মুসলমান সমাজে সংস্কার সম্বন্ধে যে সমুদয় লেখাপড়া ও তর্কপ্রশ্ন চলিতেছে সেই সমুদয়ও বাঙালী চিন্তাশক্তির অন্যতম সাক্ষী। তাহা ছাড়া একালের বাঙালী মুসলমানেরা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি চতুর্ব্বর্গের সকল ক্ষেত্রে মাথা খেলাইতে অভ্যস্ত। তাহার ভিতর মুসলমান, অ-মুসলমান, দেশী-বিদেশী সকল প্রকার মালই কিছু-কিছু ঠাঁই পাইতেছে। মুসলমান মগজের দানে বাঙালী সমাজবিজ্ঞানের ঘর ক্রমশঃ বাড়তির পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। এই উপলক্ষে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট প্রণীত গ্রন্থের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রচার করিয়াছেন হুমায়ুন কবীর (১৯৩৫)।

মুসলমান সমাজ-সংস্কারকগণের ভিতর লড়াইয়ের (১৯১৪-১৮) পরবর্ত্তী যুগে শিক্ষানেত্রী হোসেন, লুৎফর রহমান, আবুল কালাম আজাদ (উর্দ্দুতে), রেজাউল করিম ইত্যাদি লেখকগণ সমাজ-বিজ্ঞানের মজলিশে আলোচনা-যোগ্য। ১৯৩২ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত মোস্‌লেম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা। আবদুল ওদুদ-প্রণীত "সমাজ ও সাহিত্য" (১৯৩৫) এবং সামসুন নাহার-প্রণীত "বেগম মহাল" (১৯৩৬) বইয়ে বাংলার নরনারী চাঁদ সুলতানাকে বগলদাবা করিয়া গ্যেটে পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে পারে। পাঞ্জাবী কবি ইক্‌বালের চিন্তা-সম্পদ্ বাঙালী সমাজে প্রবেশ করিয়াছে "গুলিস্তাঁ"-সম্পাদক ওয়াজেদ আলির রচনার মারফৎ।

সেকালে রামপ্রাণ গুপ্ত "ইস্‌লাম কাহিনী" লিখিয়াছিলেন।

একালেও ইসলাম চর্চ্চায় বাঙালী হিন্দুর বিশেষরূপে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। এইজন্য আরবী ও ফার্সী দখল করার দিকে হিন্দু সুধীবর্গের নজর ফেলা চাই। বর্ত্তমান লেখকের রচনাবলীর ভিতর আরব দার্শনিক আল-ফারাবি, বাগদাদের মাওয়ার্দ্দি, আফগান আল্-বেরুণি, ইরাণের নিজামুল-মুল্ক্, মিশরের ইব্‌ন্ খালদুন, "হিন্দুস্থানী শেখ" আবুল ফজল ইত্যাদি মুসলমান মনীষিগণের কিছু-কিছু আলোচনা আছে। বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদের তদ্‌বিরে মুসলমান এশিয়া সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার সুযোগ সৃষ্ট হইতেছে। "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২) আর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) বই দুইটায় বাংলার নরনারী সজ্ঞানে হিন্দুমুসলমান-সমন্বিত বাঙালী জাত্।

"সৌভাগ্য-স্পর্শমণি" দুই হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিরাট বই। ফার্সী "কিমিয়া সাওদং"-গ্রন্থের তর্জ্জমা। ইহা নীতি, সমাজ ও দর্শন সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বইটা বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হইতে সুরু করে (১৯১০)। সপ্তম ও শেষ খণ্ড বাহির হইয়াছে ১৯৩২ সনে। তর্জ্জমাকারী রাজসাহী জেলার পণ্ডিত মির্জা ইউসফ আলী (১৮৫৮-১৯২০)। "নুরল-ঈমান সমাজ" নামক সাহিত্য পরিষদের তদবিরে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। রাজসাহীতে নুরল-ঈমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৫ সনে। আরবী, ফার্সী, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ বাংলায় তর্জ্জমা করা এই "সমাজের" অন্যতম উদ্দেশ্য। "পল্লী-বান্ধব" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা এই "সমাজ" হইতে প্রচারিত হইয়া থাকে।

"সৌভাগ্য-স্পর্শমণি"র বিভাগ সমূহ নিম্নরূপ :—(১) দর্শন (আত্ম-দর্শন, তত্ত্বদর্শন, সংসারদর্শন, পরকালদর্শন), (২) এবাদৎ বা অনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য (বিশ্বাস, বিদ্যার্জ্জন, পবিত্রতাবিধান ও অঙ্গশুদ্ধি, নামাজ, "জাকাৎ" বা দান, রোজা, হজ, কোরাণপাঠ, আল্লার "জেকের" বা স্মরণ, সময়-

বিভাগে কার্য্যবিভাগ), (৩) ব্যবহার (পান-আহার, বিবাহ, উপজীবিকা, হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়, সংসর্গ—বন্ধুত্ব, আত্মীয়, প্রতিবেশী, পিতামাতা, দাসদাসী ইত্যাদি,—নির্জ্জনবাস, বিদেশভ্রমণ, সঙ্গীত ও সঙ্গীত মোহ, সৎকার্য্যে উপদেশ ও অপ্রিয় কার্য্যে নিষেধ, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন), (৪) বিনাশন (চরিত্রোন্নতিকর পরিশ্রম, লোভ—ভোজন-স্পৃহা ও কামরিপু, বাক্যকথন, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা, সংসারে আসক্তি, ধনাসক্তি, সম্মানলালসা, "রিয়া" বা প্রদর্শনেচ্ছা, অহঙ্কার, মোহভ্রম), (৫) পরিত্রাণ ("তত্তবা" বা অনুতাপ, ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতা, ভয় এবং আশা, দারিদ্র্য ও বৈরাগ্য, সঙ্কল্প—একক ও প্রকৃত, প্রবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ, সদ্ভাব চিন্তন, আল্লার প্রতি ভরসা, প্রেম, অনুরাগ ও প্রসন্নতা, মৃত্যু-চিন্তা)।

মির্জা ইয়ুসফ আলি অনুবাদক মাত্র নন। তাঁহার "সৌভাগ্য-স্পর্শমণি"র ভিতর ব্যাখ্যাও আছে প্রচুর। তাহাতে ব্যক্তি ও সমাজ সম্বন্ধে বাঙালীর চিন্তাই স্পর্শ করা যায়। এই হিসাবে বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞানের ঘরে ইয়ুসফ আলি অভিনন্দিত হইবেন। অধিকন্তু তাঁহার মারফৎ ফার্সী ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের এক উপাদেয় রচনা বাংলায় আসিয়াছে ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বইয়ের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র মধ্যযুগের এশিয়ায় চিন্তাশীল লোকেরা কতখানি যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মূলগ্রন্থের লেখক ছিলেন একাদশ শতাব্দীর লোক। পারস্য বা ইরাণ দেশের দুনিয়া-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইমাম মোহাম্মদ গাজুলী (১০৩২-১০৮৭) "কিমিয়া সাঔদতে"র লেখক। যে-কোনো দেশের যে-কোনো লোক যে-কোনো যুগে "কিমিয়া"র বহুকথা যুক্তিসঙ্গত, গ্রহণযোগ্য এবং সর্ব্বদা পালনীয় বিবেচনা করিবেন।

প্রধানতঃ মজুর ও নারীদের বিশেষ পত্রিকাগুলার মারফৎ সমাজ-

তন্ত্রবাদ ও নারীত্বের আন্দোলন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রবেশ করিতেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানব রায় ইত্যাদি লেখকগণ এই শ্রেণীর সমাজ-বিজ্ঞানের প্রচারক। সাধারণ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলাও এই সমস্ত শ্রেণীর সমাজ-কথা-বিষয়ক আলোচনায় ভরপূর। আনন্দবাজার পত্রিকা, পাঞ্চজন্য (চট্টগ্রাম), সোনার বাংলা (ঢাকা), অমৃতবাজার পত্রিকা, অ্যাডভান্স্, ফরোআর্ড, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইত্যাদি পত্রিকার পূজাসংখ্যাগুলাকে তত্ত্বমূলক ও কর্ম্মমূলক উভয়বিধ সমাজ-বিজ্ঞানের চলনসই পরিবেষকরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সমাজ-বিজ্ঞানও সংখ্যা, রাশি, ও মাপজোক সমন্বিত গবেষণা-প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত। পদার্থবিজ্ঞানসেবী প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ কর্ত্তৃক স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটি (১৯৩৪) এবং "সংখ্যা" নামক উহার ত্রৈমাসিক মুখপত্র (ইংরেজিতে) সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক অনুসন্ধান-গবেষণার ক্ষেত্রেও রীতিমত উল্লেখ-যোগ্য।

ভারতীয় ও ইয়োরামেরিকান সমাজ-চিন্তাসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। জার্ম্মাণ হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) হইতে রুশ-মার্কিণ সোরোকিন পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানমূলক চিন্তাধারা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও গ্রন্থপঞ্জী বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক ১৯২৬ সন হইতে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। অধিকন্তু ভারতের দিক্ হইতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কৌটল্য, মনু, শুক্র, চণ্ডেশ্বর, কবিকঙ্কণ, মিত্রমিশ্র, নীলকণ্ঠ, আবুলফজল, রঘুনন্দন, রামদাস, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই পত্রিকার মারফৎ কতকগুলা রচনা প্রকাশ করিয়াছি (১৯৩৫-৩৮)। বিশ্লেষণাত্মক সমাজ-বিজ্ঞানের

অন্তর্গত নৃতত্ত্ব, লোকবিদ্যা, সুপ্রজনন, চিত্তবিজ্ঞান, অপরাধবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি এই পত্রিকাতে স্থান পাইয়া থাকে।

বাংলাদেশে আমেরিকান সোসিঅলজিক্যাল সোসাইটির মত একটা ব্যাপক সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ) স্থাপনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য একটা খাঁটি সমাজ-বিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা পত্রিকারও প্রয়োজন। একমাত্র এইরূপ ব্যবস্থার আবেষ্টনেই বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মত সমাজবিজ্ঞানও শিক্ষিত বাঙালী সমাজের মধ্যে উহার স্বরাজ অর্জ্জন করিতে পারিবে। এইরূপ বিবেচনার প্রভাবে ১৯৩৭ সনে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকের প্রবর্ত্তিত "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ হইতে এই নয়া পরিষদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সেকালের মত একালেও কোনো-কোনো বাঙালী লেখক বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায় লিখিতে অভ্যস্ত। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ সমাজ-বিজ্ঞানের তরফ হইতে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করিতে অগ্রসর। এই চেষ্টায় বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষৎ বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের কনিষ্ঠ ভগ্নী স্বরূপ।

কবি, নাট্যকার, গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক ইত্যাদি সাহিত্যস্রষ্টারা তাঁহাদের রচনাবলীর ভিতর সামাজিক জীবনের গড়ন ও গতিভঙ্গী সম্বন্ধে অনেক-কিছু বলিয়া থাকেন। এই হিসাবে প্রত্যেক কাব্য-নাট্য-আখ্যায়িকারই সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক খতিয়ান করা সম্ভব। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এইসব লেখকেরা সমাজবিজ্ঞানের সেবক। অধিকন্তু তাঁহাদের অনেকে প্রবন্ধ, সমালোচনা ইত্যাদি সাহিত্যের স্রষ্টা। সেই উপলক্ষ্যে তাঁহারা সোজাসুজি সমাজবিজ্ঞানের সেবক সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধলেখক হিসাবে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি সাহিত্যবীর-গণকে এইরূপ প্রত্যক্ষ সমাজবিজ্ঞানসেবী বা সমাজ-শাস্ত্রীর দলেও ঠাঁই দিতে হইবে। বস্তুতঃ ইয়োরামেরিকায় সাহিত্যবীরগণের সমাজ-চিন্তা সমাজবিজ্ঞানসেবীদের একটা মস্ত গবেষণার বস্তু।

ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতমহলে আন্তর্জ্জাতিক সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেস, আন্তর্জ্জাতিক অপরাধবিজ্ঞান-কংগ্রেস, আর আন্তর্জ্জাতিক লোকবল কংগ্রেস ইত্যাদি বিশ্ব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোনো-কোনো কংগ্রেসের সঙ্গে বাঙালী সমাজশাস্ত্রীদের যোগাযোগ আছে। তাহার ফলে বাঙালী গবেষকদের রচনা ও চিন্তাপ্রণালী কিছু-কিছু দুনিয়ায় প্রবেশ করিতেছে। ফরাসী, ইতালিয়ান এবং জার্ম্মাণ ভাষায় ও বাঙালী লেখকের প্রবন্ধাদি এই সূত্রে এবং অন্যান্য উপলক্ষ্যে ইয়োরোপের সমাজবিজ্ঞান ও লোকবিদ্যা বিষয়ক পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ
(১৯৩৭)

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞানপরিষৎ বৈদিক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থের কয়েকটা বচন উদ্ধৃত করিয়া জীবনের ও জ্ঞানবিজ্ঞানের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকে। বচন কয়টা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি
চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলিয়া চলিয়া যে-লোকটা হয়রান হয় না সে কখনো শ্রীলাভ করে না।

চল, চল, চল।

পরিষদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক হইবে।

১৯৩২ সনের ৯ই এপ্রিল "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার অন্যতম শাখার নাম ছিল সমাজ-বিজ্ঞান শাখা। কিন্তু এই পরিষদের কর্ম্মগণ্ডী অতি-বিস্তৃত এবং বিশ্বগ্রাসী। তাই সমাজ-বিজ্ঞানের জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিষৎ প্রতিষ্ঠার কথা পরিচালকগণকে অনেকবার ভাবিতে হইয়াছে।

১৯৩৬ সনের ২৬ ডিসেম্বর "এডুকেশন গেজেট" নামক দ্বৈভাষিক সাপ্তাহিকে বর্ত্তমান লেখকের "সোশিঅলজি ইন্ বেঙ্গল" (বঙ্গে সমাজবিজ্ঞান) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, "এডুকেশন গেজেট" উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালী সমাজশাস্ত্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৬৬ সনে তিনি প্রথম এই পত্রিকার সম্পাদক হন। রচনাটা প্রকাশের পর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের পরিচালকগণ স্বতন্ত্র সমাজবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

পরে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ ১৯৩৭ সনের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষৎ আর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দুই পরিষদেরই পরিচালকবর্গ এক।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-তালিকা নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান গবেষণা চালানো।

২। এইসকল অনুসন্ধান-গবেষণার জন্য বাংলাভাষাকে মুখ্য বাহনরূপে ব্যবহার করা।

৩। গবেষক ও গবেষণা-সহায়ক নিযুক্ত করা এবং তাঁহাদের

রচনাবলীর দ্বারা সমাজবিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাসম্পদ্ ও বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করা।

৪। বাংলাভাষায় সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা।

৫। সমাজবিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা-পত্রিকা-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সার্ব্বজনিক সভায় বক্তৃতার এবং ক্ষুদ্রায়তন পাঠ-চক্রে আলোচনা-তর্কপ্রশ্নের ব্যবস্থা করা।

৬। ভারতীয় বিভিন্ন জনপদের এবং দেশ-বিদেশের নানাকেন্দ্রের সমাজশাস্ত্রী এবং সমাজবিজ্ঞান-পরিষৎ সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করা।

৭। ভারতীয় সমাজশাস্ত্রীদের সঙ্গে বিদেশী সমাজ-শাস্ত্রীদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা।

সমাজ-বিজ্ঞানের সূচীপত্র

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষদের ব্যবস্থায় সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যাকে নিম্নরূপ দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে :—

প্রথম বিভাগ—সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ

১। প্রাতিষ্ঠানিক বা সংস্কৃতি-বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান। পরিবার (বিবাহ-প্রথা), সম্পত্তি, আইন-কানুন, রাষ্ট্র, শ্রেণী, জাত-পাঁত (বর্ণ), রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য দলগঠন, ধর্ম্মব্যবস্থা, দেবদেবী, অপরাধ, আইনভঙ্গ, সমাজ-বিরোধ, সুকুমার শিল্প, বিদ্যা-কলা, রীতি-নীতি, ভাষা ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টিসমূহ সংস্কৃতি বা কৃষ্টির অন্তর্গত। মানবীয় সংস্কৃতির এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সমাজ-বিবৃতি বা সমাজ-চিত্রণ। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকারের আলোচনা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য,—(১) রক্তগত জাতিনির্দ্দেশ, গোষ্ঠী, রক্তগত জাতি-সংমিশ্রণ, রক্তগত জাতি-লোপ, বর্ণ-সঙ্কর, জাত-পাঁতের উঠা-নামা ও ভাঙা-গড়া ইত্যাদি শারীরিক দলসমূহের বৃত্তান্ত, বিশ্লেষণ এবং সংখ্যার সাহায্যে মাপাজোকার ব্যবস্থা, (২) রক্তগত ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জাতিসমূহের শারীরিক গড়ন ও সংস্কৃতিমূলক জীবনভঙ্গীর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা।

(খ) সামাজিক দর্শন ও দর্শনমূলক ইতিহাস। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর গবেষণা উল্লেখযোগ্য,—(১) সামাজিক জীবনে ক্রমবিকাশ, বিবর্ত্তন, উন্নতি-অবনতি, যুগ-পরম্পরা, যুগ-পরিবর্ত্তন, যুগান্তর, গতি, উঠা-নামা, ভাঙা-গড়া, উৎরাই-চড়াই, সাম্য, সামঞ্জস্য, স্থিতি, বিরোধ, বৈষম্য, দূরত্ব, নৈকট্য, সাদৃশ্য ইত্যাদি বস্তু কি তাহার বিশ্লেষণ, (২) বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাসমূহ বা কার্য্যাবলীর ভিতর পরস্পর যোগাযোগ ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। এই দুই প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জনপদের ও বিভিন্ন যুগের মানবীয় সৃষ্টি বা কৃষ্টিসমূহের তুলনামূলক পরীক্ষা প্রধান কথা। সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতি এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী।

২। চিত্তবিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—

(ক) সামাজিক চিত্তবিজ্ঞান ও চিত্ত-বিকার বিষয়ক গবেষণা। মানুষের চিত্ত সামাজিক কার্য্যাবলী ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর কিরূপ গড়ন প্রাপ্ত হয় তাহার আলোচনা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ঝোঁক, প্রকৃতি, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, স্বভাব, দলগত চিত্তের মূর্ত্তি, লোকমত, অনুকরণ, সামাজিক শাসন, নির্জ্জান, গুপ্ত চেতনা, চিত্তদমন,

চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, চিত্ত-বিকৃতি, চিত্ত-বৈষম্য, চিত্ত-ব্যাধি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, সুস্থ ও অসুস্থ চিত্তের সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(খ) সামাজিক চিন্তাপদ্ধতি, যোগাযোগ ও কর্ম্মপ্রণালী এবং সামাজিক গড়ন ও রূপাবলী। এই বিদ্যার আলোচ্য বস্তু দ্বিবিধ,—(১) একাধিক মানুষের ভিতর ব্যবহার ও লেনদেনসমূহের বিশ্লেষণ,—মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং মানুষ হইতে মানুষের অপসারণ ইত্যাদি আন্তর্মানুষিক আচরণ ও যোগাযোগের নানা আকার-প্রকার সম্বন্ধে পরীক্ষা, (২) ভিড়, সমিতি, সভা, পল্লী, শহর, উপনিবেশ, দল, সঙ্ঘ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সামাজিক গড়নের কাঠাম ও কর্ম্মপ্রণালী বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় বিভাগ—সমাজ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড

মানুষকে পুনর্গঠিত করিবার, সমাজকে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে চালিত করিবার এবং দুনিয়াকে নয়া রূপ দিবার যত প্রকার চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে বা চলিতে পারে সেই সমুদয়ের অনুসন্ধান-গবেষণা কর্ম্মমূলক সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতর পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের ভিতর নিম্নলিখিত দফাগুলা এই বিদ্যার অন্তর্গত,—(১) জীবনযাত্রার মাপকাঠি, জাতিগত বা দেশগত আয়, চাষীদের আর্থিক অবস্থা, খাদ্য ও পুষ্টি, ঘরবাড়ী, আরাম-বিরাম, দারিদ্র্য, পেশা, বেকার, লোক-চলাচল, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য, লোকবল, দণ্ড-ব্যবস্থা, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজ-বীমা, রাষ্ট্রিক দলাদলি, নারীত্বের আন্দোলন, মজুরদের দাবী, আন্তর্জ্জাতিকতা ইত্যাদি, (২) আইন-কানুন, শাসন-প্রণালী, আর্থিক সংগঠন, বিবাহ, শাস্তি, নৈতিক জীবন, উপনিবেশ গঠন, আন্তর্ধার্ম্মিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ক সংস্কার ও পরিবর্ত্তনসমূহ।

এই দুই বিভাগের বিভিন্ন দফীয় সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিম্নলিখিত

বিদ্যাসমূহের নিকট আত্মীয়তা ও নিবিড় যোগাযোগ পরিস্ফুট,—(১) প্রাণ-বিজ্ঞান, (২) জলবায়ু-তত্ত্ব ও ভূগোল, (৩) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, (৪) লোকবিদ্যা, (৫) সুপ্রজনন বিদ্যা, (৬) যোনিশাস্ত্র, (৭) রক্তগত জাতি-তত্ত্ব, (৮) ভূ-রাষ্ট্র বিদ্যা, (৯) চিত্ত-বিজ্ঞান, (১০) চরিত্র-বিজ্ঞান, (১১) শিক্ষা-বিজ্ঞান, (১২) অর্থশাস্ত্র, (১৩) রাষ্ট্র-তত্ত্ব, (১৫) অপরাধ-বিজ্ঞান, (১৬) পল্লী-নগর-বিজ্ঞান, (১৭) সংখ্যাশাস্ত্র, (১৮) ইতিহাস, (১৯) দর্শন, (২০) তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সকল বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে যোগ না রাখিলে সমাজ-বিজ্ঞান এক পা ও অগ্রসর হইতে পারে না।

পরিষদের পরিচালনা

পরিষদের পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, যথা :—

১। প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে প্রচলিত সমাজ-বিজ্ঞানের কোনো নির্দ্দিষ্ট মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা কেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিনিধি, অনুবর্ত্তী বা শাখা ইত্যাদিরূপে স্বাতন্ত্র্যশূন্য-ভাবে কর্ম্ম করিবে না। পৃথিবীর সকল প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা কেন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম্ম স্বাধীনভাবে এই পরিষদের আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

২। আর্থিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি কোনো প্রকার সাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে,—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ লিপ্ত থাকিবে না। অতীত ও বর্ত্তমান সকল প্রকার আন্দোলনই এই পরিষদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু থাকিবে।

৩। একমাত্র বাংলা দেশ অথবা একমাত্র ভারতবর্ষ বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-ক্ষেত্র থাকিবে না। গোটা দুনিয়া আর

অবিকশিত, অৰ্দ্ধবিকশিত, পূৰ্ণবিকশিত এবং অতি-বিকশিত সকল প্রকার মানবীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি হইতে এই পরিষৎ তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে।

৪। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ কোনো নির্দ্দিষ্ট মত, পথ ও আলোচনা-প্রণালীর প্রচারক থাকিবে না। সভাপতি, পরিচালক ও গবেষকদের ভিতর কেহই কোনো প্রকার মত, পথ ও গবেষণা-প্রণালী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন না।

বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের তদ্‌বিরে ফরাসী সমাজশাস্ত্রী লাবা, বুথুল, ব্রুণ ও দুপ্রা, ইতালিয়ান সমাজশাস্ত্রী পারেত, জিনি, জর্জ্য দেল ভেক্য ও নিচেফর, চেক সমাজশাস্ত্রী কমেনিউস ও মাজারিক, জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী ট্যেন্নীস, জিম্মেল, ফোন ভীজে, টুর্ণভাল্ড্ হাউসহোফার, বুর্গড্যেফার ও ফোন ব্রক্‌ডর্ফ, ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী হবহাউস, ওয়ালাস, কার্সণ্ডার্স ও গিন্‌স্‌ব্যর্গ এবং মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন, রস, বার্ণস্, হান্‌কিন্‌স্, বোগার্ডুস, ইউব্যাঙ্ক, হকিং ও বার্ণার্ড ইত্যাদি বিদেশী মনীষীদের চিন্তা বাঙালী সমাজে কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে। ভারতীয় লোকবল, পল্লী-নগর, জাত-পাঁত ইত্যাদি বিষয়ক বিশ্লেষণ ও এই পরিষদের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু সুবোধকৃষ্ণ ঘোষালের "সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র" উল্লেখযোগ্য। হরিদাস পালিতের "বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক" বিষয়ক আলোচনায় ভাষার সঙ্গে জাতির যোগাযোগ আলোচিত হইয়াছে। মণীন্দ্রমোহন মৌলিকের "কাজ ও ছুটি" আলোচনায় ইতালির "দপ-লাভর" ব্যবস্থা খুলিয়া ধরা হইয়াছে। "কলিকাতার মগজ" (শচীন্দ্রনাথ দত্ত) এবং "জাত-পাঁতের মাসিক পত্রিকা" (সুশীলেন্দু দাশগুপ্ত),—এই দুই আলোচনায় সমসাময়িক বাঙালী জীবনের বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মারাঠা পণ্ডিত ধোঁদো কেশব কার্ব্বের

সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ১৮ এপ্রিল (১৯৩৮) তারিখে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন অধ্যাপক কার্ব্বে একাশী বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন।

সমাজ-বিষয়ক প্রত্যেক বাঙালী লেখকের নাম করা হইল না। কোনো রচনার ভিতরেও প্রবেশ করা হইল না। কিন্তু এক কথায় বলিয়া রাখি যে, ইয়োরামেরিকায় আজকাল যে দরের আর যে বহরের সমাজবিজ্ঞান আলোচিত হইতেছে তাহার তুলনায় বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান চর্চ্চা নেহাৎ নগণ্য। এই কথা মনে রাখিলে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যুবক বাংলার সুধীবর্গের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিতে পারে।

বাংলা দেশের জন্য অতিশীঘ্র কয়েকজন একনিষ্ঠ গবেষক আবশ্যক। ভারতীয় তথ্যে ও তত্ত্বে পাকাইয়া তুলিয়া তাঁহাদের কয়েক জনকে ফ্রান্সে, কয়েকজনকে জার্ম্মাণিতে, আর কয়েক জনকে আমেরিকায় পাঠানো দরকার হইবে। এইদিকে বাঙালী স্বদেশসেবকগণের দৃষ্টি পড়ুক।

সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যাকে জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী ফোন ভীজের আদর্শ-মাফিক নেহাৎ সঙ্কীর্ণরূপে লওয়া চলিতে পারে। আবার অন্যান্য ইয়োরামেরিকান সমাজশাস্ত্রীদের রীতি মানিয়া লইলে এই বিদ্যার বহর বেশ-কিছু বড় রাখাও চলিতে পারে। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থায় কোনো রীতিকেই পূরাপূরি মানিয়া লওয়া হয় নাই। কাজেই বাঙালী সমাজশাস্ত্রীদের পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু বা কোন্ কোন্ চিন্তা গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয় হাজার-হাজার আর আলোচনা-প্রণালীও গণ্ডা-গণ্ডা এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়

বর্ত্তমানে মাত্র একটা ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি টানিয়া আনিতে চাই। সে হইতেছে উন্নতি-অবনতির কথা, বাড়তি-ঘাট্‌তির কথা। উন্নতি-অবনতি কাহাকে বলে, উন্নতি-অবনতির লক্ষণ কি কি, উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্লেষণ বাঙালী সমাজ-শাস্ত্রীদের অন্যতম গবেষণার বস্তু হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ভারতীয় নরনারীর উন্নতি-অবনতি, আর বিশেষ করিয়া বাংলার নরনারীর বা বাঙালীজাতির উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে পঠন-পাঠন, আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদির চর্চ্চা অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উন্নতি-তত্ত্বের নানা প্রকার অনুসন্ধান বাঙালী সমাজশাস্ত্রীদের মহলে-মহলে বাড়িয়া গেলে আমাদের একটা মস্ত অভাব পূরণ হইবে। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার ক্ষেত্রেও উন্নতিতত্ত্ব বর্ত্তমান লেখকের বিবেচনায় অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৯২৬ সনে এইরূপ গবেষণার সূত্রপাত করা গিয়াছে "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকার মারফৎ। "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থ (১৯৩৪) উন্নতি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ-সাহিত্য বিশেষ। সেই উন্নতি-তত্ত্বেরই অন্যান্য দিক্‌ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের তদ্‌বিরে কিছু-কিছু আলোক ফেলিতে পারা যাইবে বিশ্বাস করি। সামাজিক উন্নতি-তত্ত্বের নানা কথা ইতিমধ্যে "সোশিঅলজি অব পপিউলেশন" (লোকবিদ্যার সমাজশাস্ত্র) গ্রন্থে (১৯৩৬) আলোচনা করিয়াছি।

একটা কথা শুনি, বাঙালী জাতিটা মরিতে বসিয়াছে। সত্যিই কি তাই ? আমরা কি সত্যই অবনতির দিকে যাইতেছি ? বাংলার অনেক জেলাতে আমাকে যাইতে হইয়াছে। আর অনেক জেলার লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতেও চেষ্টা করিয়াছি। দেখিতেছি মাত্র যে যশোহর, নদীয়া আর রাজসাহী বাংলাদেশের একমাত্র "কালো

ভেঁড়া”। কিন্তু আর সব জেলাতেই গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। আর একটা কথা শুনিতে-শুনিতে কাণ ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। আগেকার দিনে লোকেরা অল্প পাশে বা বিনা পাশেও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইতে পারিত। আর এখন অনেক সংসারে গোটা কতক যুবা এম-এ, এম-এস্-সি ইত্যাদি পাশ করিয়াও বসিয়া আছে। কিন্তু একমাত্র বেকারদের নাক শুনিয়া বলা চলে কি যে, বাঙালী জাত আর্থিক অবনতির দিকে যাইতেছে ? সোজা বুঝা যাইতেছে একমাত্র যে, লিখিয়ে-পড়িয়েদের দল ভারি হইতেছে। কিন্তু মাথাপিছু মধ্যবিত্তের সম্পদ্ কমিয়াছে তাহা বুঝিবার কারণ পাওয়া যায় না। গোটা দেশের সংখ্যা ধরিলে বরং উল্টাই বোঝা যায়। মধ্যবিত্তের সুখ-স্বচ্ছন্দতা হয়ত বাড়িয়াছে। বঙ্কিম-যুগে মধ্যবিত্ত লোক বলিতে আমরা যাহাদের বুঝিতাম তাহাদের মত এবং তাহাদের চেয়েও ভাল অবস্থার লোক এই পঞ্চাশ বছরে ঢের বাড়িয়াছে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। এইযে এত সব কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, শিল্প-প্রদর্শনী, সাহিত্য-সম্মেলন হয় এতে লাগে টাকা। মধ্যবিত্তের ট্যাঁকে টাকার জোর বাড়িয়াছে। না বাড়িলে এসব পোষাকি জিনিষ গণ্ডায়-গণ্ডায় চলিত না। আর এত হাজার-হাজার লোক এই সবে মস্‌গুল হইতে পারিত না। অধিকন্তু মধ্যবিত্তের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে।

বাঙালী আজ কোন্ অবস্থায় আছে সে কথাটা বুঝিবার জন্য ১৮৩১ সনে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের উক্তিটা তলব করা যাউক। বিলাতের কমিশনে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল “তোমাদের দেশের লোক কি খায় ?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, “ভদ্রলোকেরা, যাহাদের সংখ্যা খুব কম, তাহারা খায় ভাত, মাছ, তরকারী আর মশলা (ডালের নাম করেন নাই) ; আর সবাই খায় ভাত আর নুন।” ভাত আর নুন একটা অতি-মাত্রায় লম্বা-চৌড়া জীবনযাত্রার উপাদান নয়। ১৮৩১ এর তুলনায়

১৯৩৮এ বাঙালী জাত বড় অবস্থা হইতে ছোট অবস্থায় নামে নাই। যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতেছি খুঁটিয়া-খুঁটিয়া আলোচনা করিলে বুঝিব যে, তাহার মোটকথা ছোট হইতে বড়'য় উঠা। এই সব বিষয়ে বস্তু-নিষ্ঠ আর সংখ্যা-নিষ্ঠ গভীরতর আলোচনা চাই। বর্ত্তমানে মাত্র ঠারে-ঠোরে বলিয়া যাইতেছি। অনেক লোক উন্নতি-অবনতি জরীপ করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন।

এইবার আর এক তরফ হইতে বাঙালী জাতের জরীপ করিব। বাংলার নরনারীকে ভদ্রলোকের "পাতে দেওয়া" যায় কি না, এই প্রশ্নের সমালোচনায়ও অনেক বাঙালীর উঠিয়া-পড়িয়া লাগা উচিত। এ একটা বড় গবেষণার বস্তু। বাঙালীর প্রভাব "অ-বাঙালী" ভারতীয়ের উপর আর অ-ভারতীয় দুনিয়াবাসীর উপর কিছু পড়িয়াছে কি? যদি পড়িয়া থাকে তবে কবে হইতে, আর কতখানি? যদি কোনো বাঙালী পুরুষ বা স্ত্রী অবাঙালীদেরকে কোন প্রকারে প্রভাবিত করিয়া থাকে, যাহাকে দেখিয়া, যাহার কাজ হইতে "অন্য জাতের" লোকেরা বলিয়াছে "হাঁ একটা মানুষ বটে", তাহা হইলে আমি বলিব সেই বাঙালীটা ভদ্রলোকের "পাতে দেবার" উপযুক্ত, সেই বাঙালী "বাপকা বেটা"। অবশ্য বাঙালীর সৃষ্টিশক্তিতে বাংলার নরনারীর,—মায়, বুনো-পাহাড়ী-আদিমদেরও উন্নতি হইয়াছে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি বা কৃষ্টি পাইয়া বাংলার চৌহদ্দির বাহিরের লোকেরা কতটা লাভবান হইয়াছে তাহাই আলোচনার বস্তু। ইংরেজ জাত এমন অনেক মানুষ দিয়াছে, যাহারা না জন্মিলে ইয়োরামেরিকা আর দুনিয়া গড়িয়া উঠিত না। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির বহু সন্তান আছে যাহারা পৃথিবীকে এইভাবে গড়িয়া তুলিতে অনেক সাহায্য করিয়াছে। দুনিয়া এই সব ফরাসী ও জার্ম্মাণের "খাইয়া" মানুষ হইয়াছে। তেমনি এমন কোনো বাঙালী জন্মিয়াছে কি, যে

না জন্মিলে অবাঙালী-ভারত আর অভারতীয়-দুনিয়া দরিদ্র থাকিত? আর জন্মিয়া থাকিলেও কখন কখন? হাজার পাঁচ ছয় বছর আগে, মহেন্‌জোদড়োর যুগে বাঙালী কিরূপ ছিল জানা নাই। বৈদিক যুগের জানা আছে নামজাদা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা, যেটা বোধ হয় প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর আগেকার সাহিত্য। কিন্তু তাহা অবাঙালীর সৃষ্টি। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের আদর্শ পাওয়া যাইত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত গ্রন্থে। বৈদিক সাহিত্যের প্রাণের কথা ছিল দিগ্বিজয়, "অহমস্মি সহমান", "পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি, আমার নাম উত্তর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি জেতা, বিশ্বজয়ী, জগৎ আমায় জানে দিগ্‌বিজয়ী বলিয়া" ইত্যাদি।

এই দিগ্‌বিজয়ের চিন্তায় ও কাজে তখনকার বাঙালীর দান কিছু ছিল কিনা জানা যায় না। সেই সবের সৃষ্টিকর্ত্তা বোধহয় পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া বামুন বা আর-কেহ। তারপর তাদের চেলারা—সেই যুগের "বয়স্কাউট" সব দিগ্‌বিজয় চালাইতে-চালাইতে যখন সদানীরা দরিয়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহারা দেখিল যে, প্রাচ্য ভারতে, বঙ্গ-বিহারে মানুষ নাই, আছে শুধু জঙ্গল। তাহারা ফিরিয়া গিয়া গুরুদেবকে বলিল, "ওদেশের লোকেরা সব পক্ষি-জাতীয় নরনারী, ওরা খালি কিচির-মিচির করে।" দেখিতেছি যে, তার পর সেই সকল পশ্চিমা বামুন, ঋষি, পণ্ডিত ইত্যাদি লোক আসিয়াছিল আমাদের গুরু হইয়া। বাঙালী আমরা আর্য্যামীর অ-আ-ক-খ পাইয়াছি অ-বাঙালীর কাছে। সে যুগে বাঙালীর প্রভাবে অ-বাঙালী মানুষ হয় নাই। বাঙালীরা মানুষ হইয়াছিল অ-বাঙালীর খাইয়া।

শাক্যসিংহ নামক বুদ্ধের নাম আমরা নিই বটে, কিন্তু বুদ্ধদেব বাঙালী নন। বাঙালী বাদশা ধর্ম্মপালের প্রভাব? বাংলার বাহিরের

আবহাওয়ায় ধর্ম্মপালের নাম হোমিওপ্যাথিক ডোজে ছড়ানো আছে মাত্র। অধিকন্তু ধর্ম্মপাল খাঁটি বাঙালী কিনা সন্দেহ। এই সঙ্গে গবেষণার বস্তু—বাঙালী কাহাকে বলে। বিক্রমপুরের অতীশ-দীপঙ্করের নাম করিতে পারি। বলিতে চাই যে, দীপঙ্কর বাপকা বেটা বটে। তিব্বতের উপর তাঁহার প্রভাব জবরদস্ত ও বিস্তর। অতীশ দশম শতাব্দীর লোক। আজও তিব্বতে অতীশের নাম-ডাক জবর।

হিন্দু ছাড়িয়া বাঙালী মুসলমানদের কথা ধরিলেও অবস্থা তথৈবচ। বাংলার মুসলমানেরা অবাঙালী মুসলমানদের খাইয়া মানুষ। বাঙালী মুসলমানদেরকে অবাঙালী মুসলমানদের "পাতে দেয়া" চলিবে না। এই সকল দিকে খোঁজ চলিতে থাকুক।

বাঙালী চৈতন্যদেব বোধ হয় "সমগ্র ভারতের" শ্রদ্ধাযোগ্য ব্যক্তি। কম্-সে-কম্ আসাম ও উড়িষ্যার উপর তাঁহার প্রভাব ছিল ও আছে। অবশ্য তাঁহার সম্প্রদায়েরও আদি গুরু ছিলেন দক্ষিণী মধ্বাচার্য্য। আসল কথা,—শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় স্বীকার করিতে বাধ্য যে, রামমোহন রায়ই হইতেছেন প্রথম বাঙালী মানুষ, যাঁহাকে ইজ্জৎ দিয়াছে গোটা ভারতের নরনারী। এ ত সেদিনের কথা।

বাঙালীরা চিরকাল মুখস্থ করিয়াছে পাঞ্জাবী পাণিনি, কনৌজিয়া বরাহমিহির, মালবীয়া কালিদাস, দক্ষিণী শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি। কিন্তু অবাঙালীরা কেহ কোনো বাঙালীর জিনিষ এমন "নিত্য নৈমিত্তিক-ভাবে" গিলিতে চেষ্টা করিয়াছে কিনা খোঁজ লইয়া দেখা দরকার। এই সঙ্গে বাঙালীর "নব্য-ন্যায়" কতটা বাঙালীর স্বাধীন সৃষ্টি তাহা কষিয়া দেখা আবশ্যক হইবে। অধিকন্তু এই নব্য ন্যায়ের ইজ্জৎ বাংলার বাহিরে কতটা তাহাও পরীক্ষা করা চাই। বাঙালী সমাজে অবাঙালী দর্শনের যে প্রভাব, বাংলার বাহিরে নব্যন্যায়ের প্রভাব ততখানি বা সেই ধরণের কি? বাংলাদেশে প্রচলিত গোটা হিন্দু সংস্কৃতি আর ভারতীয় হিন্দু-

মুসলমানের তৈয়ারী সভ্যতা বোধ হয় প্রায় ষোল আনা অবাঙালীর সৃষ্টি। রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম "ভারত-প্রসিদ্ধ" বাঙালী। বর্ত্তমান যুগে আমরা বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের গৌরব করি; কিন্তু বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরকে কয়টা অবাঙালী চেনে বা চিনিত? অধিকন্তু ইঁহারা ত একালের লোক, আমাদের সমসাময়িক বলিলেই হয়। তাহাতে বর্ত্তমানে বাঙালীর বাড়্‌তি প্রমাণিত হয়,—কিন্তু বাঙালী-জাতের পুরোণো কোষ্ঠীটা ইজ্জদ্‌ পায় না।

বিবেকানন্দ প্রথম বাঙালী যার নাম "তামাম দুনিয়ায়" ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দে'র হুঙ্কারে সারা দুনিয়ার লোক,—সাদা, কালো ও হলদে—সকলে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, দক্ষিণ গঙ্গার কিনারায় একটা জাত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাদের কাজকর্ম্ম না দেখিলে, না জানিলে পৃথিবী দরিদ্র থাকিয়া যাইবে। তারপর হইতেই, বিশেষতঃ ১৯০৫ সনের গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লব হইতেই চলিয়াছে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে —বঙ্গকৃষ্টির, বঙ্গীয় সংস্কৃতির আর বঙ্গসন্তানের দিগ্‌বিজয়। মাত্রাটা অবশ্য অতি ছোট। কুছ পরোআ নাই। কিন্তু বাঙালীর জয়-পরাজয়, আশা-নৈরাশ্যের কাহিনী জগতের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাবে দুনিয়ায় একটা "বাঙালী যুগ" কায়েম হইতেছে।

আজকাল বাঙালীরা নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে-সব গবেষণা করে, তাহার বৃত্তান্ত ফরাসী, মার্কিণ, বিলাতী, জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, জাপানী কাগজে প্রকাশিত ও বিবৃত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে বিদেশীরা নিজেদেরকে খানিকটা অসম্পূর্ণ মনে করে। ভারতের নানা কেন্দ্রে যে-সব শিল্প-সম্মেলন, বিজ্ঞান-সম্মেলন, সাহিত্য-সম্মেলন, রাষ্ট্র-সম্মেলন, মজুর-সম্মেলন হয়, এসবের বৃত্তান্ত যদি ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে পাঠানো যায় তাহা হইলে, এই সকল দেশের লোকেরা সে

সব গ্রহণ করিবে, প্রকাশ করিবে, পাঠ করিবে, সমালোচনা করিবে। এইসকল ভারত-সংবাদে বাঙালীর গন্ধও কিছু-কিছু থাকে বলা বাহুল্য।

১৯৩৬ সনে সারা দুনিয়ায়, ইয়োরামেরিকায়, চীন-জাপানে, আফ্রিকায় রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে! যে সময় বাঙালীরা নৈরাশ্যে হাবুডুবু সেই সময়েই দিকে-দিকে একটা নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্য ভিত্তি গাড়িয়াছে বাঙালী জাতের দৌলতে। অর্থাৎ পাঞ্জাবী বা কনৌজিয়া ঋষিদের "অহমস্মি সহমান" মন্তরটা আজ বাঙালী ঋষিদের রপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বাণী আজ সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হইতেছে বাঙালীর মুখে। অর্থাৎ বাঙালীরা আজ দিগ্‌বিজয়ী।

এই সব দেশী-বিদেশী বঙ্গ-প্রভাব আজও নেহাৎ সামান্য। এই সবের কিম্মৎ বড় বেশী নয়। তাহা লইয়া লাফালাফি করিবার কিছু নাই। তথাপি যদি আমাকে কেহ বলে বাঙালী মরিতে বসিয়াছে, তাহা হইলে আমি বলিব বিলকুল উল্টা। আমি বলিব যে, আর্থিক ও আত্মিক পথে এতটা উন্নত অবস্থা বাঙালীর কখনও ছিল কিনা সন্দেহ। সমাজ-শাস্ত্রীরা সকলেই যাঁহার যেরূপ মর্জ্জি মাপকাঠি লইয়া জরীপ সুরু করুন। এই দিকে অনেকগুলা গবেষণা সুরু হইলে সুখের কথা হইবে।

তবে আমরা উন্নতির বা বাড়তির চূড়ায় গিয়া ঠেকিয়াছি এরূপ বুঝা ভুল হইবে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার অবস্থা এখনও আসে নাই। অবশ্য সে অবস্থা কোনো জাতির পক্ষে কোনো দিন আসে না। বৈদিক ঋষিই আবার বলিয়াছেন "অসতো মা সদ্গময়।" প্রতি মুহূর্ত্তেই নতুন "সৎ", নতুন "জ্যোতি", আর নতুন "অমৃতের" জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, খাটিতে হইবে, সাধনা চালাইতে হইবে। মানুষ যত বড়ই হউক, যত উঁচুই হউক, তাহার পক্ষে স্বাধীনতার, আলোর, উন্নতির চরম বলিয়া কিছু নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে নতূন স্বাধীনতার জন্য, নতুন জ্যোতির জন্য, নতুন দিগ্‌বিজয়ের জন্য লড়িতে

হইবে। হরেক মুহূর্ত্তেই চাই নয়া ঢঙের নয়া সাধনা অর্থাৎ নয়া-নয়া লড়াই।

স্বদেশী যুগে,—১৯০৯-১১ সনে,—কোনো উপলক্ষে বলিয়াছিলাম যে, বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস নাই। রাজপুত, শিখ, মারাঠা, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি জাতির মত বাঙালী জাতি রাষ্ট্রিক কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গৌরবপূর্ণ কিছু দেখাইতে পারে না। "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ" গ্রন্থে সেই মতটা খোদা আছে। তখনও বাংলাদেশে বাঙালী জাতির রাষ্ট্রিক ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সময়ে গবেষণার সূত্রপাত হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা ১৯১১-১৯১২ সনে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী সুধীরা নানা প্রকার গবেষণা চালাইতেছেন। আজ এই সকল গবেষণার ফলে বলিতে বাধ্য যে, সেই পুরাতন মতটা অনেকাংশে ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা আনন্দের কথা। এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, বাংলার নরনারীরও রাষ্ট্রিক ইতিহাস আছে। এই বিষয়ে সন্দেহ করা চলিবে না।

বর্ত্তমানে বলিতেছি অন্য ধরণের কথা। সমস্যা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ বাঙালী জাত অবাঙালী-ভারতীয় নর-নারীকে রাষ্ট্রে, শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিনা, আর করিয়া থাকিলে কতখানি? দ্বিতীয়তঃ, অভারতীয়-দুনিয়ায়,—যথা এশিয়ায়,—বাঙালীর রাষ্ট্রশক্তি, শিল্পশক্তি, অর্থশক্তি, বিদ্যাশক্তি, কলাশক্তি ইত্যাদি শক্তিসমূহ, এক কথায় বঙ্গ-সংস্কৃতি, প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা, আর করিয়া থাকিলে কতখানি?

প্রত্নতত্ত্বের অতি-ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বলিয়া দিলাম যে, আসাম ও উড়িষ্যায় বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় কিছু-কিছু দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে গবেষণা সুরু হইলে আরও অনেক-কিছু বাহির হইয়া পড়িবে বিশ্বাস করি। ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম সকল

জনপদেই হয়ত বঙ্গীয় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছু-কিছু চিহ্নোৎ রাখিয়া ছাড়িয়াছে। অধিকন্তু ভারতের বাহিরে, বর্ত্তমানে একমাত্র তিব্বতে, বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের পথে বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় জাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপময় ভারতে সাধিত হইয়াছে কিনা খতাইয়া দেখা আবশ্যক। তাহা ছাড়া ঘরের কোণে ব্রহ্মদেশ। এই জনপদেও বঙ্গ-প্রভাব বার্ম্মাণ জীবনের কোনো কোনো বিভাগে হয়ত লক্ষ্য করা সম্ভব। ভারতের বহির্ভূত এশিয়ার কোন্ কোন্ মুল্লুকে "বৃহত্তর বঙ্গ" জারি ছিল তাহার গবেষণা বিশেষ জরুরি। বৃহত্তর ভারতের পুষ্টিসাধনে বৃহত্তর বঙ্গের হিস্যা কিছু-কিছু ছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন-তারিখ সহ অকাট্য প্রমাণের জোরে সেই হিস্যাটা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। এই দুই দিক্‌কার কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙালী জাতির প্রাচীন ও মধ্য যুগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যেসকল মত প্রচার করিতেছি তাহা হয়ত বদলাইতে পারিব।

বঙ্গের বাহিরে বাঙালীরা ভারতবর্ষের ভিতর কোথায় কবে কতখানি সৃষ্টিশক্তি দেখাইয়াছে তাহার বস্তুনিষ্ঠ খতিয়ান চাই। অধিকন্তু ভারতের বাহিরে বাঙালী স্রষ্টারা কোন্ যুগে কতটা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের পরিচয় দিয়াছে তাহারও হিসাব নিকাশ আবশ্যক। এই দুই দিকেই বর্ত্তমানে কিছু-কিছু ঠারে-ঠোরে বলা চলে মাত্র। বিষয়টার দিকে কোনো সুনিয়ন্ত্রিত চর্চ্চা অনুষ্ঠিত হইতেছে এরূপ বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙালী জাতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার বেলায় বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে-করিতে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের শরণাপন্ন হইতে হইল। উন্নতিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য আর বিশেষতঃ বাংলার নরনারীর উন্নতি-অবনতি জরীপ করিবার জন্য

ঐতিহাসিক মালমশলার দিকেও নজর ফেলা আবশ্যক। সমাজ-বিজ্ঞানের পক্ষে ইতিহাস-নিরপেক্ষ আর প্রত্নতত্ত্ব-নিরপেক্ষ হওয়া চলিবে না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে কলা দেখাইলে সমাজ-শাস্ত্রীদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে।

অন্নপূর্ণার হাঁড়ী

বাড়তি বা উন্নতির গোড়ায় আর একটা সমস্যা আছে। পূর্ব্বেই একবার সেকথা উল্লেখ করিয়াছি। সন্দেহ উঠিয়াছে—বাঙালী জাতটা বাঁচিবে কিনা। বাংলার নরনারী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে,—না খাইয়া মরিতে-মরিতে আজ-না-হয়-কাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে, এই ধরণের সন্দেহ একালের বাঙালী পণ্ডিতদের পেটে ঢুকিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান জগতে "বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়" সম্বন্ধে,—একালের দুনিয়ায় "বাঙালীর যুগ" প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে—যে লোকটা বকিতে চায় তাহার পক্ষে বাঙালী জাতের মরা-বাঁচার কথাটা আগে সমঝিয়া লওয়া আবশ্যক। খুব সোজা যুক্তি লওয়া যাউক। ভাতের অর্থশাস্ত্রে প্রবেশ করিতেছি। কেন না বাংলার নরনারী—প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন-ধারণ করে। অবশ্য ডাল, শাকসব্জী, তরকারী, মাছ, ফল, দুধ, মাংস, ডিম, গম, যব, ভুট্টা গুড়, তেল, ঘী ইত্যাদি কোনো বাঙালী বৎসরের কোনো দিন কোনো বেলা চোখে দেখে না এরূপ বুঝিতে হইবে না। অধিকন্তু বাংলার নরনারী একদম কপর্দ্দকহীন এরূপ বুঝিবারও কারণ নাই। দরকার হইলে ট্যাঁকের কড়ি খরচ করিয়া জীবন ধারণের জন্য নানা জিনিষ খরিদ করিতে আর বিদেশ হইতে আমদানি করিতেও অনেক বাঙালী সমর্থ সন্দেহ নাই। দারিদ্র্যের প্রকোপ যতই হউক না কেন ১৯৩০-৩৮ সনের বাঙালীকে একমাত্র চাউল-সম্বল বিবেচনা করিলে অ-বাস্তবের উপর ভর করিতে

হইবে। তাহা করিবার দরকার নাই। তথাপি সম্প্রতি একমাত্র চাউলের পরিমাণ দেখাইয়া বাঙালী জাতের পরমায়ুটা কষিয়া দেখিব।

অতএব একবার বাংলা দেশের জেলায়-জেলায় পাঁয়-চারি করিয়া আসা যাউক। অধিকন্তু সরকারী চাষ-বিবরণীও আছে,—যদিও অপ্রকাশিত। তাহাতে জানা যায় কোন্ জেলায় কত চাউল আজকাল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কোন্ জেলায় লোকসংখ্যা কত তাহাও জানা আছে। আলোচনা-প্রণালী বুঝাইবার জন্য কয়েকটা মাত্র জেলার বৃত্তান্ত দিয়া যাইতেছি। সবই মোটা হিসাবের কারবার। সূক্ষ্মতর হিসাব চালাইলে পূরাপুরি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ লেখা হইয়া পড়িবে। সেদিকে সমাজ-বিজ্ঞানের তরফ হইতে সম্প্রতি পা বাড়াইতে চাই না। কয়েকটা অর্থনৈতিক সংখ্যা সমাজ-বিজ্ঞানের আখড়ায় ফেলিয়া সামাজিক উন্নতি তত্ত্বের বনিয়াদ যে জীবন-মরণ তত্ত্ব সেই জীবন-মরণ তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ কাঠামটা দেখাইব মাত্র। এইদিকে গবেষকদের নজর টানিয়া আনাই প্রধান মতলব। আমার মতামত কাহাকেও বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করিয়া লইতে বলিতেছি না।

মেদিনীপুর জিলায় ২৮ লাখ লোক। এখানে চাউল উৎপন্ন হয় ৩৭০ লাখ মণ। কিন্তু খাদক হিসাবে এই জেলার লোকসংখ্যা কত? আমার বিবেচনায় ২৮ লাখ লোক ধরা চলিবে না। কেননা সাধারণতঃ ১৫ বৎসর বয়সের যাহারা নীচে তাহাদিগকে আধা-মানুষ ধরিতে হইবে। আবার বৎসর ৫৫ যাহারা পার হইয়াছে তাহারাও প্রবীণ (অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের) লোকের আধা-আধি খায় এইরূপ ধরা যাইতে পারে। আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে ১৫ বৎসর বয়সের নীচের শিশু ও ছেলেমেয়েরা আর ৫৫ বৎসর বয়সের উপরের বুড়া-বুড়ীরা গুন্‌তিতে ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়সের স্ত্রীপুরুষের প্রায় সমান। অর্থাৎ ১৫—৫৫ বয়সের লোক ২৮ লাখের

অর্দ্ধেক বা ১৪ লাখ। অন্যান্য বয়সের লোকেরা ১৪ লাখ। কিন্তু খাদক হিসাবে তাহারা আধা মানুষ। কাজেই গুন্‌তিতে তাহারা ৭ লাখ মাত্র। সুতরাং মেদিনীপুর জেলায় লোকসংখ্যা ২৮ লাখ হইলেও খাদক হিসাবে সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৪ লাখ আর ৭ লাখ অর্থাৎ ২১ লাখ মাত্র। অতএব দেখিতেছি যে, ২১ লাখ লোকের জন্য মজুত ৩৭০ লাখ মণ। গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু প্রায় দুই সেরের কাছাকাছি পড়িতেছে।

এই ধরণের হিসাব চালাইলে নোয়াখালি জেলায় মাথা পিছু চাউল পড়ে দৈনিক ১$\frac{৩}{৫}$ সের। দিনাজপুরে পড়ে ১$\frac{২}{৫}$ সের, ফরিদপুরেও ঐরূপ। জলপাইগুড়ি আর ময়মনসিংহে ইহার চেয়ে সামান্য কম, আর বাখরগঞ্জে কিছু বেশী। চব্বিশ পরগণায় আর ঢাকা জেলায় গড় দৈনিক মাথাপিছু দাঁড়ায় $\frac{৪}{৫}$ সের অর্থাৎ একসেরের কিছু কম। বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এই চার জেলায় গড় একসের। ইত্যাদি। সব কয়টা জেলার হিসাব দেওয়া বর্ত্তমানে উদ্দেশ্য নয়। কোনো কোনো জেলায়—যথা হুগ্‌লি—বেশ-কিছু কম উৎপন্ন হয়।

বাঙালী স্ত্রীপুরুষেরা,—১৫-৫৫ বৎসর বয়সের প্রবীণদের কথা বলিতেছি,—এক এক বেলা কতটা চাউলের ভাত খায় এই সম্বন্ধে পাকা গবেষণা আজও হয় নাই। পাড়ায়-পাড়ায় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া অনুসন্ধান চালানো উচিত। কেন না পেশা হিসাবে, রুচি হিসাবে বরাদ্দ বিভিন্ন। প্রবীণ লোকদের কেহ খায় ফি বেলা আধপোআ চালের ভাত, কেহ খায় এক পোআ, কেহ দেড় পোআ, কেহ আধসের। শুনিয়াছি কাহারও কাহারও মাত্রা তিন পোআ আর এমন কি এক সের পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে। জেলখানায় কয়েদিদের জন্য গড় হিসাব দেড় পোআ। বুঝিতেছি যে, বৈচিত্র্য আছে ঢের। এই সম্বন্ধে পাঁচ, চার বা সাড়ে তিন-কোটি লোকের উপর আন্দাজ চালাইতে যাওয়া অতি-সাহসের কাজ। একসেরি পালোয়ান বাংলা দেশের চাষী বা মজুর মহলে কত হাজার

গুনিয়া দেখা মন্দ নয়। আবার জেল-কয়েদিদের মত দেড়পোআ-খোরাকওয়ালা লোক কয় লাখ তাহাও জানিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বহু জেলার বহু লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইয়া বুঝিয়াছি যে, বোধহয় মাথা পিছু ফি বেলা পোআটেক চাউলের হিসাব ধরা চলিতে পারে। এই আন্দাজেও ভুলচুক থাকিবার কথা। তবে একপোআ অসম্ভব-কমও না, অসম্ভব-বেশীও না।

যাহা হউক এক-এক বেলা এক-এক পোআ ধরিলে জনপ্রতি চাউল দরকার হয় রোজ আধসের। কিন্তু যে-কয়টা জেলার বৃত্তান্ত দেওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সব জেলায়ই মাথাপিছু দৈনিক গড় একসেরের বেশী ছাড়া কম নয়। অবশিষ্ট জেলাগুলার অবস্থাও এইরূপই দেখিয়াছি। দুইএক জেলায় কিছু কমও হয়। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, না খাইয়া মরিবার অবস্থায় অধিকাংশ জেলার নরনারী আসিয়া দাঁড়ায় নাই।

অবশ্য আরও সূক্ষ্ম বিচার চালানো উচিত। জেলায়-জেলায় আমদানি-রপ্তানি আছে, প্রদেশে-প্রদেশে আমদানি-রপ্তানি আছে। তবে এই কথাও জানিয়া রাখা ভাল যে, যে জেলায় কম উৎপন্ন হয়, আমদানি-রপ্তানির ফলে সেই জেলার লোক চাউলের অভাবে মরে না। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত গোটা বাংলা দেশের পাঁচকোটী দশ লাখ লোকের জন্য কত চাউল দেশের ভিতর থাকিয়া যায় তাহার পরিমাণও বাহির করা আবশ্যক। সেই সব দিকেও কিঞ্চিৎ-কিছু অঙ্ক কষিয়া দেখিয়াছি। বাঙালী স্বদেশ-সেবকদের পক্ষে এই দিকে মাথা খাটানো আবশ্যক। এই বিষয়টা অর্থনৈতিক গবেষণার যোগ্য বস্তু। অনেকগুলা মাথা এই দিকে খেলিলে ভাল হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সংক্ষেপে বলিয়া যাইতেছি।

বাঙালী জাতের পাঁচকোটি দশলাখ নরনারীর ভিতর আসল খাদক

কত তাহা বাহির করিবার জন্য আগেকার কায়দা খাটাইব। সেই কায়দা খাটাইয়া পাই ২ কোটি ৫২ লাখ আর ১ কোটি ২৬ লাখ, মোটের উপর ৩ কোটি ৮২ লাখ মাত্র। জনপ্রতি আধসের করিয়া রোজ ধরিলে এই তিন কোটি সওয়া আট লাখ নরনারীর জন্য চাই ৬০ লাখ টন চাউল। কিন্তু বাংলাদেশে চাউল উৎপন্ন হয় ৮৮ লাখ টনের বেশী। হিসাব বুঝিবার জন্য ২৮ মণে টন লইতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, মানুষের উদরসাৎ হইবার পরেও চাউল বেশ কিছু বাঁচে। এইবার বলিব যে, চাষীদের জন্য ক্ষেতের বীজ আবশ্যক হয়। বিঘা প্রতি লাগে আন্দাজ সাড়ে তিন সের। প্রায় ২২ লাখ একরের জন্য (১ একর = ৩ বিঘা) চাই আড়াই লাখ টনের কিছু কম। দেখা যাইতেছে যে, চাষের জন্য নেহাৎ অল্প মাত্র বীজ আবশ্যক হয়। তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বাংলা দেশ হইতে রপ্তানি হয় যত চাউল, তাহার পরিমাণ নেহাৎ কম। বিদেশ হইতে যে চাউল আমদানি হয় তাহার হিসাব করিলে রপ্তানিও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

আসল কথা, বাঙালীর খাই-খরচায় যত লাগে তাহার চেয়ে বেশ-কিছু বেশী চাউল বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় এবং থাকিয়া যায়। অর্থাৎ দরকার হইলে কয়েক লাখ লোককে ফি বেলায় এক পোআর ঠাঁইয়ে এমন কি দেড় পোআ পর্য্যন্ত দিলেও বঙ্গজননীর হাঁড়ী অন্নপূর্ণার হাঁড়ীই থাকিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বাঙালী যত গরীবই হউক, বাংলাদেশে ভাতের পরিমাণ সমগ্র জাতের পক্ষে কম নয়। ভাতের অভাবে বাঙালীকে মরিতে হইবে না। ভাত ছাড়া অন্যান্য জিনিষও অবশ্য আছে ধরিয়া লইয়াছি। তবে "দুধে ভাতের" অবস্থা যাহাকে বলে বাঙালী সেই স্বর্গ-সুখে নাই। কিন্তু আজও "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা ভরা আহ্লাদে।" দারিদ্র্য ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও অনেক দিন থাকিবে। তবে মরিবার অবস্থা এ নয়। সাহসের সহিত

দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া চলা কর্ত্তব্য। দারিদ্র্য-বিহীন সম্পদ্ আর লড়াই-বিহীন উন্নতির কল্পনা করা অসাধ্য।

জেলার ভিতর অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট চাউল উৎপন্ন হইলেই যে হরেক জেলার প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজ নিজ পেট পূরিবার মতন ভাত পাইবে এমন কোনো কথা নাই। কেননা দুইবেলা আঁচাইবার যোগ কোনো লোকের কোষ্ঠীতে লেখা আছে কিনা তাহা পল্লী-কিষাণের উৎপন্ন চাউলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাহা নির্ভর করে প্রত্যেক লোকের রোজগার করিবার ক্ষমতার উপর। আর রোজগারের পরিমাণের উপর। ধন-বিতরণ বা সম্পদ্-বণ্টনের মামলায় আসিয়া পড়িলাম। রোজগারের স্থযোগ যদি না থাকে অথবা মেহনতের মাপে রোজগার যদি না জুটে তাহা হইলে বাড়ীর পাশে মুদীর দোকানে মণ-মণ চাউল বস্তাবন্দি হইয়া পচিলেও,—হাজার-হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মরিতে পারে। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিবামাত্র জেলার ভিতর কোথাও চাউল নাই অথবা বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয় না যখন-তখন এরূপ সমঝিয়া রাখা ঠিক হইবে না। "না" "না" করিতে-করিতেও শেষ পর্য্যন্ত ধনবিজ্ঞানের আসল সমস্যার ভিতরই আসিয়া পড়িলাম। যাহা হউক, বুঝা গেল যে, ধনবিজ্ঞানের কোনো-কোনো কোঠে আসিয়া সমাজশাস্ত্রীদিগকেও মাঝে-মাঝে পাঁয়তারা ভাঁজিতে হয়। বাংলায় সমাজবিজ্ঞানের আলোচনাকারীদের পক্ষে ধনবিজ্ঞানসেবীদের সঙ্গেও ভাব রাখিয়া চলা দরকার হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শ্যাল মিউজিয়াম হইতে প্রকাশিত "কম্পেণ্ডিয়াম" বিবরণীতে (১৯৩৬) বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ দেওয়া আছে। সম্পাদক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে, অঙ্কগুলা বাংলা সরকারের কৃষি-দপ্তরের অপ্রকাশিত তথ্য ও সংখ্যা-তালিকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

সমাজ-বিজ্ঞান কি ?

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম, এ
গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ,
সহ-সম্পাদক, "সমাজ-বিজ্ঞান"

যে বিদ্যা একাধিক ব্যক্তি বা দলের নানাপ্রকার ঘটনাবলীর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করে দেয় তাকে সমাজ-বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তি কেমন করে একত্রিত হয়ে সঙ্ঘ বা দল গড়ে তোলে, কোন ভাবের দ্বারাই বা তারা একত্রিত হতে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে এই সবই সমাজ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়। কোনও দল সম্বন্ধে কোনও বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে প্রথম দেখতে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তারপর দেখ্‌তে হবে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধ কতটুকু। কিন্তু শুধু এইটুকু দেখলেই চল্‌বে না। মানুষের সংস্কৃতির বা কৃষ্টির ইতিহাস দেখতে হবে এবং জীবন যাপন প্রণালী দেখ্‌তে হবে। তা ছাড়া সমাজ-বিজ্ঞান প্রাণি-বিজ্ঞানের সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত।

জন্ম গ্রহণ করবার পর প্রভাব শূন্য অবস্থায় মানুষের মনোবৃত্তি কেমন থাকে ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কি করে মানুষ সমাজের সঙ্গে নিজের মনোবৃত্তির খাপ খাইয়ে চলতে চলতে একটা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় তাহাও আলোচনার বস্তু। গার্হস্থ্য জীবন, ধর্ম্ম, শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা, শিল্প, কলা এই সমস্তই সমাজ-বিজ্ঞানের বিচার্য্য বিষয়। এক কথায়, একাধিক ব্যক্তির দল-বিষয়ক প্রত্যেক জিনিষটাই সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

সমাজ-বিজ্ঞান এই সব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের ভিতরকার সম্বন্ধ বাহির করে, তাদের উৎপত্তির কারণও নির্ণয় করে দেয়। বস্তুতঃ, সমাজ-বিজ্ঞানের গণ্ডী এতই বিস্তৃত যে এই বিদ্যা মানুষ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানকেই নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে।

১৯৩২ সন হতে বিনয় বাবুর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের সমাজ-বিজ্ঞান শাখায় এবং ১৯৩৭ সন হতে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদে কিরূপ বিষয়ের অলোচনা হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলেই সমাজ-বিজ্ঞানের সূচীপত্র ও চতুঃসীমা সম্বন্ধে সহজেই ধারণাটা স্পষ্ট হতে পারে।

নিম্নে আলোচিত বিষয়ের একটা তালিকা দেওয়া গেল।

আলোচিত বিষয়গুলিকে সমাজ-দর্শন, সমাজ-বিশ্লেষণ, নৃতত্ত্ব, দেশী-বিদেশী সমাজ-শাস্ত্র, অর্থনীতি, শিক্ষা-তত্ত্ব, লোক-বিদ্যা, অপরাধ-বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের সমাজ-কথা ইত্যাদি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সমাজ-দর্শন ও সমাজ-বিশ্লেষণ

সমাজ-দর্শন ও সমাজ-বিশ্লেষণ বিষয়ক আলোচনার ভেতর প্রথম পাঁচটার আলোচনাকারী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। "১৯০৫ সনের ধারণা ও মতবাদ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম জগতের উপর তাহাদের প্রভাব" সম্বন্ধে ১৯৩২ সনের ১৬ই অক্টোবর একটা আলোচনা হয়েছিল। তারপর আবার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২ সনে 'সামাজিক ঘটনায় পরস্পর-সম্বন্ধের সমস্যা' বিষয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় আলো-চনার বিষয় ছিল 'সমাজ-শাস্ত্রের বিষয়-সূচী' (২৬শে মে ১৯৩৪)। চতুর্থ আলোচনার বিষয় 'সামাজিক স্তর-বিন্যাসের তুলনা-সাধন' (৩রা আগষ্ট ১৯৩৫)। ১৯৩৬ সনের ১৫ই অক্টোবর 'মালথাস্-তত্ত্ব, মালথাস্-বিরোধী মত ও নবীনীকৃত মালথাস্-বাদ' সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

১৯৩৭ এর ৩রা অক্টোবর অ্যাড্‌ভোকেট কেশব গুপ্তের আতিথ্যে পরিষদের সভ্য ও সহযোগী এবং বন্ধুগণ বর্ত্তমান যুগের সমাজ-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহাতে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান সম্মেলন সম্বন্ধে বিনয় বাবু কর্ত্তৃক বৃত্তান্ত প্রদত্ত হয়।

১৪ই অকৃটোবর ইতালির তিব্বত-পর্য্যটক তুচ্চি সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ হতে ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানীর ম্যানেজার সতীন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক ইম্পীরিয়াল রেষ্টরাণ্টে অভ্যর্থিত হন। সেই উপলক্ষে ইতালির সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি-বিনিময় আলোচিত হয়।

১৯শে ডিসেম্বর দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছিলে ঃ—"কলিকাতার মগজ" (শচীন দত্ত) আর "জাত-পাঁত বিষয়ক বাংলা পত্রিকা" (সুশীলেন্দু দাশ গুপ্ত)।

নৃতত্ত্ব

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বসুদ্ধ আলোচনা হয়েছে নয়টি। ১৯৩২ সনের ২৮শে ডিসেম্বর 'গ্রাম-প্রতিষ্ঠায় মালদহের শেরসাবাদিয়া মুসলমান' নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করা হয় (হরিদাস পালিত)।

১৯৩৩ এর ২৩শে এপ্রিল আলোচনার বিষয় ছিল "একালের বৃহত্তর ভারত এবং বহির্গামী ভারত-বাসীর জাতি-ও শ্রেণী-সমস্যা" (বিনয় সরকার)। 'রাঢ়ী বাংলার আদিম জাতি' সম্বন্ধে একটি আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৪ (হরিদাস পালিত)। ২৫শে আগষ্ট ভারতীয় শ্রেণী-ও জাতি-সংমিশ্রণে সামাজিক গতিশীলতা সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি বক্তৃতা করেন।

১৯৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী 'নয়া বাংলার সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুদয়' সম্বন্ধে বিনয় বাবুর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে আগষ্ট 'সাঁওতাল-দের বাঙ্গালীকরণ' সম্বন্ধে হরিদাস পালিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৩রা নবেম্বর 'পশুবলির নৃতত্ত্ব' সম্বন্ধে ডাঃ সরসীলাল সরকার একটি আলোচনা করেন। ১৭ই নবেম্বর আলোচনা হয়েছিল বাংলার জাত-পাঁত সম্বন্ধে। আলোচনা করেন ডাঃ ভূপেন দত্ত। ১৯৩৬ সনের ২৭শে জুলাই অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস "বাঙালী বৈশ্যের অগ্রগতি" সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯৩৭ সনের ১৪ই এপ্রিল বিনয় বাবু "আজকালকার উন্নতিশীল জাতি ও শ্রেণী" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

দেশী-বিদেশী সমাজ-শাস্ত্র

দেশী-বিদেশী সুধীগণের চিন্তাপ্রসূত সমাজ-শাস্ত্র সম্বন্ধে বহুসংখ্যক আলোচনা ও বিশ্লেষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩২ সনের ১৯শে নবেম্বর জার্ম্মাণ কবি গ্যেটের সমাজ-চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা হয় (বিনয় সরকার)।

১৯৩৩ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জ্জাতিকতা বিশ্লেষিত হয় (বিনয় সরকার)। ২রা জুলাই অষ্ট্রিয়ান সমাজশাস্ত্রী স্পানের "যথার্থ রাষ্ট্র",ইতালির সমাজশাস্ত্রী নিচে-ফোরোর "দরিদ্র শ্রেণীর নৃতত্ত্ব" এবং ফরাসী সমাজশাস্ত্রী বুগ্‌লের "মূল্যের ক্রমবিকাশ" আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয় সরকার)। ১৩ই আগষ্ট সতীশ মুখোপাধ্যায় এবং ডন সোসাইটীর সমাজ-চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা হয় (বিনয় সরকার)। ১০ই সেপ্টেম্বর 'সমাজ-চিন্তায় হব্‌হাউস্ ও মিল' সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয়েছিল (বিনয় সরকার)। ২৬শে নবেম্বর মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী পার্মেলের অপরাধ-বিজ্ঞানে সামাজিক উদারতা সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয়েছিল (পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়)। ঐ দিনই পঙ্কজ বাবু মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী হানকিন্‌সএর "সভ্যতায় রক্তগত জাতির ভিত্তি" সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেন। ১৯৩৩ সনের ২৩শে ডিসেম্বর ভূদেব, বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

এই তিনজন বাঙালী সমাজশাস্ত্রী সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয়েছিল (বিনয় সরকার)।

১৯৩৪ সনের ১৩ই জুলাই মার্কিণ দার্শনিক ডিউয়ীর 'সমাজ-দর্শনে শিল্পশিক্ষা' আলোচ্য বিষয় ছিল (ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত)। ১৬ই সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণ টোন্নীস, ফরাসী দুরখাইম ও ইতালিয়ান পারেতোর সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনা করা হয় (বিনয়কুমার সরকার)। ১৯৩৪ সনের ১৩ই অক্টোবর বৈদিক সমাজ-শাস্ত্রের "অহমস্মি সহমান", পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং "চরৈবেতি" এই তিন তথ্য নিয়ে একটি আলোচনা হয় (বিনয়কুমার সরকার)। ১৯৩৪এর ২৪শে নবেম্বর 'সমাজ-শাস্ত্রে অর্থশাস্ত্রী মার্শ্যাল ও কানান্' আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয় সরকার)। ১৯৩৪ সনের ২৩শে ডিসেম্বর 'ইবন খালদুনের মোকদ্দমা ও আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি' সম্বন্ধে আলোচনা হয় (বিনয়কুমার সরকার)।

১৯৩৫ সনের ৫ই জানুয়ারী মার্কিণ দার্শনিক ডিউয়ী ও হকিংয়ের সমাজচিন্তা সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয় (বিনয় সরকার)। ডাঃ দেবেন দাশগুপ্ত ফ্রান্সে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে ১৭ই ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা করেন। বাঙালী মুসলমানদের সমাজ-চিন্তা আলোচিত হয় ১২ই জুন (বিনয় সরকার)। ৮ই সেপ্টেম্বর আলোচিত হয় ভারতীয় ভাষার ইয়োরোপীয় গবেষকগণের গ্রন্থাবলী (অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়)। ২৬শে অক্টোবরের আলোচনার বিষয় ছিল বৌদ্ধ সমাজতত্ত্বের ভদ্দেকরত্ত এবং বোধিসত্ত্ব (বিনয়কুমার সরকার)। এই বৎসরের ৬ই নবেম্বর বৃটিশ শিক্ষা-ব্যবস্থার সামাজিক লক্ষ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয় (দেবেন দাশগুপ্ত)। ১৮ই ডিসেম্বর জার্ম্মাণ পণ্ডিত মাইনেকের "রাষ্ট্রের স্বার্থ" এবং ইতালিয়ান পণ্ডিত রেদানোর "নীতিমূলক রাষ্ট্র" বই দুইটার বিশ্লেষণ করা হয় (বিনয়কুমার সরকার)।

১৯৩৬ সনের ২৪শে মে অষ্ট্রিয়ান চিত্তবিশ্লেষণ-শাস্ত্রী ফ্রয়েড সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার। ২২শে জুন ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেন। ঐ বৎসরই জুলাই মাসে ইংরেজ পণ্ডিত হব্‌সন্‌ ও ওয়ালাসএর সামাজিক মতবাদ সম্বন্ধে বিনয় বাবু একটি বক্তৃতা করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর হেমাদ্রি হইতে চণ্ডেশ্বর এবং রামমোহন পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজ-শাস্ত্রের ধারা আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয় কুমার সরকার)। ২৫শে নবেম্বর জার্ম্মাণ পণ্ডিত হাউসহোফারের "মহাদেশব্যাপী রাষ্ট্রনীতি এবং স্থান-অতিক্রমকারী শক্তিপুঞ্জ" সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি বক্তৃতা করেন।

১৯৩৬এর ৬ই ডিসেম্বর তিনটি মার্কিণ গ্রন্থ আলোচনার বিষয় ছিল :—প্রথম ইউব্যাঙ্কের "কারাগৃহে কুড়ি বৎসর", দ্বিতীয় ফেল্‌প্‌সের 'বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যা', তৃতীয় হকিংয়ের "খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের শতবর্ষ"। আলোচনা করেন অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়। ঐ বৎসরই ১৬ই ডিসেম্বর ইতালিয়ান পণ্ডিত জিনির সমাজ-চিন্তায় লোকবিন্যার অতি-প্রভাব এবং ক্রোচে, জেন্‌তিলে ও জর্জ্জ্য দেল ভেক্য এই তিন দার্শনিকের রাজনৈতিক ও আইনসম্বন্ধীয় আদর্শনিষ্ঠা আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয় সরকার)।

১৯৩৭ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত ইংরেজ পণ্ডিত বার্কার ও পিগুর মতাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী আলোচনার বিষয় ছিল মার্কিণ পণ্ডিত বার্ণস প্রণীত পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস (পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়)। ১২ই মার্চ্চের আলোচ্য বিষয় 'রামানুজের লীলা ও ব্যর্গসোঁর এলাঁ ভিতাল' (হেমেন্দ্রবিজয় সেন)। ২৭শে মার্চ্চ বিনয়কুমার সরকার ফরাসী লোকশাস্ত্রী লেভাসস্থর, গোনাঁর, বোভ্‌রা, বুথুল এবং লাঁদ্রির মতামত

সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেন। ৪ঠা এপ্রিল মার্কিণ পণ্ডিত বোগর্ডুস সম্পাদিত "সমসাময়িক সমাজ-শাস্ত্র" এবং বার্ণার্ড-সম্পাদিত "সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও গবেষণা-প্রণালী" আলোচনার বিষয় ছিল (পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়)। ফরাসী লেভিব্রুল ও জার্ম্মাণ টুর্ণভাল্ড এর সামাজিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ১১ই এপ্রিল বিনয় বাবুর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে মে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে সামাজিক কর্ত্তব্যের বিশ্লেষণ' আলোচ্য বিষয় ছিল। আলোচনাকারী হেমেন্দ্র বিজয় সেন।

এই বৎসর ২৮শে মে ফরাসী পণ্ডিত লাবা প্রণীত 'মানব সমাজ' এবং ব্রুন্-প্রণীত মানবীয় ভূগোল ও দুপ্রা-প্রণীত সমাজ-শাস্ত্রের মোট কথা সম্বন্ধে বিনয় বাবু একটি আলোচনা করেন। ১লা জুন আলোচনার বিষয় ছিল 'বৌদ্ধ বিস্তারের সমাজ-কথা'। আলোচনা করেন ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত। ৩রা জুলাই রুশ-মার্কিণ সোরোকিনের "সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতি-বিজ্ঞান গ্রন্থে হিন্দু জাতির বস্তুনিষ্ঠা ও চিন্তানিষ্ঠা" সম্বন্ধে বিনয় বাবু একটি আলোচনা করেন। ২৯শে জুলাই আলোচিত হয় "মার্কিণ সমাজ-শাস্ত্রে উন্নতি-তত্ত্ব" (নগেন চৌধুরী)। ৭ই আগষ্ট শিবচন্দ্র দত্ত ইংরেজ পণ্ডিত কার-সণ্ডার্স ও গিণ্স্বার্গের সামাজ চিন্তা সম্বন্ধে একটি আলোচনা করেন। ১৯শে আগষ্ট জার্ম্মাণ পণ্ডিত জিম্মেল এবং ফোন ভীজে-প্রণীত গ্রন্থাবলীতে সমাজ-বিজ্ঞানের নবীন মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিনয় বাবু বক্তৃতা করেন। 'চেক্ জাতীয় শিক্ষা-শাস্ত্রী কমেনিউসের সমাজ-চিন্তা' আলোচনার বিষয় ছিল ২৬শে আগষ্ট। আলোচনা করেন ডাঃ দেবেন দাশগুপ্ত।

৫ই সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণ পণ্ডিত কোল্‌রয়ট্টার-প্রণীত "রাষ্ট্র-বিজ্ঞান", বুর্গডোর্ফার-প্রণীত "নয়া জার্ম্মাণির জনসংখ্যা বৃদ্ধি" এবং ভিসকেমানের "নবীন ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থ বিশ্লেষণের বিষয় ছিল। আলোচনাকারী বিনয়কুমার সরকার। ১১ই সেপ্টেম্বর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সমাজ-

চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র' (সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)। তাহার পর (১৫ সেপ্টেম্বর) চেকোস্লোভাক রাষ্ট্রনায়ক মাজারিকের সমাজ-দর্শন আলোচিত হয় (বিনয় সরকার)। শিবচন্দ্র দত্ত রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী পরিষৎ হইতে প্রকাশিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ "কালচার‍্যাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া" (ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) এবং বিনয়কুমার সরকার জার্ম্মাণ পণ্ডিত মায়ার প্রণীত "হিন্দু পালা পার্ব্বণ" বিষয়ক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিশ্লেষণ করেন (১৯ সেপ্টেম্বর)।

এই বৎসরের অন্যান্য আলোচনার তালিকা নিম্নরূপ :—জার্ম্মাণ সমাজ-শাস্ত্রী ফোন ভীজে-প্রণীত গ্রন্থের মার্কিণ অনুবাদ এবং "একাল ও সেকালের জাপানী সমাজ-শাস্ত্র" সম্বন্ধে আলোচনা করেন পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর)। ফরাসী সমাজ-শাস্ত্রী বোদাঁ, মঁতস্কিয়ো এবং রুসো সম্বন্ধে শচীন দত্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন (৩ নবেম্বর)।

১৯৩৮ সনে "একালের ফরাসী সমাজ-শাস্ত্র" আলোচিত হয় ১২ই জুন তারিখে (সুবোধ ঘোষাল)। ১০ই জুলাই বিনয় বাবু আলোচনা করেন "বঙ্কিমের কতটা টেকসই ?" পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ছিল "সমাজ-বিজ্ঞানের গিডিংস্-রীতি" (১৫ আগষ্ট)।

অর্থনীতি

১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সনের মধ্যে অর্থনীতি সম্বন্ধে আটটী বিষয় আলোচিত হয়েছিল। ১৯৩২ সনের ৫ই মে 'বাংলার চাষীদের আত্ম-চৈতন্য' সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয় (বাণেশ্বর দাস)। ২৬শে জুন 'শিল্প-নিষ্ঠার সামাজিক সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় (শিবচন্দ্র দত্ত)। ১লা ডিসেম্বর 'আন্তর্জ্জাতিক-মজুর কানুন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় (পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়)। ১৯৩৩ সনের ৩১শে মার্চ্চ 'সমাজবীমা ও নবীনী-কৃত পুঁজিনিষ্ঠা' আলোচনার বিষয় ছিল

(বিনয়কুমার সরকার)। ২৩শে জুলাই 'গ্রাম্য জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তন' সম্বন্ধে একটি আলোচনা হয় (অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস)। ৫ই অক্টোবর 'সমবায় আন্দোলনের সমাজ-কথা' আলোচনার বিষয় ছিল (শিবচন্দ্র দত্ত)। ১৯৩৫ সনের ৩রা আগষ্ট 'দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ' সম্বন্ধে বিনয় বাবু একটি আলোচনা করেন। ১৯৩৬ সনের ২৫শে এপ্রিল সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের সমাজ-কথা আলোচিত হয় (বিনয় সরকার) ১৯৩৭ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর "কাজ ও ছুটি" সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডাঃ মণি মৌলিক।

শিক্ষা

শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা মোটের উপর চারটী হয়েছে। ১৯৩২ সনের ১০ই জুলাই 'অশিক্ষিত ও নিরক্ষরের সমীকরণে ভ্রমপ্রমাদ' সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি বক্তৃতা করেন। ১৯৩৩ সনের ১০ই মে আলোচিল হয় 'গৃহস্থালীর মারফৎ শিক্ষা ব্যবস্থা' (হরিদাস পালিত)।

১৯৩৪ সনের ২৬শে মার্চ্চ 'শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যার ভিতর সমীকরণের সমস্যা' আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয়কুমার সরকার)।

১৯৩৮ সনের ১৮ই এপ্রিল সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের তরফ হতে ডক্টর আর আহম্মদ তাঁহার ডেণ্টাল কলেজে মারাঠা মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধোঁদো কেশব কার্ব্বের একাশী বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

লোক-বিদ্যা

লোক-বিদ্যা বিষয়ক আলোচনার সংখ্যা হচ্ছে ৬টী। ১৯৩২ সনের ৬ই জুন 'জন্মহারের সঙ্গে দেশের জলবায়ু ও রক্তগত-জাতির যোগাযোগ'

সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি বক্তৃতা করেন। ১৯৩৩ সনের ২০শে অক্টোবর লোক-বল নীতির সেকেলে ও একেলে ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হয় (বিনয়কুমার সরকার)। ১৯৩৫ সনের ২রা মার্চ্চ 'জনগণের ঘনত্ব উত্তম লোক-সংখ্যা-নির্দ্দেশক নয়' এই মত প্রচারিত হয় (বিনয়কুমার সরকার)। ঐ বৎসরই ৭ই জুলাই 'সু-প্রজনন বিদ্যার কর্ম্ম-কথা' সম্বন্ধে বিনয়বাবুর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সনের ২০শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 'লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৩৭ সনের ২২শে জুলাই 'গ্রাম ও সহরের জন-পরিবর্ত্তন' সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি আলোচনা করেন।

অপরাধ-বিজ্ঞান

অপরাধ-বিজ্ঞান বিষয়ক ৫টী আলোচনা হয়েছে মোটের উপর। ১৯৩৩ সনের ২৯শে জানুয়ারী 'ভারতীয় সমাজ ও অপরাধ-সংখ্যা সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী' বিনয়বাবু কর্ত্তৃক আলোচিত হয়। ১৩ই মার্চ্চ অ্যাডভোকেট পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আলোচিত হয় 'আজকালকার কারা-গৃহ'। ১৯৩৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর 'অপরাধ ও শাস্তি' সম্বন্ধে পঙ্কজবাবু আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৩৭ সনের ১৩ই জুন 'শিশুদের অপরাধ' আলোচ্য বিষয় ছিল (পঙ্কজ মুখার্জ্জি)। ১৯৩৮ সনের ৭ই মে অমিয় দাশগুপ্ত বিনয় বাবুর "অপরাধ ও শাস্তি" নামক ইংরেজি রচনার বাংলা তর্জ্জমা পাঠ করেন।

দেশ-বিদেশের সমাজ-কথা

দেশ-বিদেশের সমাজ-কথা সম্বন্ধে সর্ব্বসুদ্ধ ২৩টী আলোচনা হয়েছে। ১৯৩২ সনের ১৮ই এপ্রিল নয়া বাংলার সমাজ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিনয়বাবু

কর্ত্তৃক একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরের ২৩শে এপ্রিল স্পেন ভ্রমণ সম্বন্ধে হাসান সহিদ সুরবর্দ্দি কর্ত্তৃক একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

২৭শে জুলাই বর্ত্তমান পারস্য (ইরাণ) সম্বন্ধে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতী সৌদামিনী মেটা গুজরাটের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৩৩ সনের ৬ই মার্চ্চ বষ্টনের স্বামী পরমানন্দ আমেরিকার বেদান্ত-কেন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯৩৪ সনের ২৬শে জানুয়ারী 'জাপানী খাদ্যের সমাজ-তত্ত্ব' বিনয়বাবু কর্ত্তৃক আলোচিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী একালেয় হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় (অধ্যাপক লাল্‌তাপ্রসায় সুকুল)। ৮ই এপ্রিল 'ফাশিস্ত ইতালীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' সম্বন্ধে পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩রা জুন 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতবাসী' সম্বন্ধে মান্দ্রাজের ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম্ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৯৩৫ সনের ২২শে মার্চ্চ 'জাপানের শ্রম-ব্যবস্থা' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

১৯৩৬ সনের ৫ই জানুয়ারী "হুস্ হইতে মাজারিক পর্য্যন্ত চেক্ আদর্শের ধারা" আলোচনার বিষয় ছিল (বিনয় কুমার সরকার)। ২০শে জানুয়ারী 'দেশ-বিদেশের নগর-শাসন' সম্বন্ধে বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বীরেন রায় একটি বক্তৃতা করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আলোচিত হয় ভারতীয় নারীত্বের সমাজ-কথা (বিনয় সরকার)। ১০ই মে পশ্চিমবঙ্গের আল্‌পনা সম্বন্ধে হরিদাস পালিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮ই জুন 'ভারতে জনন-শক্তির তারতম্য' সম্বন্ধে বিনয় কুমার সরকার

একটি বক্তৃতা করেন। দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ১৮ই নবেম্বর হেমেন্দ্রবিজয় সেন একটি আলোচনা করেন। ১০ই ডিসেম্বর 'সিন্ধুদেশে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব' সম্বন্ধে বিনয়বাবু একটি বক্তৃতা করেন। ২৭শে ডিসেম্বর আলোচিত হয় হিন্দু-আইনের সংস্কারসাধন (শিবচন্দ্র দত্ত)।

১৯৩৭ এর ৬ই জানুয়ারী 'আর্জেন্টিনায় বেদান্ত-কেন্দ্র' সম্বন্ধে রি ও দি জানিরোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দ একটি বক্তৃতা করেন। ১৫ই জানুয়ারী 'বাংলার গ্রামে নারী-প্রগতি' সম্বন্ধে অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস একটি আলোচনা করেন। ২১শে জুন 'ফাশিস্ত্ ইতালির সঙ্ঘ-রাষ্ট্রের নবীনীকৃত সমাজ-তন্ত্র' বিশ্লেষিত হয় (বিনয় সরকার)।

১৯৩৭ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে "বর্ত্তমান বঙ্গ-সংস্কৃতিতে স্বুবর্ণ-বণিক সমাজের দান" আলোচিত হয়। আলোচনাকারী ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা।

১৯৩৮ এর ৪ঠা মে হরিদাস পালিত "প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম" এবং ১লা জুন মারাঠা ঐতিহাসিক সখারাম সার্দেসাই "মারাঠি দলিল দস্তাবেজের সমাজ-কথা" আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচনা দার্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী তাকৃদা পাহাড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পরিষদের আলোচনা-প্রণালী

এইখানে বলে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আলোচনায়ই এক-একটা ৪০।৫০ মিনিট-ব্যাপী প্রবন্ধ পড়া হয় নি। কতকগুলায় প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধ ছাপাও হয়ে গেছে। অনেক আলোচনা চলেছিল পাঠচক্রের তর্ক-বিতর্কের আকারে। কতকগুলার আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী ঘাঁটাঘাঁটি করা।

সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার প্রবন্ধ-লেখকদের রচনাবলীর সারাংশও আলোচিত হয়েছে। একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সমাজ-বিজ্ঞানের পরিধি ও বিস্তৃতি বুঝাবার জন্য পরিষদের সভাপতি ও গবেষণাধ্যক্ষ বিনয় বাবুকে অনেক দিকে আলোচনা চালাতে হয়েছে ও অনেক বইয়ের বিশ্লেষণ কর্‌তে হয়েছে। তাঁহাব নিজেয় বক্তব্যের ভিতর অর্থনৈতিক তথ্য ও সংখ্যার ব্যবহার বেশী থাকৃত। দেশী-বিদেশী সমাজ-শাস্ত্রী সম্বন্ধে বিনয় বাবুর আলোচনাসমূহের ফল বহুসংখ্যক প্রবন্ধের আকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত "ক্যালকাটা রিভিউ" নামক ইংরেজি মাসিকে বাহির হয়েছে (১৯২৬-১৯৩৮)।

উপরি উক্ত তালিকার প্রতি লক্ষ্য করলে সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে কত রকম বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তা উপলব্ধি করা যাবে। এখানে আলোচনার বিষয়ীভূত জিনিষগুলিকে পাঠকদের সুবিধার জন্য আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এইসব প্রবন্ধাবলীকে ঠিকভাবে তাহাদের আলোচনার বিষয় অনুসারে ভাগ করতে হলে অন্ততপক্ষে ২৫টা বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করতে হত। যা'হোক যতগুলি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নিয়ে একটু বিচার করলে দেখা যাবে যে, সাধারণতঃ সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতর যে সব বিষয় পড়ে তার মধ্যে এই কটিই প্রধান :—নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, আবহাওয়াতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, লোক-বিদ্যা, সুপ্রজননবিদ্যা, যৌনতত্ত্ব, রক্তগত জাতিতত্ত্ব, ভূরাষ্ট্রবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা, অর্থনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, অপরাধ-বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, পল্লীনগর-বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ও দর্শন সম্বন্ধীয় তথ্যাবলী। এতগুলি আলোচনার বিষয় লিপিবদ্ধ করবার কারণ হচ্ছে যে পাঠকদের বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাজ-বিজ্ঞান কাকে বলে তা বুঝতে সুবিধা হতে পারে।

উপসংহারে বলা উচিত যে, অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, অ্যাড্‌ভান্স, ফরোয়ার্ড, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইত্যাদি পত্রিকায় পরিষদে আলোচিত বিষয়সমূহের অনেকগুলার সংবাদ এবং বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সমাজবিজ্ঞানের অনেক কথা দেশের ভিতর কিছু-কিছু ছড়িয়ে পড়েছে।

(খ) সামাজিক প্রণালী
সামাজিক যোগাযোগ ও
সামাজিক গড়নের
বিশ্লেষণ

দরিদ্র-নারায়ণের সমাজ-শাস্ত্র *

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"শীতের সাহায্য" ও আর্থিক সংগঠন

"যৌবন-আন্দোলনের" জন্মদাতা, জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিখ্‌টে তুনিয়ার নরনারীর জন্য একটা মহাশিক্ষা প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ঘোষণা করেন যে, "নেহাৎ পদদলিত যে ক্রীতদাস সেও হোলিগোষ্ট বা পরমেশ্বরের মন্দির"। আধুনিককালে আর একজন জগদ্‌গুরু 'আমাদের বিবেকানন্দ' তাঁহার "দরিদ্র-নারায়ণ" পূজা-মন্ত্রের মারফৎ গরীব-তুঃখীদের দেবত্বের কথাই ঘোষণা করিয়াছেন। গোলাম-সেবার আর দরিদ্র-সেবার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বনিয়াদ জার্ম্মাণ চিন্তাধারার মতন ভারতীয় চিন্তা-ধারায়ও বেশ সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ, সমাজ-সেবা বহু প্রাচীনকাল হইতেই মানবজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ও খৃষ্টান মুসলমান সকলেই প্রায় একধাপে অবস্থিত।

সমাজ-সেবার আদর্শ ও প্রবৃত্তি বাস্তবিকই বিশ্বজনীন। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে সমাজ-সেবার মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। দেখিতে পাই যে, সময় সময় সমাজ-সেবার সংজ্ঞা, মায় কাঠামো পর্য্যন্ত বিলকুল বদলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং সকল সময়েই সমাজ-সেবার আদর্শ ও আকার-প্রকারের নূতনভাবে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও পরিচয়দানের প্রয়োজন দেখা যায়।

---

* বঙ্গীয় জার্ম্মাণ বিদ্যাসংসদে অনুষ্ঠিত ইংরেজি বক্তৃতার বাংলা মর্ম্ম (১৪ মে ১৯৩৬)।

এ কালের অতি-পরিচিত সমাজ-সেবা, যথা বেকার-সেবা বা বেকার-সাহায্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদির আবশ্যকতা সহজেই মালুম হইবে। দুনিয়ার সকলেই বেকার বস্তুটা যেন ভাল রকম বোঝে। তবুও ইয়োরামেরিকান বা জাপানী আর আন্তর্জ্জাতিক সংখ্যা ও তথ্য তালিকায় কর্ম্মহীন প্রত্যেক নরনারীকেই বেকাররূপে বিবৃত করা হয় না। বেকার বলিতে তাহাকেই বুঝায় যে এক সময় কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশতঃ ঘটনাচক্রে কর্ম্মহীন হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, "বেকার" পুরা-দস্তুর "পারিভাষিক" শব্দ। অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও মাপজোক্-নিয়ন্ত্রিত শব্দের মতন বেকারও একটা কৃত্রিম অর্থযুক্ত শব্দবিশেষ। দারিদ্র্য শব্দটা বেকারের চেয়ে বেশী ব্যাপক। কিন্তু এই মামুলি দারিদ্র্য পদও পারিভাষিক। উপার্জ্জন, জীবনযাত্রা-প্রণালী, দ্রব্যমূল্য, পোষ্য-সংখ্যা ইত্যাদি বস্তু মাপিয়া-জুকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় না নামিলে এই ব্যাপকতর শব্দের অর্থ বাহির করা কঠিন। বেকার-"সেবা" বা দরিদ্র-"সবা"ও তেমনি এমন শব্দ যা যে-সে অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। এই দুই শব্দেরও পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। সমাজসেবা আর একটা আটপৌরে শব্দ। আমরা প্রায় সকলেই যেন এই শব্দটা বুঝি। কিন্তু দরিদ্র বা বেকার এবং দরিদ্র-সেবা, বেকার-সেবা ইত্যাদি শব্দের মত এই সমাজ-সেবা শব্দটারও পারিভাষিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের জন্য কৃত্রিম উপায়ে একটা সংজ্ঞা স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমরা জানি যে, আমাদের দেশে অভাব বা দুঃখদারিদ্র্য উপস্থিত হইলেই চট্ করিয়া তাহাকে "দুর্ভিক্ষ" বলা চলে না, এমন কি "টানাটানি"ও বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বাংলার কথা তোলা যাইতে পারে। আজকাল—মে মাসে (১৯৩৬)—বাংলার যা অবস্থা

তাহাতে "ভারতীয় দুর্ভিক্ষ বিধি"র নিয়ম অনুসারে বাংলার কয়েকটা অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গে) "অন্নকষ্ট" উপস্থিত হইয়াছে বলা যায়। সেই সকল অঞ্চলের লোকেরা কোনরূপ কাজকর্ম্ম না করিয়া সরকারী সাহায্যভোগ করিতেছে। স্থানে স্থানে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু খরচপত্রের সমস্ত ঝুঁকি গবর্ণমেণ্টের উপর। এখন এইভাবে ক্রমাগত দুই মাসকাল যদি সরকারী দান-খয়রাৎ চালাইতে হয়, তবে সেই অঞ্চলকে পরিভাষা অনুসারে "দুর্ভিক্ষ"-প্রপীড়িত অঞ্চল বলা যাইতে পারে। আরও একটা সর্ত্ত আছে। প্রপীড়িত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ½ জন অর্থাৎ হাজার করা ৫ জন যদি দুই মাসকাল ধরিয়া ক্রমাগত সরকারী দান-খয়রাৎ গ্রহণ করিতে থাকে তখন ঐ অঞ্চলে "দুর্ভিক্ষ" লাগিয়াছে এরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।

পরিভাষার মামলাটা সর্ব্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। যাহা হউক এইবার সমাজ-সেবার ভিতর প্রবেশ করা যাউক। প্রথমেই জানিয়া রাখা দরকার যে, সমাজ-সেবা রকমারি। ইহার নামও রকমারি। *সমাজের কাজ, সমাজ-সেবা, সাহায্যের কার্য্য,* উদ্ধার-সাধন, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দারিদ্র্য-নিবারণ, সঙ্কটত্রাণ ইত্যাদির মূর্ত্তি, গড়ন বা রূপ নানাবিধ। সমাজ-সেবা বা দারিদ্র্য-নিয়ন্ত্রণ হাজারো রকমের মূর্ত্তি-বিশিষ্ট। একটি বিশিষ্ট ধরণের মূর্ত্তি জার্ম্মাণির "ভিণ্টার-হিল্‌ফে"র (শীতকালের দরিদ্র-সেবার) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। "অর্থনৈতিক কর্ম্ম-কৌশলের" সমাজ-শাস্ত্রে জার্ম্মাণ শীতের দরিদ্র-সেবা বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ ঠাঁই দখল করিবে।

জার্ম্মাণ জাতি প্রত্যেক বৎসর শীতের ছয় মাসে (অক্টোবর—মার্চ্চ) দুঃখ-কষ্ট এবং দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণের সেবায় কম্‌সে-কম্ সাঁইত্রিশ কোটি টাকা (রাইখ্‌স্‌মার্ক) খরচ করে। এই টঙ্কা ভারতের কেন্দ্রীয়

গবর্ণমেণ্টের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিষয়টা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য আমাদের আপন ঘরের উপর দৃষ্টিপাত করা যাউক। জার্ম্মাণরা শীতের দরিদ্রসেবার জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের মোট বার্ষিক ব্যয়ের (প্রায় বার কোটী টাকা) তিন গুণেরও বেশী খরচ করিতেছে। সাড়ে ছয় কোটী জার্ম্মাণ নরনারীর পক্ষে মাত্র এই শীতকালীন সমাজ-সেবার কাজেই মাথাপিছু প্রায় ২৸৹ ব্যয় হইয়া থাকে। ৫ কোটী ১০ লক্ষ মানুষের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সকল প্রকার কাজে মাছাপিছু যে পরিমাণ ব্যয় করিয়া থাকে, একমাত্র শীতের দরিদ্র-সেবার জন্য জার্ম্মাণিতে মাথাপিছু খরচ তাহার চেয়েও বেশী। এখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই শীতকালীন সেবা ছাড়া আরও নানাপ্রকার সমাজ-সেবায় জার্ম্মাণজাতি অর্থব্যয় করিতে অভ্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ "সমাজ-বীমা", "দরিদ্র-সেবা" ইত্যাদি বিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলার নাম করা যাইতে পারে।

রকমারি দারিদ্র্য-নিয়ন্ত্রণ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত এবং ফ্রান্সের মতই জার্ম্মাণি দুনিয়ার অন্যতম চরম ধনী দেশ। তবু জার্ম্মাণজাতিকে দরিদ্র্য সেবায় ভারতীয় দুর্ভিক্ষত্রাণের মতই অজস্র অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহা একটা হেঁয়ালি বা রহস্য-বিশেষ। হেঁয়ালির বিশ্লেষণ করিয়াছি ঢাকা শহরে আহূত ভারতীয় অর্থ নৈতিক সম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশনে। এই উপলক্ষে (জানুয়ারি ১৯৩৬) "সমাজ-বীমা এবং সরকারী রাজস্বের আলোকে মজুরির তত্ত্বকথা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেখানে দেখাইয়াছি যে, সংসারের আর্থিক ব্যবস্থায় "ন্যায্য মজুরি" বলিয়া কোনো বস্তুর সন্ধান মিলা ভার। রোগ, দৈবদুর্ঘটনা, দৈহিক অক্ষমতা, বার্দ্ধক্য এবং বেকার অবস্থার জন্য কোনো চাকুর্য়ে বা মজুর

তাহার আইনসঙ্গত মজুরির আয় হইতে ব্যবস্থা করিতে সমর্থ নয়। অর্থাৎ যখন কাজের বাজার খুব সচল, এমন কি তখনও সমাজে "আপেক্ষিক দারিদ্র্য" কিছু-না-কিছু থাকিয়া যায়। আর 'সঙ্কট' সময়ের ত কথাই নাই,—তখন হাজার হাজার লোকের জবাব হয়। আর তার জন্য বেকার-ব্যাধি সমাজদেহ আক্রমণ করে। এই ব্যাধি অল্প মেয়াদের, সাময়িক আকারের, ঋতুমাফিক, লম্বা মেয়াদের বা বহু পুরাতন হইতে পারে। সুতরাং সঙ্কট সময়ে সমাজিক ঘটনা হিসাবে দারিদ্র্যের সনাতন মূর্ত্তি আরও বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সম্প্রতি যে দুনিয়াব্যাপী আথিক মন্দা (১৯২৯—৩৪) ঘটিয়া গেল, তাহাতে দারিদ্র্য সত্য-সত্যই বিশ্বব্যাপী রূপ ধারণ করিয়াছিল। যেখানে যেখানে মানুষের বাস সেখানেই যেন দারিদ্র্যের রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত এবং জার্ম্মাণির মত ধনিশ্রেষ্ঠ দেশগুলাও আপন-আপন দারিদ্র্য-সমস্যায় অস্থির বনিয়া গিয়াছিল। তবে এই সমস্ত দেশের লোক "বলকান জনপদ", রুশিয়া, চীন বা ভারতবর্ষের তুলনায় দারিদ্র্যের অন্যরূপ ব্যাখা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি? এই সমস্ত সেরা দেশে,—যেখানে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী,—সেখানেও দারিদ্র্য চির-পুরাতন দরিদ্র দেশগুলার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দারিদ্র্য বাস্তবিকই সনাতন ও সার্ব্বজনীন।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইও তেমনি সনাতন, অর্থাৎ মানবজাতির নিত্য সহচর। দারিদ্র্য-নিয়ন্ত্রণ বা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নবীনতম মূর্ত্তি "সমাজ-বীমা"র ভিন্ন-ভিন্ন শাখায় দেখিতে পাওয়া যায়। বেকার-বীমা এই সমাজ-বীমারই অন্যতম রূপ মাত্র। কিন্তু সমাজ-বীমার সমগ্র বাহিনী মিলিত হইয়াও দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণরূপে দেশ-ছাড়া করিতে পারে নাই।

সুতরাং "নেও-ক্যাপিট্যালিষ্টিক" বা নবীনীকৃত পুঁজিনিষ্ঠার দেশগুলায়ও এখন পর্য্যন্ত "সেকেলে" দারিদ্র্য-সেবার পন্থাগুলা বজায় আছে। এই সমস্ত দেশে "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" দরুণ নতুন সভ্যতার ধারা আরব্ধ হইয়াছে। তবুও ঐগুলা দারিদ্র্য-সেবার কৌশলে এখনও বেশ-কিছু পুরাতন-পন্থী। দারিদ্র্য-সেবার পুরাতন উপায়সমূহ, যথা "দারিদ্র্য-আইন", "দারিদ্র্য-কর" ইত্যাদি চিজ্ জার্ম্মাণি বা বিলাতে এখনও বর্জ্জিত হয় নাই,—বরং ঐগুলা নতুন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি দারিদ্র্য-নিবারণের আরও বেশী সেকেলে দাওয়াই, যথা বদান্যতা বা পরহিতৈষণা—যেগুলাকে প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টানী, হিন্দু, বা মুসলমানী দাওয়াই বলা যাইতে পারে, সেগুলা পর্য্যন্তও দুনিয়ার সর্ব্বাধিক অগ্রগামী দেশগুলায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণি এই "সেকেলে" পথে এত বেশী অগ্রসর হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ইতিহাসে তাহার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে পরিমাণ এবং কার্য্য-শৃঙ্খলা দুদিক্ দিয়াই জার্ম্মাণি নয়া ইতিহাসের পত্তন করিয়াছে। ভিণ্টার হিল্ফ্‌স্‌ভের্কে* (শীতকালীন দরিদ্র-সেবা) খাঁটি সেকেলে দান-খয়রাৎ আর আধুনিক সমাজ-বীমা বিষয়ক কার্য্য-তালিকার উপর নতুন করিয়া অতিরিক্তরূপে কায়েম করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষ "সমাজ-বীমা" বা "দারিদ্র্য-কর" কোনো-কিছুরই ধার ধারে না। এ দেশের দুর্ভিক্ষ-সেবা এই পন্থা দুইটার কোনটারই অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের পরিচয় কেবল মাত্র দানখয়রাৎ বা পরোপকারের মত মান্ধাতার আমলের দরিদ্র-সেবার সহিত। এই শ্রেণীর দরিদ্র-সেবায় নিয়ম, শৃঙ্খলা বা কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রায়ই অভাব দেখা

* লেখকের "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স লেজিসলেশন্ অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্" (কলিকাতা ১৯৩৬) গ্রন্থের ৩৯২-৪০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যায়। জার্ম্মাণ-জাতি এই মান্ধাতার আমলের দরিদ্র-সেবায়ও নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। সেকেলে কর্ম্ম-কৌশলগুলাকে কিভাবে আধুনিক জগতের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, সে বিষয়ে হিটলারী আমলের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত "ভিণ্টার-হিল্‌ফ্‌স্‌ভের্ক" ভারতের মত অনগ্রসর দেশগুলার চোখ ফুটাইতে সমর্থ। জার্ম্মাণ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শীতকালীন দরিদ্র-সেবার ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৫ সন পর্য্যন্ত দুই বৎসরের বিবরণী পাঠ করিলে রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য সমাজ-হিতকর প্রতিষ্ঠানগুলা কর্ম্ম-কৌশলের নয়া নয়া হদিশ পাইবে।

জার্ম্মাণ শীতের দরিদ্র-সেবা

নগদ এবং জিনিষপত্রে ১৯৩৩-৩৪ সনের ৩৫৮,১৩৬,০৪১ রাইখ্‌স্‌ মার্কের স্থানে ১৯৩৪-৩৫ সনে ৩৬৭,৪২৫,৪৮৫ রাইখ্‌স্‌ মার্ক আদায় হইয়াছিল। ১৯৩৪-৩৫ সনে মোট সেবা-প্রাপ্তের সংখ্যা ১৩,৮৬৬,৫৭১ জন (১৯৩৩-৩৪ সনে ১৬,৬১৭,৬৮১ জন)। অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ সনে মোট জনসংখ্যার ২১·১% লোক সাহায্য ভোগ করিয়াছে ; ১৯৩৩-৩৪ সনে সাহায্য-প্রাপ্তের হিসাব ছিল ২৫·৩%। সেবা কার্য্যাবলীতে মোট ১,৩৩৮,৩৩৩ (১,৪৯৫,০০০) জন লোক খাটিয়াছিল। অধিকাংশ সেবকই স্বেচ্ছায় খাটিয়াছে এবং ইহাদের বেতনভোগী সাহায্যকারীর সংখ্যা ছিল ৫,১৯৮ জন (৪,১১৬)। খরচার পরিমাণ মোট আদায়ের মাত্র শতকরা ০·৯৩ অর্থাৎ এক ভাগেরও কম (১৯৩৩-৩৪ সনে ০·৯৫%)।

আলোচ্য দুই সনের এই সেবাকার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন দফার তুলনামূলক খতিয়ান নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা গেল :—

দফা	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
১। সাহায্যপ্রাপ্তের সংখ্যা	১৬,৬১৭,৬৮১	১৩,৮৬৬,৫৭১
২। মোট জন-সংখ্যার মধ্যে সাহায্যপ্রাপ্তের শতকরা হিস্যা	২৫·৩	২১·১

	১৯৩৩-৩৪	১৯৩৪-৩৫
৩। সেবকের সংখ্যা	১,৪৯৫,০০০	১,৩৩৮,৩৩৩
৪। বেতনভোগী সেবক	৪,১১৬	৫,১৯৮
৫। জিনিষপত্র ও নগদ আদায়ের মোট মূল্য (রাইখ্‌স্‌মার্ক)	৩৫৮,১৩৬,০৪১	৩৬৭,৪২৫,৪৮৫
৬। সেবা কাজের খরচা (রাইখ্‌স্‌মার্ক)	৩,৪১৪,১৩০	৩,৪০৭,৩২৬
৭। মোট আদায়ের মধ্যে খরচা শতকরা	০.৯৫	০.৯৩

রাইখ্‌স্‌ মার্ককে মোটামুটি এক ভারতীয় টাকার সমান ধরিয়া লওয়া গেল।

নগদ আদায়

কেন্দ্রীয় (রাইখ্‌স ফ্যিরুং) এবং স্থানীয় (গাও ফ্যিরুং) এই দুই প্রতিষ্ঠানের মারফতে চাঁদা আদায় হইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সনে নাৎসি দলের বৈদেশিক বিভাগ বিদেশে উপনিবিষ্ট এবং অবস্থানকারী জার্ম্মাণদের নিকট হইতে ৯১৮,১৫৮ রাইখ্‌স্‌মার্ক আদায় করিয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই আদায়ের হিসাব প্রকাশ করিয়াছে।

নিম্নের তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন খাতে আদায়ের অঙ্ক দেওয়া হইল :—

আদায়কারী	১৯৩৩-৩৪ রাইখ্‌স্‌ মার্ক	১৯৩৪-৩৫ রাইখ্‌স্‌ মার্ক
১। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (রাইখ্‌স্‌ ফ্যিরুং)	৬৫,৪৬২,৩৯১	৫৪,৪৬৫,১৯৯*
২। জেলা প্রতিষ্ঠানসমূহ (গাও-ফ্যিরুং)	১১৮,৭৯৯,৯১৭	১৫০,৩৪৪,৩২৫
৩। পূর্ব্ব বৎসরের জের	×	৮,১৩৫,৬৮৫
৪। মোট রাইখ্‌স্‌ মার্ক	১৮৪,২৭২,৩০৭	২১২,৯৪৫,২০৯

* নাৎসি দল কর্ত্তৃক বিদেশে আদায় করা ৯১৮,১৫৮ রাইখ্‌স্‌ মার্কসহ।

নিম্নে ১৯৩৪-৩৫ সনের নগদ কেন্দ্রীয় আদায় ভিন্ন ভিন্ন দফায় প্রকাশ করা হইল :—

		রাইখ্‌স্‌ মার্ক
১।	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আদায়	১৮,৩২১,৬৫২
২।	রেলওয়ে, ডাক-বিভাগ, নৌ-সৈন্যবিভাগ, বে-সরকারী লোক-জনদের বেতন হইতে কাটিয়া স্বেচ্ছাকৃত দান	১১,০৮৮,৩৫৮
৩।	ব্যক্তিগত চাঁদা	১,৫৪৬,৩৭২
৪।	পোষ্ট-চেক্ ও ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে স্বেচ্ছাকৃত দান	৫,৫০৮,৮৮৫
৫।	সেবাকার্য্যে ব্যবহৃত কয়লা চালানের জন্য রেলপথের মাশুল রেহাই	৯,৫৪৩,৪৯১
৬।	শীতকালীন সেবার জন্য লটারী	৭,৫৩৮,২৭২
৭।	বিদেশে আদায়	৯১৮,১৫৮
	মোট	৫৪,৪৬৫,১৯৯

নিম্নে "গাও" অর্থাৎ জেলা-প্রতিষ্ঠানগুলার নগদ আদায়ের হিসাব দেওয়া হইল :—

		রাইখ্‌স্‌ রার্ক
১।	মজুরি ও বেতন হইতে মাসিক সাহায্য	৭৭,৭৩৯,০৭৬
২।	মাসিক "একপাত্র" খাদ্য ("আইন-টফ্‌ গেরিখ্‌ট্‌")	২০,৫৮১,৩৭৯
৩।	সওদাগরী আফিস, কোম্পানী এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান	১৮,২৩০,৯৩৭
৪।	কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	৪,২৯১,১৫২
৫।	বাক্সে-বাক্সে আদায়	১,১৩৮,৩৮৫
৬।	রাস্তায় আদায় (কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীন)—	৮,৪৭১,৪৮৩

		রাইখ্‌স মার্ক
(১)	অ্যাম্বার তক্‌মা	১,৩১৪,২৫৯
(২)	অ্যাষ্টার ফুল	১,৪১২,৮৪২
(৩)	কাঠের তক্‌মা	১,৪৩৬,৮৮৯
(৪)	লেসের গোলাপ	১,৩৯৮,১৯৩
(৫)	চীনামাটির তক্‌মা	১,২৫৩,৯৪৭
(৬)	এডেলভাইস ফুলের ব্যাজ	১,৬৫৫,৭৫২
	মোট	৮,৪৭১,৪৮৩

৭। কেন্দ্রীয় খাতে উৎসব— ৫,০৩৯,২৭৯

		রাইখ্‌স্ মার্ক
(১)	জাতীয় ঐক্য দিবস	৪,০২১,৫৯৪
(২)	জার্ম্মাণ পুলিশ দিবস	৬২৮,৯৬১
(৩)	মোজেক্ স্মৃতি-ফলক	৩৮৮,৭২৫
	মোট	৫,০৩৯,২৭৯

৮।	গাও (জেলা) খাতে উৎসব	৩,০৭১,৯৮৩
৯।	গাও-রাস্তায় চাঁদা আদায়	১,৬৮৮,৮৩৯
১০।	অন্যান্য খাতে আদায়	১,০১১,৮১৩
	মোট	১৫০,৩৪৪,৩২৬

নিম্নলিখিত দফাসমূহে ১৯৩৪-৩৫ সনে নগদ আদায়ের হিসাব দেওয়া যাইতেছে :—

		রাইখ্স্ মার্ক
১।	১৯৩৩-৩৪ সনের জের	৮,১৩৫,৬৮৫
২।	কেন্দ্রীয়	৫৪,৪৬৫,১৯৯
৩।	জেলা	১৫০,৩৪৪,৩২৫
	মোট	২১২,৯৪৫,২০৯

"আইন্-টফ্-গেরিখ্ট্" (এক পাত্র খাদ্য) শব্দটা ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার সমস্ত জার্ম্মাণ পরিবারে মাত্র একটা পাত্রে খিঁচুড়ী জাতীয় একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রান্না করা হয়। ঐ খাদ্যে থাকে মাত্র এক "পদ"। এই দিন কাহারও এক তরকারী ছাড়া দুই তরকারী খাওয়ার অধিকার নাই। সুতরাং সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় এই দিনে অনেক কম খরচ হয়। আহার বাবদ এই দিন যে পয়সা বাঁচে, তাহা সেবা-প্রতিষ্ঠানের নিকট নগদ জমা দেওয়া হয়। ১৯৩৪-৩৫ সনে এই খাতে ২৯,৫৮১,৩৭৯ রাইখ্স্ মার্ক (১৯৩৩-৩৪ সনে ২৫,১২৯,০০৩ রাইখ্স্ মার্কর) আদায় হইয়াছিল।

মালে আদায় ও মাল খরিদ

কেন্দ্রীয় (বিদেশে সংগৃহীত টাকাসহ) ও জেলা প্রতিষ্ঠানগুলায় নিম্নলিখিতরূপে মালে আদায় হইয়াছে :—

		রাইখ্স্ মার্ক
১।	কেন্দ্রীয়	৮,৮৬৬,৬৫২
২।	জেলা	১০১,৫৬৭,১২০
৩।	বিদেশী (কেন্দ্রীয়)	৯,৮৪৮
	মোট	১১০,৪৪৩,৬২০

কোন্ কোন্ জিনিষ আদায় হইয়াছিল মূল্য সহ সেই সমস্ত দ্রব্যের হিসাব নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা গেল ঃ—

		রাইখ্‌স্ মার্ক
১।	আহার্য্য দ্রব্য	৬০,৯৭২,৭২২
২।	ইন্ধন (কাঠ, কয়লা, ইত্যাদি)	৩,০৯৯,৬০৬
৩।	পোষাক	২৭,২৬১,৭৬২
৪।	টিকিট ও মেহনতের দাম	১৩,২৭০,৯৯৮
৫।	গৃহস্থালীর জিনিষপত্র	১,৫১১,৮০৫
৬।	অন্যান্য জিনিষ	৩,৭৪৬,৭২৮
	মোট	১১০,৪৬৩,৬২১

অভাবগ্রস্তদের মধ্যে যে যে জিনিষপত্র এবং সেবার জন্য মোট নগদ আদায়ের ২১২,৯৪৫,২০৯ টাকা খরচ করা হইয়াছিল, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল ঃ—

		রাইখস্ মার্ক
১।	আহার্য্য	৭০,৮৯৮,২৯৮
২।	ইন্ধন	৭৬,৪৫৩,৮৭৭
৩।	পোষাক	৪৬,৭১৭,৯০৭
৪।	টিকিট ও মেহনতের দাম	৪৫,২০৫,১৩৪
৫।	গৃহস্থালীর উপকরণ	৫,২০১,০৯১
৬।	অন্যান্য জিনিষ	২,১৪৬,১৭৭
	মোট	২৪৬,৬২২,৪৮৪

বুঝিতে হইবে যে, শীতের সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলা যে টাকা খরচ করিয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী মাল পাইয়াছে। সকল প্রকার জিনিষ-

পত্র বাবদ এইগুলা মোট ২১২,৯৪৫,২০৯ রাইখ্‌স্‌ মার্ক ব্যয় করিয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত জিনিষের বাজার-মূল্য ছিল ২৪৬,৬২২,৪৮৪ রাইখ্‌স্‌ মার্ক। অর্থাৎ সেবা-প্রতিষ্ঠান মালগুলা সস্তায় পাইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানগুলা দুই উপায়ে মালপত্র ও সেবা সংগ্রহ করিয়াছে। প্রথমতঃ, দাতাদের নিকট হইতে সোজাসুজি দান রূপে, এবং দ্বিতীয়তঃ দাতাদের নিকট সংগৃহীত টাকা দ্বারা খোলা বাজারে ক্রয়রূপে। নিম্নে মাল-পত্রের মোট মূল্য দেওয়া হইল :—

		রাইখ্‌স্‌ মার্ক
১।	আহার্য্য	১৩১,৮৭১,০১৯
২।	ইন্ধন	৭৯,৫৫৩,৪৮৩
৩।	পোষাক	৭৪,৫৭৯,৬৬৯
৪।	টিকিট ও মেহনৎ	৫৮,৪৭৬,১৩২
৫।	গৃহস্থালীর জিনিষ	৬,৭১২,৮৯৭
৬।	অন্যান্য জিনিষ	৫,৮৯২,৯০৪
	মোট	৩৫৭,০৮৬,১০৪

সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা

জেলা হিসাবে সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। যে সমস্ত জেলায় ("গাও"য়ে) সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা খুব বেশী তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া গেল :—

	জেলা	সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ
১।	স্যাক্সনি	১,২৬৫,০০০	২৪·৩
২।	সিলেসিয়া	১,২৬০,০০০	২৬·৯

জেলা	সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা	জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ
৩। বৃহত্তর বার্লিন	৭৮৫,০০০	১৮·৫
৪। দক্ষিণ ওয়েষ্টফালিয়া	৬৯০,০০০	২৬·৫
৫। উত্তর ওয়েষ্টফালিয়া	৬৫৫,০০০	২৪·২
৬। কোলান্-আখেন্	৬২০,০০০	২৭·১
৭। এস্‌সেন	৬০০,০০০	৩১·৫
৮। ডুিস্‌সেল্‌ডর্ফ	৫৯৮,০০০	২৭·৫
৯। হেস্‌সে-নাস্‌সাও	৫৮২,০০০	১৯·১
১০। পূর্ব্ব প্রুসিয়া	৫০৬,০০০	২১·৭

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মোট সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা গোটা দেশে ১৩,৮৬৬,৫৭১ জন, অর্থাৎ জার্ম্মাণির মোট জনসংখ্যার শতকরা ২১·১।

১৯৩৪ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৩৫ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ছয় মাস সেবাকার্য্য চালানো হইয়াছিল। মাস হইতে মাসান্তরে সাহায্য-প্রাপ্তদের সংখ্যার ওঠা-নামা দেখা গিয়াছে। মোট ১৩,৮৬৬,৫৭১ সংখ্যাকে গোটা সময়ের গড় মাসিক সংখ্যারূপে সম্‌ঝিতে হইবে। সাহায্য-প্রাপ্তদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টী শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—

	মাসিক গড়
১। বেকার ও সঙ্কটের জন্য সাহায্য-প্রাপ্ত	১,৩২০,২৭০
২। "মঙ্গল-সেবা"র সাহায্য-প্রাপ্ত	৬৩৩,৮৩০
৩। পেন্সনভোগিগণ	৮৭১,৯০৯

৪।	স্বল্প মেয়াদের মজুর	৭০,৭৪৬
৫।	সাময়িক নিযুক্ত মজুর	১,৪৩৬,৫৪৮
৬।	সাহায্য-প্রাপ্ত পরিবারভুক্ত পোষ্যগণ	৯,৫৩৮,২৬৮
	মোট মাসিক গড়	১৩,৮৬৬,৫৭১

শীতের সাহায্য দেওয়ার বেলায় জাতিবর্ণের কোনরূপ বৈষম্য করা হয় না। ১৯৩৪-৩৫ সনে সাহায্য-প্রাপ্তদের তালিকায় ইহুদীদিগের সংখ্যা ছিল ২৯,১০৮। ইহার মধ্যে বৃহত্তর বার্লিনবাসী ১৩,৯১৮ জন। তা ছাড়া ৬৯,৩৩৬ বিদেশী নরনারীকেও সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

"শীতের সাহায্য" এবং সুপ্রচলিত নয়া-পুরাণা সকল প্রকার সমাজ-সেবার মধ্যে পার্থক্যটা পূরাপূরি বুঝা এখন সহজ হইয়া আসিবে। ইতিপূর্ব্বে আধুনিক ধরণের সমাজ-সেবার কয়েক দফা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই দফার মধ্যে "দরিদ্র-সেবা" এবং "সমাজ-বীমা" বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

বিলাতে এবং পাশ্চাত্য জগতের অন্যত্র তিন শতাব্দীর উপর "দরিদ্র-সেবার" রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। "শীতের সাহায্য" এই "দরিদ্র-সেবা" হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা ধরণের বস্তু। "দরিদ্র-সেবা" সরকারী ট্যাক্স বা খাজনার উপর নির্ভর করে। গ্রাম্য বা শহুরো স্বায়ত্ত-শাসক-মণ্ডলীর কর্ত্তৃপক্ষ এই খাজনা আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু শীতের সাহায্য রাজস্বের আইনসম্মত কোনোরূপ খাজনা বা ট্যাক্স নয়। লোকে স্বেচ্ছায় ইহা দান করে। বৎসরের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোনো সময়ে সাময়িকভাবে "শীতের সাহায্য" আদায় করা হয়। তাহা ছাড়া "দরিদ্র-সেবা"র বেলায় যে স্থানে বা অঞ্চলে ট্যাক্স্ আদায় করা হয়, একমাত্র সেই স্থান বা অঞ্চলের দরিদ্রগণই সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারী। পক্ষান্তরে "শীতের সাহায্যে"র বেলায় সাহায্য-প্রাপ্তের বাসস্থান, কোন্

অঞ্চলে এবং কোন্ সূত্রে সাহায্য আদায় হইয়াছে ইত্যাদির কোনো প্রকার খোঁজ খবর লওয়ায় নিয়ম নাই।

এইবার "সমাজ-বীমা"র কথা ধরা যাউক। সমাজ-বীমার ব্যবস্থায় মালিক এবং রাষ্ট্র প্রিমিয়াম (চাঁদা)-তহবিলে চাঁদা প্রদান করে। মজুর আর কেরাণীরাও কিছু চাঁদা দেয়। কিন্তু যে-কোনো ব্যক্তিই "সমাজ-বীমা"র উপকার ভোগ করিতে পারে না। যাহারা নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া চাঁদা দিয়া আসিয়াছে একমাত্র সেই সমস্ত মজুর এবং বেতনভোগী কেরাণী ইহা ভোগ করিবার অধিকারী। "শীতের সাহায্যে"র ব্যবস্থায় কিন্তু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই সাহায্য ভোগ করিতে পারে। মজুর বা কেরাণীর তরফ হইতে চাঁদা দেওয়ার কোনো বালাই নাই। ইহাতে বীমার আইন-কানুনের গন্ধও শুঁকিতে পাওয়া যায় না। ইহা নির্জ্জলা দান-খয়রাৎ, পরোপকার বা "ভিক্ষার ঝুলি"।

বিতরিত মালের আকার-প্রকার

"ভিণ্টার-হিল্ফের" ব্যবস্থায় কেবল মাত্র মালে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্তদের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য বিতরিত হইয়াছে নিম্নে তাহার কয়েক দফার পরিমাণ দেওয়া হইল:—

ক। আহার্য্য দ্রব্য

১।	আলু	১৪,৫০৬,৫৮৪	ৎসেণ্ট্নার (হন্দর)
২।	রাই	৩৮১,৫২২	,,
৩।	গম	১৯২,৬৬২	,,
৪।	রাইয়ের ময়দা	১৪৪,৫২১	,,
৫।	গমের ময়দা	৩১১,৯৩৮	,,
৬।	রুটী	২৯২,৪৮২	,,

৭।	মাখন	১৭,৯৫২	,,
৮।	ডিম	২,৫০৫,৬৩৮	(গুন্‌তিতে)
৯।	শাকসব্‌জী	১৩৪,৬০৪	ৎসেণ্ট্‌নার (হন্দর)
১০।	দুধ	৪;৭৭৮,০৭০	লিটার (সের)
১১।	ফল	৪৩,৪০৭	ৎসেণ্ট্‌নার (হন্দর)
১২।	চাউল	৫৭,৪৭০	,,
১৩।	লবণ	১,৭৬৬	,,
১৪।	গরু (জ্যান্ত)	৪,৮০৯	,,
১৫।	চিনি	১৩৮,৩৫৩	,,

খ। ইন্ধন

১।	কয়লা	৫১,০০১,৭১২	ৎসেণ্ট্‌নার (হন্দর)
২।	কোক্	২৩,২১৮	,,

খ। বস্ত্র

১।	স্যুট	২০১,৭১৮	(সংখ্যা)
২।	ব্লাউজ	১২৫,০৯০	,,
৩।	দস্তানা	২৭,৪৩৫	(জোড়া)
৪।	প্যাণ্টালুন	৫৪৪,৫২০	(সংখ্যা)
৫।	কোট	৬৯০,৬৭৪	,,
৬।	ওভারকোট	৩৯০,৫৪৬	,,
৭।	জুতা	২,৪৩৭,৬৯৪	(জোড়া)
৮।	পোষাকের উপকরণ	২,৮৫৯,৯২৫	মিটার (গজ)
৯।	পশম	১,১৭০	ৎসেণ্ট্‌নার (হন্দর)

ঘ। টিকিট ও মেহনৎ

১।	থিয়েটার, কনসার্ট ও সিনেমার ফ্রি টিকিট্	১,১৬০,৩৯৮	(সংখ্যা)

২।	আহারের জন্য টিকিট	১,৩৫৯,১৩৪	,,
৩।	পোষাকের টিকিট	৪,১৪৯,৫৮৬	রাঃ মাঃ
৪।	আহার্য্যের টিকিট	৩০,৬৬৮,৯৭৬	,,
৫।	শিক্ষিত পেশার লোক কর্ত্তৃক সেবা	৪০,৬৮৫	,,
৬।	কুটির-শিল্পের কাজ	৫৮২,০৭৪	,,
৭।	বাড়ী ভাড়ার সাহায্য	১,৯৮৬,৩৪১	,,

ঙ। গৃহস্থালীর জিনিষপত্র

১।	বিছানা	৭৯,৮৯৬	(সংখ্যা)
২।	লেপ	১৪৩,০৫০	,,
৩।	বাসন-কোসন	২১৫,৯৭৬	,,
৪।	আসবাব-পত্র	১৪,৯০১	,,
৫।	শেলাইয়ের কল	২৯৪	,,

চ। অন্যান্য জিনিষ

১।	বই	৭৪,৫২১	(সংখ্যা)
২।	ছেলেদের গাড়ী	৫,৫০১	,,
৩।	উপহার (খৃষ্টমাস)	৯৪৮,২৫৫	,,
৪।	বাদ্যযন্ত্র	১,৬৫১	,,
৫।	বীজ (কৃষি)	৫৪,৮৫০ ৎসেণ্ট্নার (হন্দর)	
৬।	খেলনা	১,১৩৭,৩৫৬	(সংখ্যা)
৭।	বড়দিনের গাছ	৭৪১,৪৩৬	,,

"মুষ্টি-ভিক্ষা" বনাম "শীতের সাহায্য"

বাংলাদেশের প্রত্যেক গৃহস্থই মুষ্টি-ভিক্ষার সন্ধান রাখে। জার্ম্মাণির "সাখ্-স্পেণ্ডেন্" (মালে দান) ঠিক এই ধরণের ভিক্ষা দেওয়া।

এই কথাটা নিম্নলিখিত সমীকরণ বা সাম্য-সম্বন্ধ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে ঃ—

জার্ম্মাণ ভিণ্টার-হিল্‌ফে = বঙ্গীয় মুষ্টি-ভিক্ষা (হিমালয়-প্রমাণ)।

বাংলাদেশে বৎসর-বৎসর এইভাবে যে কি পরিমাণ চাউল ও অন্যান্য জিনিষ অভাবগ্রস্ত নরনারী এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হয় এ পর্য্যন্ত তাহার কোনো মাপজোক লওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই। এই মান্ধাতার আমলের 'জিনিষপত্রের দান-খয়রাৎ' এখনও বাঙালী সমাজে অনিয়ন্ত্রিত রহিয়া গিয়াছে এবং তাহার কোনো হিসাবপত্রও নাই। কিন্তু এই জন্য বাংলার পরিবারগুলা জগতের নিকট এই দাবী করিতে অধিকারী যে, সমাজ-সেবার ইতিহাসে তাহাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভিক্ষাদান-প্রথা বিশ্বের দরবারে এক নূতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। জার্ম্মাণির "ভিণ্টার-হিল্‌ফস্-ভের্ক" রূপ যুগ-প্রবর্ত্তক প্রচেষ্টার মধ্যে বাঙালী জাতের চিরপ্রসিদ্ধ ভিক্ষা দান প্রথারই দিগ্‌বিজয় দেখা যাইতেছে।

জিনিষপত্রে দানশীলতার জার্ম্মাণ বহরটা আবার একবার স্মরণ করা যাউক। ছয় মাসের ভিতর এই ভাবে জার্ম্মাণির সাড়েছয় কোটী লোকের মধ্যে ৩৬৭,৪২৫,৪৮৫ রাইখ্‌স্ মার্ক বিতরিত হয়। অর্থাৎ মাথাপিছু প্রত্যেক জার্ম্মাণকে যেন প্রত্যেক সন এই খাতে ২৸৹ খাজনা জোগাইতে হইতেছে। বাংলার সমবেত সম্পদ্ ও সরকারী রাজস্বের মাপকাঠিতে এই অতিরিক্ত ট্যাক্স শ্রেণীর জার্ম্মাণ খরচ নিশ্চয়ই বাঙালীর কল্পনার বাহিরে। কিন্তু তবুও "ভিণ্টার হিল্‌ফ্‌স্ ভের্কে"র সুবিস্তৃত আলোচনায় বাঙালীরা লাভবান হইবে। বাঙলার নিজস্ব মুষ্টিভিক্ষা প্রথার যে কতখানি গুণ এবং জাতীয় ঐক্য ও সঙ্ঘ-বদ্ধতার কত বড় আদর্শ যে ইহার মধ্যে নিহিত আছে, তাহা বাংলার নরনারী বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে; সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের প্রাণে

আত্মবিশ্বাসও গজাইতে পারিবে। সমাজতত্ত্বের দিক্ হইতে আমরা আর একবার স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, মানুষের ইষ্টানিষ্টের কাজে মানুষের সৃষ্ট আদিম, প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মাত্রই বাসি মাল বলিয়া ফেলিতব্য চিজ নয়। কখনো-কখনো একালেও সেকালের চিজের কিম্মৎ আছে।

অপর দিকে মুষ্টি-ভিক্ষা এবং শীতের সাহায্যের মধ্যে যে সমস্ত আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, সে সব ভুলিলে চলিবে না। মুষ্টিভিক্ষায় দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটা সাক্ষাৎ ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বিরাজমান। এই প্রথায় ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির হৃদয়-বিনিময় কিছু-কিছু সাধিত হয়। আদিম যুগের অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম বা খৃষ্টানী দানশীলতার এই হইতেছে চিরন্তন দস্তুর। মুষ্টি-ভিক্ষাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নৈসর্গিক প্রবৃত্তি-সঞ্জাত, মানুষিক, সার্ব্বজনীন দয়া-প্রণোদিত এবং আধ্যাত্মিক দরিদ্র-সেবা রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণ সমাজ-শাস্ত্রী ফার্ডিনাণ্ড টোেন্নীস্-কথিত দুইটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতেছি যে, মুষ্টিভিক্ষা—"গেজেল শাফ্‌টে"র (সমাজের) অভিব্যক্তি নয়; ইহা "গেমাইন্ শাফ্‌টের" (আত্মীয়তার বা সহযোগিতার) অভিব্যক্তি।

পক্ষান্তরে শীতের সাহায্যে আমরা অন্যরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এই প্রথায় প্রধানতঃ "সাখ্‌স্পেণ্ডেন" (মালে আদায়) ও "ফুণ্ড্-সাম্‌লুঙ্গেন" অর্থাৎ পাউণ্ড হিসাবে ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। সুতরাং ইহা বাঙালী মুষ্টি-ভিক্ষার অনুরূপ প্রথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহাতে গৃহস্থ ও ভিক্ষুকের মধ্যে কোনোরূপ যোগাযোগ নাই। সুতরাং ইহা চির-পুরাতন, সার্ব্বজনীন এবং আধ্যাত্মিক মানব-সেবা,—হিন্দুদের জীবে দয়া, জৈন বদান্যতা, বৌদ্ধ মতের লোকসেবা এবং খৃষ্টীয় দান-খয়রাৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরুণের বস্তু। এই প্রথার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এখানে "গেমাইন্‌শাফটে"র (আত্মীয়তার) বা সহযোগিতার

কোনরূপ প্রভাব নাই; এখানে বিদ্যমান "গেজেল্ শাফ্‌টে"রই (সমাজের) পূর্ণ রাজত্ব। মালপত্র আদায়ের কড়াকড়ি, সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি, মিলিত এবং যৌথ সেবার যুক্তিযোগের জন্য এই প্রথা মামুলি মুষ্টি-ভিক্ষা হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

সমাজ-সেবার রকমফের হিসাবে "শীতের সাহায্য" মানুষের ইচ্ছা ও বুদ্ধিবৃত্তির এক বিলকুল নয়া সৃষ্টি। একমাত্র সঙ্ঘ-শক্তি, কেন্দ্রবদ্ধতা, যুক্তিযোগ ইত্যাদি লইয়া গঠিত "বাঘা-বাঘা" প্রতিষ্ঠান-সমন্বিত "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের" যুগে শীতের সাহায্যরূপ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। ইহার পরিধি এত বৃহৎ এবং কার্য্য-কলাপ এত শৃঙ্খলিত যে, এমন কি বৎসর পঞ্চাশেক আগে বিস্‌মার্কের আমলে জার্ম্মাণজাতি স্বপ্নেও ইহা ধারণা করিতে পারিত না। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জার্ম্মাণি প্রাগ্‌যুদ্ধ যুগের চেয়ে আজ (১৯৩৩-৩৬) অনেক বেশী কেন্দ্রীভূত ও সঙ্ঘবদ্ধ এবং অধিকতর যন্ত্র-সম্পদে সজ্জিত। সেই জন্য ভারতীয় মুষ্টিভিক্ষা এবং জার্ম্মাণ শীতের সাহায্যের মধ্যে কিছু-কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও, জার্ম্মাণ শীতের সাহায্য স্বভাবতই ভারতবাসীর পক্ষে চিন্তারও অতীত। যে-সমস্ত দেশের সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতি ভারতবর্ষের মত অবনত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেই সমস্ত দেশের অধিবাসিগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিবে না। জার্ম্মাণ শীতের দরিদ্র-নারায়ণকে কল্পনা করা সম্ভব একমাত্র জার্ম্মাণদের মাসতুত ভাইদের পক্ষে।

হিট্‌লার-রাজের স্মরণযোগ্য বহু কৃতিত্বের মধ্যে এই কাজটা বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। শীতের সাহায্যের মোট আদায়ের এক-তৃতীয়াংশ মুষ্টি-ভিক্ষা বাবদ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রায় পনর লক্ষ লোক কার্য্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মাত্র প্রায় পাঁচ হাজার বেতনভোগী সেবক। মোট আদায়ের শতকরা এক অংশেরও কম

সেবা-পরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে। এই সমস্ত দফার মহত্ত্ব ও গৌরব বিলাত, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি "বাঘা-বাঘা" দেশের প্রতিষ্ঠানগুলা ছাড়া অন্য কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা আছে কিনা সন্দেহ।

তবে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতীয় কংগ্রেস, কর্পোরেশন, মিউনিসি-প্যালিটি, বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতি এবং ব্যক্তি-বিশেষ লইয়া গঠিত গোটাকয়েক প্রতিষ্ঠানের ধনভাণ্ডার এই উপলক্ষে উল্লেখ করিতেছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর ফেলিলে আমরা জার্ম্মাণ শীতের সাহায্য-কাণ্ডটা বহুদূর হইতে সামান্য একটু উপলব্ধি করিতে পারিব। পরিচালন এবং গঠনের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ভারতীয় মুষ্টি-ভিক্ষাও যে এইসকল প্রতিষ্ঠানের তদ্‌বিরে "আধুনিকতা"র দিকে আস্তে-আস্তে কিছু-কিছু অগ্রসর হইতেছে তাহা খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ সমঝিয়া রাখা ভাল।*

* রেখেন শাফ্‌ট্‌স্ বেরিখ্‌ট্‌ ডেস্ ভিণ্টার হিল্‌ফস্ ভের্কেস ডেস্ ডয়চেন ফোল্‌কেন ১৯৩৩-৩৪ ও ১৯৩৪-৩৫ (বার্লিন) হইতে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকের "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স লেজিস্‌লেশন অ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্,—এ ষ্টাডি ইন্ দি লেবার ইক-নমিকস্ অব্ নেও-ক্যাপিটালিস্‌ম্" (কলিকাতা ১৯৩৬) এবং "দি সোসিঅলজি অব্ পপিউলেশন কলিকাতা ১৯৩৬) গ্রন্থ দুইটা দ্রষ্টব্য।

লোক-ঘনত্বের সামাজিক ফলাফল*

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

"উত্তম" ও লোক-ঘনত্ব

একালের লোকবিদ্যায় "অপ্‌টিমাম" বা "উত্তম' সংখ্যার রেওয়াজ খুব বেশী। এই পারিভাষিক শব্দটা নতুন। এই শব্দের ভিতরকার "উত্তম" ও লোক-ঘনত্ব খোলসা করিয়া দেখানো আবশ্যক।

"উত্তম" সংখ্যার বিশ্লেষণ করিতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত মাথাপিছু আয় বা জীবনযাত্রা প্রণালীতে গিয়া ঠেকিতে হয়। মাথাপিছু আয়ের দৌড় দেখিয়া লোকসংখ্যার উত্তম বা অপটিমাম বিচার করা সম্ভব। এই দুই বস্তু একই চিজ্‌ ছাড়া আর কিছু নয়।

অপটিমাম বা উত্তম একটা সংখ্যা-বিশেষ। এই সংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য লোক-ঘনত্ব অর্থাৎ ফি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা কত তাহার হিসাব করা লোকশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রী আর সমাজশাস্ত্রীদের দস্তুর। কিন্তু এই দস্তুরে গলদ আছে বিস্তর। এই দস্তুর বা রীতি দস্তুরমতো সন্দেহজনক ও ভ্রমাত্মক।

লোকসংখ্যার "উত্তম" বলিলে কতকগুলা বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে প্রতি বর্গমাইলে নরনারীর একটা বিশিষ্ট সংখ্যা আছে। নরনারীর সংখ্যা জনপদের চৌহদ্দি অনুসারে কষিয়া দেখিলে তাহাকে লোক-ঘনত্ব বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, বুঝিতে হইবে যে, ঐ সংখ্যার অন্তর্গত প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের

* "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের আলোচনা (২ মার্চ্চ, ১৯৩৫

মাথাপিছু আয় (অর্থাৎ জীবনযাত্রা প্রণালী) সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছে। এই সংখ্যা যদি বাড়িয়া যায় অর্থাৎ "উত্তম" ঘনত্ব ছাড়াইয়া জনপদটা যদি অতিরিক্ত লোকের বসতিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের মাথাপিছু আয়ও কমিয়া যায়। এই অবস্থায় লোক-বাহুল্য বা লোকসংখ্যার "অতিবৃদ্ধি" বুঝিতে হইবে। অন্যপক্ষে সংখ্যা যদি কমিয়া যায় অর্থাৎ "উত্তম" ঘনত্বের নীচে নামিয়া আসে এবং জনপদটা বিরল লোকের বসতিতে পরিণত হয় তাহা হইলে মাথাপিছু আয়ও কমিয়া যায়। "উত্তম" হইতেছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুবিধার জন্য গণিত-প্রতিষ্ঠিত কল্পনা-সহায়ক সংখ্যা। এই সংখ্যাটা এমনভাবে কল্পনা করা হইয়াছে যে, বাড়িলেও মাথাপিছু আয় কমে আর কমিলেও মাথাপিছু আয় কমে। "উত্তম" সংখ্যার পারিভাষিক অর্থ এইরূপ বিচিত্র যে ইহার একদিকে লোকসংখ্যার "অতি-বৃদ্ধি" বা লোক-বাহুল্য অপর দিকে "অতি-হ্রাস" বা লোক-বৈরল্য। আর দুয়ের আর্থিক ফল একরূপ,—মাথাপিছু আয়ের ঘাটতি। এইরূপ অপ্‌টিমাম বা উত্তম সংখ্যার বৈজ্ঞানিক মূল্য কতখানি তাহাই বর্ত্তমানে আলোচনা করিব।

একমাত্র লোক-বসতির হারকে অতিরিক্ত বা বিরল লোক বসতির সূচী-সংখ্যারূপে ধরিয়া লওয়া উচিত নয়। কেন না অর্থনৈতিক গবেষণাক্ষেত্রে ইহার কিম্মৎ খুব বেশী নয়। লোকঘনত্ব অঙ্কশাস্ত্র বা পাটিগণিতের মামুলি অনুপাত মাত্র। ইহার সংখ্যা দ্বারা কোনো জনপদের চতুঃসীমার হিসাবে নরনারীর সংখ্যা কিরূপ তাহার স্থূল পরিচয় মিলিতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত বা বিরল লোকসংখ্যা—লোকসংখ্যার অতি-বৃদ্ধি বা অতি-হ্রাস—দারিদ্র্য অর্থাৎ "উত্তম" আয় ও "উত্তম" জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে বিচ্যুতি, এই সব রীতিমত অর্থনৈতিক জিনিষ। কারণ গোটা দেশের, জনপদের, জাতির বা শ্রেণীর মোট আয়ের সহিত এইগুলা সম্বন্ধযুক্ত। আয়-বৃদ্ধি ও আয়-হ্রাস

ইত্যাদি বস্তু আলোচনা করিতে হইলে জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। কোনো জনপদে কতগুলা লোক আছে তাহার সংখ্যা লইয়া তাহাকে জনপদের বর্গমাইলের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাতে নরনারীর আর্থিক অবস্থা কিছুই মালুম হয় না। পাওয়া যায় মাত্র একটা ছোট, বড় বা মাঝারি সংখ্যা। কথাটা তলাইয়া-মজাইয়া বুঝা আবশ্যক।

নিম্নে ভারতের নয়টা প্রদেশ, ইয়োরামেরিকার কয়েকটা দেশ, চীন এবং জাপানের লোকসংখ্যার ঘনত্ব পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেখাইতেছি। শ্রেণী পাঁচটাকে আবার দুইটা প্রশস্ত দলেও ভাগ করা হইল (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোকসংখ্যার হিসাব, ১ কিলোমিটার = ৫/৮ মাইল ; ১ বর্গ কিলোমিটার = ২৫/৬৪ বর্গ মাইল) :—

১। উচ্চ ঘনত্বের দল

ক অত্যন্ত উচ্চ			খ অপেক্ষাকৃত উচ্চ		
বেলজিয়াম (১৯৩০)	...	২৬৬	বিলাত (১৯৩১)	...	১৯৭
বাংলা (ভারত)	...	২৫২	যুক্তপ্রদেশ (ভারত)	...	১৭৭
হল্যাণ্ড (১৯৩০)	...	২৩২	বিহার-উড়িষ্যা (ভারত)		১৭৭
			জাপান (১৯৩০)	...	১৬৯

গ

উচ্চ

জার্ম্মাণি (১৯২৫)	...	১৩৪
ইতালি (১৯৩১)	...	১৩৩
মান্দ্রাজ (ভারত)	...	১২৮
চেকোস্লোভাকিয়া	...	১০৫
চীন (১৯৩০)	...	১০০

২। নিম্ন ঘনত্বের দল

ক			খ		
অপেক্ষাকৃত নিম্ন			অত্যন্ত নিম্ন		
হাঙ্গারী	...	৯৩	মধ্যপ্রদেশ (ভারত)	...	৬০
পাঞ্জাব (ভারত)	...	৯২	বুলগেরিয়া	...	৫৯
পোলাণ্ড	...	৮৩	রুশিয়াবর্জ্জিত ইয়োরোপ		৫৬
অষ্ট্রিয়া	...	৮০	গ্রীস	...	৪৯
ভারত	...	৭৬	লিথুয়ানিয়া	...	৪৩
ফ্রান্স	...	৭৬	ইয়োরোপ	...	৪২
বোম্বাই (ভারত)	...	৬৯	রুশিয়া	...	২৬
আসাম (ভারত)	...	৬১	বর্ম্মা (ভারত)	...	২৪
রুমানিয়া	...	৬১	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	১৬

ভারত ও ভারতীয় প্রদেশগুলার অঙ্ক ১৯৩১ সনের আদম স্মারী হইতে গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের বেলায় ১৯৩০-৩১ সনের হিসাব ধরা হইয়াছে।

মাথাপিছু জাতীয় আয়

এখন নানা দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের সূচীসংখ্যা লইয়া আলোচনা করিব। সকলেরই জানা আছে যে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় ঠিক একই রীতিতে বা কায়দায় নির্দ্ধারিত হয় না। অথচ সাংসারিক জীবন-যাত্রা প্রণালী বা অর্থনৈতিক কর্ম্ম-ক্ষমতা জরীপ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে এই সমস্ত অঙ্ক লইয়া তুলনা করা অর্থশাস্ত্রী মহলের দস্তুর। কিন্তু সংখ্যা-শাস্ত্রের বিচারে এইরূপ তুলনা সাধন টেঁকসই নয়। ইহা নির্ভরযোগ্য কিনা তাহা রীতিমত সংশয়-পূর্ণ। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও ভুলচুকের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া

নিম্নে কতকগুলি মাপজোক দেওয়া হইল। আর যাহাই হউক না কেন, এইসকল সংখ্যার সাহায্যে খানিকটা বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে আর্থিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ চলিতে পারিবে। ১৯১৩-১৪ সনের অবস্থা বুঝাইবার জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয়ের অঙ্কগুলা বিলাতী পাউণ্ডের হিসাবে দেওয়া যাইতেছে :—

ক			খ		
১।	মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র …	৭২	১।	ক্যানাডা …	৪০
২।	অষ্ট্রেলিয়া …	৫৪	২।	ফ্রান্স …	৩৮
৩।	বিলাত ও আয়ার্ল্যাণ্ড	৫০	৩।	জার্ম্মাণি …	৩০

গ			ঘ		
১।	ইতালি …	২৩	১।	জাপান …	৬
২।	অষ্ট্রিয়া …	২১	২।	ভারতবর্ষ …	৪
৩।	স্পেন …	১১			

মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাতীয় আয়ের হিসাব একটা মার্কিণ জরীপে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে ১৯২২ সনের নিম্নলিখিতরূপ অবস্থা (ডলারে) জানিতে পারা যায় :—

ক			খ		
১।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র …	২৮২	১।	ইতালি …	৮৫
২।	বিলাত …	২১৩	২।	রুশিয়া …	৪২
৩।	ফ্রান্স …	১৭৯	৩।	জাপান …	৩৫
৪।	জার্ম্মাণি …	১১৪	৪।	ভারত …	১৪

নিম্নে কয়েকটী দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের হিসাব (জার্ম্মাণ রাইখ্‌স মার্কে) দেওয়া হইল :—

১।	মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (১৯২৬) …	৩,২৩০
২।	বিলাত (১৯২৪-২৫) …	১,৬২০

৩। জার্ম্মাণি (১৯২৯)	...	১,০৯৫
৪। ফ্রান্স (১৯২৫)	...	৯৮০
৫। ইতালি (১৯২৮)	...	৪৬০

এক্ষণে ঘনত্বের সূচীসংখ্যা ও আয়ের সূচীসংখ্যার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা, বিচার করিয়া দেখা যাউক।

"অতি উচ্চ" ঘনত্বের মণ্ডলে (১-ক সংখ্যক ঘনত্ব-শ্রেণী) বাংলার জনপ্রতি জাতীয় আয়ের মাত্রা নিতান্ত অল্প। তাহা সত্ত্বেও এই দেশ উচ্চ আয়-বিশিষ্ট বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং "অতি উচ্চ" ঘনত্বের সহিত উচ্চ বা নিম্ন আয়ের যোগাযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১-গ সংখ্যক শ্রেণীর মধ্যে "উচ্চ" ঘনত্ব মণ্ডল অবস্থিত। জার্ম্মাণি, মাদ্রাজ, ইতালি ও চীন এই মণ্ডলে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু মাথা-পিছু আয় হিসাবে মাদ্রাজ বা চীন ইতালি বা জার্ম্মাণির সহিত এক আসনে বসিবার যোগ্য নয়; এমন কি ইতালির স্থানও জার্ম্মাণির অনেক নীচে।

এইবার "অপেক্ষাকৃত নিম্ন" ঘনত্বের মণ্ডলে পায়চারি করিতেছি। ২-ক সংখ্যক শ্রেণী এই পর্য্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখিতে পাই-তেছি যে, ফ্রান্সের সহিত বোম্বাই এবং পাঞ্জাবও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সুবিদিত যে, ফ্রান্স-বাসীর মাথাপিছু আয় এই ভারতীয় প্রদেশ দুইটীর মাথাপিছু আয় অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। গোটা ভারতের লোক-ঘনত্ব ফ্রান্সের লোক-ঘনত্বের সমান। লোক-ঘনত্বের সাম্য আর জাতীয় আয়ের সাম্য পরস্পর-সম্বন্ধ নয়। এই দুইয়ের ভিতর কার্য্যকারণ সম্বন্ধও নাই বা অন্য কোনো প্রকার যোগা-যোগও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উচ্চ-ঘনত্ব-সম্পন্ন দেশগুলার মধ্যে কয়েকটী উচ্চতম আয়ের মাত্রা

স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বেলজিয়াম, ইংল্যণ্ড ও জার্মাণির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উচ্চ ঘনত্ব দারিদ্র্যের "স্যাঙ্গাত" নয়। অন্য পক্ষে নিম্ন ঘনত্ব ও উচ্চ আয়ের মধ্যে রীতিমত সম্বন্ধ থাকিতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লোক-ঘনত্ব খুব নিম্ন, কিন্তু এই দেশ সর্ব্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের মালিক। ফ্রান্সও অপেক্ষাকৃত নিম্ন ঘনত্বের দেশ হইয়াও অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়ের দেশ।

আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ ও সামাজিক গতিশীলতা

লোক-ঘনত্ব সমস্যার সহিত লোক-চলাচলের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। লোক-চলাচল বলিলে দুই ধরণের গতিভঙ্গী বুঝিতে হইবে। প্রথমতঃ স্বাভাবিক, দ্বিতীয়তঃ কৃত্রিম। জন্ম-মৃত্যু স্বাভাবিক লোক-চলাচলের উদাহরণ। কৃত্রিম লোক-চলাচল নানা উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে। নরনারীর আমদানি-রপ্তানি, বিদেশ-গমন, দেশ-প্রবেশ, দেশ-বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন, পল্লী-গঠন, পল্লী হইতে নগরে গমন, শহরে আড্ডাগাড়া ইত্যাদি ঘটনা কৃত্রিম লোক-চলাচলের অন্যতম মূর্ত্তি। কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার ভিতর কতগুলা বিদেশী লোকের আমদানি হইল আর মোট জনসংখ্যা হইতে কতগুলা বাহিরে চলিয়া গেল, তাহার "ব্যালান্স্" অর্থাৎ বিয়োগ-ফল—এই ক্ষেত্রে হিসাব-নিকাশের বস্তু। এই বিয়োগের ফলে কখনো দেশের লোকসংখ্যা বাড়িয়া যায়, কখনো বা কমিয়া যায়। কৃত্রিম লোক-চলাচলের দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কোনো জনপদে বহির্জ্জাত নরনারীর সংখ্যা কত গুনিয়া দেখা আবশ্যক। জনপদের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে বহির্জ্জাত লোকের সংখ্যা কিরূপ তাহাও কষিয়া দেখিতে হয়।

দ্বিতীয় দফার লোক-চলাচলকে কোনরূপেই প্রথম দফার অন্তর্গত করা চলে না। কিন্তু তবুও ইহা সামাজিক গতিশীলতার একটা বিশেষ মূর্ত্তি সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গবেষণায় এই অনুপাতকে গতি-ভঙ্গীর অভিব্যক্তিরূপে ধরিয়া লইব।

ভারতীয় লোক-চলাচলের বিয়োগ-ফল অর্থাৎ নয়টা প্রদেশে লোক-রপ্তানি অপেক্ষা লোক-আমদানি বেশী না কম দেখানো যাইতেছে। ১৯৩১ সনের হিসাবে বাড়্‌তি-ঘাট্‌তি নিম্নরূপ :—

প্রদেশ	বৃদ্ধি + বা হ্রাস −	লোক-চাপ
আসাম	+১,২৪১,০১১	অত্যন্ত নিম্ন
বাংলা	+৭৭১,৯৩৬	নিম্ন
বর্ম্মা	+৫৯৩,৩২৪	নিম্ন
বোম্বাই	+৫০৬,৭০৭	নিম্ন
মধ্যপ্রদেশ	+২২৭,০০৩	প্রায় নিম্ন
পাঞ্জাব	−৬৭,৭৯২	প্রায় উচ্চ
মাদ্রাজ	−৮৮৮,৩৩৯	উচ্চ
যুক্তপ্রদেশ	−১,০৬৩,১৪৩	অত্যন্ত উচ্চ
বিহার-উড়িষ্যা	−১,২৯১,৫৬৭	অত্যন্ত উচ্চ

উপরের তালিকায় রপ্তানিকারক প্রদেশগুলাকে "উচ্চ" জনবলের চাপবিশিষ্ট জনপদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর পক্ষে "নিম্ন" চাপবিশিষ্ট জনপদগুলায় লোক-আমদানি হইয়া থাকে। এই নয়টা প্রদেশের মধ্যে পাঁচটাতে যোগের চিহ্ন এবং চারটাতে বিয়োগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বুঝিতেছি যে, আন্তঃপ্রাদেশিক লোক-চলাচল—জার্ম্মাণ পারিভাষিকের "ইন্‌নেরে কোলোনিজীরুং"—বা আন্তর্ভৌম উপনিবেশের ফলে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর প্রদেশগুলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পাইয়াছে। অন্য শ্রেণীর বেলায় বহিরাগত অপেক্ষা বিদেশগামী লোকের সংখ্যাধিক্যই স্পষ্ট প্রতীয়মান।

লোক-চলাচলের বিয়োগ-ফল আর লোক-ঘনত্ব এই দুই সামাজিক তথ্যের ভিতর নির্দ্দিষ্ট কোনো যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর নয়। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আমরা উচ্চ ঘনত্বের প্রদেশ বাংলার (২৫২) সহিত নিম্ন ঘনত্বের বর্ম্মা (২৪) ও মধ্যপ্রদেশ (৬০) এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন ঘনত্বের আসাম (৬১) ও বোম্বাইকে (৬৯) অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাইতেছি। তেমনি বিয়োগ-চিহ্ন-সংযুক্ত শ্রেণীতে "উচ্চ" ঘনত্ব বিশিষ্ট যুক্ত প্রদেশ (১৭৭) ও বিহারের (১৭৭) সহিত অপেক্ষাকৃত উচ্চ ঘনত্বের মাদ্রাজ (১২৮) এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন ঘনত্বের পাঞ্জাব (৯২) অন্তর্ভুক্ত লোকের সংখ্যাধিক্যই স্পষ্ট রহিয়াছে।

১৯২১ সনে পাঞ্জাব যোগচিহ্নযুক্ত শ্রেণীতে ছিল। ১৯২১ আর ১৯৩১ এই দুই বৎসরের প্রভেদ মাত্র এইটুকু। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত প্রদেশেই লোক-চলাচলের "ব্যালান্স" বা বিয়োগ-ফল হিসাবে ১৯২১ সনে যাহা ছিল ১৯৩১ সনেও তাহাই। তবে আপেক্ষিক অবস্থান সম্বন্ধে প্রত্যেক শ্রেণীতেই অল্পবিস্তর রদবল ঘটিয়াছে।

অন্য কথায় বলিতে গেলে, উচ্চ ঘনত্বকে সকল সময় "উচ্চ জনবলের চাপ" রূপে ধরিয়া লওয়া যায় না। জনবলের চাপ উচ্চ হইলে প্রত্যেক জনপদের পক্ষে অতিরিক্ত লোকজন সরাইয়া ফেলিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে হয়। কিন্তু উচ্চ ঘনত্ব থাকা সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে জনপদ হইতে লোকজন সরাইয়া ফেলিবার আবশ্যকতা না হইতেও পারে। এমন কি উল্টাই দেখা যাইতে পারে। অর্থাৎ উচ্চ ঘনত্বের মুল্লুকেও বিস্তর লোক-আমদানি হওয়া সম্ভব। অপর-দিকে মাপজোকের বলে "নিম্ন জনবল চাপ" আর নিম্ন ঘনত্বের মধ্যেও ধাঁ করিয়া সাম্য-সম্বন্ধ স্থাপন করা চলিবে না। অর্থাৎ নিম্ন ঘনত্ব

দেখিবামাত্র বাহির হইতে ঔপনিবেশিক আমদানি করিতে অগ্রসর হইলে বেয়াকুবি করা হইবে। কেননা নিম্ন ঘনত্বের মুল্লুকেও উচ্চ চাপ থাকা সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাটীগণিত-সম্মত লোক-ঘনত্ব বা প্রতি বর্গ মাইলে লোক-সংখ্যার হিসাব করিয়া কোনো জনপদের উপর উচ্চ বা নিম্ন জনবল চাপের ফতোআ জারি করা যায় না। ঐ জনপদে কোন্ কোন্ আকর্ষণের বস্তু আছে,—অর্থাৎ বর্ত্তমান বা ভাবী অধিবাসীরা ভাত-কাপড়ের কিরূপ সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে বা করিবে তাহা বিচার করিয়া বলিতে হইবে জনবলের চাপ উচ্চ বা নিম্ন।

জার্ম্মাণ লোকশাস্ত্রী এলষ্টার বলিয়াছেন যে, কোনো জনপদের মোট লোকসংখ্যা দেখিয়া সেই জনপদে লোক-বাহুল্য অর্থাৎ লোকের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে কিনা বলা চলে না। এলষ্টার-প্রচারিত এই মত পূরাপূরি স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কিন্তু তবুও ইহা খাঁটী সত্য যে, বিরল লোক-বসতিযুক্ত কোনো জনপদ অতি-বৃদ্ধির অর্থাৎ লোক-বাহুল্যের দেশ বিবেচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে উচ্চ ঘনত্ববিশিষ্ট, কিন্তু মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী কোনো জনপদকে মোটেই অতিবৃদ্ধির দেশ সমঝানো চলে না।

বহির্জ্জাতের সূচীসংখ্যা

নরনারীর জন্মস্থান লইয়াও প্রত্যেক জনপদের লোক-গঠনের প্রকার-ভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সামাজিক গতিশীলতা উপলক্ষে এই সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যে জনপদের লোকসংখ্যার হিসাব লওয়া হয় সেখানে অন্যস্থানে জাত লোকের অস্তিত্ব মানুষ-আমদানির সূচীসংখ্যারূপে গ্রাহ্য।

নিম্নের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩১ সনে প্রতি দশহাজারে বহির্জ্জাতের সংখ্যা কিরূপ ছিল প্রকাশ করা হইল :—

প্রদেশ	সূচী সংখ্যা	সামাজিক গতিশীলতা
মাদ্রাজ	২১	অত্যন্ত নিম্ন
যুক্তপ্রদেশ	৫৭	অত্যন্ত নিম্ন
বিহার-উড়িষ্যা	১১৩	অপেক্ষাকৃত নিম্ন
পাঞ্জাব	২৩৭	অপেক্ষাকৃত নিম্ন
বাংলা	৩৬৩	অপেক্ষাকৃত উচ্চ
মধ্যপ্রদেশ	৩৬৪	অপেক্ষাকৃত উচ্চ
বোম্বাই	৪৭৫	উচ্চ
বর্ম্মা	৫৩০	উচ্চ
আসাম	১,৫২৩	অত্যন্ত উচ্চ

সামাজিক গতিশীলতার এই দিক্‌টার সহিত লোক-ঘনত্বের কতকটা বিপরীত সম্বন্ধ পাতানো চলে। আসাম, বর্ম্মা ও বোম্বাই প্রদেশ এই ধরণের সামাজিক গতিশীলতা হিসাবে উচ্চ সূচীসংখ্যা-বিশিষ্ট অথচ এই তিনটী প্রদেশ নিম্ন ঘনত্ব বিশিষ্টও বটে। এই বিপরীত যোগাযোগটা কিন্তু নিখুঁত নয়; কারণ সমাজের এই গতিশীলতার ক্রমের সহিত ঘনত্বের বৃদ্ধি বা হ্রাসের ক্রম ঠিক তাল রক্ষা করিয়া চলে না।

বাংলা "অতি উচ্চ" ঘনত্বের দেশ (২৫২) এবং মধ্যপ্রদেশ "অতি নিম্ন" ঘনত্বের মুল্লুক (৬০) ; কিন্তু উভয়েই "অপেক্ষাকৃত উচ্চ" সামাজিক গতিশীলতার (৩৬৩-৩৬৪) মালিক। অর্থাৎ "নিম্ন", "অত্যন্ত নিম্ন", "অত্যন্ত উচ্চ" ঘনত্বের সহিতও "অপেক্ষাকৃত উচ্চ" সামাজিক গতিশীলতার সম্পর্ক থাকিতে পারে।

মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের সামাজিক গতিশীলতার সূচী-সংখ্যা

যথাক্রমে ২১ ও ৫৭; সুতরাং উভয় প্রদেশই "অত্যন্ত নিম্ন" সূচী সংখ্যার অধিকারী। কিন্তু দুইটী প্রদেশই "উচ্চ" ঘনত্ব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এখানেও বিপরীত সম্বন্ধের সন্ধান মিলিতেছে। অধিকন্তু বিহার-উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশের সহিত অনেকটা এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে উনিশ-বিশ লক্ষ্য করিতে হইবে।

কিন্তু পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত আবার বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই প্রদেশ ঘনত্ব হিসাবে যেমন "অপেক্ষাকৃত নিম্ন" সামাজিক গতিশীলতার দিক্ হইতেও তেমনি "অপেক্ষাকৃত নিম্ন।"

তবে কাজ চালাইবার মত একটা মোটা সিদ্ধান্ত যে দাঁড় করানো যায় না তাহা নয়। বাংলা, মধ্যপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবকে বাদ দিয়া এবং মাপজোকের দিকেও অত্যধিক নজর না দিয়া মোটামুটিভাবে নিম্ন গতিশীলতার সহিত উচ্চ ঘনত্বের, এবং উচ্চ গতিশীলতার সহিত নিম্ন ঘনত্বের সম্বন্ধ পাতানো যাইতে পারে।

লোক-ঘনত্ব ও আর্থিক সুযোগ

লোক-সংখ্যার ঘনত্ব ও সামাজিক গতিশীলতার সমস্যা নিতান্ত সহজ-সরল কাণ্ড নয়। তবে লোক-চলাচলের সহিত জনপদের আর্থিক সম্পদ, সুযোগ ও আকর্ষণী শক্তির যোগাযোগ বেশ সহজেই মালুম হয়। আর্থিক সম্পদ্ বলিতে কেবল মাত্র শিল্প-বিষয়ক কলকারখানা বা পুঁজিপাট্টা সমঝিলে চলিবে না।

নিম্নের তালিকায় ১৯২৬-২৭ সনে বৃটিশ ভারতের জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সংখ্যা এবং প্রত্যেক কোম্পানীর পুঁজি-পাট্টার পরিচয় দেওয়া হইল:—

প্রদেশ	কোম্পানীর সংখ্যা	কোম্পানী পিছু গড় পুঁজির পরিমাণ (হাজার টাকা)
১। বোম্বাই	৮১২	১,২৪৯
২। বর্ম্মা	২৮৩	৯৩৮
৩। যুক্তপ্রদেশ	২১৫	৬০০
৪। বাংলা	২,৬৫২	৩৯৮
৫। মধ্যপ্রদেশ	৪৯	২০৯
৬। মাদ্রাজ	৬৬২	১৮৯
৭। পাঞ্জাব	১৭৩	১৮২
৮। বিহার-উড়িষ্যা	৮২	১৪৫
৯। আসাম	১১৬	৫৮

সংখ্যাগুলা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় দৃষ্টান্তস্বরূপ লইতে হইবে। এই জন্য কয়েক বৎসরের পুরাণা হইলেও অঙ্কগুলায় কাজ চলিবে।

এই তালিকা দেখিবামাত্র যেন কেহ পুঁজিপাট্টা বা শিল্পোন্নতির সহিত লোক-ঘনত্বের সম্বন্ধ পাতাইতে চেষ্টা না করেন। কেননা পুঁজিপাট্টা নিয়োগ এবং কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের পরিধি বা আকার-প্রকার প্রদেশগুলার লোক-ঘনত্বের ক্রম মানিয়া চলে নাই।

অন্য পক্ষে ঘনত্বের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, লোক-চলাচলের বা নরনারীর আমদানি-রপ্তানির বিয়োগ-ফলের সহিত আর্থিক সুযোগ বা পুঁজিপাট্টা নিয়োগের পরিমাণের বেশ-কিছু একটা সম্বন্ধ আছে দেখা যাইতেছে।

আসাম হইতে লোক-রপ্তানি অপেক্ষা ঐ প্রদেশে লোক-আমদানির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। আসামের চা-বাগিচাসমূহে প্রযুক্ত বিরাট পুঁজিপাট্টা ইহার একমাত্র কারণ নয়। আসামে পতিত জমির আধিক্য

বশতই বাংলার ময়মনসিংহ জেলা হইতে বিস্তর লোক এখানে আসিয়া চাষআবাদের উদ্দেশ্যে বসবাস করিতেছে। অর্থাৎ "চা-শিল্পের" চেয়ে চাষ-আবাদের টান বহরে খুব বেশী। বাংলায় এবং বোম্বাইয়ে শিল্পোন্নতিই লোকরপ্তানি অপেক্ষা লোক-আমদানির আধিক্য ঘটিবার প্রকৃষ্টতম কারণ। এই কারণ বশতঃ "বহির্জ্জাত" লোকজন পুঁজিপাট্টা নিয়োগের মতলবে বা চাকুরি ঢুঁড়িবার উদ্দেশ্যে চিরদিনই এই দুই মুল্লুকে ভিড় করিয়া থাকে।

শিল্পনিষ্ঠার বাড়্‌তি নানা উপায়ে বহির্জ্জাত লোকজনকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। প্রথমতঃ কলকারখানায় চাকুরি বা কাজ পাওয়ার আশায় অনেকে আসিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ কলকারখানার নানারূপ সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এবং মজুরদের প্রয়োজনীয় নানারূপ চিজ সরবরাহের জন্য বহুলোক কলকারখানার অঞ্চলে আসিয়া বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করে। নানা ধরণের চাষ-আবাদ, খুচরা ব্যবসা, মাল-চলাচল ও লোক-চলাচলের জন্য যানবাহনের ব্যবসা, কেরাণীগিরি ইত্যাদি নানারূপ রোজগারের পন্থা বা উপায় শিল্প-বিস্তৃতি-চক্রের আনুষঙ্গিক। এই সবই আভ্যন্তরীণ লোক-চলাচলের,—উপনিবেশ-কায়েমের পহেলা নম্বরের সহায়ক।

আর্থিক মন্দার পূর্ব্ববর্ত্তী এক সনে (১৯২৬-২৭) ভারতের ৫,৫৩৫টা জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীতে মোট ২৭৭ কোটি ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা খাটিতেছিল। ইহার মধ্যে বোম্বাইয়ের হিস্যা ১০১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৯ হাজার এবং বাংলার ১০৫ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩২হাজার টাকা।

উল্লিখিত তথ্যাদি ঘাঁটিয়া বেশ দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন ঘনত্বের দুই দেশ, আসাম ও বোম্বাই, বিদেশী লোকজনকে আকৃষ্ট করিয়াছে। অন্য পক্ষে বাংলা উচ্চ ঘনত্বের মুল্লুক হইয়াও বহু বিদেশীকে ঠাঁই দিতে সমর্থ। কৃষি-প্রধান আসাম, শিল্প-প্রধান বোম্বাই

এবং উচ্চ ঘনত্বের বাংলা, তিনটী প্রদেশেরই অর্থনৈতিক আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়া বহির্জ্জাত লোকজন এই সমস্ত দেশে আসিতে প্রলুব্ধ হইতেছে। কাজেই প্রদেশ তিনটা এবিষয়ে একশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ঘনত্বের দিক্ হইতে তারতম্য থাকা সত্বেও এই প্রদেশগুলি অন্তর্গামী লোকের সংস্থান করিতে পারিতেছে।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে আধুনিক কলকারখানায় প্রযুক্ত পুঁজি-পাট্টা আয়তন বা লোকসংখ্যার প্রয়োজন-মাফিক নয়। ভূমির শস্য-সম্পদও অপ্রচুর, এবং ইহা অধিবাসীদিগকে চতুঃসীমার মধ্যে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। কোনো কোনো অঞ্চলে অজন্মা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য বাংলার মত এই দুই প্রদেশ বহির্জ্জাতদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। বরং ইহাদের অদৃষ্টে লোক-চলাচলের বিপরীত বিয়োগফলই উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই দুই অঞ্চলে লোক-আমদানি অপেক্ষা লোক-রপ্তানি বেশী ঘটিয়াছে।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোকবলের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির অবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। অনুর্ব্বর জমি, ছোট-ছোট ক্ষেত, আর কলকারখানার অভাব ইত্যাদি কারণে ইতালিয়ান গ্রামগুলা হইতে লোকজন দলে-দলে দেশ-ছাড়া হইত। ১৯০৬-০৮ সনে উত্তর ইতালিতে কলকারখানার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইলে পর সেখান হইতে অধিবাসীদের বিদেশ-যাত্রা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ইতালিতে কলকারখানা একপ্রকার না থাকায় সেখানে বিদেশগামীর সংখ্যা কমিতে পারে নাই।

অন্যান্য অবস্থার যদি কোনোরূপ তারতম্য না হয় তাহা হইলে পুঁজিপাট্টার নিয়োগ বাড়াইয়া বিহার-উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে লোকজনের বহির্যাত্রা বন্ধ করা যাইতে পারে। এমন কি এই দুই প্রদেশের ভাগ্যেও লোক-চলাচলের বিয়োগফল অনুকূল আকারও ধারণ

করিতে পারে। অর্থাৎ লোক-রপ্তানি অপেক্ষা লোক-আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইতেও পারে। ১৯৪০ সনে আদমসুমারী আসিতেছে। সেই সময়ে বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর,—১৯৩০ সনের পর হইতে,—এই দুই প্রদেশে যেসকল চিনির কল কায়েম হইয়াছে লোকসংখ্যার উপর এমন কি এইসমুদয়ের প্রভাবও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইবে।

নগরী-করণ ও লোকঘনত্ব

শিল্পবিস্তার ও আভ্যন্তরীণ লোকচলাচল প্রসঙ্গে শেষোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথার দিকে নজর রাখা দরকার। লোক-চলাচলের ফলে নগরের উৎপত্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ লোক বা জনপদের নগরী-করণ লোক-চলাচলের অন্যতম মূর্ত্তি। ১৯৩১ সনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মোট জনসংখ্যার নিম্নলিখিতরূপ শতকরা হিস্যা শহরে বসবাস করিতেছিল :—

প্রদেশ	শতকরা হিস্যা	হার
১। বোম্বাই	২২·৪	অত্যন্ত উচ্চ
২। মান্দ্রাজ	১৩·৫	উচ্চ
৩। পাঞ্জাব	১৩·০	উচ্চ
৪। যুক্তপ্রদেশ	১১·২	উচ্চ
৫। ভারত	১১·০	উচ্চ
৬। মধ্যপ্রদেশ	১০·৮	উচ্চ
৭। বর্ম্মা	১০·৩	উচ্চ
৮। বাংলা	৭·৩	অপেক্ষাকৃত নিম্ন
৯। বিহার-উড়িষ্যা	৪·৩	অত্যন্ত নিম্ন
১০। আসাম	২·৩	অত্যন্ত নিম্ন

নগরী-করণের সূচী হিসাবে ১৯২১ সনেও প্রদেশগুলার পরস্পর সম্বন্ধ একদম এইরূপ ছিল। কেবলমাত্র বর্ম্মা ও মধ্যপ্রদেশ ক্রম বদলাইয়াছে।

মোটের উপর শহর-বৃদ্ধি বা লোকজনের শহরে বসবাস বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় নাই। ১৮৯১ সনের নগরীকরণের সূচীসংখ্যা ছিল ৯·৫% তাহা ১৯৩১ সনে ১১% পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখিতেছি যে, এই বাড়তি এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়।

লোকসংখ্যার উত্তমের দিক্ হইতে বিচার করিলে, শহরে বসবাসকে ঘনত্ব বা শিল্পবিস্তৃতির চিহ্নোৎরূপে সমঝানো চলে না। বোম্বাইয়ের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত নিম্ন। কিন্তু এই প্রদেশে শহুরো নরনারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে বাংলা উচ্চ ঘনত্বের মালিক হইয়াও শহুরো লোকসংখ্যার মাপকাঠিতে "অপেক্ষাকৃত নিম্ন" স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার ঘনত্বের দিক্ হইতে তুল্যমূল্য; কিন্তু নগরীকরণের তরফ হইতে পূর্ব্বোক্তটী "উচ্চ" এবং শেষোক্ত প্রদেশ "নিম্ন" স্থানের অধিকারী। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিপর্য্যয়। পুঁজিপাট্টা এবং কলকারখানার মাপকাঠিতে বোম্বাই ও বাংলা এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শহরে বসবাসের মাপকাঠিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান।

একালের বৃহৎ-পরিবার-নীতি

শহুরো লোকজনের উচ্চ সূচীসংখ্যার অভাব থাকা সত্ত্বেও বাংলা উচ্চ ঘনত্বের দেশ। অধিকন্তু বাংলা উচ্চ শিল্প-সমৃদ্ধি-চক্রের অন্তর্গত দেশও বটে। সুতরাং বিশেষ কোনো সূচীসংখ্যার বলে কোনো জনপদের সমৃদ্ধি, মানবমঙ্গল বিষয়ক কার্য্যকলাপ বা ভদ্র জীবনযাত্রা ইত্যাদি সম্বন্ধে মত প্রতিষ্ঠিত করা সুকঠিন। এই বিষয়ে গবেষণা

করিবার সময় খুব হুসিয়ার হইতে হইবে। অর্থাৎ যখন-তখন যে-কোনো একটা মাপকাঠি বা সূচী লইয়া বাড়াবাড়ি করা আহাম্মুকি।

উল্লিখিত বিষয়াবলীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ভারতের কোনো জেলা, জনপদ বা প্রদেশের পক্ষে কতজন নরনারী "উত্তম"রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। এমন কি এসম্বন্ধে আংশিক সত্যে উপনীত হওয়াও একরূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ, দুনিয়ার কোনো দেশের পক্ষেই "উত্তম" জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে জীবনযাত্রা প্রণালী ও কর্ম্মদক্ষতা বিষয়ক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই দুই বস্তুই অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল এবং এসম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের নাগাল পাওয়াও যারপর নাই কঠিন। ইয়োরামেরিকার গলিঘোঁচির মত ভারতের প্রত্যেক জেলায়ই বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাবিশিষ্ট নরনারী বসবাস করিয়া থাকে। এক এক শ্রেণীর আর্থিক ও নৈতিক মঙ্গলের ভাব-ধারণাও এক এক ধরণের। কাজেই যদি কোনো গবেষক বিশেষ কোন জেলা, শ্রেণী, জনপদ বা প্রদেশ সম্পর্কে লম্বাগলায় প্রচার করিতে থাকেন যে, "উত্তম" সংখ্যা পৌছিয়া গিয়াছে তাহা হইলে নেহাৎ গা-জুরি করা হইবে। আর যাহাই হউক এই সিদ্ধান্তকে কোনোমতে যুক্তিসঙ্গত বা বিজ্ঞানসম্মত বলা চলিবে না। এই কথা মনে রাখিলে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে লোকবাহুল্য ঘটিয়াছে এরূপ প্রচার করাও আদৌ যুক্তিসম্মত হইবে না। দারিদ্র্যের ভয় অথবা দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক দেখাইয়া দেশের লোকজনকে দারিদ্র্য নিবারণের জন্য কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে চাঙ্গা করিয়া রাখা ভালই। কিন্তু কথায়-কথায় লোক-বাহুল্যের ডর দেখানো ঠিক নয়।

"উত্তম", লোক-ঘনত্ব, লোক-বাহুল্য, অতি-বৃদ্ধি, জীবনযাত্রা-প্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে যেসকল ধারণা প্রচলিত আছে সেইসব মূলতঃ

যুক্তিনিষ্ঠ নয়। ফ্রান্স, ফাশিস্ত্ ইতালি, নাৎসি জার্ম্মাণি এবং জাপান ও এই চার দেশের রাষ্ট্রিক ও বৈজ্ঞানিকেরা এইজন্য সজ্ঞানে "বৃহৎ-পরিবার-আন্দোলনে" ব্রতী হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সমাজশাস্ত্রীদের পক্ষে এই বৃহৎ-পরিবার-নীতির ভাল-মন্দ খতাইয়া দেখা আবশ্যক। ভারতের কথা আলোচনা করা যাউক। আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক প্রত্যেক শ্রেণীর জীবনযাত্রা-প্রণালী উন্নততর করা অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ্‌বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। একথা প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি। এইজন্য আবশ্যক শিল্প-বিস্তার এবং অন্যান্য উপায়ে দেশের আর্থিক উন্নতি-সাধন। সেই সঙ্গে সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিবারের বহর ছোট করিতেই হইবে এমন কোনো কথা নাই। পরিবার-সঙ্কোচ-নীতি আর্থিক উন্নতির কারণরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য নয়। লোক-বাহুল্যের দুঃস্বপ্নে অভিভূত হইলে অর্থাৎ জনসংখ্যার তথাকথিত অতিবৃদ্ধি হ্রাস করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইলেই কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে এরূপ বলা চলে না। ফ্রান্সে বৃহৎ পরিবারকে "ফামিয় নঁব্র্যজ", ইতালিতে "ফামিলিয়ে নুমেরোজে" আর জার্ম্মাণিতে "কিণ্ডার-রাইখেন ফামিলিয়ে" বলে। এই তিন দেশে আর্থিক উন্নতির কাজকর্ম্ম, আইনকানুন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সবই বৃহৎ-পরিবার-নীতির সহিত হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতেছে। ভারতীয় লোকশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রী, রাষ্ট্রশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীদের পক্ষে এই দৃষ্টান্তগুলা প্রণিধানযোগ্য। সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যান্য মতবাদের মত লোকবাহুল্যের মতবাদও খাটে উঠিয়াছে। এই মতটা নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজাইবার দিন আসিয়াছে। পুরাণা বুলিতে আর বর্ত্তমান তথ্যের ব্যাখ্যা করা চলে না।

মাথাপিছু আয়ের তঙ্কা, জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং কর্ম্মদক্ষতার যাহাতে

অধোগতি সাধিত না হয় প্রতিপদেই সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। একথা অনেকবার বলা ভাল। কেননা সাবধানের মার নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন-তখন যেখানে-সেখানে লোকবাহুল্যের আতঙ্কে বা অতি-বৃদ্ধির ভয়ে জড়সড় হইবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মমূলক সমাজবিজ্ঞান এবং গঠনমূলক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লোকবাহুল্য সমস্যাটাকে বর্ত্তমানে পাকা সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করা চলে না। অন্যান্য বহুসংখ্যক মতামতের মত লোকবাহুল্য বা লোকজনের অতিবৃদ্ধি বিষয়ক মতও একটা "খোলা প্রশ্ন" বিশেষ। কাজেই আঁতকাইয়া উঠা ছেলেমানুষি মাত্র।

গত পনর বৎসর যাবৎ ফ্রান্সের "সক্রিয়" জনবল-নীতিতে "আলোকাসিওঁ ফামিলিয়াল" (পারিবারিক ভাতা) আন্দোলন স্থান পাইয়া আসিতেছে। ইতালিতে মুসলিনির বাণী জবরদস্ত্ রূপে চলিতেছে। "রিস্কাত্তারে লা তেরা, কন্ লা তেরা লি উঅমিনি এ কন্ লি উঅমিনি লা রাৎসা" (জমির উদ্ধার সাধন কর, জমির সাহায্যে লোকের উদ্ধার সাধন কর, এবং লোকের সাহায্যে জাতির উদ্ধার সাধন কর),—এই ফাশিস্ত সূত্র ১৯২৮ সনের "বনিফিকা ইন্তেগ্রালে" (ব্যাপক ভূমি-সংস্কার) আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ঘটনার পর হইতে ইতালির সরকারী রাজস্ব ও অর্থনৈতিক মোসাবিদার ভিতর লোকনীতি ও "মবিলি জ্জাৎসিঅনে রুরালে" (পল্লীসংক্রান্ত চলাচল) আর "বাত্তালিয়া দেল্ গ্রাণো" (গোধুমের লড়াই) অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ আরও একটী বিষয় জানিয়া রাখা ভাল। উচ্চ জন্মহারের সহিত পল্লীজীবন বা চাষ-আবাদের যোগাযোগ তত বেশী সুস্পষ্ট নয়। চাষ-আবাদের সহিত উচ্চ জন্ম হারের এবং শিল্পোন্নতির সহিত নিম্ন জন্মহারের সম্বন্ধ স্থাপন করা সমসাময়িক লোকশাস্ত্রীদের পক্ষে যেন

একটা প্রথা দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু রীতিমত বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ কোনো সম্বন্ধের নাগাল পাওয়া দুষ্কর।

১৯১৪-২৪ সনে জার্ম্মাণির পট্‌স্‌ডাম, ফ্রাঙ্কফোর্ট (ওডার তীরবর্ত্তী) হানোফার, লিনেব্যার্গ, উচ্চ ব্যাভেরিয়া, মেক্‌লেনবুর্গ, সোআবিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে জন্মহার নিতান্ত কম ছিল। কিন্তু এই সমস্ত জেলায় কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পক্ষান্তরে কোলোন, আখেন, আর্ণ্‌স্‌ব্যর্গ্‌ ইত্যাদি শিল্পপ্রধান অঞ্চলের জন্মহার রীতিমত চড়া দেখা গিয়াছে।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে শহর ও পাড়াগাঁর মধ্যে পার্থক্য বহুল পরিমাণে জন্মহার দ্বারা নির্ণয় করা চলিত; কিন্তু বর্ত্তমানে এই পার্থক্য একরূপ লোপ পাইয়াছে। জার্ম্মাণ অর্থশাস্ত্রী ৎস্বইডিনেক জার্ম্মাণির সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে জন্মহারের হ্রাসপ্রাপ্তি শহর ও পাড়াগাঁ এবং চাষী ও কলকারখানার মজুর সকলের উপরই সমান প্রযোজ্য।

লোক-ঘনত্ব ও জার্ম্মাণ আয়-কর

জার্ম্মাণিতে ৎসান, বুর্গড্যেফ্যার ইত্যাদি লোকশাস্ত্রী ও সংখ্যা-শাস্ত্রীদের সিদ্ধান্তসমূহ নাৎসি আমলে (১৯৩৩ সনের পর) এমনভাবে বাস্তবে পরিণত করা হইয়াছে যে, উহা ইতালিয়ান নজীরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে ১৯৩৪ সনের নাৎসি আয়কর বিষয়ক আইনটা "কিণ্ডার-রাইখেন ফামিলিয়ে" (বহু সন্তানবিশিষ্ট অর্থাৎ বৃহৎ পরিবার) সমর্থক আইনের চরম কথা। এই আইন অনুসারে একটী সন্তানের জনককে সমগ্র আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় না; মোট আয়ের শতকরা ৮৫ হিস্যার উপরই আয়কর ধার্য্য করা হয়। তাহাছাড়া এক ছেলের বাপের আয় যাহাই হউক না কেন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে

তাহার এক সন্তানের জন্য সে বার্ষিক ২৪০ রাইখ্‌স মার্ক কিণ্ডার-ৎস্থলাগে (সন্তান-ভাতা) পাইয়া থাকে। দুই ছেলের জনককে মাত্র শতকরা ৬৫ ভাগ আয়ের উপর আয়কর দিতে হয়। সে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বার্ষিক ৫৪০ রাইখসমার্ক সন্তান-ভাতা পায়। তিনটী ছেলের বেলায় শতকরা ৪০ ভাগ আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য হয়, আর সন্তান-ভাতা মিলে বার্ষিক ৯৬০ রাইখস মার্ক। চার ছেলের বেলায় শতকরা ১০ ভাগ আয়ের উপর আয়কর এবং বার্ষিক ভাতা ১,৪৪০ রাইখস মার্ক। পাঁচ সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে কোনোরূপ আয়করই দিতে হয় না। অধিকন্তু এই পরিবারের বার্ষিক আয় যদি ১০ হাজার রাইখস মার্কের উপরে না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই পরিবার ১০ হাজার রাইখস মার্ক সন্তান-ভাতা পায়। সোজা বাংলায় কাণ্ডটা এইরূপ। বার্ষিক দশ হাজার টঙ্কা উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি পাঁচছেলের বাপ হয় তাহা হইলে সে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বছরে আরও দশহাজার টাকা ভাতা পাইবে। জগতের কোথাও এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া বিশ্বাস করা অতি কঠিন। যাহা হউক, এই জার্ম্মাণ আইন অনুসারে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক-যুবতী পর্য্যন্ত সকলেই "শিশু"রূপে গণ্য;—যদি তখনও তাহারা ইস্কুলের পড়ুয়া থাকে।

নিম্নলিখিত আয়গুলিকে আয়কর হইতে সম্পূর্ণরূপে রেহাই দেওয়া হইয়াছে :—

১। মাসিক ১০০ রাইখস মার্ক :—একটী ছেলে।

২। মাসিক ১২৫ রাইখস মার্ক :—দুইটী ছেলে।

৩। মাসিক ১৭৫ রাইখস মার্ক :—তিন ছেলে।

৪। মাসিক ২৭৫ রাইখস মার্ক :—চার ছেলে।

৫। মাসিক ৮৫০ রাইখস মার্ক :—পাঁচ ছেলে।

নাৎসি আয়কর "বৃহৎ পরিবার গঠনের" সহায়ক এবং "আন্তর্জ্জাতিক ও দেশব্যাপী জন্মনিরোধ" আন্দোলনের দারুণ পরিপন্থী। এই জার্ম্মাণ নীতির ফলে ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণির বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-ঘনত্বের পুনর্গঠন এবং ওলটপালট সুরু হইয়াছে। ১৯৩৪ সনের জার্ম্মাণির জন্মহার ১৯৩৩ সনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য এই হার পূরাপূরি আয়কর আইনের ফল নয়। অধিকন্তু এই হার কতদিন টিকিবে তাহা এখনো বলা চলে না। তবে বৃহৎ পরিবার-পোষক আইনের কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক।

ভারত বা চীনের অবস্থা জার্ম্মাণি বা ফ্রান্স, এমন কি ইতালি বা জাপানেরও সমকক্ষ নয়। এই চারটা দেশের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু যদি "উত্তম", জীবনযাত্রা-প্রণালী, লোকবাহুল্য এবং বাঞ্ছনীয় ঘনত্ব সম্বন্ধে কোনো-কিছু সিদ্ধান্ত করার দরকার হয় তাহা হইলে অনেক তথাকথিত মীমাংসিত সমস্যারও পুনর্ব্বিবেচনা বা কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া আলোচনা আবশ্যক হইবে। ফরাসী পণ্ডিত বোভ্রা-প্রণীত "আঁকুরাজমাঁ নাসিওনাল ও ফামিয় নঁব্র্যজ" (বড় বড় পরিবারে সরকারী সাহায্য), ১৯২৬, জার্ম্মাণ পণ্ডিত করহেয়ার-প্রণীত "গেবুর্টেন

লোকবিদ্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের নিম্নলিখিত রচনাসমূহ উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১। ই কৎসিয়েন্তি দি নাতালিতা, দি মর্ত্তালিতা এ দি আউমেন্ত নাতুরালে নেল্ ইন্দিয়া আত্তয়ালে নেল্ কোআদ্রো দেল্লা দেমগ্রাফিয়া কম্পারাতা (ইতালিয়ান ভাষায়), রোম, ১৯৩১।

২। কম্পারেটিভ্ বার্থ্, ডেথ্ অ্যাণ্ড গ্রোথ্ রেট্‌স্, কলিকাতা, ১৯৩২।

৩। "জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধির হারে বাঙালী জাতি" ("বাড়্‌তির পথে বাঙালী" গ্রন্থের ৩৫০-৪৩৩ পৃষ্ঠা, ১৯৩৪)।

৪। দি ট্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ান বার্থ্ রেট্‌স্ ইন্ দি পার্স্পেক্‌টিভ অব্ কম্পারেটিভ ডেমগ্রাফি ("ইণ্ডিয়ান জার্ণ্যাল অব্ ইকনমিক্‌স্", এলাহাবাদ, এপ্রিল ও জুলাই, ১৯৩৪)।

রি্যকগাঙ্" (জন্মহারের হ্রাসপ্রাপ্তি), ১৯২৭, এবং ইতালিয়ান রাষ্ট্রবীর মুসলিনি-প্রণীত "ইল্ নুমেরো কমে ফৎর্সা" (সংখ্যাই শক্তি), ১৯২৮,— এই তিন রচনার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য যুক্তিতর্ক এ সম্বন্ধে নতুন রকমের আলোকপাত করিবে।

৫। নয়-ওরিয়েণ্টীরুঙ্গেন্ ইন্ ওপ্‌টিমুম্ উণ্ড্ ভিটশাফটলিখার লাইষ্টুংস ফেহিগ-কাইট্ (জার্ম্মাণ ভাষায়), বার্লিন, ১৯৩৫।

৬। ওপ্‌ন্ কোয়েস্চ্যান্‌স্ অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশ্যন্‌স্ ইন দি সোশিঅলজি অব পপিউলেশন (লক্ষ্ণৌ ১৯৩৬)।

৭। দি সোশিঅলজি অব্ পপিউলেশন, কলিকাতা, ১৯৩৬।

৮। ডী সোৎসিওলোগিশেন্ ভেক্‌সেলবেৎসীহুঙ্গেন্ ড্যর ডেমোগ্রাফিশেন ডিখ্‌টে, "আর্খিভ ফ্যির্ বেফ্যেল্‌কারুংস ভিস্‌সেনশাফ্‌ট্" পত্রিকা, (জার্ম্মাণ ভাষায়) লাইপৎসিগ, এপ্রিল ১৯৩৭।

৯। লা সিতুআসিঅঁ দেমগ্রাফিক্ ছ ল্যাঁদ্ আক্‌তিয়েল্ ভিজ্ আ ভি লে রেকল্ত, লেজ্ অ্যাঁদুস্ত্রী এ লে কাপিতো (ফরাসী ভাষায়), প্যারিস, ১৯৩৭।

১০। দি ইকনমিক্স অব এম্প্লয়মেণ্ট ভিজ্ আ ভি ডেমগ্রাফিক রিকনষ্ট্রাক্‌শন, বম্বে, ১৯৩৮।

দিগ্‌বিজয়ের ধর্ম্ম ও সমাজ*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নবীন হিন্দু-সাম্রাজ্য

আজ ৬ই জুন ১৯৩৬। উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে আমাদের এই মালদহে "জাতীয় শিক্ষাসমিতি" জন্মগ্রহণ করে। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির জন্ম উপলক্ষে "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে অন্যান্য অনেক কথার ভিতর ছিল "দিগ্‌বিজয়ে"র কথা। বলিয়াছিলাম, "দেখ্‌ব ভারতের ধর্ম্মনেতারা দেশ হ'তে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হবেন।"†

উনত্রিশ বৎসর পর ঠিক সেই তারিখে আমি মালদহের রামকৃষ্ণ-মহোৎসবে খাড়া আছি। আজ আমার মুখে আর কোন্ কথা বাহির হইতে পারে? দিগ্‌বিজয়ের কথা লইয়া জন্মিয়াছি, সেই দিগ্‌বিজয়ের কথাই পাড়িব। হিন্দুধর্ম্মের দিগ্‌বিজয় আজ আমার মুদ্দা।

১৯০৭ সনের জুন মাসে যখন মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি কায়েম হয় তখন বিবেকানন্দের মৃত্যু হইয়াছে পাঁচ বৎসর। তখনও বিবেকানন্দের শিষ্যেরা গুন্‌তিতে পুরু নয়। তখনও রামকৃষ্ণ মিশন বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বস্তুতঃ, আজকাল যে-আকারে রামকৃষ্ণ মিশন চলিতেছে তাহা ১৯০৯ সনের পূর্ব্বে সুরুই হয় নাই। কিন্তু এই উনত্রিশ বৎসরের ভিতর কী দেখিতেছি? আজ বাংলাদেশের নানা

---

* রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে মালদহে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ (৬ জুন ১৯৩৬)।

† লেখকের "সাধনা" (১৯১২)।

স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের ২০টা কর্ম্মকেন্দ্র হইতে বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দুধর্ম্মের ও নবীন আধ্যাত্মিকতার প্রচার সাধিত হইতেছে। নয়া বাংলার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতা আজ বাংলা দেশের বাহিরে ভারত-বিজয়ী হইতে পারিয়াছে। ভারতের জনপদে-জনপদে আজ ৪৬টা রামকৃষ্ণ-স্মৃতিমণ্ডিত কর্ম্মকেন্দ্র চলিতেছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর রাজ্য, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, কোচিন রাজ্য এবং মালাবার অঞ্চল সর্ব্বত্রই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধিরা একালের বঙ্গদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। এই বৎসরই পঞ্জাবে এবং নবগঠিত সিন্ধুপ্রদেশেও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্র কায়েম হইবে।

এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, মধ্যযুগে বাঙালী চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা বাংলা দেশের বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উড়িষ্যা ও আসাম ছাড়া ভারতের আর কোথাও বোধ হয় চৈতন্যপন্থী হিন্দু নর-নারী দেখা দেয় নাই। বাঙালীর ইতিহাসে আজ প্রথম দেখিতেছি যে, বাঙালীর চিন্তা ও কর্ম্মরাশি অবাঙালী-ভারতীয় নরনারীর জীবনে কথঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতে একটা "বাঙালী যুগে"র সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। "ভারতে" এত দিনে বাঙালী জাতের "ঠিকানা" কায়েম হইতে চলিল। বাংলার নরনারীর পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন একটা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে।*

ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলিতেছে,—লঙ্কায়। ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণের নিশান খাড়া দেখিয়া আসিয়াছি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর,—রেঙ্গুনে (এপ্রিল ১৯৩৬)। মালয় জনপদের সিঙ্গাপুর বন্দরেও এই ঝাণ্ডা উড়িতেছে।

* পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য। লেখকের "বিশ্বসভ্যতায় 'বাঙালী-যুগের' প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ" ("আর্থিক উন্নতি", জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩, মে-জুন ১৯৩৬)।

বিবেকানন্দের দিগ্‌বিজয় সুরু হয় মার্কিণ মুলুকে ১৮৯৩ সনে। আমেরিকায় আজকাল বেদান্ত-চর্চ্চা চলিতেছে ১৩।১৪ কেন্দ্রে নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে। এই গেল উত্তর আমেরিকার কথা। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশভাষী আর্জেন্টিনা দেশে রামকৃষ্ণের নামে আশ্রম পরিচালিত হইতেছে। জার্ম্মাণিতে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি গিয়াছেন জার্ম্মাণ দর্শনসেবীদের নিমন্ত্রণে। বিলাতের ইংরেজ নরনারীও রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের নামে কেন্দ্র কায়েম করিতে উৎসাহ দিয়াছে। তাহা ছাড়া পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, স্থইট্‌সার্ল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে কেন্দ্র গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

দেশ-বিদেশের নানা কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের শিষ্যেরা স্থায়িরূপে মোতায়েন আছেন। এইসকল প্রতিনিধিদের ভিতর শতকরা পনর জন মাদ্রাজী। অন্যান্য সকলেই এক-প্রকার বাঙালী।

১৯৩৬ সনে কলিকাতায় ও বাংলা দেশের বহুসংখ্যক পল্লীতে রাম-কৃষ্ণের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইতেছে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই। অপর দিকে লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদি ভারত-সংলগ্ন এশিয়ায় উৎসব কায়েম হইতেছে। এই উপলক্ষে এশিয়ার চীন, জাপান ইত্যাদি দেশ হইতে কলিকাতায় বেলুড় মঠের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা আসিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা ইত্যাদি ভূখণ্ডে উৎসবের ব্যবস্থা হইতেছে। অধিকন্তু ইয়োরামেরিকার নানা দেশেও রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে খৃষ্টিয়ান নরনারী নবীন হিন্দু ধর্ম্মের ও নবীন হিন্দু আধ্যাত্মিকতার সম্বর্দ্ধনা করিতেছে। যে-সকল দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কর্ম্মকেন্দ্র নাই সেই সকল দেশেও আজ রামকৃষ্ণ-কথা গুল্‌জার।

স্থতরাং দেখিতেছি যে, "ভারতের ধর্ম্মনেতারা" সত্যসত্যই "দেশ হ'তে দিগবিজয়ে বহির্গত" হইয়াছিলেন, আর দিগ্‌বিজয় সাধিত

হইয়াছেও। সেই দিগ্‌বিজয়ের চিহ্নোৎ দেখিতেছি জগতের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে। এই হিন্দু সাম্রাজ্যের মারফৎ দেশ-বিদেশের নরনারী বাংলার ও অবশিষ্ট ভারতের নরনারীর সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ, আত্মার কোলাকুলি, সংস্কৃতির বিনিময় চালাইতেছে। রাষ্ট্রিক আর আর্থিক কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালীরা দুনিয়ায় আজও বিশেষ উন্নত নয়। কিন্তু,—এই বৎসর-ত্রিশেকের ভিতর তাহারা বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী নবীন হিন্দু সাম্রাজ্য কায়েম করিয়া ছাড়িয়াছে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বাঙালী বিপ্লবের ইহা এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নবীন বঙ্গ-দর্শন, নবীন বঙ্গ-ধর্ম্ম, নবীন বঙ্গ-সংস্কৃতি, নবীন বঙ্গের সৃষ্টি-সম্পদ, নবীন বঙ্গের আধ্যাত্মিকতা আজ দুনিয়ার নরনারীর জীবনে ছাপ মারিতে পারিতেছে।

জয় রামকৃষ্ণের জয়, জয় বিবেকানন্দের জয়, জয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জয়। যে-সকল কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর "স্বামী"রা এই বিপুল সংস্কৃতি-সাম্রাজ্য, ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য ও আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্য দেশ-বিদেশে কায়েম করিতে সমর্থ হইয়াছেন সেইসকল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ-ভক্ত বিবেকানন্দ-পন্থীরা একালের ভারতীয় নরনারীর প্রণম্য। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কর্ম্মনিষ্ঠা ও চিন্তাসম্পদের তালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের শ' পাঁচেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য ও স্মরণীয় মহাপুরুষ। আমরা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় কৃতী স্ত্রী-পুরুষদের নাম করিবার সময় সাধারণতঃ বিজ্ঞানসেবী, সাহিত্যসেবী, রাষ্ট্রসেবী, বাণিজ্যসেবী, শিল্পসেবী ইত্যাদি লোকের কথা মনে আনিয়া থাকি। ইহাতে করিতকর্ম্মা ভারত-সন্তানদের সংখ্যা কিছু খাটো দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের "স্বামী"রাও সেই সঙ্গেই সর্ব্বথা উল্লেখযোগ্য।

দিগ্‌বিজয়ের ধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম দিগ্‌বিজয়ের ধর্ম্ম। এই দিগ্‌বিজয় স্থরু হইয়াছে মহেঞ্জো-দড়োর (৩৫০০ খৃঃ পূঃ) বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে। পরবর্ত্তীকালে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৭।১৫) ঋষিরা জানিতেন, "নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি।" চলিয়া-চলিয়া হাঁটিয়া-হাঁটিয়া যে-লোকটা হয়রাণ-পরেষাণ হয় নাই সেই লোকটার নসিবে শ্রী নাই, সম্পদ নাই। তাঁহাদের জীবনের আসল কথা ছিল,—চল, চল, "আগে চল্ আগে চল্ ভাই", "চরৈবেতি", "চরৈবেতি", "চরৈবেতি"। বর্ত্তমান লেখকের বোলচালে—*

ছুটাছুটি কর্চ্ছে সদা উদ্বেগে ভরা পরাণে তারা,
শান্তি তারা চাখেনা কখনো জানে না আরাম ক্লান্তিহারা।

এইরূপ ছুটাছুটি আর "চরৈবেতি"র ফল আজ পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পর কী দেখিতেছি? দেখিতেছি যে, হিন্দুধর্ম্ম পল্লী হইতে পল্লীতে গিয়াছে, জনপদ হইতে জনপদে গিয়াছে, দেশ হইতে দেশে গিয়াছে। অসংখ্য অনার্য্য আর্য্যে পরিণত হইয়াছে, অসংখ্য অহিন্দুকে হিন্দু করা হইয়াছে, অসংখ্য অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের ইজ্জৎ দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ আর্য্য, সনাতন বা হিন্দুধর্ম্মের তাঁবে আসিয়াছে। ভারতের বাহিরে,—উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম,—চারদিকে তামাম এশিয়ায় হিন্দু ধর্ম্মের এক্তিয়ার কায়েম হইয়াছে। প্রাচীন "বৃহত্তর ভারত" হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়ে গঠিত।† সেই দিগ্‌বিজয় আজও চলিতেছে। আজও ভারতের পাহাড়ে-জঙ্গলে "আদিম" নরনারী লাখে-লাখে হিন্দু হইতেছে, আর্য্য-সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করিতেছে। আজও এশিয়ায়, আফ্রিকায়,

* "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" দ্বিতীয় ভাগ (১৯৩২), ৫ পৃষ্ঠা।

† লেখকের "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ" (শাংহাই ১৯১৬) দ্রষ্টব্য।

ইয়োরামেরিকায় হিন্দু-সংস্কৃতির "চরৈবেতি" দেখা যাইতেছে। দুনিয়ার রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য এই নবীন হিন্দু সাম্রাজ্যেরই,—আধুনিক "বৃহত্তর ভারতের"ই অন্যতম প্রতিমূর্ত্তি।

শক্তিযোগ ও পৌরুষ

হিন্দুধর্ম্ম শক্তিযোগের ধর্ম্ম। অথর্ব্ববেদের (১২।১।৫৪) পুরুষ দুনিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

"অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়াশামাশাং বিষাষহি॥"

অর্থাৎ

পরাক্রমের মূর্ত্তি আমি
শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী ;
জন্ম আমার দিকে-দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে।

পরাক্রম, শক্তি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিজয়,—এই সবই হইল হিন্দু নরনারীর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি স্বরূপ। এই মুড়ি-মুড়কির জোরেই হিন্দু-নরনারী সারা জগৎকে দখলে আনিয়াছে। বলিয়াছে অহঙ্কারের সহিত,—

রে দুনিয়া মেরে গোড় পর সো যাও,
রে জাহাঁ মেরে কব্‌জে মে আ যাও।

হিন্দুধর্ম্ম পৌরুষের ধর্ম্ম, পুরুষকারের ধর্ম্ম, "বাপকা বেটা"র ধর্ম্ম।

অশেষ সংগ্রামের ধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম অফুরন্ত আশার ধর্ম্ম। হিন্দু নরনারী প্রতি মুহূর্ত্তই নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কোনো মুহূর্ত্তকেই হিন্দু তাহার জীবনের

চরম অবস্থা বিবেচনা করে না। প্রচুর উন্নতির পরও হিন্দু চায় আরও উন্নতি। উন্নতির সীমানা দেখা হিন্দু ধর্ম্মের কোষ্ঠীতে পাওয়া যায় না। দিগ্‌বিজয়ের পরও দিগ্‌বিজয় কামনা করা হইল হিন্দু নরনারীর সনাতন প্রার্থনা। ভগবানের নিকট হিন্দু যে-সকল প্রার্থনা চালাইতে অভ্যস্ত তাহার আসল মুদ্দা নিম্নরূপ :—

অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, ১।৩।২৮)

হিন্দুরা সর্ব্বদাই এক-একটা অসতের ঘাড় মটকাইবার জন্য লালায়িত। তাহার ঠাঁইয়ে চায় তাহারা এক-একটা নতুন সৎ কায়েম করিতে। হিন্দুর চোখে প্রতি মুহূর্ত্তেই এক-একটা অন্ধকার আসিয়া খাড়া হয়। এই অন্ধকারকে ধ্বংস করিয়া তাহার রাজ্যে এক-একটা নয়া জ্যোতি ছড়াইবার ব্যবস্থা করা হিন্দুধর্ম্মের মামুলি কথা। প্রতি মুহূর্ত্তেই হিন্দু নরনারী চায় মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে। মৃত্যুকে জুতাইয়া দুরস্ত করিয়া, মৃত্যুর তোআক্কা না রাখিয়া, মৃত্যুভয়ে অস্থির না হইয়া, সাহসের সহিত কাজ করিতে-করিতে,—হিন্দু নরনারী চায় প্রতি মুহূর্ত্তেই নতুন-নতুন অমৃত বা নতুন-নতুন জীবন চাখিতে। ফি বার অমৃত বা জীবন চাখিবার পরই হিন্দু প্রস্তুত হয় নতুন একটা মৃত্যু, নতুন একটা কাপুরুষতা, নতুন একটা দারিদ্র্য, নতুন একটা অস্বাস্থ্য, নতুন একটা অবসাদ-নৈরাশ্য-দুর্ব্বলতার সঙ্গে লড়িতে। ইহাই হিন্দু জীবনের গতি।

সকল দিক্‌ হইতেই হিন্দুধর্ম্ম অসীম উন্নতির ধর্ম্ম, অন্তহীন কর্ম্মনিষ্ঠার ধর্ম্ম, অশেষ সংগ্রামের ধর্ম্ম। ইহাকেই বলি সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা, স্বর্গীয় অশান্তি,—এক কথায় উন্নতি-নিষ্ঠা। ইহারই নাম,—

"এত উচ্চে উঠেছি তবু উচ্চতমের অনেক দেরি।"

"উচ্চতম"কে পাকড়াও করা হিন্দু মেজাজে অসম্ভব। চাঁই কেবল

সাধনার পর সাধনা, সাধনার সিঁড়ি, সাধনার স্রোত—অস্থিরতার দরিয়া, অশান্তির ধারা।

খানিকটা বাড়্তি ঘটিয়াছে বলিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিবার সময় নাই। কোনো-কোনো দিকে কিছু-কিছু উন্নতি দেখা যাইতেছে বলিয়া নিষ্কর্ম্মাভাবে নাকে তেল দেওয়া যাউক,—এই কথা হিন্দুর মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। হিন্দু দেখিতে পায় নতুন-নতুন অসৎ, নতুন-নতুন তমঃ, নতুন-নতুন মৃত্যুর অবসাদ। অতএব লাগিয়া যায় হিন্দু নরনারী বাড়্তির পরেও বাড়্তির কাজে। দিগ্‌বিজয়ের পরেও চায় হিন্দু নতুন দিগ্‌বিজয়।

চাই নতুন দিগ্‌বিজয়

আজ বাংলার হিন্দুকে নতুন দিগ্‌বিজয়ের কথা ভাবিতে হইবে। তুনিয়ায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য কায়েম হইয়াছে। এই সাম্রাজ্য দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতের ভিতরেই, বাংলা-দেশের ভিতরেই হিন্দুধর্ম্মের দিগ্‌বিজয় আবশ্যক। নতুন-নতুন অনার্য্যকে আর্য্যের সিঁড়িতে আনিয়া খাড়া করা যাইতে পারে। সম্প্রতি সেকথা বলিতেছি না। সাঁওতাল, ওরাওঁ, খাসিয়া, গারো ইত্যাদি "আদিম" জাতিকে হিন্দু-সংস্কৃতির অন্তর্গত করিবার কথা বলিতেছি না। এই সবও চলিতেছে। এই সকল দিকে কাজ বাড়ানো আবশ্যকও। আজ বলিতেছি "সনাতন" হিন্দু নরনারীর পরিবারে-পরিবারে হিন্দু-ধর্ম্মের গভীরতর প্রবেশের কথা। সনাতন হিন্দুরা আজও ষোল আনা হিন্দু হইতে পারে নাই। প্রত্যেক হিন্দুকে পুরাপুরি হিন্দু হইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের গভীরতর আত্মপ্রকাশকেই বলিতেছি হিন্দুধর্ম্মের নতুন দিগ্‌বিজয়। অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দু নরনারীকে খাঁটি ও গভীরতর হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করার কথা পাড়িতেছি।

"যত মত, তত পথ"

এই নতুন দিগ্‌বিজয়ের জন্য পথ তৈয়ারি হইয়াই আছে। রামকৃষ্ণের দৌলতে বাংলার হিন্দু একটা নতুন মন্তর পাইয়াছে। আমরা আওড়াইতে শিখিয়াছি, "যত মত, তত পথ"।* ভাল কথা। এই মন্তরের ব্যাখ্যা আবশ্যক জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে। মন্তরটা প্রয়োগ করা চাই প্রতিদিনকার প্রত্যেক উঠা-বসায়। প্রতিমুহূর্ত্তের কাজে আমরা দেখিতে চাই যে, বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার সব কয়টা মতই সম্মানযোগ্য —কোনো মতই ফেলিতব্য নয়। অধিকন্তু আমার পথটাই একমাত্র পথ নয়, আর তোমার পথটাও একমাত্র পথ নয়। দুনিয়ায় পথ হাজার-হাজার। অতএব জগতের কোনো পথই তুচ্ছ, বর্জ্জনীয়, অস্পৃশ্য নয়। যে-লোকটা যে-পথে চলিতে চায়, দাও তাহাকে সেই পথে চলিতে। সুতরাং হিন্দু সমাজে "ম্লেচ্ছ" বা "অস্পৃশ্য" ইত্যাদি শব্দের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া উচিত নয়। হিন্দুর জীবন হইতে "ম্লেচ্ছ" আর "অস্পৃশ্য" বস্তু দুইটা খেদাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

"যত মত, তত পথ"-বাণী বাঙালী হিন্দুর মুড়োয় নতুন ঘী ঢালিতে পারিয়াছে। বাঙালী হিন্দুর মাথা কিছু-কিছু পরিষ্কার হইয়াছে। বাংলার হিন্দু ইহার প্রভাবে আধ্যাত্মিক হিসাবে খানিকটা "উদার" হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু একমাত্র "আধ্যাত্মিক" উদারতায় পেট ভরিবে না। "যত মত, তত পথ" আওড়াইবার সঙ্গে-সঙ্গে "সামাজিক" জীব হিসাবেও বাঙালী হিন্দুর উন্নত হওয়া আবশ্যক। নানা শ্রেণীর ও নানা ধর্ম্মের নরনারীর সঙ্গে লেনদেন চালাইবার বেলায় "যত মত, তত পথ" মন্তর এখনো বাঙালী-হিন্দুর প্রাণের মন্তরে পরিণত হইতে পারে

* লেখকের "দি মাইট্ অব ম্যান ইন্ দি সোশ্যাল ফিলজফি অব্ রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ" (মাদ্রাজ ১৯৩৬)।

নাই। এই বাণীর উপরে "সামাজিক" উদারতার বনিয়াদ গড়িয়া উঠুক। তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের দিগ্‌বিজয় কতকগুলা নতুন-নতুন কর্ম্মক্ষেত্রে মূর্ত্তি দেখাইতে পারিবে। রামকৃষ্ণকে বাঙালী হিন্দু আজও পূরাপূরি কাজে লাগাইতে পারে নাই। কথাটা বিনা গোঁজামিলে জানিয়া রাখা উচিত যে, রামকৃষ্ণের বাণী এখনো বাঙালী হিন্দুর পূরাপূরি মরমে পশে নাই।

আম্বেদকার বনাম সনাতনী

অস্পৃশ্য জাতিপুঞ্জের দরদ বুকে লইয়া জন্মাবধি-অস্পৃশ্য মারাঠা পণ্ডিত আম্বেদকার সনাতন হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছেন। ১৯৩২ সনে তাঁহার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের তীব্র উত্তেজনা চলিতেছিল। সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের এই মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে ১৮ই তারিখের সভায় এই অধমও উপস্থিত ছিল। সেইদিন আল্‌টপ্‌কা ভাবে সভাক্ষেত্রে প্রকাশ্যরূপে বাংলার হিন্দু নরনারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আম্বেদকার আপনাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন আর আপনারা আম্বেদকারের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। কিন্তু আপনারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ বুকে হাত দিয়া বলিতে সাহস করেন কি যে, আপনারা আম্বেদকারের চেয়ে বেশী স্বদেশ-সেবক?"

বাংলার মুসলমান

আজ ১৯৩৬ সনের জুন মাসে আবার মালদহেই রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের পতাকা-তলে দাঁড়াইয়া বাংলাদেশের সমগ্র হিন্দু সমাজকে সেই প্রশ্নেরই জুড়িদার একটা নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি:—"মুসলমানকে সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিলে হিন্দু নরনারীর বাড়্‌তি

সাধিত হইবে কি ?" বাংলাদেশের যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের দিগ্‌বিজয় কামনা করেন তাঁহারা এই "সামাজিক" প্রশ্নটার জবাব দিতে প্রস্তুত হউন।

চোখ খুলিয়া পথে হাঁটিতে স্বরু করিলেই দেখিব যে মুসলমান নরনারীর জীবনে আর হিন্দু নরনারীর জীবনে মিল, সাদৃশ্য ও ঐক্য আছে অসংখ্য।

প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল যে, স্বাস্থ্যের তরফ হইতে হিন্দু-মুসলমানে একপ্রকার কোনো তফাৎ নাই। মরে দুই ধর্ম্মের লোকই প্রায় সমান-সমান। ১৯৩২ সনে হাজার-করা হিন্দু মরিয়াছিল ২০·৪ আর মুসলমান মরিয়াছিল ২০·১। ১৯৩৩ সনে মুসলমান মরিয়াছিল ২৪·৩ আর হিন্দু মরিয়াছিল ২৩·১। জীবনের আদর্শ, সমাজের সভ্যতা-ভব্যতা ইত্যাদি যত-কিছু বোল্‌চাল থাকিতে পারে সব হজম করিয়াও কাঠখোট্টাভাবে এই অঙ্কগুলার দিকে নজর ফেলা ভাল। শারীরিক সম্পদে আর স্বাস্থ্য-সম্পদে যাঁহা মুসলমান, তাঁহা হিন্দু। "মোটা কাজের" জন্য এই দুইয়ের ভিতর উনিশ-বিশ করিতে বসা সময় নষ্ট করা মাত্র।

ইস্‌লামে হিন্দুত্ব

একালের বাঙালী মুসলমানেরা "খোদা-প্রাপ্তির" জন্য যেরূপ সোপান বা "শরফুল-ইন্‌সান" রচনা করিতে অভ্যস্ত তাহার ভিতর বাঙালী হিন্দুও ভগবৎ-প্রাপ্তির সূত্র ছাড়া আর কিছু পাইবে না। খোদা-প্রাপ্তির জন্য প্রথম আবশ্যক "সিদ্‌কে তলব" অর্থাৎ প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা। সে কী চিজ্‌? আরবী ছাড়িয়া সোজা বাংলায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ* :—

* হামিদুর রহমান (সম্পাদক ও অনুবাদক), "শরফুল-ইনসান অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্তি সোপান" (ঢাকা) পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৯।

"দুনিয়া ও আখেরাতের (পরকালের) প্রত্যাশী না হওয়াই প্রকৃত দরবেশের চিহ্ন। যে খোদার আকাঙ্ক্ষী সে তাঁহারই মুখাপেক্ষী, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহার কাজ নাই" (কোরাণ, পারা ৭, সুরা অল্‌ আম, রুকু ৫, আয়ত ৪২)। "খোদাতালার প্রেমকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইলে, হৃদয়কে সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ হইতে শূন্য করা আবশ্যক।"

মুসলমান "এবাদাত" বা সাধনার পথিকেরা জানেন যে, "পরকালের সুখ-শান্তিময় ঘর তাহারাই পায় যাহারা এই পৃথিবীতে নিরীহ, নির্লোভ ও নির্ব্বিবাদী।"* সংসার-লোভী মানুষ হইতে দূরে থাকা ইস্‌লাম-সাধকগণের পক্ষে অতি জরুরি বিধান। হিন্দু বৈরাগ্যের চরম কথাই বাঙালী মুসলমানেরা তাহাদের কোরাণ হইতে সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত।

মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধু", মোজাম্মেল হক প্রণীত "তাপস-কাহিনী" ও "মহর্ষি মনসুর" ইত্যাদি বই বাঙালী মুসলমানদের অতিপ্রিয়। এই সমুদয়ের ভিতর হিন্দুরা নিজেদের সব-কিছুই পাইবে। লোক ও জায়গার নাম ছাড়া এই সকল কিচ্ছার ভিতর আছে বিলকুল হিন্দুত্ব। বুঝিতে হইবে যে, খাঁটি ইস্‌লাম-সাহিত্যের প্রাণের কথাগুলা হিন্দুয়ানিতে ভরপূর। কাজেই মুসলমানদের ধর্ম্মে আর হিন্দুধর্ম্মে আস্‌মান-পাতাল ফারাক মালুম হয় না। বাঙালী হিন্দু একটুকু চিত্তের বাড়্‌তি সাধন করিয়া ইস্‌লাম-সাহিত্যে প্রবেশ করুন। তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের দিগ্‌বিজয়ই সাধিত হইবে আর হিন্দুসমাজেরই শক্তিবৃদ্ধির সুযোগগুলা আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। বাঙালী মুসলমানেরা হিন্দু ধর্ম্ম, দেবদেবী ও সাহিত্যের যতখানি জানে বাঙালী হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তার দশভাগের

* কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী (অনুবাদক), "শান্তিসোপান বা পান্থ-প্রদীপ" (ঢাকা), পৃষ্ঠা ৫৮-৬৭।

একভাগও জানে না। মুসলমান ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দেশবিদেশে,—দুনিয়ার সর্ব্বত্র,—যতটা খাটো ও তুচ্ছ বিবেচনা করা দস্তুর প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধর্ম্মের হালচাল সেরূপ নয়। আমার মত দুনিয়ার বাজারে-বাজারে প্রচলিত মতের উল্টা। দুনিয়ার যে-কোনো ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিধানের সঙ্গে ইস্‌লাম সমানে-সমানে পাঞ্জা কষিয়া চলিতে অধিকারী। বাংলার হিন্দু এই কথাটা রপ্ত করিতে অভ্যস্ত হউন। ইস্‌লাম সম্বন্ধে নিরেট জ্ঞানলাভ করিলে হিন্দুর মাথাটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে, চরিত্রও উন্নত হইবে, আর স্বদেশ-সেবার কাজেও আমরা বেশ-কিছু পাকিয়া উঠিতে পারিব।

যাঁহা হিন্দু তাঁহা মুসলমান

কতকগুলা অতিমাত্রায় গভীর বিষয়েও মুসলমান হৃদয় হইতে হিন্দু হৃদয়ে বিনা শুল্কে চলাফেরা করা সহজ। দুয়ের স্বাভাবিক ঐক্য এতই বেশী।

অনেক দিন ধরিয়া মুসলমানেরা ইংরেজি "ভাষা" শিক্ষার বিরোধী। আজও এই বিরোধ পূরাপূরি ঘুচে নাই। ইংরেজি শিখিলে মুসলমানেরা খৃষ্টিয়ান গ্রন্থ বাইবেল পড়া সুরু করিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা খৃষ্টিয়ান হইয়া যাইতে পারে। মুসলমানদের এই ভয় জবর। কিন্তু এই ধরণের ভয়টা মুসলমানদের একচেটিয়া নয়। হিন্দুরাও প্রথম-প্রথম এই ভয়ে অস্থির হইয়াছিল কিনা রামমোহনের যুগ তাহার সাক্ষী। আজও পাড়াগাঁয়ে হিন্দুমহলে এই "জুজু" কিছু-কিছু দেখা যায়। অর্থাৎ বাইবেল-বিভীষিকায় হিন্দু আর মুসলমান এক। খৃষ্টিয়ানি-বিদ্বেষে হিন্দু আর মুসলমান পূরাদস্তুর ভারত-জননীর যমজ সন্তান।

কোনো-কোনো মুসলমান আজকালও "পাশ্চাত্য" শিক্ষার ভয়ে বেশ-

কিছু জড়সড়। পাশ্চাত্যের আলোকওয়ালা মুসলমান স্ত্রী-পুরুষেরা নাকি ধর্ম্মহীন, আধ্যাত্মিকতাহীন, জড়বাদী জানোয়ারে পরিণত হইতেছে! পাশ্চাত্য-বিভীষিকায় হিন্দুরা মুসলমানের চেয়ে পশ্চাৎপদ কি? মজার কথা, হিন্দুসমাজের তথাকথিত দার্শনিকগণ যেখানে-সেখানে লম্বা গলায় বক্তৃতা মারেন না কি যে, পাশ্চাত্য জীবন ষোল আনা জড়নিষ্ঠ আর প্রাচ্য জীবনে জড়নিষ্ঠা বিলকুল নাই? বস্তুতঃ, প্রাচ্যে-প্রাশ্চাত্যে ফারাক প্রচার করিয়া প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতা আর পাশ্চাত্যের নিকৃষ্টতা জাহির করা যাঁহা হিন্দুর তাঁহা মুসলমানের এক মস্ত বাতিক। কাজেই এই দিকেও দেখিতেছি হিন্দু আত্মায় আর মুসলমান আত্মায় সমঝোতা খুব নিবিড়। হিন্দু-মুসলমানে "হরিহর" এক আত্মা।

মহানন্দার উপর আজও পুল তৈয়ারি হইল না। কিন্তু জীবন-দরিয়ার হিন্দু কিনারা হইতে মুসলমান কিনারায় পারাপার করিবার জন্য নিরেট পুল তৈয়ারি আছে শত-শত বৎসর ধরিয়া।

মুসলমানদের রীতিনীতি

এইবার কিছুক্ষণ মুসলমানদের পাড়ায়-পাড়ায় গিয়া টহল মারিয়া আসি। বিয়েতে "গায়ে হলুদ" দেওয়া মুসলমান সমাজের রেওয়াজ। এমন কি সাত পাক খাইতেও মুসলমানেরা নারাজ নয়। মালদহিয়া "লবান্" (নবান্ন) বাঙালী মুসলমানেরও বেশ রপ্ত হইয়া গিয়াছে। বাপ-মা মারা গেলে অশৌচ পালন করা মুসলমানদের দস্তুর। এমন কি ভাই ফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে মুসলমানদের দিল্ কম নাচে না। হিন্দু দেবদেবীর নিকট মানত্ দিতে মুসলমানেরা অভ্যস্ত। তুলসীতলা, বেলতলা ইত্যাদি সংস্রবে গাছের মাহাত্ম্য মুসলমানেরাও বুঝে। দশহরার সময় লোহার সিন্দুকে সিন্দুরের আল্পনা চালাইতে মুসলমানরাও সিদ্ধহস্ত। এমন কি দুর্গা

পূজায়ও মুসলমানেরা মসগুল হয়। জন্মাষ্টমীর মিছিলে মুসলমানদের সহযোগ আছে। কালী, মনসা, শীতলা ইত্যাদির পূজা করিয়া হিন্দুদের মত মুসলমানেরাও কলেরা, বসন্ত ইত্যাদির হাম্‌লা হইতে আত্মরক্ষা করিতে জানে।

হিন্দুর পক্ষে মুসলমান সমাজের আর একটা বড় কথা বলিতেছি। মাসে এমন কি একবার মাত্র গরু খায় এমন মুসলমানের সংখ্যাও যারপরনাই কম। আসল কথা, এই সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জেলায়-জেলায় এই তরফ হইতে খোঁজ চালাইয়া দেখা যাইতে পারে। বর্দ্ধমান, যশোহর ইত্যাদি জেলা হইতে কিছু-কিছু খবর লইয়াছি।

বাংলাদেশের সবকয়টা জেলার আর তাহার সবকয়টা সাবডিভিশন বা পরগণার খতিয়ান করিয়া বেড়াই নাই। বর্ত্তমান আলোচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, লেনদেন ইত্যাদির ভিতর হিন্দুরা অহিন্দু বা ম্লেচ্ছ মাল বড় বেশী পাইবে না। মুসলমানেরা যে-সকল পারিবারিক ও সামাজিক রেওয়াজ চালাইয়া থাকে তাহার অনেকগুলার ভিতরই হিন্দু নরনারীর সুপরিচিত এবং অতি-প্রিয় রেওয়াজ দেখা যায়। প্রত্যেক জেলার ভিতরই কোনো-না-কোনো গ্রামে কোনো-না-কোনো মুসলমান পরিবারে তথাকথিত হিঁদুয়ানি বেশ সুস্পষ্ট। মুসলমান নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে আর আটপৌরে ঘরকন্নায় হিন্দু রীতিনীতি বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জবরদস্ত আকারেই ছিল। আজও বাংলা দেশের নানা পল্লীতে নানা মুসলমান পরিবারে হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার পুরাদস্তুর বজায় আছে।

এইসকল কথা "প্রত্যেক" বাঙালী মুসলমান পরিবার সম্বন্ধেই খাটে এইরূপ বলিতেছি না। বলিতেছি এই মাত্র যে, খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খোঁজ চালাইলে বাংলা দেশের বহুসংখ্যক পল্লীতে হাজার-হাজার

মুসলমান পরিবারে এইসকল হিন্দু রীতি-নীতির অস্তিত্ব মালুম হইবে। জোর-জবরদস্তি করিয়া মুসলমানেরা যদি হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন চালাইতে অগ্রসর না হন তাহা হইলে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমান সমাজের হিঁদুয়ানি আরও অনেক দিন ধরিয়া দেখিতে পাইবে। আমার বিবেচনায় এই রীতিনীতিগুলা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। এই সব স্থানীয় বস্তু, জনপদের সৃষ্টি, বাংলা দেশের আবহাওয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে। রীতিনীতিগুলাকে বাঙালী বলা উচিত।

এইসকল কথার মতলব অতি সোজা। মুসলমানকে হিন্দুদের তরফ হইতে "সামাজিক" জীব হিসাবে বর্জ্জনীয় ও অস্পৃশ্য সমঝিয়া রাখা আহাম্মুকি। বরং মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক মিলনের পথগুলা ঢুঁড়িয়া বাহির করা হিন্দু স্বদেশ-সেবকদের অন্যতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। মুসলমানদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা বর্ত্তমানে আমার ধান্ধা নয়। সম্প্রতি হিন্দু হিসাবে হিন্দুর কর্ত্তব্য আলোচনা করিতেছি। মিলনের পথ সমাজের ভিতর যদি না থাকিত তাহা হইলে সেই সব নতুন করিয়া সৃষ্টি করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু দেখিতেছি যে, এই সব পথ ও পুল বহুদিন ধরিয়া বাংলার পল্লীতে-পল্লীতে মজুত আছে। কাজেই সেইগুলা সম্বন্ধে নেহাৎ চোখ বুজিয়া থাকা কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সেই সবের সদ্‌ব্যবহার করিবার দিকেই আমাদের মর্জ্জি চলা উচিত।

হিন্দুসমাজের "মুসলমান-বিধি"

বাঙালী-হিন্দুসমাজে মুসলমানের সঙ্গে লেনদেন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পাঁতি প্রচারিত হওয়া আবশ্যক :—

১। মুসলমানের ছোঁআ অথবা রান্না খাইলে হিন্দু নরনারীর জাত্ মারা যাইবে না।

ছোঁআছুঁয়ির গণ্ডগোলে হিন্দুদের আর্থিক ক্ষতি কিরূপ হয় তাহার একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিদেশী পুঁজিতে পরিচালিত ফ্যাক্টরির মালিকদের নিকট হইতে খবর পাইয়াছি যে, তাঁহারা মাঝে-মাঝে শ'য়ে শ'য়ে হিন্দু মজুর বরখাস্ত করিতে বাধ্য হন। কেন না হিন্দু মজুরদের ভিতরকার "বার রাজপুতের তের হাঁড়ী"-সমস্যায় ফ্যাক্টরির কাজে ক্ষতি হয়। এই সকল মজুরদের কেহ অমুকের কুয়ায় জল তুলিতে অরাজি, কেহ অমুকের পাশের বাড়ীতে থাকিতে অরাজি ইত্যাদি। এই ছুঁৎ-মার্গের দৌরাত্ম্যে অনেক বিদেশী পুঁজিপতি ও ম্যানেজার হিন্দু মজুরদেরকে "দূরাদস্পর্শনং বরং" বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

২। মুসলমানের বেটী বিবাহ করিলে হিন্দু পুরুষের জাত্‌ মারা যাইবে না।

৩। হিন্দুর বেটীর সহিত মুসলমানের বিবাহ হইলে হিন্দু বেটীর জাত্‌ মারা যাইবে না।

মুসলমান আইনের ব্যবস্থায় এইরূপ বিবাহ সত্ত্বেও হিন্দু বেটী ইচ্ছা করিলে হিন্দু থাকিয়া যাইতে পারে।

৪। হিন্দু সমাজ বিবাহের নিয়মে সেকালের শাস্ত্র ছাড়িয়া একালের সরকারী কানুন (১৯২৩) মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হউক। এই কানুনের মোটা কথা নিম্নরূপ,—যে জাত্‌ বা সমাজ বা ধর্ম্মেই বিবাহ কর না কেন, তোমার নিজের ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে না।

৫। মুসলমানের ঘরে হিন্দু বেটীকে দু-চার-দশ মাস থাকিতে হইলেও হিন্দু বেটীর জাত্‌ মারা যাইবে না।

৬। এই সকল ক্ষেত্রে কোনো প্রকার "প্রায়শ্চিত্ত", "শুদ্ধি", আচার বা সংস্কার আবশ্যক হইবে না।

হিন্দু সমাজের জন্য এই যে "মুসলমান-বিধি" জারি করা যাইতেছে,

তাহা অনেকটা হিন্দু-সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক "অস্পৃশ্য-বিধি"রই জুড়িদার স্বরূপ।

তথাকথিত অস্পৃশ্য নরনারীর সঙ্গে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের নরনারীর যোগদান সম্বন্ধে যেসকল নতুন ব্যবস্থা করা উচিত সেই সবই আরও বিস্তৃতরূপে মুসলমানদের সঙ্গে লেনদেন সম্বন্ধে কায়েম করা কর্ত্তব্য।

খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ করা এই সব কাজ জোর-জবরদস্তির জিনিষ নয়। যখন-তখন যেখানে-সেখানে হিন্দুকে মুসলমানের রান্না খাইতে হইবে এরূপ কথা বলা হইতেছে না। বলা হইতেছে এই যে, যখনই খাওয়া হউক না কেন, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আর শুদ্ধি আবশ্যক হইবে না। বিবাহ সম্বন্ধেও সেই কথা। রোজ-রোজ ডজন-ডজন হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ ঘটাইতে হইবে এমন পাঁতি প্রচার করিতেছি না। বলিতেছি যে, যেখানে-যেখানে এইরূপ ঘটে সেইসকল স্থলে ঝাড়া-ফুঁকার কথা তুলিতে হইবে না। সমাজের অলিতে-গলিতে এইরূপ বিধান প্রচারিত হইয়া গেলেই হিন্দু নরনারী বুক ফুলাইয়া চলিতে পারিবে। এই পাঁতি যতদিন সুপ্রচারিত না হয় ততদিন মুসলমানদের সঙ্গে লেনদেনে হিন্দু সমাজের পেটে ভয় থাকিবেই থাকিবে। এই ভয় খেদাইয়া না দিলে হিন্দু সমাজে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার ও শক্তিমত্তার ঘর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

৭। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিকে মুসলমানেরা ছুঁইলে অথবা অপমান করিলে দেবদেবীর জাত্ মারা যাইবে না।

৮। হিন্দু মন্দিরে গরু কোর্ব্বাণি হইলেও মন্দিরের জাত্ মারা যাইবে না।

একালের হিন্দু-সমাজ

"মুসলমান-বিধি"র প্রস্তাবগুলা ঠিক হিসাবে "হাতী-ঘোড়া" নয়।

বাস্তবিক পক্ষে নেহাৎ মামুলি কথাই বলা হইতেছে। ১৯৩৬ সনে অনেক হিন্দুই মুসলমানের ছোঁআ মাল খাইয়া থাকে। মুসলমানের রান্না খাইয়া যে-সকল হিন্দু মানুষ বা নামজাদা হইয়াছে, তাহাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে হইতেছে ষোল আনা হিন্দুদের ঘরে। এইসকল হিন্দু বা হিন্দুর আত্মীয়দেরকে যাঁহারা একঘরে্য করিতে খাড়া হন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারাই একঘরে্য হইয়া পড়িতেছেন। বর্ত্তমান ভারতে আর বিশেষতঃ বাংলাদেশে যে-সকল হিন্দু স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনে,—মায় ধর্ম্মের আন্দোলনে,—পাণ্ডা স্বরূপ তাঁহাদের অনেকের পেটেই মুসলমানী খানা গিজির-গিজির করিয়া থাকে। এই ধরণের হিন্দুর সঙ্গে অসহযোগ চালাইতে হইলে ১৯৩৬ সনের হিন্দু সংস্কৃতি পটল তুলিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ এই সকল মুসলমান-ঘেঁশা হিন্দুরাই বাঙালী ও আবাঙালী হিন্দু সমাজের, সাহিত্যের, শিক্ষাদীক্ষার আর শিল্পবাণিজ্যের ধুরন্ধর।

ভারতের বাহিরে দুনিয়ার জনপদে-জনপদে যে-সকল হিন্দু নরনারী দেখিয়া আসিয়াছি তাহারা কোন্ প্রকার জীব? তাহারা সকলেই মুসলমানের ছোঁআ রান্না খায়। মুসলমানী খানায় তাহাদের প্রায় কাহারও কোনো আপত্তি নাই। মুসলমান লেকড়ীও তাহারা সহজেই আত্মস্থ করে। বস্তুতঃ, বিয়ের সময় এই সকল প্রবাসী হিন্দুরা ক'নের চোদ্দ পুরুষের কোষ্ঠী দেখিতে প্রলুব্ধ হয় না। বর্ণ-জাতি-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া এই সকল ভারতের বহির্ভূত হিন্দুরা বিবাহ করিতেছে। এই রীতিতে গড়িয়া উঠিতেছে এক বিশ্বব্যাপী "বৃহত্তর ভারত।" অথচ এই সকল "আচারশূন্য," "বর্ণাশ্রমহীন," "বর্ণ-সঙ্কর"শীল হিন্দুরা নিজেদেরকে হিন্দু ছাড়া আর কিছু ভাবে না। হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তারে তাহারা বিশেষ উৎসাহী। হিন্দু সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় তাহারা চালাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুনিয়ায় বিপুল রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য ক্রমে-ক্রমে বাড়িয়া চলি-

য়াছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে বাড়্‌তির পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের ভিতর কেহই মুসলমান অথবা অন্য কোনো ধর্ম্মের বা জাতের লোককে কোনো প্রকারে অস্পৃশ্য বা ম্লেচ্ছ বিবেচনা করেন না।

দেশ-বিদেশে যদি হিন্দু নরনারীর এই ঝোঁক হয় তাহা হইলে বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে সেই ঝোঁকটার স্বপক্ষে সার্ব্বজনীন ফার্ম্মান জারি করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ পাঁতি প্রচার করিবার জন্য আজ হাজার-হাজার হিন্দু-সেবক আবশ্যক।

সমাজ বনাম ধর্ম্ম

আর্থিক ক্ষেত্রে, সরকারী চাকুরির আবহাওয়ায়, অন্যান্য রাষ্ট্রিক কর্ম্মকাণ্ডে মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর সদ্ভাব বাড়াইবার প্রণালীগুলা* আলোচনা করা আজ আমার উদ্দেশ্য নয়। অধিকন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,—মুসলমান নরনারীর কর্ত্তব্য বাৎলাইতে আসি নাই। আমি হিন্দু-"ধর্ম্মের" উদারতাকে হিন্দু-"সমাজের" ভিতর টানিয়া আনিবার মতলবেই এইসকল কথা বলিতেছি। হিন্দুসমাজকে উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ বনিয়াদের উপর খাড়া করিতে পারিলে হিন্দু নরনারীর রক্ত সাফ্ হইয়া আসিবে। হিন্দু সমাজ যার পর নাই শক্তিশালী হইবে। সেই শক্তি-মান্ হিন্দুসমাজ জগদ্‌বরেণ্য হইতে বাধ্য। আজ আমার একমাত্র লক্ষ্য,—হিন্দুসমাজের অঙ্গে-অঙ্গে শক্তি ও সামর্থ্যের সাল্‌সা পরিবেষণ করা, কমসে কম্ এই পরিবেষণের জন্য আন্দোলন রুজু করা।

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা

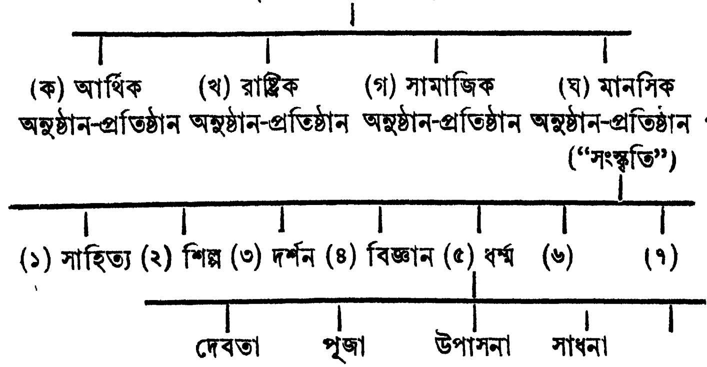
সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মিকতা এই শব্দ দুইটা প্রায় এক অর্থে

---

* লেখকের "সাধনা" (১৯১২), "নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন" দুইভাগ (১৯৩২) এবং "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) দ্রষ্টব্য।

অথবা ঘেঁশাঘেঁশি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ধর্ম্ম (=আধ্যাত্মিকতা)কে মানুষের জীবনে একদম পূরাপূরি স্বতন্ত্র এবং "উচ্চতর" ইজ্জদ্‌ দেওয়া হইয়া থাকে। মানুষের জীবনে অন্যান্য যাহা-কিছু দেখা যায় তাহা হইতে ধর্ম্ম (=অধ্যাত্মিকতা)কে ষোল আনা আল্‌গারূপে বিবৃত করা দস্তর। সেই সমুদয় কাজ আর চিন্তার ইজ্জৎও দুনিয়ার সাধারণ নরনারীর চিন্তায় বেশ-কিছু খাটো।

আমার বিবেচনায় ধর্ম্ম=আধ্যাত্মিকতা নামক "ইকুয়েশন" বা সাম্য-সম্বন্ধ গ্রহণীয় নয়। ধর্ম্মকে আধ্যাত্মিকতার ঘেঁশা কোনো চিজ সমঝিতে আমি অভ্যস্ত নই। আমার বিচারে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিকতা-বিহীন কোনো প্রকার কাজ বা চিন্তা থাকিতেই পারে না।* বিষয়টা সহজে বুঝিবার জন্য সাময়িকভাবে নিম্নের ছবিটা প্রকাশ করিতেছি :—



* লেখকের "দি এক্‌স্‌প্যান্‌শন অব স্পিরিচুয়্যালিটি অ্যাজ এ ফ্যাক্‌ট্‌ অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিবিলিজেশন" ("প্রবুদ্ধ ভারত", মে ১৯৩৬)। এই প্রবন্ধ রেঙ্গুণের রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসম্মেলনের (৮-১০ এপ্রিল ১৯৩৬) সভাপতির অভিভাষণ রূপে লিখিত।

মানুষের সৃষ্টিমাত্রই আধ্যাত্মিক। কেননা মানুষের আত্মা যেখানে কর্তৃত্ব করে না সেখানে সৃষ্টি হয় না। দুনিয়ার উপর আত্মার অধিকার স্থাপনকে বলি সৃষ্টি। তাহারই অপর নাম আধ্যাত্মিকতা।

আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ সৃষ্টি অসংখ্য মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। সেই সৃষ্টি-গুলাকে সহজে চলনসই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম :—(ক) আর্থিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, (খ) রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, (গ) সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, (ঘ) মানসিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। এক কথায় (ঘ)-কে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলিতেছি।

সংস্কৃতির ভিতর পড়ে অসংখ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। একটার নাম সাহিত্য, আর একটার নাম শিল্প, ইত্যাদি। ধর্ম্ম এই সকল সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। ধর্ম্ম বলিতে বুঝি দেবতা, পূজা, উপাসনা, সাধনা ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম হইল মানুষের হাজার-হাজার আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ম্মের) অন্যতম অভিব্যক্তি।

সংসারের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ চিরকালই সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ প্রাচীনতম মানুষও আধ্যাত্মিক ছিল। আর একালের আদিমতম মানুষও আধ্যাত্মিক বটে। আধ্যাত্মিকতাশূন্য মানুষ থাকিতেই পারে না। অপর দিকে খাওয়া-পরা, দেশ শাসন করা ইত্যাদির মতন দেবতা কল্পনা করা, দেবতার পূজা করা ইত্যাদি কাজও মানুষের পক্ষে অতি প্রাচীন। অর্থাৎ ধর্ম্মহীন মানুষ কোনো দিন ছিল না। আজকালকার অতি-আদিম মানুষও ধর্ম্মহীন নয়। সুতরাং

"ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ",—

"হিতোপদেশে"র এই বয়েৎটা পূরাপূরি সত্য।

আমার বিশ্বাস,—মানুষ আধ্যাত্মিক হিসাবে যুগের পর যুগ ধরিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই ঘোরতর "কলিযুগে"ও

আধ্যাত্মিকতা কমে নাই। বরং আধ্যাত্মিকতার বাড়্‌তিই দেখিতেছি। সেইরূপ বাড়্‌তি দেখিতেছি মানুষের ধর্ম্মজীবনেও। প্রাচীন ও মধ্য যুগের নরনারীর চেয়ে বর্ত্তমান কালের নরনারী কম ধার্ম্মিক নয়, বেশী ধার্ম্মিক। অর্থাৎ এমন কি যান্ত্রিক এবং অন্যান্য সভ্যতার "চাপে পড়িয়া"ও কি ধর্ম্ম, কি আধ্যাত্মিকতা দুয়েরই আকার-প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে। কোনোটাই ঘাট্‌তির দিকে নয়।

বলা বাহুল্য এইসকল আলোচনা অনেকটা পারিভাষিকের মামলা। তর্কশাস্ত্রের এই গণ্ডগোলে অনেক সময়েই প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ধর্ম্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ আর মানুষের অন্যান্য কাজ ও চিন্তার সঙ্গে এই দুই চিজের যোগাযোগ আলোচনা করিবার জন্য সকলকে ডাকিতেছি না। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এই ক্ষেত্রেও আমি আমার মেজাজ-মাফিক শব্দ ও অর্থ চালাইয়া যাইতেছি। যাঁহার যেরূপ মর্জ্জি তিনি সেই অর্থেই ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা বুঝিতে থাকুন। এই আলোচনার ভিতর পারিভাষিক শব্দগুলা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা খতাইয়া না দেখিলেও চলিবে। ধর্ম্ম আর আধ্যাত্মিকতা ঘেঁশাঘেঁশি এইরূপ বুঝিয়া লইলেও সম্প্রতি কোনো গোলযোগ উপস্থিত হইবে না।

হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু দেবদেবী অমর

পাছে কেহ ভুল বুঝেন এইজন্য কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলিয়া রাখিতেছি। হিন্দু "ধর্ম্ম" অমর, কিন্তু হিন্দু "সমাজ" বর্ত্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাকে "ভদ্রলোকের পাতে" দেওয়া অসম্ভব। এরূপ নীচাশয়, ঘৃণ্য, অমানুষিক ও নিষ্ঠুর "সামাজিক" ব্যবস্থা দুনিয়ার কোথাও চোখে পড়ে নাই। মান্ধাতার আমলে অথবা মধ্যযুগে ভারতের হিন্দু "সমাজ" কিরূপ ছিল চোখে দেখি নাই। কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু

চোখের সম্মুখে হিন্দু সমাজের বিধি-নিষেধ, অনুলোম-প্রতিলোম, জল-চল ইত্যাদি সংক্রান্ত যাহা-কিছু নজরে পড়িতেছে তাহাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব আর সংঘশক্তি দুইই এক সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সমাজের বিধানে মনুষ্যত্বের বিন্দুমাত্র ঢুঁড়িয়া পাইনা বলিলেই চলে। যতদিন এই সামাজিক বিধানগুলি জারি থাকিবে ততদিন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত নরনারী দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে থাকিবে। সেই দুর্ব্বলতা হইতে হিন্দুজাতিকে বাঁচাইতে পারা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

অপর দিকে হিন্দু সাহিত্যের উপনিষৎ, বেদান্ত আর গীতা যতদিন আছে ততদিন হিন্দু "ধর্ম্ম" দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ের পর দিগ্‌বিজয় চালাইবেই চালাইবে। কেননা ইহার ভিতর আছে মানুষকে ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ করার মন্ত্র। মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের স্বরাজ ও স্বারাজ্যসিদ্ধি, প্রকৃতির উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব, জগতে মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা,—এই সবই হইল উপনিষৎ-বেদান্ত-গীতার পক্ষে ডাল-ভাত স্বরূপ। মানুষকে দেবতা, ভগবান্, পরমেশ্বরের মর্য্যাদা দিয়া এই "ধর্ম্ম" সংসারে আশা, কর্ম্মনিষ্ঠা আর সৃষ্টির আনন্দ বাঁটিয়াছে। নতুন-নতুন দেশে নতুন-নতুন অবস্থার ভিতর মাথাওয়ালা নরনারী উপনিষৎ, বেদান্ত আর গীতার ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠার নতুন-নতুন ব্যাখ্যা চালাইয়া মানুষকে নতুন-নতুন কর্ত্তব্যের পথ দেখাইতে পারিবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার চরম কথা আর মানুষের অধ্যাত্ম-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতেছি হিন্দু সাহিত্যের এইসকল "ধর্ম্ম"-গ্রন্থে।

অধিকন্তু দেবতা, পূজা, উপাসনা, সাধন-ভজন ইত্যাদির দিকে তাকাইলেও হিন্দু"ধর্ম্মে"র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীগুলা টিকিয়া যাইবে এইরূপ বিশ্বাস করিতে ভয় পাইতেছি না। তেত্রিশ কোটি দেবতার সংসারে যদি তিনশ'

কোটি দেবদেবী আসিয়াও জুটে তাহাও মানুষের মগজ হজম করিতে পারিবে। কেননা নতুন-নতুন দেবদেবী নতুন-নতুন সুকুমার-শিল্পেরই রসদ জোগাইবে মাত্র। মানুষের আত্মা এই বাড়্‌তিতে বাধা দিবে না। নতুন-নতুন মূর্ত্তি-ছবি-পট, নতুন-নতুন আটচালা-মন্দির-অট্টালিকা, নতুন-নতুন মন্তর-গান-কথকতা-কীর্ত্তন-প্রার্থনা, নতুন-নতুন নাচ, নতুন-নতুন বাজনা, নতুন-নতুন বক্তৃতা-প্রবন্ধ-গ্রন্থ,—এই সবই হইবে নতুন-নতুন দেবদেবীর বস্তুনিষ্ঠ নিদর্শন। এইগুলি দেশের সংস্কৃতির অন্তর্গতরূপে সমাদৃত হইবারই কথা। অধিকন্তু একালের "সার্ব্বজনীন দুর্গা-পূজা", "সার্ব্বজনীন সরস্বতী-পূজা" ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় দেবদেবী-সংক্রান্ত ধর্ম্ম লোক-চিত্তে বেশী-বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিবে। তাহা ছাড়া, ইস্কুল-পাঠশালায় ম্যাট্রিক্‌-বাড়্‌তির সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃত-পড়ুয়াদের সংখ্যা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার অন্যতম ফল হইবে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসাহিত্য ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রতি জনগণের অনুরাগ-বৃদ্ধি—এক কথায় হিন্দুত্বের বাড়্‌তি। কাজেই হিন্দু"ধর্ম্ম" সকল তরফ হইতেই অমরতা লইয়া জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার মার নাই। বরং সর্ব্বদাই হিন্দু"ধর্ম্ম" বাড়্‌তির পথে চলিতে থাকিবে।

হিন্দু "সমাজ" আর টেঁকসই নয়

কিন্তু মানুষের চেহারাওয়ালা জীব মানুষের অস্পৃশ্য, ইহা যে-সমাজের বিধান সেই "সমাজ"কে বাঁচাইয়া রাখা বিংশ শতাব্দীতে চলিবে না। হিন্দু "সমাজ" আর টেঁকসই নয়। যে-সমাজের আইন-কানুন ব্যক্তিমাত্রকে সঙ্কীর্ণচেতা করিয়া তোলে সেই সমাজকে তাহার নরনারী খোলাখুলি আর-অজ্ঞাতসারেও "কলা দেখাইয়া" চলিতে বাধ্য। এখনই অধিকাংশ হিন্দু নরনারী প্রাণে-প্রাণে হিন্দু-

সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনযাত্রা চালাইতেছে। আর কিছুদিন পর এই হিন্দু-সমাজ সমাজ-লীলা সংবরণ করিয়া বসিবে। অর্থাৎ ইহার বিধি-নিষেধ কেহ সম্মান করিতে রাজি থাকিবে না। অতএব হিন্দু সমাজের সেবকগণ নিজ-নিজ কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হউন।

"ধর্ম্ম" উদার ও মহান্ অথচ "সমাজ" জঘন্য ও সঙ্কীর্ণ,—এই সমস্যাই বিংশ শতাব্দীর নয়া বাংলাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। মীমাংসা চাই-ই-চাই। মীমাংসার পথ অতি-সোজা। ইস্কুল-পাঠশালায়, সংবাদপত্রে, কংগ্রেসে-কাউন্সিলে, আন্তর্জ্জাতিক মেলামেশায় বাঙালী-হিন্দুর মুড়ো ও কলিজা হাজার-প্রকার উদারতা লাভ করিতেছে। সেই উদারতা ত হিন্দু "ধর্ম্মের"ই চিরন্তন সত্য। আর বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণের প্রভাবে সেই উদারতা হিন্দুধর্ম্মের গোড়ার কথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ও চিন্তাক্ষেত্রে যে উদারতা বাঙালী হিন্দুর আটপৌরে জিনিষ হইতে চলিয়াছে সেই উদারতা একমাত্র "সমাজে" নাই,—এই অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। এই অসামঞ্জস্য ও "বেখাপ্পা" অবস্থা আধ্যাত্মিক বিপ্লবের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে। সেই আবহাওয়ায়ই নির্য্যাতিত ও বিদ্রোহী আম্বেদকার হিন্দু সমাজের যথার্থ সেবক ও সুহৃৎ। আম্বেদকার সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার প্রতিমূর্ত্তি। সনাতন-সমাজপন্থীরা চোখের ঠুলি খুলিয়া সংসার নিরীক্ষণ করুন।

যে-যুগের অবতারের মুখে হিন্দু বলিতে শিখিয়াছে "যত মত, তত পথ" সেই যুগের হিন্দু-"সমাজে" কোনো লোকই নিজ পথের বহির্ভূত অপর পথের পথিককে অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছ বিবেচনা করিতে পারিবে না। হিন্দু মাত্রেরই মগজে ক্রমশঃ প্রবেশ করিতে বাধ্য যে, হয় "যত মত, তত পথ" মিথ্যা কথা, না হয় অন্যান্য পথের পথিকেরাও সকলেই ষোলআনা মানুষ। সকলের মাথায়ই আজ নতুন করিয়া প্রবেশ করিতেছে চণ্ডীদাসের বাণী,—

"সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ
তাহার উপরে নাই।"

এক মুড়োর ভিতর দুই পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ঠাঁই পাইবে না। অতএব হিন্দুরা "সমাজ"কে "ধর্ম্মে"র আদর্শে "যত মত, তত পথ"-মাফিক ভাঙিয়া গড়িবেই গড়িবে।

একালের হিন্দু ঋষি আম্বেদকার

হিন্দু-সমাজের সংস্কার ও উদ্ধার সাধন করিবে কে বা কাহারা? সনাতনীরা নয়, ব্রাহ্মণেরা নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ বা উচ্চ জাতের লোকেরা নয়। হিন্দু সমাজকে মেরামত করিবে, হিন্দু-সমাজকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঢালিয়া সাজাইবে অস্পৃশ্য, পদদলিত, শিয়াল-কুকুরের মতন উপেক্ষিত, আর অমানুষিকভাবে অবনমিত "ছোট লোকেরা"। তাহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই আম্বেদ-কারকে বিংশ শতাব্দীর নবীন হিন্দু ঋষিরূপে পূজা করিতেছে। কেননা রক্তমাংসের মানুষ মাত্রেই স্বীকার করে যে,—

গানে বক্তৃতায় বা কথার জোরে সাহস-আশা বাড়ালে আমার,
অগ্নিহোতা মধুচ্ছন্দার আগুন-মূর্ত্তি দেখি তোমার।

আম্বেদকারের জাত্‌ বা দল বা পেটোআরাই হিন্দুসমাজকে দুরন্ত করিয়া নয়া দিগ্‌বিজয়ের জন্য খাড়া করিয়া তুলিবে। আম্বেদ-কারের মতন লোকই যুগে-যুগে ভারতের জনপদে-জনপদে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুর সমাজ, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে বাড়্‌তির পথে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। আম্বেদকার সেই সকল যুগান্তর-সাধনকারী হিন্দু ঋষিদেরই বর্ত্তমান প্রতিনিধি। সনাতনীদের ভিতর যাঁহাদের মগজে ঘী আছে আর যাঁহাদের হৃদয়ে মানুষের রক্ত আছে তাঁহারা আম্বেদ-কারকে অগ্রণী করিয়া হিন্দু-সমাজের ওলট-পালট সাধনে আগুয়ান

হউন। আম্বেদকার নির্য্যাতিত হিন্দুর বাণীমূর্ত্তি, এক বিপুল স্বর্গীয় অশান্তির বিগ্রহ। সে জবরদস্ত্ "বাপ্‌কা বেটা।" অতএব আম্বেদকার হিন্দু মাত্রের প্রণম্য।

হিন্দু সমাজের সকল প্রকার গলদের কথা আলোচনা করা এই রচনার বহির্ভূত। গলদগুলা কাটিয়া ফেলিবার সহজ বা কঠিন উপায়-সমূহের বিবরণ দিতেও আসি নাই। হিন্দু সমাজকে খোল্-নল্‌চে দুই-ই বদলাইতে হইবে, শুধু এই কথাটা বলিবার জন্যই বর্ত্তমানে কলম ধরিয়াছি। দুএকটা গলদ ও দাওয়াই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ-কিছু বলিয়া গেলাম মাত্র। "বিদ্রোহীদের" লেজুর ধরিয়া হিন্দুসমাজকে ভাঙিবার জন্য "সনাতনী"রা উঠিয়া-পড়িয়া লাগুন। সনাতনীদের বুকের পাটা অত চওড়া কি?

অপ্রিয় কথার বেপারী

আম্বেদকার আজ কোটি-কোটি নির্য্যাতিত নরনারীকে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়িতে আর হিন্দুধর্ম্মের বাহিরে চলিয়া যাইতে ডাকিতেছেন। এই অবস্থায় একটা নয়া ধর্ম্ম ভারতে দেখা দিতেও পারে। নতুন একটা ধর্ম্ম বা সমাজ কায়েম করা অতি-কঠিন কিছু নয়। বলাই আছে:—*

জল-পাহাড়ে খেত্-খনিতে ঢুঁড়ে যারা নয়া মাল,
তাজা প্রাণে গড়্‌ছে তারা নয়া ধর্ম্ম, সমাজ, কাল।

আম্বেদকারের এই "জেহাদ্"-মাফিক কাজ করিবার জন্য অগণিত নরনারী প্রস্তুত হইতেছে। মামুলি চোখে আম্বেদকারের মতন হিন্দু-শত্রু আর কেহ নাই। আমি ঠিক সেই সময়েই এই আম্বেদকারকে হিন্দু-সেবক আর হিন্দু-সুহৃৎ বলিতেছি। আর বলিতেছি যে,

* লেখকের "তাজা প্রাণ" ("বাড়্‌তির পথে বাঙালী" পৃঃ ২৩৯)

নির্য্যাতিতের ক্রন্দনের ভিতরেই আর বিদ্রোহীদের হুঙ্কারের ভিতরেই সত্য আছে, সত্য নাই সনাতনীদের বিধানে। অধিকন্তু আম্বেদকারের বাণী হজম করিয়া দাঁড়াইলেই হিন্দু সমাজ মজবুদ হইতে পারিবে। বলা বাহুল্য আমার মতন আহাম্মুক কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলার মুসলমানেরাও আজ বাঙালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্রতবদ্ধ। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বঙ্গজীবনের কোনো কর্ম্মক্ষেত্রেই হিন্দু টিকির পাশে বা পশ্চাতে বা সাম্‌নে মুসলমান দাড়ি দেখিতে পাই না। মুসলমানের হাতে যে দুএকটা নতুন প্রতিষ্ঠান কায়েম হইতেছে তাহার চৌহদ্দির ভিতর হিন্দুর প্রবেশ যেন এক-প্রকার নিষিদ্ধ। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের অসহযোগ প্রায় চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। হিন্দুগুলা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরিলেই যেন বোধ হয় বহুসংখ্যক মুসলমানের "আপদঃ শান্তি" হয়। আফ্‌শোষের কথা। কিন্তু এইরূপই দেখা যাইতেছে বাংলাদেশের আবহাওয়ায়। অতএব সহজ দৃষ্টিতে মুসলমানেরা হিন্দুর শত্রু। কিন্তু এই দুর্য্যোগের সময়েও, বহু-বহু হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানের চড়া মেজাজ দেখিবার পরও আমি হিন্দুকে বলিতেছি যে, মুসলমানের আত্মায় আর হিন্দুর আত্মায় জোড়া লাগাইবার সুযোগ আছে। হিন্দুচিত্তের সঙ্গে মুসলমান চিত্তের সাঁকো-বাঁধাবাঁধি চলিতে পারে। মুসলমানের স্পর্শ বরদাস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেই হিন্দুসমাজ বিশ্ববিজয়ী হইবে। বুঝাই যাইতেছে যে, আর এক দফা আহাম্মুকির চূড়ান্ত দেখাইয়া ছাড়িলাম। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই আমাকে চরম বেআকুব ভাবিতেছেন। কি করা যায়?

লোক-প্রিয় কথা এই উনত্রিশ বৎসরের ভিতর একদিনও বলিয়াছি কিনা সন্দেহ। দেশ-বিদেশে সারা জীবন অপ্রিয় কথার বেপারীভাবে কাটাইতেছি। সার্ব্বজনিক মত-মাফিক যেটা সত্য তাহার অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই সত্য ঢুঁড়িয়া পাই নাই। আজ হিন্দু নরনারীর অতি-প্রিয় ধারণাগুলাকে সম্মানযোগ্য সম্‌ঝিতে পারিলাম না। অতএব অতিমাত্রায় অপ্রিয় কথাই বকিয়া যাইতেছি। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে-সব কথা লোকজনের পছন্দসই হইল না সেই সব কথা পাঁচ-সাত-দশ-পনর বৎসরের ভিতর সাধারণ্যে অনেকটা স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কি প্রথমবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৯২৫-২৭ সনে যে-সকল সার্ব্বজনিক মতের বিরোধী বোলচাল ঝাড়িয়া লোক-প্রিয় কথার যমরূপে চলাফেরা করিয়াছি সেই-সকল বোলচালও ইতিমধ্যেই রামা-ইস্‌মাইল-আবদুল-যদুর মুখে-মুখে কিছু-কিছু যেখানে-সেখানে চলিতেছে। অপ্রিয় কথা বেশী দিন অপ্রিয় থাকে না।

আজ হিন্দু সমাজের খোল্‌-নল্‌চে বদলাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ঠোঁটকাটারূপে যে-সকল কথা বলিয়া হিন্দু নরনারীর ঝাঁটা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিলাম সেই সকল কথাও আগামী পাঁচ-সাত-দশ-পনর বৎসরের ভিতরই বহুসংখ্যক হিন্দু-সেবকের প্রাণের কথায় পরিণত হইবে। ১৯৫০ সনের পূর্ব্বেই বাঙালী-হিন্দুর মগজ এই বিষয়ে গোঁজামিলপূর্ণ চিন্তার দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মগণ্ডী

বঙ্গজীবনে রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মগণ্ডী সম্বন্ধে ১৯১৩ সনের শেষাশেষি লিখিয়াছিলাম :—*

"বঙ্গে ত্যাগধর্ম্ম জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকল্পেই সবিশেষ আত্মপ্রকাশ করে। * * * যখন চারি পাঁচ বৎসরের কর্ম্মাভ্যাসে বঙ্গসমাজে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও কষ্টস্বীকারের প্রবৃত্তি সুবিস্তৃত ও সুগভীর

* "গৃহস্থ" (অগ্রহায়ণ, ১৩২০, নবেম্বর ১৯১৩)। লেখকের "বিশ্বশক্তি" (১৯১৪) দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৬

হইল তখন বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের প্রতি বাঙ্গালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গত দুই তিন বৎসরের ভিতর (১৯১১-১৩) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

তখনকার দিনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনকে "সকল প্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এবং বেদান্ত ও পদার্থবিদ্যার সমন্বয়-সাধনের" যন্ত্র ও বাহনস্বরূপ মনে হইত। এই মিশনকে "জাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান" রূপে সম্বর্দ্ধনা করিতাম। ইহার মারফৎ "বিংশ শতাব্দীর মানবোপযোগী গীতাধর্ম্ম" প্রচারিত হইতেছে এইরূপ ছিল ধারণা। এই নয়া ঢঙের গীতাধর্ম্মের মূলমন্ত্র বুঝিয়াছিলাম তিনটি—"প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন এবং কাম-কাঞ্চন-কীর্ত্তি বর্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে পরোপকার ও মানব সেবার কর্ম্মযোগ, তৃতীয়তঃ, সংসারে ও গার্হস্থ্যাশ্রমে এই বৈরাগ্য ও কর্ম্মযোগের যথোচিত প্রবর্ত্তন।" বর্ত্তমানেও সেইসব ধারণাই বজায় আছে। সেকালে এই "জাতীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের" ঘাড়ে "সমাজ-সংস্কারের" বোঝা চাপাইতে ঝুঁকিতাম না। বোধ হয় "জাতীয় শিক্ষার" যুগে সমাজ-সংস্কার কাণ্ডটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। মোটের উপর ভাবিতাম যে, অন্য কোনো নয়া-পুরাণা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ হয়ত সমাজ-সংস্কারের যাহা-কিছু সবই সাধিত হইবে। আজও রামকৃষ্ণ মিশনকে "সামাজিক" ভাঙা-গড়ার দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিতেছি না। কিন্তু আজ জোরের সহিত সজ্ঞানে সামাজিক ওলট-পালটের জন্য নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

রামকৃষ্ণ মিশন যে-"যুগধর্ম্ম" প্রচারের দায়িত্ব লইয়া জন্মিয়াছে সেই যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে বাঙালী স্ত্রীপুরুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-জ্ঞান শক্তিশালী হইতে পারিবে। চরিত্র গঠনের জন্য এই যুগধর্ম্মের মহত্ত্ব অতি বেশী। এই জন্য সেকালে সাহসের সহিত বলিয়াছিলাম যে, "এই যুগধর্ম্মের কর্ম্ম

যতদিন না পরিসমাপ্ত হয়, ততদিন আর কোনো দর্শনবাদ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। ধর্ম্ম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষা-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক যাহা-কিছু নূতন মৌলিক তত্ত্ব স্বাধীনভাবে প্রচারিত হইবে তাহাও নূতন প্রণালীতে সেই চিন্তাস্রোতকেই পুষ্ট করিবে। সকলই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনবাদের কুক্ষিগত হইয়া যাইবে এবং নানাদিক্ হইতে তাহাকে বিশদ ও স্পষ্টীকৃত করিবে। এই তত্ত্বের প্রচার, প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও উপলব্ধিই আগামী বঙ্গীয় জীবনের একমাত্র কার্য্য থাকিবে।"

তাহার পর বাইশ-তেইশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর নবীন গীতা-ধর্ম্ম নয়া-নয়া আকার-প্রকারে বাঙালী জাতের মহলে-মহলে তরঙ্গ তুলিতেছে। বাংলার নরনারী হাজারে-হাজারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত যুগ-ধর্ম্মের জোআরে সাঁতার কাটিতেছে। ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠা আর স্বার্থত্যাগের আধ্যাত্মিকতা বাঙালী জাত্‌কে নিত্য-নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য তাতাইয়া তুলিতেছে।

কিন্তু সামাজিক নীচাশয়তা, সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতাগুলা ভাঙিবার উদ্দেশ্যে বাংলার নরনারী আজও উল্লেখযোগ্য কর্ম্মশক্তি দেখাইতেছে না। এইদিকে আমাদের মস্ত অভাব। চাই তাহার জন্য নতুন-নতুন ব্যক্তি, নতুন-নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন-নতুন আন্দোলন।

বিবেকানন্দের ডাক

বিবেকানন্দ যুবক বাংলাকে বলিয়া গিয়াছেন (১৮৯৭),—"দুনিয়াকে দখল না করিয়া ভারতের উদ্ধার নাই। আমরা দুনিয়া দখল করিবই করিব।"* হিন্দু-"সমাজ" উদার ভিত্তির উপর চলিতে শিখিলেই

* 'দি কম্প্লীট ওয়ার্কস্ অব স্বামী বিবেকানন্দ" (কলিকাতা ১৯৩২), তৃতীয় ভাগ, ৩১৬ পৃষ্ঠা।

হিন্দু-"ধর্ম্মের" দিগ্‌বিজয় এক অভিনব অধ্যায়ে আসিয়া দেখা দিবে। বিবেকানন্দের আদর্শ বাঙালী হিন্দুকে এই নয়া কর্ম্মনিষ্ঠা ও নয়া সাধনার দিকে কোমর বাঁধিয়া খাড়া হইবার জন্য ডাকা-ডাকি করিতেছে। বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা আজও অপূর্ণ রহিয়াছে। এই নবীন অস্থিরতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য যুবক বাংলা দলে-দলে প্রস্তুত হউক।

"হিন্দুসমাজ" একবার দুরস্ত হইলেই, ভাই বাঙালী, দেখিতে পাইবে যে,—

"তোমারি চরণ তলে
রহিয়াছে চাহি
দৈন্যনাশী ধরণীর
সমগ্র রতন।"†

† মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির কবি কুমুদনাথ লাহিড়ীর "তুমি" ("গৃহস্থ" জানুয়ারি ১৯১৩)।

উন্নতি-অবনতি ও ভাঙন-গড়নের ধরণ-ধারণ*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

অবনতির ভয়

একালের সমাজ-চিন্তায় ও রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে ফরাসী পণ্ডিত লাপুজ্ কর্ত্তৃক "লে সেলেক্‌সিওঁ সোসিয়াল" (সামাজিক নির্ব্বাচন) গ্রন্থে (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠিত মতবাদটা যার পর নাই প্রভাবশালী। তাঁহার বাণী নিম্নরূপঃ—(১) আর্য্যজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; (২) সমসাময়িক সভ্যতার সমগ্র ধারা ও আকার-প্রকার সবই অবনতির পর অবনতি এবং ক্ষয়ের পর ক্ষয়ের পথেই ছুটিয়া চলিয়াছে; (৩) পৃথিবীর ইতিহাসের উপাদান ও তথ্যাদি বিশ্লেষণ করিলে এবং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ খতাইয়া দেখিলে প্রগতি বা উন্নতিকে এই সমুদয়ের যুক্তিযুক্ত পরিণতি রূপে বিবেচনা করা যায় না। লাপুজের এই সকল সিদ্ধান্ত সমসাময়িক দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আখড়ায় একটা জবরদস্ত্ তর্ক-লড়াইয়ের মশ্‌লা জোগাইয়াছে। এইসকল কথার ভিতর মগজওয়ালা লোকেরা বিজ্ঞান-ক্ষেত্রের "যুদ্ধং দেহি" শুনিতে পাইয়া থাকে। সমস্যাটার ভিতর "দুর্গা" বলিয়া ঝুলিয়া পড়া যাউক। দেখা যাউক লড়াইয়ের মাঠ হইতে কী বাহির হইয়া আসে।

* আমেরিকার "সোশ্যাল ফোর্সেজ" নামক পত্রিকায় (ডিসেম্বর ১৯৩৭) প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে "আন্তর্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের গবেষক শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ সরকার এম-এ কর্ত্তৃক অনূদিত।

আজকালকার দিনে খ্যাতনামা বহু চিন্তানায়ককে মানব-জাতির অবনতি বা অধঃপতনের মতবাদ প্রচার করিতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য-জগৎ অবনতির পথে প্রধাবিত,—জার্ম্মাণ পণ্ডিত স্পেঙ্গ্‌লার তাঁহার "উন্টার-গাঙ্‌ ডেস্‌ আবেণ্ড্‌লাণ্ডেস" (পাশ্চাত্যের অধোগমন) গ্রন্থে (১৯১৮-১৯২২) এই সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। "পাশ্চাত্য সভ্যতার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী",—সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত এই বাণী আসিয়াছে ফরাসী সাহিত্যবীর রমঁ্যা রলাঁ হইতে। খুব সম্ভব, একমাত্র ইতালিয়ান ও স্লাভিক জাতি বাদে ইয়োরোপের সমস্ত রক্তগত জাতির মধ্যেই বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—ইতালীর লোক-শাস্ত্রী জিনি "ক্রমোন্নতির পারাবোলা (অধিবৃত্ত)" বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কিণ সমাজ-বিজ্ঞান-সেবকগণও এই ক্ষয়-বাদের ছোঁআচ এড়াইতে পারেন নাই। হান্‌কিন্‌স্‌ ইত্যাদি কোনো-কোনো পণ্ডিত ইয়োরামেরিকান জনগণের স্বাভাবিক সন্তান-জনন-ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তেই সমস্যাটার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের এই সমস্ত ক্ষয়বাদ ও অবনতিবাদ প্রচারের প্রাচুর্য্য বশতঃ সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীদিগকে বাধ্য হইয়া সমাজের পরমায়ু, বাড়্‌তি ও বিস্তৃতি বিষয়ক সমস্যাগুলি লইয়া ভীষণ মাথা ঘামাইতে হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদিগকে সামাজিক পরিবর্ত্তন ও ভাঙন-গড়ন, সমাজ-বিপ্লব এবং সমাজের রূপান্তর-সাধন ইত্যাদি সমস্যাটা সম্বন্ধেও অবহিত হইতে হইতেছে। লম্বা-লম্বি (অর্থাৎ উর্দ্ধাধ বা উল্লম্ব এবং অনুভূমিক আড়াআড়ি অর্থাৎ সমস্তর,—এই দুই প্রকার সামাজিক গতিশীলতার মধ্য দিয়াই সমষ্টিগত পরিবর্ত্তন আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উন্নতি বা অবনতির স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ক আলোচনার বেলায় জীবনের গতিভঙ্গীসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার উপরই নির্ভর করিতে

হয়। অর্থাৎ যে সমস্ত শক্তি রক্তগত জাতি, শ্রেণী, বর্ণ বা জাতপাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন মানব সমষ্টির সংগঠন ও রূপান্তর সাধন করিতেছে তাহার রীতিমত বিশ্লেষণ আবশ্যক। এই সকল গতি বা শক্তি বিশ্লেষণের ভিতরই উন্নতি-তত্ত্বের ন্যায়শাস্ত্র পাকড়াও করিতে হইবে। চাই কেবল গতি, বিপ্লব, পরিবর্ত্তন আর ভাঙন-গড়নের তথ্য ও শক্তিগুলা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি।

দুঃখবাদ, সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা ও উন্নতি

সকল যুগেই সংসারের কতকগুলি মানুষ দুঃখ-পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থিব ঘটনা ও বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এইরূপ মনোভাববিশিষ্ট মানুষের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান বাইবেল-প্রসিদ্ধ জেরেমিয়াদের দুঃখবাদ অল্পবিস্তর প্রত্যেক নরনারীই সমর্থন করে। ইহার কারণ নির্ণয় অত্যন্ত সহজ। প্রথমতঃ কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর আর্থিক, রাষ্ট্রিক বা সামাজিক অবস্থা বা মর্য্যাদা যত উচ্চই হউক না কেন, তাহাকে কম-বেশী, এক প্রকার না এক প্রকার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হইতেই হয়। দুঃখহীন লোক ধরাতলে নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী প্রত্যেক ব্যক্তিই দুঃখবাদীদের সংশয়পূর্ণ মনোভাব ও সতর্কবাণী অর্থাৎ "স্বর্গীয় অসন্তোষের" মধ্যে নিঃসন্দেহে আত্ম-সমালোচনা ও সামাজিক পুনর্গঠনের পক্ষে শক্তিশালী মালমশলার সন্ধান পাইয়া থাকে। দুঃখবাদ নৈরাশ্যমূলক নয়। বাস্তবিক পক্ষে দুঃখবাদই "সুপ্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলার পুনর্মূল্য নির্দ্ধারণ" সম্বন্ধে সাহায্য করে। মূল্যের নূতন মাপকাঠির আবিষ্কার এবং সভ্যতার উর্দ্ধযাত্রার সহায়ক নানাপ্রকার উৎসাহ-উদ্দীপনা-পূর্ণ দুঃসাহসিক কার্য্যাদির জন্য মানবসমাজ দুঃখবাদের নিকট ঋণী। অভাব, দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিতে-রাখিতেই দুনিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

গঠনশক্তি হিসাবে দুঃখবাদের অবদান কোনরূপেই অবজ্ঞা করা চলে না। দুঃখবাদের সামাজিক কিম্মৎ "লাখ টাকা"। দুঃখবাদের স্বপক্ষে ওকালতি করিবার জন্য গলদঘর্ম্ম হইতে হয় না। কাজেই যখন লোকেরা দেশের বা দুনিয়ার ধ্বংসের কথা, অবনতির কথা, ঘাট্‌তির কথা চড়া বা নরম স্বরে বলাবলি করে তখন তাহাতে সহজেই সহানুভূতি দেখানো যাইতে পারে।

সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ছাড়া উন্নতিসাধন অসম্ভব। এই অস্থিরতা, চঞ্চলতা ও অশান্তির মূলে প্রায় সব সময়ই দেখা যায় অভাব-বোধ, অপূর্ণতার খেদ, দুঃখের তাড়না, দুঃখবাদ।

তবে সর্ব্বত্রই তর্কাতর্কি আর আলোচনা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আছে। আমাদের চারদিকেই সমাজজীবনের রূপান্তর, ভাঙন-গড়ন, উঠানামা, বিপ্লব আর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এই তথ্য সম্বন্ধে সকল লোকই প্রায় একমত। কিন্তু গণ্ডগোল হাজির হয় সামাজিক ভাঙন-গড়নের বা গতিভঙ্গীর মূল্য-নির্দ্ধারণের বেলায়। সমাজের ভিতর যেসকল রূপান্তর ও বিপ্লব সাধিত হইতেছে সেইগুলার সু-কু সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এই মতবৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বলা বাহুল্য প্রত্যেক সমাজ-শাস্ত্রী নিজ-নিজ বুথ্‌নি ও পারিভাষিকের পরিপোষক। প্রত্যেকেই আবার নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত দার্শনিকতা ফলাইয়া দুনিয়ার সু-কু সমঝিতে এবং মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে পাঁতি দিতে অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত বুথ্‌নি-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অগণিত। দুই একটা উল্লেখ করিতেছি। স্পেঙ্গ্‌লার আপন খেয়াল-খুসী মত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী অপেক্ষা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীকে অধিকতর সৃজন-ধর্ম্মী রূপে প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগৎটা তাঁহার চিন্তায় সৃষ্টিশক্তিহীন। বলাবাহুল্য স্পেঙ্গলারের এই মত মানিয়া লওয়া কঠিন। আবার পণ্ডিত মহলের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনযাত্রা-

প্রণালী ও জনগণের মঙ্গলবিধানের উপর সমাজবীমা ও অন্যান্য আধুনিক আইন-কানুনের কল্যাণকর প্রভাব দেখিতে পান না। বর্ত্তমান লেখকের বিচারে এই ধরণের পণ্ডিতেরা বস্তুনিষ্ঠ নন। প্রকারান্তরে তাঁহারা সামাজিক তথ্য সম্বন্ধে অন্ধ।

রক্তগত জাতির বিনাশ সামাজিক অবনতির লক্ষণ নয়

অন্যান্য গলদও আছে। আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির ধারা এক সমষ্টি হইতে অন্য সমষ্টি এবং এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর দিকে প্রবাহিত হয়। সামাজিক ভাঙন-গড়ন বা রূপান্তরসমূহ সাধারণতঃ শ্রেণী-বিপ্লব বা সমাজ-বিপ্লবরূপে পরিচিত। কিন্তু সমাজদেহের এই সমুদয় রূপান্তর-প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই মূলতঃ "রেস্" অর্থাৎ হাড়মাস সম্বন্ধীয় বা রক্তগত জাতির চড়াই-উৎরাই বা উঠা-নামা ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাচক্রে পূর্ব্বোক্ত সত্যটী যাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাহারা শেষোক্ত মতবাদটীকে আমল দিতে আদৌ প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ শ্রেণী-বিপ্লব বা সমাজ-বিপ্লব নামে পরিচিত ভাঙন-গড়নগুলা অনেক ক্ষেত্রে যে "রক্তগত জাতির" ভাঙন-গড়ন হাড়মাসের উঠা-নামা এইরূপ সমঝিয়া লওয়া অনেক সমাজশাস্ত্রীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

এক একটী "রেস" (রক্তগত জাতি) অপর একটী, রেসের সহিত মিশিয়া যাইতেছে বা তাহাকে স্থানচ্যুত করিতেছে অথবা একদম লোপাট করিয়া ছাড়িতেছে। বিশ্ব-সংস্কৃতির পশ্চাদভূমি বিশ্লেষণ করিলে ঠিক এই সত্য অনেক সময়েই আবিষ্কৃত হইবে। মানব-সভ্যতার কাঠাম কাটিয়া-ছিঁড়িয়া দেখিলে রক্তগত জাতির ঊর্দ্ধগমন ও নিম্নগমন, অর্থাৎ হাড়মাসের বিস্তার ও বিনাশ হামেশা নজরে আসে। এই রক্তগত জাতির ভাঙন-গড়নগুলা সামাজিক ভাঙন-গড়ন ও উন্নতি-তত্ত্বের আখড়ায় বিশেষরূপে খতাইয়া দেখা উচিত।

পুরা-প্রস্তরযুগের পাথুরে যন্ত্রপাতি আর হাল-হাতিয়ারের কাহিনীর মধ্যেই মানব জাতির চিরন্তনী কাহিনী অতি সহজে পাকড়াও করিতে পারি। সে হইতেছে রক্তগত জাতির বিনাশ-বিকাশ। এই যুগেরই কোনো সময়ে "ফরাসী" ও "জার্ম্মাণ" মুস্তেরিয়ান রক্তের জাতি প্রবল ছিল। কিন্তু তাহাদিগকে লোপাট করে বিলাতের ওরিনাসিয়ান রক্তের জাত্। পরবর্ত্তিকালে আবার জার্ম্মাণির মাগ্ডালেনিয়ান রক্তের জাত্ ওরিনাসিয়ান রক্তের জাত্‌কে ধ্বংস করে ইত্যাদি। পাথরগুলা এইরূপ রক্তের পরে রক্তের গতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। মান্ধাতার আমল হইতেই দেখিতেছি যে, দেশান্তর-গমন অর্থাৎ লোক-চলাচল ও বিভিন্ন রক্তগত জাতির মধ্যে সংঘর্ষ, লড়াই, লেনদেন ও যোগাযোগের মারফৎই সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-জীবনের কাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিপ্লব বা যুগান্তরগুলা ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যুগের যুগান্তরগুলা বিশ্লেষণ করা যাউক। ইয়োরোপের রোম সাম্রাজ্যের আর এশিয়ার হিন্দু ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের পতন-কাণ্ডগুলা কি? এই সবের বেলায়ও দেখিতে পাই যে, বিশেষ বিশেষ রক্তগত জাতিকে অপরাপর রক্তগত জাতি বিধ্বস্ত করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছে। আধুনিক, অতি-আধুনিক, সাম্প্রতিক ও সমসাময়িক যুগগুলাও ঠিক একই ধরণের সাক্ষ্য দেয়। ইয়োরেশিয়া মহাদেশে রক্তগত জাতির সংমিশ্রণ, নিমজ্জন ও উন্নয়ন ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্ত্তন ও ভাঙ্গন-গড়নের সমস্ত ধারাই ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। রক্তের পর রক্তের বিনাশ আর বিকাশ এত বেশী যে, ইয়োরোপের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত আধুনিক ইয়োরোপীয়ানদের শারীরিক কাঠাম বিষয়ক সম্বন্ধ-সংস্থাপন যারপর নাই সংশয়পূর্ণ ও কঠিন প্রমাণ-সাপেক্ষ। সেকালের ইয়োরোপীয়ান আর একালের ইয়োরোপীয়নেরা যে এক রক্তের ও এক হাড়মাসের লোক তাহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। পরিবর্ত্তনের পরিমাণ

অতি বেশী। ঠিক সেইরূপই আধুনিক ভারতবাসীর সহিত পুরাকালীন ভারতীয়দের শারীরিক কাঠাম-বিষয়ক যোগাযোগ ও তেমনি সংশয়পূর্ণ ও প্রমাণসাপেক্ষ। অসংখ্য রক্ত-সংমিশ্রণ এবং বহুবার বহুবিধ রক্তের উঠানামা এইসকল সন্দেহের কারণ।

বাংলায় আমাদের চোখের সম্মুখেই দল-গত পরিবর্ত্তনের ও ভাঙন-গড়নের বিশ্বমূর্ত্তি প্রকটিত। বঙ্গীয় সমাজে প্রায় ত্রিশটা জাত্ "আদিম" রূপে পরিচিত। বিভিন্ন ধরণের এই জাতগুলার মোট লোক-সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ অর্থাৎ বাংলার মোট জন-সংখ্যার প্রায় শতকরা ৩ অংশ। এই সমস্ত আদিম জাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় তিনটা ("ত্রিবীর") সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুণ্ডা নামে পরিচিত। সকল প্রকার আদিম জাতের লোকগুলার মধ্যে এই তিন জাতের লোকসংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যরূপে পরিচিত তিনটা তথাকথিক উচ্চ বর্ণের মোট লোক-সংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও অধিক। গত ৪০ বৎসরের মধ্যে এই তিন বর্ণ শতকরা ১৩৭ অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আদিম জাতগুলা এই সময়ের মধ্যে শতকরা ৩৮৯ অংশ বাড়িয়াছে। ইহাদের এই অসম্ভব বৃদ্ধি বা অতি-বাড়্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সাঁওতাল-মুণ্ডা-ওরাওঁ ইত্যাদি জাতিসমূহের জনন-ক্ষমতা যারপরনাই বিশেষত্বপূর্ণ।

আদিম জাত্দের এই সংখ্যা-বৃদ্ধি সংখ্যার তরফ হইতে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। আরওএকটা ব্যাপারে এই বাড়্তির মূল্য বাড়িয়াছে। কেননা বর্ত্তমানে আদিম রক্তের লোকগুলা ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাহাদের আনিমিজম্ বা তথাকথিত প্রেতোপাসনা অর্থাৎ "উপজাতীয়" ধরণ-ধারণ পরিত্যাগ করিয়া দলে-দলে "হিন্দু" বনিয়া গিয়াছে। আদিম রক্তের জাতি সমূহের ভিতর আজকাল "প্রেতোপাসনার" চেয়ে হিন্দুত্বই বহরে বেশী। সব চেয়ে বড় আদিম "ত্রিবীর"দের ভিতর শতকরা ৬৬ জন এখন হিন্দু। তাহাছাড়া আদিম জাত্দের গুণগত রূপান্তর-গ্রহণ অর্থাৎ হিন্দু করণ অন্য

এক তরফ হইতেও যারপর নাই মহত্বপূর্ণ সামাজিক তথ্য। "হিন্দু" সমাজের তথাকথিত অবনত রূপে পরিচিত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে "হিন্দুকৃত" আদিম রক্তের লোকজনের হিস্যা প্রায় শতকরা ১২ জন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গতকল্যকার "আদিম"রক্তের লোকজন বর্ত্তমানে "অবনত" হিন্দুর আকার ধারণ করিতেছে। অন্য কথায় বলিতে হয় যে, সামাজিক পরিবর্ত্তন বা ভাঙন-গড়নের প্রভাবে অহিন্দু আদিম রক্তের লোক ধর্ম্ম হিসাবে হিন্দুত্ব পাইতেছে আর হিন্দু সমাজের বিস্তৃতি সাধনে সাহায্য করিতেছে। তাহাতে বাস্তবিক পক্ষে রক্তগত জাতিসমূহের সংমিশ্রণের প্রণালী এবং আত্মীকরণের পথ পরিষ্কার হইতেছে। জাতি-সঙ্কর ও বর্ণ-সঙ্কর হিন্দুসমাজের অতিমাত্রায় সুপ্রচলিত স্বভাবসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই ঘটনাগুলাই নয়া আকারে একালেও দেখা যাইতেছে।

বর্ণ-সঙ্কর ও সাংস্কৃতিক উন্নতির যোগাযোগ

হিন্দু বাংলার সমাজ-বিপ্লব অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্ত্তন বা ভাঙন-গড়ন এইখানে আসিয়াই ঠেকে নাই। বুঝা যাইতেছে যে, পরিবর্ত্তনগুলা একমাত্র সংখ্যা-বিষয়ক নয়। নরনারীর গুণ আর সামাজিক মূল্য ইত্যাদিতেও ভাঙন-গড়ন লাগিয়াছে। এই গুণ-গত বা মূল্য-গত ভাঙন-গড়নের দৌড় আরও সুদূর-বিস্তৃত। সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৎসর চল্লিশেকের ভিতর একটা বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। বৎসর চল্লিশেক ধরিয়া তথাকথিত উচ্চ তিন বর্ণের ভিতর কায়স্থদের স্থান ছিল ব্রাহ্মণদের ঠিক নিম্নে। কিন্তু সম্প্রতি কায়স্থদের বাড়্তি ঘটিয়াছে জবর। এমন সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে যে, বর্ত্তমানে তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ যেখানে বাড়িয়াছে শতকরা ২৪, কায়স্থদের সেখানে বাড়তির হার

৫৮%। কায়স্থদের এই অতি-বৃদ্ধি বা বিপুল বাড়্তির কারণ কি? ইহা কেবলমাত্র আপেক্ষিক জনন-ক্ষমতা নয়। একমাত্র প্রাকৃতিক বৃদ্ধি-হারও এখানে দেখিলে চলিবে না। অর্থাৎ মৃত্যু-হার অপেক্ষা জন্ম-হারের আধিক্য বশতঃ কায়স্থরা এত বেশী বাড়িয়া যায় নাই। আসল কথা,—অন্যান্য বর্ণের লোকেরা কায়স্থদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। এই সংমিশ্রণের ফলে কায়স্থদের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। বহুকাল ধরিয়া জাত-পাঁতগুলার উর্দ্ধযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। খুব সম্ভব, গতকল্যকার "অবনত" দলভুক্ত অ-কায়স্থগণই দলে-দলে আজকার তথাকথিত উচ্চ বর্ণে (কায়স্থে) পরিণত হইয়াছে। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আবার দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র সামাজিক বা শ্রেণীগত উর্দ্ধ-যাত্রাই সাধিত হয় নাই; সঙ্গে-সঙ্গে রক্তগত জাতি-ঘটিত রূপান্তরও সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ জাতি-সঙ্কর ও বর্ণ-সঙ্করের জয়-জয়কার চলিতেছে। আদিম ও উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মধ্যে অবশ্যই খুব বেশী ফারাক বিদ্যমান; কিন্তু মন্দ গতিতে হইলেও এই ব্যবধানের সেতুবন্ধের কাজ নিশ্চিত ও সুদৃঢ় ভাবেই চলিতেছে।

এইখানে মনে পড়িতেছে "ডী গেজেলশাফ্ট্সওর্ড্নুঙ" (সমাজ-শৃঙ্খলা) নামক গ্রন্থের (১৮৯৫) জার্ম্মাণ পণ্ডিত আম্মন-প্রচারিত বাণী। তিনি বিবেচনা করিতেন যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস অতিমাত্রায় নিরেট বাঁধাবাঁধির ভিতর আবদ্ধ। চোখের সম্মুখে দেখিতেছি যে, এমন কি হিন্দু সমাজের বর্ণ-বিভাগেও বিস্তর ফাঁক আছে। স্তরবিন্যাসকে পুরাপূরি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, নড়ন-চড়নহীন ও সীমাবদ্ধ রূপে সমঝিয়া রাখা বিজ্ঞানসম্মত নয়। আম্মনকে স্বীকার করিয়া চলা সমাজশাস্ত্রীদের পক্ষে যুক্তিহীন বিবেচিত হইবে।

শ্রেণীগত ও রক্তগত কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন চলিতেছে নিবিড়-ভাবে। অর্থাৎ ভাঙন-গড়ন ও রূপান্তর-পরিগ্রহ দেখিতেছি অতি

গভীর। তাহা সত্ত্বেও অথবা তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙালী জাতি বাড়িয়া চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকায় অন্যান্য রক্তগত জাতির উপর স্লাভদের চাপের দরুণ যে রূপান্তর-ক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভারতবর্ষের সুপরিচিত পরিবর্ত্তনসমূহেরই জুড়িদার। সর্ব্বত্রই চলিতেছে বর্ণ-সঙ্কর ও জাতি-সঙ্কর। এই সকল সঙ্কর বা রক্তসংমিশ্রণের ফলাফল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইবার কারণ দেখা যায় না। "বর্ণসঙ্কর"দের গুণ বা সভ্যতার আলোকবর্ত্তিকাবহনের যোগ্যতা সম্পর্কে সুপ্রজনন-বিদ্যা এখন পর্য্যন্ত সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। তবে নিতান্ত সংরক্ষণমূলক সংস্কার-প্রয়াসী অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ অবশ্যই অন্যরূপ গাহিতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত লাপুজ এইরূপ প্রতি-ক্রিয়াশীল মতই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নৈরাশ্য ও দুর্ভাবনা সত্ত্বেও দুনিয়ার ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে যে, একটার পর একটা করিয়া রক্ত-গত জাতিগুলা উঠিতেছে ও নামিতেছে। এই ধরণের রক্তের অভ্যুদয় ও তিরোধান অনবরত ঘটিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সভ্যতার ধারা চলিতেছে অবিরত। অর্থাৎ কোনো নির্দ্দিষ্ট হাড়মাসের রক্তের বা জাতের উপর আজ পর্য্যন্ত সভ্যতার বাড়্‌তি নির্ভর করে নাই। রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে সভ্যতা কোনো গর্ত্তে আসিয়া আটক হইয়া পড়ে নাই। লাপুজের মত ও সিদ্ধান্ত খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বুঝা যাইতেছে। সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার উপরই সাংস্কৃতিক পরিবর্ত্তন ও বাড়তি নির্ভর করে। বহুসংখ্যক অনার্য্য রক্তওয়ালা জাতি এইরূপ সৃষ্টিমূলক চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, তথাকথিত আর্য্য-রক্ত না থাকিলেও অথবা অতি অল্প মাত্র থাকিলেও সভ্যতার বিকাশ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। সভ্যতার ধারা ভবিষ্যতেও চলিতে পারিবে আশা করা যায়।

রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে ও জাতে-জাতে অনৈক্য সত্ত্বেও উন্নতি

সমষ্টিগত পরিবর্ত্তন ও সামাজিক রূপান্তরের আর একদিকে পায়চারি করা যাউক। কিঞ্চিৎ রাষ্ট্রিক লেনদেনের ভিতর প্রবেশ করিতেছি। উন্নতি-অবনতির ধরণ-ধারণ নতুনভাবে পরিষ্কার হইয়া আসিবে। যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে ইয়োরোপ আজ ৪৭ কোটি নরনারীর মহাদেশে পরিণত। ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩৫॥ কোটী। অর্থাৎ ভারত ইয়োরোপের মোট লোকবলের প্রায় বার আনার (তিন-চতুর্থাংশের) অধিকারী। ভারতবর্ষকে একটা মহাদেশ বা উপ-মহাদেশ বলিলে অন্যায় করা হইবে না। ভারত ঠিক যেন আর একখানা ইয়োরোপ। ভারতীয় উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অংশকে লইয়া আজকাল একটা ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জল্পন-কল্পন চলিতেছে। এই সূত্রে "গেও-পোলিটিক" (ভূ-রাষ্ট্রনীতি বা ভূ-নীতি) অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের সীমানা-চৌহদ্দি আর বিভিন্ন দলের যোগাযোগ লইয়া অবশ্যই অসুবিধা ঘটিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার ভিতর খাঁটি ভারতীয়, প্রাচ্য বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিজস্ব বস্তু বলিয়া কোনো কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী (১৯১৯) পুনর্গঠনের পরেও ইয়োরোপের রাষ্ট্রিক নৃতত্ত্ব বা ভূ-রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষের চেয়ে কম সমস্যাবহুল নয়। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে চলিতেছে ৩২টা বা ৩৩টা স্বাধীন রাষ্ট্র। আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে এইগুলির প্রত্যেকেই নিজ-নিজ এলাকার ভিতর সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ গোটা ইয়োরোপ লইয়া ঐক্যগঠন আজও অলীক কল্পনা মাত্র। ফরাসী রাষ্ট্রবীর ব্রিয়াঁর "প্যান-ওরোপ" আজও আকাশ-কুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। ঐক্যবদ্ধ ইয়োরোপ-রাষ্ট্র পূর্ব্বেকার মত এখনও সুদূরবর্ত্তীই রহিয়াছে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অনৈক্য সত্ত্বেও ইয়োরোপে উন্নতির অভাব

নাই। ইয়োরোপের মাপকাঠি ও নজীর অনুসারে ভারতবর্ষেও অনায়াসে ডজন দুই স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারিত।

জেনীভার বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘ যতদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপের মানচিত্রে এই রাষ্ট্র-বণ্টনের ব্যবস্থার জিম্মাদার স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থাকে ভয়াবহ গরমিলের অবস্থা বলিয়া দোষাবহরূপে ঘোষণা করা চলিবে না। কাজেই ভারতেও এইরূপ বিশ-পঁচিশটা স্ব-স্ব-প্রধান স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হইলে সেই অবস্থাতে মহাভারত ও অশুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে না। কোনো জনপদে রাষ্ট্রের সংখ্যাধিক্য লোক-জনের পক্ষে উন্নতির বিঘ্নস্বরূপ সমঝিয়া রাখা অনুচিত। বহুসংখ্যক পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বরাজশীল রাষ্ট্রের অনৈক্য সত্ত্বেও জনপদের উন্নতি,—রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক,—সাধিত হইতে পারে। এইবার অপেক্ষা-কৃত ছোট-খাটো অঞ্চল লইয়া তথাকথিত "জাতীয়" ঐক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শুনা যায়,—ভার্সাই সন্ধির (১৯১৯) পর অনেকগুলি "জাতিগত রাষ্ট্রের" পত্তন হইয়াছে। তন্মধ্যে পোলাণ্ডের কথাই ধরা যাউক। পোলাণ্ডে খাঁটি পোল জাতির শতকার হিস্যার পরিচয় রাষ্ট্রিক বা সামাজিক উন্নতি-তত্ত্বের গবেষণায় রীতিমতো আলোকপাত করিবে। পোলাণ্ডের জনসংখ্যার মধ্যে পোলদের সংখ্যা শতকরা ৫৩ জনের বেশী নয়। পোল ছাড়া এই দেশে উক্রেনিয়ান (২১%), ইহুদি (১১%), শ্বেত রুশ (৭%), জার্ম্মাণ (৭%) প্রভৃতি বহু জাতীয় লোকের বসবাস। এই নয়া তথাকথিত "নেশন"-রাষ্ট্রে অর্থাৎ জাতিগত রাষ্ট্রে কম্‌সে-কম্ পাঁচ-পাঁচটা বিভিন্ন জাত্ বা ভাষাগত দল বিদ্যমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপের সামাজিক ভাঙন-গড়ন নেহাৎ ছোট-ছোট রাষ্ট্রের বেলাতেও রক্তগত ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। জাতে-জাতে আর ভাষায়-ভাষায় অনৈক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রের জন্ম ও বিকাশ বাধা পায় নাই।

"বেৎসীহুংস্‌-লেরে" অর্থাৎ যোগাযোগ-বিদ্যা বা সামাজিক "সম্বন্ধ বিজ্ঞান" ও সামাজিক গড়ন লইয়া গবেষণা করা ফরাসী পণ্ডিত দুর্খাইম, জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফোন ভীজে ইত্যাদি সমাজশাস্ত্রীদের প্রধান ধান্ধা। ইঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে যাঁহারা যোগাযোগ-বিদ্যায় গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা বলিতে বাধ্য যে, রক্তগত জাতি-সম্পর্কিত ঐক্য জাতীয়তাবাদের প্রধান খুঁটা নয়। এই সম্পর্কে যাঁহা ইয়োরোপ তাঁহা ভারত। দুয়ে উনিশ-বিশ করা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। দেখিতেছি যে, ইয়োরোপের প্রত্যেক ছোট-ছোট জনপদে রক্তগত জাতির বহুত্ব সত্ত্বেও উন্নতির পথে বাধা আসিয়া জুটে নাই। অর্থাৎ উন্নতির ধরণ-ধারণ সমঝিবার জন্য যখন-তখন যেখানে-সেখানে রক্তগত বা ভাষাগত ঐক্যের ধান্ধায় দিশেহারা হইবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্য ভারতের জন্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময় এই কথাটা মনে রাখা আবশ্যক।

ধর্ম্মবিরোধ ও শ্রেণী-সমস্যা সনাতন

এইবার সমাজ-জীবনের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করা যাউক। সামাজিক "স্তরবিন্যাসের" কয়েকটা সমস্যা সম্পর্কে বিশ্লেষণ চালাইব। সামাজিক ভাঙন-গড়ন আর বিভিন্ন দলের পারস্পরিক সম্বন্ধের পুনর্গঠন মানুষকে নয়া-নয়া আকারে গড়িয়া তুলিতেছে। একটা বিলাতী নজীর দিতেছি। সকলেরই জানা আছে যে, ১৮৩৯ সনে ইংলণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদিগকে সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মুক্তি প্রদান করিতে হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, রোমান ক্যাথলিকগণ বহুকাল যাবৎ বিলাতী সমাজে কোনো কোনো বিষয়ে বেশ-কিছু অবনত, ঠিক যেন অস্পৃশ্য ও পারিয়া শ্রেণীরূপে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে খৃষ্টানদের সহিত অ-খৃষ্টানদের,—বিশেষতঃ পূর্ব্ব, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইয়োরোপে

ইহুদিদের—সম্বন্ধ রীতিমতো প্রণিধান-যোগ্য। জেনীভার বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের সংখ্যালঘুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মবিভাগ এসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের অবস্থা অ-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের সনাতন বদ্ধমূল কুসংস্কারের আর একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই সকল কুসংস্কার, নির্য্যাতন ইত্যাদি শোচনীয় অবস্থার সহিত পাশ্চাত্য-জগতের সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীদের যথেষ্ট পরিচয় আছে। পুরাপুরি খৃষ্টানদের মধ্যেও সামাজিক যোগাযোগের অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রথা বিদ্যমান। ক্যাথলিক ও অ-ক্যাথলিকদের মিলমিশের বেলায় ইহার জ্বল-জ্যান্ত দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বিবাহ বিষয়ক গীর্জ্জার আইনকানুনের দরুণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সামাজিক যোগাযোগ সাধনের চরম বাধা ঘটিত। বর্ত্তমানে বিবাহ-আইনগুলা ধর্ম্মের প্রভাব হইতে অনেকাংশে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু তবুও পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন খৃষ্টান উপ-সম্প্রদায়ের ঐক্য সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে "সাম্প্রদায়িক" উপজাতীয় বা শ্রেণীগত ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমানে রীতিমত নিন্দিত হইতেছে বটে, কিন্তু এইসকল শ্রেণী-বিদ্বেষ বা উপজাতিও সম্প্রদায়-বিষয়ক কুসংস্কার ভারতীয় সমাজে সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইয়োরোপ এই বিষয়ে ভারতের মতনই পাপী। ইয়োরোপের ছোট-বড়-ও-মাঝারি কয়েকটা রাষ্ট্রে দেখিতে পাই যে, রাষ্ট্রনৈতিক দলগঠনের বেলায় ধর্ম্মবিদ্বেষ, শ্রেণী-বিদ্বেষ ইত্যাদি মূলক ভেদবুদ্ধি ষোলকলায় বিদ্যমান। ইয়োরোপে যতদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক দলগঠনে নরনারী স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং বাধা-নিষেধের রেওয়াজ কায়েম হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইয়োরোপের নানা দেশে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় অনুসারে দল-গঠনই ছিল চিরন্তনী নীতি। উদাহরণ স্বরূপ প্রাক্-ফাশিস্ত্ ইতালির "পপোলারি" ও প্রাক্-নাৎসী

জার্ম্মাণির "ৎসেন্টরুম" নামক ক্যাথলিক দল দুইটার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রুমানিয়াতে একটি ইহুদি রাষ্ট্রিক দল আজও চলিতেছে। আবার ইহার উল্টা ইহুদি-বিরোধী রাষ্ট্রিক দলও আছে।

এক্ষণে খৃষ্টান নৃতত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইব। প্রটেষ্টাণ্টদের সমাজ বিশ্লেষণ করিতেছি। ইহাদের ভিতর বিস্তর দল, উপদল এবং মতবাদ সংক্রান্ত পার্থক্য ও অনৈক্য রহিয়াছে। তাহার ফলে প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে স্তরে-স্তরে বা শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিভিন্নতা দেখা যায় প্রচুর। খৃষ্টান জগতের ধর্ম্ম-বিষয়ক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এই সকল কথা অতি-পুরাতন। এই সকল অনৈক্য, পার্থক্য ও বিভিন্নতার সামাজিক ফলাফল নেহাৎ অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নয়। খৃষ্টান মিশনারী-দিগকে চীন মুল্লুকে খৃষ্টধর্ম্মে নব দীক্ষিত চীনাদের সহিত কারবারের বেলায় প্রতিনিয়তই এই ভেদমূলক সামাজিক নীতির বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করিতে হইয়া থাকে। চীনারা খৃষ্টানদের বহুত্ব ও অনৈক্যে অস্থির হইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে অভ্যস্ত। "আমরা কাহাকে অনুসরণ করিব? ব্যাপটিষ্টদিগকে, এপিস্কোপেলিয়ানদিগকে, এভাঞ্জেলিষ্ট না প্রেস্‌বিটেরিয়ান দিগকে? তোমাদের যিশু কে? আর তাদের যিশুই বা কে?" নবদীক্ষিত চীনা খৃষ্টানগণ প্রত্যহই এই ধরণের উদ্ভট প্রশ্নাদি উত্থাপন করিয়া খৃষ্টান প্রচারকদিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলে। উত্তর দেওয়ার সময় ইহাদিগকে বাস্তবিকই দিশেহারা হইতে হয়।

ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে অশেষ ভাঙন-গড়ন, পরিবর্ত্তন, বিপ্লব রূপান্তর ও পুনর্গঠনের কর্ম্মপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও খৃষ্টান জগতে শেষ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক বাদ-বিসম্বাদের কারণ রহিয়া গিয়াছে। ঝগড়া-ঝাঁটিগুলা আজও লুপ্ত হইবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে নাই। ভারতের অবস্থাও তদ্রূপ। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাদৃশ্য, ঐক্য ও সমান্তরলতা দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরের সংখ্যা, মাপজোক

ও তথ্যমূলক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে এইরূপ ধারণা ও বিশ্বাসই মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে বাধ্য। "শ্রেণী-সমস্যার" বা সাম্প্রদায়িক বিরোধের যথোপযুক্ত সমাধান এখনও সুদূরবর্ত্তী ভবিষ্যের গর্ভে অবস্থিত। উচ্চতম সংস্কৃতির অধিকারী অর্থাৎ ইয়োরোপের তথাকথিত "নর্ডিক" বা উত্তরদেশীয় জাতি ইত্যাদি সকল মিঞার বেলাতেই এই দুরবস্থা লক্ষ্য করিতে হইবে। উন্নতির চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াও ধর্ম্মে-ধর্ম্মে আর শ্রেণীতে-শ্রেণীতে লড়াই বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ ধর্ম্ম-সংগ্রাম আর শ্রেণী-সংগ্রাম সত্ত্বেও নানা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্রনিষ্ঠা

ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের মৃত্যুহার বর্ত্তমানে অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। মানব জাতির পুনর্গঠনে ইহা খুব বেশী সহায়তা করিতেছে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনারও প্রয়োজন। ১৯০৫ সনে জার্ম্মাণির ব্যাভেরিয়া প্রদেশে শিশুমৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ২৪৮। বাংলার হার ১৯১৪ সনের ২২১ হইতে ১৯৩২ সনের ১৭৯ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে বিহারের হার ১৪৮। ইংল্যণ্ড ও ফ্রান্স ১৮৯৬-১৯০৫ পর্য্যন্ত, ইতালি ১৯০৫-১৪ সন পর্য্যন্ত, এবং জার্ম্মাণি যুদ্ধোত্তর দশক পর্য্যন্ত এই অবস্থায় উপনীত হয় নাই। অর্থাৎ বিহারের অবস্থা এই ইয়োরোপীয় দেশগুলার তুলনায় বেশ চলনসই। বর্ত্তমানে উক্রেনিয়া, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, মিসর, হাঙ্গারী, রুমানিয়া, রুশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ইত্যাদি দেশে বিহার অপেক্ষা অধিকতর হার চলিতেছে। সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, উচ্চ শিশু-মৃত্যু হারের সঙ্গে ভারতীয় আবহাওয়ার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ টুঁড়া চলিবে না। ভারতীয় রক্তগত জাতিসমূহও এই উচ্চ হারের

কারণ নয়। অধিকন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, শিশুমৃত্যুর উচ্চ হার ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতির একচেটিয়া বিশেষত্ব নয়। জন্ম-মৃত্যুর হারের তুলনামূলক আলোচনার ফলে আমরা ভাঙন-গড়ন ও সামাজিক পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে অনেক নতুন ধারণা লাভ করিতে পারি।

এই সঙ্গে সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের ফলে সমাজে নবজীবনই সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রের উন্নতিটা পয়সার খেলা। সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য রীতিমত ব্যয়-সাপেক্ষ। এই ব্যয় সম্বন্ধেও আলোচনার প্রয়োজন। ১৮৩১ সন হইতে ১৮৭১ সন পর্য্যন্ত বিলাতকে পাঁচ দফা কলেরার আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে এশিয়ার মতো ইয়োরোপও ছিল কলেরা ও বসন্তের লীলা-নিকেতন। টাইফাস ও টাইফয়েডও কেবলমাত্র প্রাচ্য জগতের ব্যাধি নয়। ইয়োরোপের কয়েকটা দেশে অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াইয়া এই সমস্ত ব্যাধি দমন করা হইয়াছে। অবলম্বিত প্রক্রিয়াসমূহও সুবিদিত। ১৮৪৮ সন পর্য্যন্ত বিলাতে জন-স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন অজ্ঞাত ছিল। জল-সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত ছিল মান্ধাতার আমলের অবস্থায়। বিশেষতঃ কল-কারখানা ও সহর অঞ্চলে এই দুই ব্যবস্থা ছিল জঘন্য ধরণের। ১৮৪৮ সনে প্রথম সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন জারি হয় বটে, কিন্তু আইনটা কার্য্যে পরিণত করার কোনো ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৮৭৫ সনে কাউন্টি কাউন্সিল (জেলা-সভা) গুলা বাধ্য হইয়া মোটা বেতনে হেল্‌থ-অফিসার বা স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী ও জঞ্জাল-পরীক্ষকসমূহ নিয়োগ করে। জার্ম্মাণিতেও এই সময় "রাইখ্‌স্‌-গেজুণ্ড্‌হাইট্‌স্‌-আম্‌ট" (সাম্রাজ্যিক স্বাস্থ্য-দপ্তর) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বারে বারে বলিতেছি যে, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত প্রচুর

টাকাকড়ির মামলা। বিলাতে "লোক্যাল রেট্‌স্‌" বা মফঃস্বলে সংগৃহীত করের ২২% স্বাস্থ্য-রক্ষাকল্পে খরচ করা হয়। পরের কোঠায় পড়ে শিক্ষা বিষয়ক ব্যয় এবং এই খাতে হার ১৯%। অতএব বেশ মালুম হইতেছে যে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, নর্ডিক্ বা উত্তর দেশীয় রক্তের জাতি, আর ইয়োরোপীয় বা পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার কোনো-কিছুই ব্যাধিকে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই। সামাজিক ভাঙন-গড়ন, রূপান্তর ও উন্নতি-বিধানের তরফ হইতে এই সত্যটা পরিষ্কাররূপে সমঝিয়া রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দণ্ডশক্তি অর্থাৎ দণ্ডমূলক আইনই ব্যাধিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাষ্ট্রিক আইনের দণ্ডভয়েই পাশ্চাত্য নরনারীরা স্বাস্থ্যরক্ষার অভ্যাসটা রপ্ত করিয়াছে। এই চরিত্র-পরিবর্ত্তন বা চরিত্র-বিপ্লব, আচার-ব্যবহারের রূপান্তর ইত্যাদির জন্য আইন আর আইন অমান্য করিবার ফলে রাষ্ট্রিক সাজা প্রধান ভাবে দায়ী। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের পেছনে জলের মত অর্থ ব্যয় করিবার ব্যবস্থা ছিল ও আছে। টাকাটা আবার আসিয়াছে সরকারী দপ্তর হইতে। বর্ত্তমান যুগের নয়া মানবসমাজের গোড়া-পত্তনের জন্য "রুধির" ঢালা হইয়াছে বিস্তর। "রূপচাঁদ" আর সরকারী রূপচাঁদ হইল স্বাস্থ্যবিষয়ক মানব-চরিত্র আর স্বাস্থ্য-বিষয়ক নয়া সমাজের জন্মদাতা। সুতরাং শ্রেণী-গত ও রক্তগত রূপান্তর ও পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে "এতাতিস্‌ম্‌" বা রাষ্ট্র-নিষ্ঠার ইজ্জৎ খুব বড়।

ভারতবর্ষে আজও সার্ব্বজনিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইনের কোনো বালাই নাই। সামাজিক, আর্থিক বা অন্য কোনো পুনর্গঠন ও প্রগতিমূলক পরিকল্পনাদি সম্পর্কে আমাদের অর্থাভাবের কাহিনীও চির-পরিচিত। কিন্তু স্বদেশ-সেবক চিত্তরঞ্জনের দৌলতে বাংলা

সরকার ১৯২৫ সনে বিভিন্ন স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাটা মানিয়া লইয়াছে। তাহার ফলে জেলায়-জেলায় কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে এইগুলি পরিচালিত হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক কেন্দ্রে বার্ষিক ২০০০৲ টাকা সাহায্য যোগাইয়া থাকে। স্পষ্টাস্পষ্টি বুঝিয়া রাখা ভাল যে, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়াদি সম্বন্ধে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং দুনিয়ার অগ্রগামী দেশগুলার মধ্যে পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে। অর্থাৎ অগ্রবর্ত্তী আর পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দেশসমূহের ভিতর কেবলমাত্র ঐতিহাসিক অর্থাৎ সময়ের দূরত্বই পরিস্ফুট। ইহার ভিতর আবহাওয়া, রক্ত, ধর্ম্ম ইত্যাদির প্রভেদ লক্ষ্য করা চলিবে না। কিন্তু গবর্মেণ্ট যদি চিত্তরঞ্জনের প্রবর্ত্তিত পথে জোরের সহিত চলিতে থাকে, আর বেশী-বেশী "রুধির" ঢালিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সময়ের দূরত্ব বা ব্যবধান অর্থাৎ ইয়োরোপের তুলনায় বাঙালীর বা ভারতবাসীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তিতা নিবারণ করা সম্ভব হইবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক অগ্রগমনের অভাব ঘটিয়াছে টাকার অভাবে আর সরকারী দরদের অভাবে। স্বাস্থ্যবিষয়ক সমাজ-বিপ্লব বা সামাজিক উন্নতি-তত্ত্বের আলোচনা-ক্ষেত্রে সমাজশাস্ত্রীদিগের পক্ষে টাকাকড়ি আর সরকারী দরদের বিশ্লেষণ বিশেষ আবশ্যক।

যন্ত্রনিষ্ঠা ও ভাঙন-গড়ন

সমাজ-বিপ্লবের অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবনে ভাঙন-গড়ন, রূপান্তর ও পরিবর্ত্তনের সহায়করূপে যন্ত্রনিষ্ঠার ঠাঁই অতি উঁচু। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আলোচনা উন্নতি-অবনতির সমাজশাস্ত্রে যারপরনাই প্রাসঙ্গিক। বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে; কিন্তু ইতিহাসের দিক্ হইতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, এই পার্থক্য

আদৌ আদর্শ-গত নয়। সভ্যতার লক্ষ্য লইয়া, জীবনের গন্তব্য স্থান লইয়া পূর্ব্বে-পশ্চিমে কোনো ফারাক নাই। সর্ব্বত্রই লোকেরা চায় একই ধরণের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি। মানবজাতির পুনর্গঠন বিষয়ক স্তর বা ধাপের বিভিন্নতায়ই এই পার্থক্য নিহিত রহিয়াছে। কলকব্জা ও যন্ত্র-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সভ্যতা বিষয়ক সাম্যের বস্তুনিষ্ঠ মাপকাঠি ঢুঁড়িতে হইবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য লইলে দেখিব যে, মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত ইয়োরেশিয়ার এই দুই শাখার —অর্থাৎ ইয়োরোপ ও এশিয়ার—মধ্যে আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ধ্যান-ধারণা বিষয়ক বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। পরবর্ত্তী কালে এশিয়ায় ও ইয়োরোপে "রেণেসাঁস", নবাভ্যুদয় বা নবযুগ সাধিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের সমবেত প্রচেষ্টায় এশিয়ার রেণেসাঁস সাধিত হয়। ইয়োরোপের মত ভারতে, চীনে ও এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে রেণেসাঁস (অর্থাৎ নবাভ্যুদয় বা নবযুগ) সুকুমার শিল্পে, কুটীর শিল্পে ধর্ম্ম-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। ইয়োরোপীয় রেণেসাঁস আর এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের রেণেসাঁস অনেক বিষয়ে পরস্পর জুড়িদার ছিল।

ইতিহাসের দিক্ হইতে যাচাই করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ-বিপ্লবের বা সামাজিক পরিবর্ত্তনের গতি-ভঙ্গী বহু ক্ষেত্রেই ধর্ম্ম, দেশ ও রক্তগত জাতিকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। দেশ, ধর্ম্ম ও রক্তের সঙ্গে সামাজিক ভাঙন-গড়নের যদি কোনো যোগাযোগ থাকে তবে তাহা সম্পন্ন হইতেছে অনেকটা একই প্রণালীতে। অর্থাৎ দেশে-দেশে, ধর্ম্মে-ধর্ম্মে, রক্তে-রক্তে প্রভেদ ঢুঁড়িয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী মাক্স ভেবার প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে "ভির্টশাফ্‌টস্‌-এটিক" (আর্থিক কর্ত্তব্য জ্ঞান) বিষয়ক যেসব সূত্র প্রচার করিয়াছেন সেই সব সংশোধনের প্রয়োজন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম

সম্বন্ধে যেসকল মত প্রচার করিয়াছেন সেই সব অভিমত মামুলি, পুঁথিগত ও একদেশ-দর্শিতা-দুষ্ট। বস্তুনিষ্ঠ সমাজশাস্ত্রের জন্য যে ধরণের তথ্য ও সংখ্যা আবশ্যক ভেবার সেইসকল তথ্য ও সংখ্যার সাহায্য না লইয়াই ভারতীয় ধর্ম্ম এবং আর্থিক কর্ত্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মত প্রচার করিয়াছেন। ভেবারের সমাজ-চিন্তায় গলদ আছে।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হইতেছেন লাইবনিট্‌স্‌, দেকার্ত্ত ও নিউটন। তাঁহারা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পাশ্চাত্য জগৎ প্রাচ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। তবুও নয়া বিজ্ঞানের পক্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত কোনো প্রকার আর্থিক ও সামাজিক ভাঙন-গড়ন সাধন করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে ১৭৮৫ সনে বাষ্পযন্ত্র তূলা-শিল্পে বিপ্লব আনয়ন করে। ক্রমশঃ অন্যান্য শিল্পেও বিপ্লব দেখা দেয়। এই সময়ে পাশ্চাত্য জগতের ও প্রাচ্য জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যথার্থ ভেদরেখা অঙ্কিত হয়। এই প্রভেদকে পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রভেদ না বলিয়া আদিম বা মধ্য যুগ হইতে আধুনিক যুগের প্রভেদরূপে বিবৃত করাই সমাজশাস্ত্রীদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। শিল্প-বিপ্লবই সেকাল ও একালের মাঝখানে দাঁড়ি বিশেষ। একদম নতুন ধরণের সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা সুরু হয় শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে। এই ধরণের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এশিয়ায়ও ছিল না, ইয়োরোপেও ছিল না। গোটা দুনিয়ার পক্ষে এই অস্থিরতা বিলকুল নতুন।

আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও শেষ দিকে নবীন দুনিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। প্রায় দুই পুরুষকাল ধরিয়া শিল্প-বিপ্লবের অগ্রদূতরূপে বিলাত এই নয়া দুনিয়ায় ইয়োরোমেরিকার অন্যান্য দেশগুলার উপর স্বমহিমায় শির উন্নত করিয়াই দণ্ডায়মান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জার্ম্মানি

ও ফ্রান্স এই নতুন সামাজিক কৌলীন্যের ধাপে উন্নীত হইতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে জার্ম্মাণরা শিল্পনিষ্ঠায় আর যন্ত্রপাতিতে দৈত্যদানবের মত লাফাইতে-লাফাইতে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯০৫ সনে পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতেই জার্ম্মাণ নরনারী যন্ত্রবিজ্ঞানের কৃতিত্বে ইংরেজের সমান মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। সেই সঙ্গে শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে ইঙ্গ-জার্ম্মাণ সাম্য-সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক গতিবিজ্ঞানের রাজ্যে সমষ্টিগত রূপান্তর-সম্পর্কিত পার্থক্যের ও সাম্যের এতবড় উদাহরণ আর কোনো স্থানেই মিলিতে পারে না। দেখা গেল যে, কাল হিসাবে অনেক পরে সুরু করিয়াও জার্ম্মাণ জাতি ইংরেজ জাতিকে পাকড়াও করিয়া ফেলিল। জার্ম্মাণদের গতি ইংরেজদের চেয়ে খুব বেশী দ্রুত সন্দেহ নাই। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক সমাজই জার্ম্মাণ বা এমন কি ফরাসী জাতির মত দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। বলকান-চক্র, পূর্ব্ব ইয়োরোপ, রুশিয়া, ও লাটিন আমেরিকার নানা সমাজ আপনাদিগকে আজও জার্ম্মাণি বা ফ্রান্সের প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীর পূর্ব্বেকার যান্ত্রিক ও আর্থিক অবস্থায় দেখিতে পাইতেছে। এই সকল দেশ ঠিক যেন শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায়ই রহিয়াছে। উন্নতির হার ভিন্ন ভিন্ন জনপদে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তথাপি উন্নতি সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। উন্নতির নিদর্শনগুলা সবই মজুদ অথচ বিকাশের অসাম্যও রহিয়াছে। এই দুয়ে অসামঞ্জস্য নাই। ভারতবর্ষও আপনাকে বর্ত্তমানে অল্পবিস্তর "প্রথম শিল্প-বিপ্লবের" স্তরেই দেখিতে পাইতেছে। আমাদের চোখের সম্মুখে জার্ম্মাণি, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র, বিলাত ও ফ্রান্সের সামাজিক কাঠামোয় ট্রাষ্ট্ বা শিল্পবাণিজ্যের সঙ্ঘ, যুক্তিযোগ, অতি-আধুনিক যন্ত্র-নিষ্ঠা, সরকারী মালিকানা, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ঘাত-প্রতিঘাতে গভীর রূপান্তর সাধিত হইতেছে। এই সকল ভাঙন-গড়ন "দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লব" রূপে

অভিহিত হওয়ার যোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল তাহাকে প্রথম শিল্প বিপ্লব বলিতেছি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের পারম্পর্য্য

দ্বিতীয় ও প্রথম শিল্প-বিপ্লবের মধ্যে "সামাজিক ভাঙন-গড়ন" সম্বন্ধে দূরত্বের পরিমাণ ঊর্দ্ধপক্ষে দুই পুরুষের বেশী নয়। কিন্তু গভীর অর্থ-নৈতিক ও চিত্তগত শৃঙ্খলাপরম্পরা এই দুই বিপ্লবকে সংবদ্ধ রাখিয়াছে। এই দুই ভাঙন-গড়ন পরস্পর-সাপেক্ষ। একটি রূপান্তরে অপরটির প্রয়োজন আছে। প্রথম শিল্প-বিপ্লবের দেশগুলি আপন-আপন সাধারণ আর্থিক জীবন যাপনের জন্য দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের দেশগুলা হইতে যন্ত্রপাতি, যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ, এবং পুঁজিপাট্টা আমদানি করিতে বাধ্য। প্রসঙ্গক্রমে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার দিকে নজর ফেলা যাইতে পারে। বাংলার জমিদারেরা দেশবাসীদেরকে যন্ত্রনিষ্ঠায়, শিল্প-বিজ্ঞানে ও সংস্কৃতিমূলক আধুনিকতায় উন্নত করিবার জন্য আপন-আপন পুঁজিপাট্টা নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অধিবাসী সম্বলিত বিস্তীর্ণ জনপদের যথোপযুক্ত শিল্পোন্নতি-বিধানের পক্ষে তাঁহাদের সমবেত আর্থিক মুরোদ যথেষ্ট নহে। সুতরাং দেশের বাহির হইতে পুঁজি আমদানি করা বঙ্গসমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কাজেই স্বদেশী আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক "অটার্কি" বা আত্ম-পরি-পূর্ণতার আদর্শ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই পরমুখাপেক্ষিতা। ষোল আনা আর্থিক স্বরাজ, ষোল আনা জাতীয়তা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে গুল্‌জার দেশে-দেশে পরস্পর-নির্ভরতা এবং আন্তর্জ্জাতিকতা।

ভারত এবং অন্যান্য অনগ্রসর দেশের শিল্পোন্নতি সাধিত হইলে যন্ত্রনিষ্ঠার রেওয়াজ বাড়িয়া যাইতে বাধ্য। তাহা হইলে বিদেশ হইতে

যন্ত্রপাতির আমদানি অবশ্যম্ভাবী। অগ্রগামী দেশগুলার ভিতর মজুরদের জন্য নতুন-নতুন কাজের সংস্থানও না হইয়া পারে না। ফলতঃ অনগ্রসর দেশসমূহে প্রথম শিল্প-বিপ্লবের ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলা এইভাবে উচ্চতর জীবন-যাত্রার ধাপে উন্নীত হইবার অবকাশ পাইতেছে। ফরাসী সমাজ-শাস্ত্রী দুর্থাইমের প্রচারিত শ্রমবিভাগ-নীতির কার্য্যফল এইক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট। কেননা যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের ভাঙন-গড়নগুলা দুই বিভিন্ন প্রকারের রূপান্তর তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা কায়েম হইয়াছে। এই পারস্পর্য্যের প্রভাবে এক নয়া আন্তর্জ্জাতিক "সংহতির" গোড়াপত্তন দেখিতেছি।

অপূর্ব্ব যান্ত্রিক উন্নতির বলেই "দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব" সাধিত হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে দেশব্যাপী ও আন্তর্জ্জাতিক বেকার-সমস্যা ইহার নিত্য-সহচরে পরিণত। বর্ত্তমান যুগের অর্থনৈতিক সঙ্কটের রাজ্যে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের এই অশুভ দিক্‌টা ভাস্বর দীপ্তিতেই প্রকটিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, একই সময়ে কোনো-কোনো জনপদে প্রথম শিল্পবিপ্লবও চলিতেছে। ফলে অনগ্রসর দেশগুলার কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা এবং ভূস্বামী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলার আর্থিক শক্তিও বাড়িতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের দেশগুলার হাল-হাতিয়ার ("প্রোডক্‌ট্‌সিয়োন্‌স্‌ মিট্টেল"), ধনোৎপাদনের যন্ত্রপাতি, রেল ও সড়কের উপাদান, "উৎকৃষ্ট দ্রব্যনিচয়" প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের বাজারও নয়া-নয়া দেশে সম্প্রসারিত হইতেছে। অনগ্রসর দেশের হাতে যেই টাকা বাড়িতেছে সেই তাহারা উন্নত দেশ হইতে নতুন-নতুন ধরণের জিনিষপত্র কিনিতে সুরু করিতেছে। অনগ্রসর দেশগুলার কুটীরশিল্প ও আধুনিক ছোট-বড়-মাঝারি শিল্পগুলা শেষ পর্য্যন্ত "উন্নত" দেশগুলার অর্থনৈতিক শক্তি-বৃদ্ধিরই সহায়ক। সুতরাং শুনিতে যতই অসম্ভব বোধ হউক না কেন, দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের দেশগুলার আথিক সেনাপতি-

দিগকে আপন এলাকার বেকার-ব্যাধি দূর করিবার জন্য পূর্ব্ব ইয়োরোপ, রুশিয়া, এশিয়া ও লাটিন আমেরিকার "স্বদেশী আন্দোলন"-সমূহ সফল করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে হইবে। ভারতের পক্ষে অটাওয়ায় গৃহীত সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত-নীতি (১৯৩২) লাভজনক হইবার কথা। কেননা ইহার ফলে বিলাতের বাজারে ভারতীয় মালের বিক্রী বাড়িবে।' অধিকন্তু ভারতে বৃটিশ পুঁজি আমদানির সুযোগ পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষ যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে ততদিন বৃটিশ মুদ্রা-ব্যবস্থার সহিত ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে বাঁধিয়া রাখারও প্রয়োজন। তাহাতে ভারতের কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে বিদেশী মাল কিনিবার বেলায় সুবিধা জুটিবে।

বিশ্বব্যাপী মন্দা নবযৌবনের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথম শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে সৃষ্ট অনগ্রসর সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির দ্বারা উন্নততর দেশের বেকার-ব্যাধি প্রভৃতি দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের অমঙ্গলগুলার অনেকাংশে উপশম হইতে পারে। সোজা কথা,—"প্রবীণদের" সমৃদ্ধি "তরুণদের" সম্পদ্ ও ক্রয়-ক্ষমতার বৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ত্যহার উপরই নির্ভর করিতেছে। আবার তরুণদের উন্নতিও প্রবীণদের উন্নতির উপর একইভাবে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের শিল্প-বিপ্লব দুইটা একই আর্থিক ও সামাজিক চক্রের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক রূপান্তরগুলা পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে —তরুণ ও প্রবীণকে—আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার শক্ত বনিয়াদের উপরই দৃঢ় সংবদ্ধ করিতেছে।

সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা বা স্বর্গীয় অশান্তি একই সময়ে জগতের দুই প্রকার অঞ্চলে দুই বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু দুই আকারের ভিতর কাজ করিতেছে একই শক্তি। অধিকন্তু দুই আকারের

লোকজন শেষপর্য্যন্ত এক বিপুল সামাজিক ও আর্থিক জীবন-কেন্দ্রের বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ভিতর গিয়া পড়িতেছে।

বলিতে হইবে যে, জীবন যাত্রা প্রণালী ও ধ্যান-ধারণার উচ্চতর স্তরের দিকেই গোটা মানব জাতির যাত্রা সুরু হইয়াছে। পৃথিবী-ব্যাপী আর্থিক মন্দা তাহারই একটা আনুষঙ্গিক ও সামাজিক লক্ষণ মাত্র। গোটা দুনিয়ার নরনারী বর্ত্তমানে আপনাদিগকে এক নব-যৌবনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইতেছে। সামাজিক ভাঙন-গড়ন ও রূপান্তরসমূহ সামাজিক গতিশীলতার আনুষঙ্গিক ঘটনা হিসাবে বেশ-কিছু জটিল বিবেচিত হইতে পারে। বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য বহু উপসর্গ মানবকে দিশেহারাও করিতেছে। এই সমস্ত সত্ত্বেও বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যা-মূলক সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকগণ অনায়াসেই জাগতিক প্রগতির যথার্থতা সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে সমর্থ ও অধিকারী। উন্নতি অলীক কথা মাত্র নয়। ইহা একটা বস্তুনিষ্ঠ নিরেট তথ্য।

সর্ব্বত্রই দেখিতেছি যে, সামাজিক রূপান্তর বা সমাজ-বিপ্লব রক্তগত জাতি, দেশ, ধর্ম্ম প্রভৃতির কোন তোআক্কা না রাখিয়াই চলিতেছে। এইরূপ নিরপেক্ষতার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আর্থিক ক্রম-বিকাশের কোনো-কোনো ধাপে যন্ত্র-বিরোধিতা ও যান্ত্রিক উন্নতির শত্রুতা সাধন যেন কতকটা দস্তুরে পরিণত। ফরাসী লোকশাস্ত্রী বুথুল যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বিলাত ও ফ্রান্স এবং বর্ত্তমান যুগের চীন ও ভারতের মধ্যে একটি রীতিমত সাম্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের সর্ব্বত্র ১৯২৯ সনে আর্থিক মন্দা সুরু হওয়ার পর হইতে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই "ত্রাভ্ দেজ্ আঁভ্যাসিওঁ" (আবিক্রিয়া-বিরতি) বিষয়ক দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। যান্ত্রিক উন্নতির ও যুক্তি-যোগের বিরোধী মনোভাবও মানবজাতিকে যেন পাইয়া বসিয়াছে। দেখিতে গেলে এইরূপ

চিন্তা-প্রণালী অনেকটা বিশ্বজনীন ব্যাপার। বুথুলের এই বিশ্লেষণ সামাজিক রূপান্তরের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় নূতন ইন্ধন যোগাইবে।

উন্নতি-তত্ত্বে বহুত্ব-নিষ্ঠা

ভাঙন-গড়ন, উৎরাই-চড়াই, সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা, বিপ্লব, স্বর্গীয় অশান্তি অথবা উন্নতি-অবনতির নানা কথা আলোচনা করা গেল। এই সকল রূপান্তর গ্রহণের আকার-প্রকার, আনুষঙ্গিক ফলাফল এবং কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও রকমারি তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেখিলাম। এইবার কয়েকটা সোজা সিদ্ধান্ত দেখাইয়া বিশ্লেষণটা খতম করিব।

বিশেষ কোনো রক্তগত বা হাড়মাসের জাতি সভ্যতার একমাত্র অধিকারী,—বর্ত্তমান আলোচনা সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীদিগকে এই অন্ধ গোঁড়ামির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ দেখাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ যে-কোনো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তর, শ্রেণী ও দলগুলি অনেকটা তরল পদার্থের মতো এবং সদা-সর্ব্বদাই এইগুলি বিভিন্ন রক্তগত জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইতেছে। সমাজ-বিজ্ঞানসেবীদিগকে এই কথাটাও উপলব্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক দেশ, ধর্ম্ম, রক্তগত জাতি, শ্রেণী ও সামাজিক স্তরে বিচিত্র ও বহুবিধ শক্তি বা কারণের প্রভাবে ভাঙন-গড়ন সাধিত হইয়া থাকে। সমষ্টিগত জীবনের এই গতি-ধর্ম্মটাও তলাইয়া দেখার দরকার। নয়া-নয়া জনপদ, নয়া-নয়া রক্ত বা হাড়মাসের জাতি, নয়া-নয়া শ্রেণী ও নয়া-নয়া শক্তি বা কারণের ঊর্দ্ধযাত্রা নজরে না রাখিলে বিপ্লবের, ভাঙন-গড়নের অথবা উন্নতি-অবনতির মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। আসল কথা সর্ব্বত্রই নজরটা রাখিতে হইবে বৈচিত্র্যের দিকে,—বহুত্বের দিকে।

লাপুজ ও আমমন ইত্যাদি সমাজশাস্ত্রীরা আর্য্য জাতির অবশ্যম্ভাবী পতনের কথা প্রচার করিয়াছেন। তাহা যদি ঘটেও তথাপি তাহাতে

মানব-জাতির বা বিশ্ব-সভ্যতার বিশেষ-কোনো দুর্দ্দিন উপস্থিত হইতে পারে না। কেন না নতুন-নতুন মূল্যের দ্বারা মানুষের সংস্কৃতি অবিরত গতিতে সমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং উন্নতি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার সময় এইসকল নতুন-নতুন ঘটনা, নতুন-নতুন তথ্য ও নতুন-নতুন পরিস্থিতির খতিয়ান করিয়া অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। সমাজ-বিজ্ঞানের, গতি-বিজ্ঞানের, জীবন-বিজ্ঞানের অস্থিরতা-বিজ্ঞানের বিপ্লব-বিজ্ঞানের এবং উন্নতি-বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় হামেশা চাই বৈচিত্র্য-বোধ ও বহুত্বনিষ্ঠা।

রকমারি সমাজ ও সভ্যতা*

শ্রীহরিদাস পালিত

"আদ্যের গম্ভীরা" এবং "বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক" প্রণেতা

সমাজ শব্দের নানা নজীর

সমাজ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সংস্কৃতে ;—ইহা পুংলিঙ্গ শব্দ, "সম্-অজ-অধিকরণে ঘঞ্"—সমূহ গণ, সভা, একসঙ্গে (ভাবে)। বাংলা-ভাষায়—সম + অজ—সমাজ। সম, ধা—বৈক্লব্য (বিক্লব-ভাব, বিক্লব—'বি-ক্লব,কর্ত্তৃ-অন্'—অর্থ বিবশ, বিহ্বল, ভীত, অবধারণ অসমর্থ, পু—(ভাবে-অন্',—ব্যাকুলতা, জড়তা†)—বিহ্বলতা, বিবশতা

* "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের আলোচনা (১৫ ডিসেম্বর ১৯৩২)। সেই সময়ে সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনাসমূহ এই পরিষদের অন্তর্গত ছিল।

সন-তারিখের মামলা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এক প্রকার বর্জ্জিত হইয়াছে। ভারতীয় সমাজের একাল ও সেকাল সম্বন্ধীয় নানা তথ্য এই রচনায় সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব আলোচনা করেন এই সকল তথ্য তাঁহাদের কাজে লাগিবে। তথ্য সমূহের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানা প্রকার মত দেখা দিতে পারে। বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থায় কোনা নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা-প্রণালী গৃহীত হয় না। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। যে ধরণের তথ্য হরিদাস বাবুর রচনায় নানা স্থান যুগ ও সাহিত্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে সেই ধরণের তথ্য সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখিয়াই ভারতীয় সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, আদর্শ, দর্শন, জীবনের লক্ষ্য ও গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

† অমর কোষ (বিশেষ বিঘ্নবর্গ) জড় (ত্রি) "জল-অচ্-কর্ত্তৃ"—যে ব্যক্তি মোহ

ইত্যাদি। অজ, ধা—গতি; ক্ষেপণে (অ-জ, অ টি—নঞ্ ন, না অর্থ প্রকাশ করে, অব্যয় শব্দ, এবং জ টি জন, ধাতুর—জ, অর্থ উৎপত্তি, যথা—দ্বিজ, অন্ত্যজ ইত্যাদি), ক্ষেপণ অর্থে—ক্লী, "ক্ষিপ-ভাবে-অনট্", —ক্ষেপ, প্রেরণ, যাপন। ক্ষিপ ধাতু—প্রেরণ, ক্ষেপণ। মূল অর্থ হইতেছে—বিহ্বলতা, বিবশতা পূর্ব্বক গতি বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা,—অপ্রাকৃত ব্যাপার। জনগণের সজ্যবদ্ধভাবে হিতাহিত অবধারণে অসমর্থ হইয়াও কাল ক্ষেপণ। দলবদ্ধ হইয়া একই নিয়মে, কেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি ইহা অবধারণে অসমর্থ হইয়াও গতিশীল হওয়া বুঝায়। মোট কথা হইতেছে দশেমিলে কেন একভাবে চলিতেছি ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া, ভীত বা বিবশভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অথবা জড়বৎ গতিশীলতা। ইহা একপ্রকার বন্ধন, স্বাধীন ভাবের আংশিক বিলোপ। ইহা স্বভাবেই প্রবর্ত্তিত করায়—দলবদ্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে। সকল প্রাণী মাত্রেই প্রায় দল বাঁধিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, মৌমাছি, পিপড়েরাও দল বাঁধিয়া থাকে। সজ্যবদ্ধ হওয়াটা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত। আপনিই প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতিই দলবদ্ধ হইতে প্রবৃত্তি দেন। দলবদ্ধ গতি এবং সমাজ মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তত্রাচ মৌমাছি ও পিপড়েরা যে সমাজবদ্ধ জীব ইহা বুঝিতে পারা যায়। একা মানুষ সমাজ স্রষ্টা নয়। প্রথমে বিক্লব শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে, বিক্লব ও বিহ্বল একই অর্থ, অমর ১৩৪ শ্লোকে—"ব্যসনার্ত্তোপরক্তৌ

বশে ইষ্ট, অনিষ্ট, সুখ দুঃখ জানে না সর্ব্বদা তুষ্ণীভাবে (চুপ করিয়া) পরের বশ ধরিয়া থাকে তাহাকে জড় বলে। ১১৪। সম ধাতুর বৈক্লব্য অর্থে—যে জড়, যাহা সমাজের প্রধান বিষয়। সমাজের এই জড়ত্ব ব্যাপার চিন্তনীয়।

জড় অজ্ঞ সমান—কিছু জানে না যে। সমাজ-পরবশে চলার একটি সজ্ঘ। বিক্লব—বিহ্বল—ভয়াদিতে অভিভূত হইয়া স্বীয় শরীর ধারণাক্ষমকে বুঝায়। ১৩৪।

(১৩২ দ্বৌ বিহস্ত-ব্যাকুলৌ সমৌ। বিক্লবো বিহ্বলঃ স্যাত্ত (১৩৪) বিবশোঽরিষ্ট দুষ্টধীঃ (১৩৫)"—ভয়াদিতে অভিভূত হইয়া স্বীয় শরীর ধারণাক্ষমকে বুঝায়।" ১৩৪।

সমাজ শব্দের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করিতে হইলে প্রমাণযোগ্য বিষয় অবলম্বনেই করিতে হয়, এমন এক বা একাধিক প্রমাণের আবশ্যক যে, তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় নাই, যে কালে উক্ত শব্দটির ব্যবহার বা প্রয়োগ হইয়াছে এখন সেই প্রমাণ বিদ্যমান। সম্রাট অশোকের সময় যে শিলা এবং শৈল শাসনলিপিমালা খোদিত হইয়াছিল, উহার নিদর্শন এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। অশোকের রাজ্যকাল ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন। বারাণসীর সারনাথস্থ স্তম্ভলিপি তাঁহার জীবনকালেই খোদিত হইয়াছিল।

অশোক নামটি একমাত্র মাস্কি-অনুশাসনেই পাওয়া যায়। বৈদিক পুরাণে 'অশোকবর্দ্ধন' এই নামের ব্যবহার হইয়াছে। প্রায় সকল অশোক-শাসন লিপিতে 'সঙ্ঘ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। 'সঙ্ঘ' শব্দটি বৌদ্ধ-সমাজ বিশেষকেই গৌণরূপে বুঝায়। সঙ্ঘ অর্থে—সমূহ, দল। সমাজ অর্থেও প্রায় উহাই বুঝায় (সম্-হন-কর্ম্মে-ঘঞ্ হন, ধা-বধ, গতি)। অশোক শাসন লেখমালায় যেসকল আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে নিশ্চয়ই সেই সকল শাসন বাক্য,—'পাটলিপুত্রের ধর্ম্ম-সমিতিতে' উক্ত বিষয়ের আলোচনা হইবার ফলে অশোকের তথারূপ আজ্ঞা—অশোক শাসনে খোদিত হইয়াছে। এইসকল শাসনলিপির ভাষা মাগধী। পালি সাহিত্যের অনুরূপ ভাষা, এবং লিপি মাগধী বংশীর। কেবল দুইখানি শাসন লেখমালা—নাগ (খরোষ্ঠী) অক্ষরে লিখিত। অশোকের ২৭শ রাজ্যাব্দের (খৃঃ পূঃ ২৪৩ সনের) পরবর্ত্তী কালের।

সঙ্ঘ শব্দটির একটি উদাহরণ—"[ভিক্ষু-বা-ভিখুনি-বা] সংঘং ভা

[থতি] সে ওদাতানি দুস [†] সং নং ধাপয়িয়া অনাবাসসি আবাসয়িয়ে ॥" সঙ্ঘের পরিচয় একাধিক শাসনে বিদ্যমান রহিয়াছে। অশোকের অন্যান্য স্তম্ভলিপির মত এ লিপিখানিও প্রাচীন মৌর্য্য—বংশী লিপিতে খোদিত। অশোকের 'দেবানাং প্রিয়'টি বংশগত উপাধি বিশেষ। মুদ্রারাক্ষসে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি উহা প্রয়োগ হইয়াছে। সঙ্ঘ নামান্তর সমাজ বিশেষ।

সম্রাট অশোকের গির্ণার শৈল লেখমালার প্রথম লিপির কিয়দংশ—

(মূল লিপির অনুরূপ পাঠ)

"ইয়ং ধংমলিপি দেবানং পিয়েন্‌ পিয়দসিনা রাঞা লিখাপিতা
ইধ ন কিংচি জীবং অরভিংপা প্রজুহিতব্যং ন চ সমাজো কতব্যো
বহুকং হি দোসং সমাজমহি পসতি" ইত্যাদি।

এই শাসনে দুই স্থানে সমাজ শব্দের উল্লেখ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার বাংলা অনুবাদ (সান্যালকৃত)—"এই ধর্ম্মলিপি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দ্বারা লেখান হইল। এখানে কোন জীবকে বলি দিয়া হোম করিবে না; অথবা সমাজ (সুরাপান ও মাংসাহার সহিত আমোদ-প্রমোদ) করিবে না। অনেক দোষ সমাজে প্রবেশ করে। (পরবর্ত্তী পাঠের অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল)—দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার একটী হিতকর সমাজ (বৌদ্ধ সঙ্ঘ) আছে ইত্যাদি।"

সঙ্ঘ অর্থে বৌদ্ধ-সমাজ এবং ইহা ধর্ম্মাশোক-প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত। বৌদ্ধ সমাজের পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতা রাজা। যাজ্ঞিক সমাজে তথাকালে "অনেক দোষ সমাজে প্রবেশ করে' বাক্যাদি দ্বারা মদ্যপানাদি দোষের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। অন্ধভাবে ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া থাকায় কদাচারী হইয়া থাকে, উঁহাই বিহ্বল গতি, বিবশগতি। দোষগুণের বিচার করিবার অবকাশ

হয় না, সকলেই সমাজভয়ে অনাচার করিতে থাকে। যাহাই হউক সমাজ ও সঙ্ঘ প্রায় এক অর্থ প্রকাশ করিলেও সমাজ অর্থ যে কি, তাহা এই অশোক শাসন হইতে কিছু অবগত হওয়া যায়। সমাজ শব্দের ব্যবহারের ঐতিহাসিক প্রমাণ ইহার পূর্ব্বে বড় একটা পাওয়া যায় না। যদিও সমাজের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই শৈল-লিপি, তত্রাচ সমাজ শব্দের প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। মগধরাজ্যে একাধিক বৈদিক, বৌদ্ধ এবং জৈনাদি সমাজ বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধদের সঙ্ঘ ও হিন্দুদের সমাজ মানে একই।

বৌদ্ধ সাহিত্যে নরনারী একত্রে পান ভোজনাদিসহ নৃত্য-গীতাদির উপাখ্যান একাধিক আছে, এবং এই প্রকার সামাজিক ব্যাপার বৈদিকগণ করিতেন, ইহা বৌদ্ধ সাহিত্যেও আছে এবং বৈদিক পুরাণাদিতেও আছে। সেইসকল অভিনয় হিন্দু-বৈদিক সমাজের। যথা-কালে প্রদর্শিত হইবে।

"সভাসদঃ সভাস্তারাঃ সভ্যাঃ সামাজিকাশ্চতে ॥৩৮

(ব্রহ্মবর্গ, অমর)

সভ্য শব্দে সভার আরম্ভকারক ব্যক্তিকে বুঝায়। সামাজিক (পুঃ) (সমাজ+ইক্‌ণ্‌ ষ্টিক) সমাজে আগমন করে যে।৩৮। সভাস্তার (পুঃ) 'সভা-আ-স্তৃ অণ্‌ কর্ত্তৃ'—সভা আস্তরণ (আচ্ছাদন) করে যে। সভার সভ্যগণই সামাজিক ব্যক্তি। ভারতে যখন গণতন্ত্র-শাসন প্রচলিত ছিল, তখন সাধারণ জনগণের মনোনীত প্রধানগণ 'সংস্থানাগারে' যখন সভা করিয়া বসিয়া, একযোগে বিধিবিধান সম্বন্ধে একমত হইতেন, এবং কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন, সেই এক মতাবলম্বী প্রধানগণ সভ্য বলিয়া উক্ত হইতেন। গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে উহাই বুঝাইত। সেই প্রধানগণ প্রকৃতিপুঞ্জের মনোনীত প্রতিনিধি। তাহাদের উপাধি ছিল তখন গণমুখ বা সঙ্ঘমুখ (মুখপাত্র)। গণ-তান্ত্রিক সমাজ ক্রমে

রাজ-তান্ত্রিক হয়, দেখা যায় অবন্তি, বৎস, কোশল ও মগধে প্রথমে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তত্রাচ চাণক্য ও শুক্রনীতিতে গণমত সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের সময় রাজমত প্রধান হইলেও গণমত একেবারে উপেক্ষিত হইত না। সমাজ বলিতে সমূহ, গণ, সভা (এক সঙ্গে গতিশীল জনগণ) এবং সমাজের নামান্তর সভা। অমর কোষে সভা ও সমাজ প্রায় সমান অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। গণ-সভা সঙ্ঘ-সভা ইত্যাদি সমাজের মূল।

সঙ্ঘ শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধ সামাজিকেরাই অধিক করিয়াছেন। বৌদ্ধ বিহারাদিতে যেসকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এক প্রধান স্থবিরের অধীনে অবস্থান করিতেন সঙ্ঘের লোক দ্বারা তাঁহাদিগকেই বুঝাইত। প্রতি সঙ্ঘের প্রধানের অধীনে একই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গ করিলে বা 'উপোনথ' যথাযথ পালন না করিলে অশোকের আদেশে নিয়মভঙ্গকারীদিগকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া, সঙ্ঘ হইতে দূরে পাঠান হইত। মোট কথা বৌদ্ধ সমাজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। সঙ্ঘ ও সমাজকথার অর্থে বিশেষ প্রভেদ নাই।

অশোক শৈলাদি শাসনে যে 'সমাজ' শব্দের উল্লেখ আছে, উহা বৌদ্ধ সঙ্ঘ অর্থে প্রয়োগ হয় নাই। যাজ্ঞিক-সমাজ অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে। পশুহত্যা, মদ্য মাংস উপভোগসহ নরনারী একত্রে নৃত্যগীতাদি বৈদিকগণই করিতেন, অশোক তথাকথিত আচরণ নিবারণের আদেশ দেন। এই আচরণে সমাজে অনেক দোষ প্রবেশ করে, এই সমাজ বৈদিক-সমাজ (হিন্দুসমাজ?) সঙ্ঘে যেমন উপদেশাদি পালন না করিলে, অনাচারীদিগকে বিতাড়নের আদেশ ছিল, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণের তথাকথিত কদাচার নিবারণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইজন্য বলা যাইতে পারে, যাজ্ঞিক সামাজিকদের

দোষ নিবারণেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল, সুতরাং 'সমাজ' অর্থে বৈদিক-সমাজই বুঝায় (যাজ্ঞিক-কর্ম্মকাণ্ড আচরণকারী)।

যজ্ঞস্থলে বহু নরনারী পান, ভোজন এবং উৎসবাদিতে যোগ দিতেন সেই হেতু উক্ত জনগণ বৈদিক সমাজভুক্ত বিবেচিত হইত,—ইহা সভা নয়। ইহা জাতীয় উৎসবে সমাগত জনসঙ্ঘ মাত্র। যাজ্ঞিকের গণ। এই যজ্ঞীয় উৎসব প্রায়ই বর্ত্তমান বারোয়ারীর তুল্য ব্যাপার ছিল। ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের সময় 'নগর-সভা' ছিল। অশোকের সময়ও ছিল। অশোক খৃঃ পূঃ ২৭৩ বা ২৭২ অব্দে মগধের রাজা হন। নগর, পল্লী প্রভৃতিতে একাধিক সভা-সমিতি ছিল। কিন্তু সেসকল সভা প্রকৃত সমাজ নয়। এক জাতি এবং এক ধর্ম্মীদের যে নিয়মবদ্ধ গতি ইহাই সমাজ, সমাজ ঠিক সভা নয়।

অমর সিংহের সময় সভা-সমিতি-বিশেষকেই 'সমাজ' বলিতে আরম্ভ হয়। অশোকের সময়ে সমাজ ও সঙ্ঘ প্রায় একার্থকই ছিল—কিন্তু ইহাকে 'সভা' বলা হইত না। সভাটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান—বিবিধ ধর্ম্মের, একাধিক জাতীয় সভ্যগণের একত্রে অবস্থিতিকে সভা বলা হয়; কিন্তু সমাজের অর্থ ইহা নয়। এক জাতি ও এক ধর্ম্মী না হইলে 'সমাজ'বদ্ধ হওয়া চলে না। মগধের পরবর্ত্তী গুপ্ত উপাধিধারী রাজাদের সময়েরই বিক্রমাদিত্য, এবং সেই রাজসভায় পণ্ডিত অমরসিংহ ও বরাহমিহির ছিলেন।

অশোক এবং অমরসিংহের মধ্যে কালব্যবধান কত? অশোক খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের; অমর সিংহ পণ্ডিত লোক, প্রবাদ এই যে, তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী কোন রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। অমর সিংহের কাল যথাযথ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তিনি কোন বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা অবগত

হওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। প্রবাদ আছে নবরত্ন পণ্ডিত সভার তিনি একজন সভ্য ছিলেন। এই নবরত্ন সভা সমাজ নয়, যেহেতু পণ্ডিতদের মধ্যে একাধিক পণ্ডিত বৌদ্ধ ছিলেন। সভায় বৈদিক ও বৌদ্ধ পণ্ডিত থাকায় এই সভাকে সমাজ বলা সঙ্গত হয় না।

বৌদ্ধ পণ্ডিত সমাজ; জৈন এবং বৈদিক পণ্ডিত সামাজিকগণের সভা, ইহা সমাজ নয়। এক্ষণে বৌদ্ধ পণ্ডিত অমরকোষ-প্রণেতা অমর সিংহের সময় নির্দ্ধারণ করা যাউক। বৌদ্ধগয়ার একটি বৌদ্ধমন্দিরের (বিহার) একখানি প্রস্তর লেখমালানুসারে বিক্রমাদিত্যের নয়জন সভাসদ ছিলেন। এই সভাসদেরাই 'নবরত্ন' নামে প্রসিদ্ধ। প্রধান পণ্ডিত ও রাজার প্রিয়মন্ত্রী অমর সিংহ এই মন্দির বৌদ্ধগয়ায় নির্ম্মাণ করেন। শিলা-লিপিখানি অমরের সময় সংযোজিত হয় নাই। অন্য কোন ব্যক্তি লিপি-রচয়িতা*—তিনি লিখিয়াছেন "অমরদেবই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয় পণ্ডিতগণকে জানাইবার জন্য এই লিপি ১০০৫ সম্বতের (৯৪৮ খৃঃ) চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে শুক্রবারে খোদিত করান হইল। অমরদেব এই সময়ের কিছু পূর্ব্বের লোক ছিলেন। চৈনিক পর্য্যটক হিউএনথসঙ খৃষ্টীয় ৬২৮ হইতে ৬৪৩ অব্দের মধ্যে উক্ত বৌদ্ধ-নিকেতনটি দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন মন্দিরের বুদ্ধমূর্ত্তিটি পূর্ব্ব মুখে। বর্ত্তমান মন্দিরের দ্বারটিও পূর্ব্বমুখী। ফা-হিয়াঙ যখন ভারত ভ্রমণ করেন সে সময়টি খৃষ্টীয় ৩৯৯ অব্দ। তিনি অমরের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির দেখেন নাই। অতএব ফা-হিয়াঙ (গ) সময়ের পরে এবং হিউএনথসঙএর পূর্ব্বে অমরদেব তাঁহার মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বরাহ মিহিরও

* এসিয়াটিক রিসার্চেজ প্রথম ভাগ ২৮৬ পৃষ্ঠা।

নবরত্নের এক রত্ন। ইনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন।† ‘শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য’ নামক একখানি জৈন গ্রন্থের অনুবাদ বেবের সাহেব ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে করেন। ইহাতে লিখিত আছে জনৈক বিক্রমাদিত্য ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে (৪৬৬ শকে) বিদ্যমান ছিলেন বা রাজা হন। সুতরাং বলা চলে তাঁহারই সভাপণ্ডিত অমর সিংহ, মিহিরও সেই সময়ের লোক ছিলেন। এক্ষণে বলা যাইতে পারে অমর সিংহ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অমরকোষ লিখিয়াছেন। সেই কালে, সভা ও সমাজের অর্থ ভেদ হইয়াছিল। মগধের পাটলিপুত্রে অশোক রাজা হন প্রায় ২৭৩ খৃষ্টাব্দে। প্রায় ৯ শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘ ও সমাজ শব্দে যাহা বুঝাইত সঙ্ঘ অর্থ ঠিক সেই মতই ছিল, কিন্তু সমাজ শব্দের অর্থ পৃথক হইয়া পড়ে। অশোকের সময় হইতেই বৈদিক সমাজ হীনবল হয়, অমরের সময়ে আরও অনাচার প্রবেশ করে।

যে কোন ধর্ম্মমত মানবে প্রচার করে, কালে কালে তাহা হইতেই একাধিক মতবাদের উদয় হয় এবং মূল মতবাদটি প্রায় অস্তমিত হইয়া পড়ে। অশোকের সময় ভগবান বুদ্ধদেবের প্রচারিত মতবাদেরও তাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। অশোক তথাকথিত বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিবার জন্য মগধের পাটলিপুত্র নগরে এক সভা করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারার্থ ‘ধর্ম্ম-মহামাত্র’ নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাজকর্ম্মচারী দ্বারাই ভারতে এবং ভারত-বহির্ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রচারিত হয়।

পাটলীপুত্রে যে মহাসভা হয় তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের একাধিক মতবাদীরা সভ্যরূপে সমবেত হইয়াছিলেন, এই হেতু ইহা সভা-সমিতি নামের যোগ্য। এবং এক মতাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্মী দ্বারা যে ‘ধর্ম্মমহামাত্র’

† এসিয়াটিক রিসার্চেজ নবম ভাগ ১৫৬ পৃষ্ঠা।

নামক পৃথক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন, উহা একপ্রকার ক্ষুদ্র-সমাজ বিশেষ, সুতরাং একধর্ম্মী ও এক কর্ম্মীর দলই সমাজের স্বরূপ।

মেগাস্থিনিসের লেখা হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি কতিপয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া, পৃথক পৃথক শাসন কার্য্যের ভার, এক এক সঙ্ঘের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শাসন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেন। সঙ্ঘগুলি একই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিত বটে, কিন্তু সঙ্ঘের জনগণ একধর্ম্মী ছিলেন না, সুতরাং সেই সঙ্ঘগুলি 'সমাজ' নামে পরিচিত হয় নাই। নগরাদির শৃঙ্খলা সম্পাদনের ভার ৩০ জন প্রধান সদস্যের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 'সদস' শব্দের অর্থই—সভা, এবং সদস্য বলিতে সভাসদ বুঝায়। বৈদিক সাহিত্যে "সদস্য" বলিতে যজ্ঞাদি স্থলের বিধিদর্শী বুঝায়। এইরূপ বর্ত্তমান মিউনিসি-পালিটির মত চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে সদস্য পরিষদ গঠিত হয় তাহার ছয়টি বিভাগও ছিল। সদস্যেরা সমিতির সভাসদ বা পারিষদ্ ছিলেন। এ প্রকার যে প্রতিষ্ঠান তাহা 'সমাজ' নহে। সকলে এক কর্ম্মী থাকিলেও এক ধর্ম্মী ছিলেন না। বৈদিক 'সদস্য' সদস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞ ব্যাপারের একাংশ মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন সমগ্র যজ্ঞ ব্যাপার নয়—তাঁহারা একধর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা একত্র হইয়া কর্ম্ম করিতেন বলিয়া সভা বলা হইত। সভার প্রকৃত অর্থ পরিষদ, জনতা। সভাজন—পূজা (রঘু, ১৩শ) কিন্তু এ অর্থে পঞ্চায়েৎ সভা বুঝায়, সে সভার অধিবেশনে লোকে ভয় ভক্তি করিত। "সভাজ," ধাতু গঠিত পদ—সভা (সভাজন), এই ধাতুর অর্থ—সেবা, সম্ভাষণ। দশের বা সমাজের সেবা করণার্থে যাঁহারা সমবেত হয় এবং পরস্পর সম্ভাষণ দ্বারা (অর্থযুক্ত কথন বা বাক্যালাপ) কর্ত্তব্য স্থির করিয়া একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই সভাজন। তাঁহাদের যুক্তি পরামর্শের যে বৈঠক উহাই সভা। ইহা সমাজ নামের যোগ্য নয়,

বিভিন্ন সামাজিকগণের লোকেরাই সভাজন, সভ্য ইত্যাদি,—এক কর্ম্মী হইলেও এক ধর্ম্মী নহেন। নানা রকমে দশের সেবা করাই সভার কার্য্য। চন্দ্রগুপ্তের সময় রাষ্ট্রের পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, উহা 'সমাজ' নয়। বৈদিক সদস্য বৈদিক সমাজের এক অংশ বিশেষ, পূর্ণ সমাজ নহে, সমাজে সকল বৈদিকগণকে সর্ব্ব রকমে পরিচালন করা হয়, বাধ্য করা হয় সকলের হিতাহিত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে।

অশোক পূর্ব্ব পুরুষের রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারে তাহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। তিনি বৌদ্ধ প্রকৃতিপুঞ্জের 'সমাজপতি' ছিলেন, কিন্তু সকল প্রজাদের ছিলেন রাজা; যদিও তিনি একাধিকবার বলিয়াছিলেন—"সকল প্রজাকেই আমি পুত্রতুল্য দেখি।" প্রজারা ছিল একাধিক ধর্ম্মের। ধর্ম্মভেদ থাকায় তাঁর কর্ম্মভেদও ছিল। তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মে ভেদ থাকায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন সভা, সমিতি, 'সমাজ' (সাধারণ-সমাজ) নামের যোগ্য হয় নাই। তত্রাচ তিনি বৌদ্ধ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে কখন 'এক সমাজ' ছিল না, বৈদিক কালেও হয় নাই, হিন্দু রাজাদের সময়েও এক সমাজ ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই। হিন্দুদের মধ্যে একাধিক সমাজ বিদ্যমান, প্রত্যেক সমাজ পৃথক পৃথক।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বৈদিক চাণক্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক নারী হেলেনকে বিবাহ করেন। চাণক্যের অমতে এ বিবাহ সম্পাদিত হয় নাই। অবশ্যই তাঁহার মত ছিল। এই দিক্ দিয়া তথা-কালের উদার বৈদিক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক 'সমাজ' বিবাহ ব্যাপারে তখনও সঙ্কীর্ণ ছিল না। বৈদিক অপরাধ-নীতি-তত্ত্ব চন্দ্রগুপ্তের সময়েও প্রচলিত ছিল, যেমন অপরাধ-বিশেষে অঙ্গচ্ছেদন। বৈদিক সমাজে নাসা-কর্ণ ছেদনেরও ব্যবস্থা ছিল।

এই সকল অপরাধ-বিধি অশোকের সময় উঠিয়া যায়। অশোক বৈদিক-দিগকে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে কখনও নিষেধ করেন নাই, কেবল কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন—যজ্ঞে পশু বধ না করিতে, এবং বৈদিক-সামাজিকদিগকে যজ্ঞ-উৎসবে মদ, মাংস ইত্যাদি পান ভোজন না করিতে। ঐসবেতে সমাজ কলুষিত হয়। নর-নারী একত্রে মদ্য-আসব (তাড়ি) এমন কি বারুণী (ভোতো মদ, হাঁড়িয়া) পান করিয়া যজ্ঞস্থলে মাতলামি করিত। পুরাণে এসব উপাখ্যান আছে। বৈদিক সমাজ, তথাকালে সর্ব্বাংশে উন্নত ছিল ইহা বলা যায় না।

দীর্ঘ নয়শত বৎসরে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহা অস্বাভাবিকও নয়। চন্দ্রগুপ্ত (১ম) মৌর্য্য ধারার প্রবর্ত্তক। মৌর্য্য নামক প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম, বৈদিক পুরাণে এই বংশ শূদ্র বলিয়া লিখিত আছে।* প্রকৃত কথা তাহা নয়—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নামক ক্ষত্রিয় বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক। তাঁহার কোন পীড়ায় রাজ-বৈদ্য তাঁহাকে 'পেঁয়াজ' খাইতে উপদেশ দেন, ইহাতে অশোক বলিয়াছিলেন "আমি ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, পেঁয়াজ খাইতে পারিনা।" বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; তত্রাচ মগধের বিখ্যাত নন্দবংশেই চন্দ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। পুরাণ বিশেষে (পরবর্ত্তিকালে রচিত, বৌদ্ধ বিদ্বেষপূর্ণ) নন্দদিগকে শূদ্র বলা হইয়াছে, কিন্তু নন্দেরাও মৌর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ৩২১ খৃঃ পূঃ চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ নন্দ রাজাদিগকে,

---

* নীতিসারের একটি শ্লোকের মর্ম্ম—(বেদবিদ্ চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করান চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা)।

"যস্যাভিচার বজ্রেণ বজ্রজ্বলন তেজসঃ। পপাত-মূলতঃ শ্রীমান্ সুপর্ব্বা নন্দ পর্ব্বতঃ॥
একাকী অভ্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ। আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্॥"

চন্দ্রগুপ্তের কথাই বলা হইয়াছে। ভাগবতে এইরূপ শ্লোকের গুপ্ত শব্দটি মেদিনীর বিশেষণ করিয়া অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন ব্যাখ্যা কর্ত্তারা। ভাগবত চন্দ্রগুপ্তের পরের লিখা।

চাণক্যের মন্ত্রণাবলে হত্যা করিয়া রাজা হন। যখন চন্দ্রগুপ্ত আত্ম-রক্ষার্থ পঞ্জাবে পলায়ন করেন, তখন চাণক্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। নন্দেরা ক্ষত্রিয়, হর্য্যঙ্গ কুলের, ইহারই নামান্তর মৌর্য্য-ক্ষত্রিয়। মৌর্য্য হইতে 'মুরা' নাম করণ করিয়াছেন পৌরাণিকেরা।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়কার অনেক কথা মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। তাঁহার সময়েও বৈদিক সামাজিক রীতি-নীতি-রাজ্যশাসনে প্রচলিত ছিল, দণ্ড-প্রণালীর মধ্যে হস্তপদাদির অংশ-ছেদন চলিত। রাজ্য শাসনে কতকটা বৈদিক দণ্ড-প্রণালীর প্রচলন ছিল। রাজ্য শাসন ব্যাপারে মিশ্র নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চাণক্যের মত পণ্ডিত এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাধান্য কালে, গ্রীক রাজকন্যা হেলেনকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেন। তখন এই প্রথা অবৈধ ছিল না। থাকিলে চাণক্য অবশ্য বাধা দিতেন। বিদেশের নারী গ্রহণ ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা করিতেন এবং ধনিকেরাও তক্ষশীলার বাজারে বৎসরে একাধিকবার ইয়োরোপীয় শ্বেতনারী হাটে ক্রয় করিয়া গৃহে আনিতেন। অযোধ্যার রাজা দশরথও পারসিক রাজকন্যা কৈকেয়ীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী শচীদেবী অসুর-কন্যা ছিলেন। বৈদিক সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, রাষ্ট্রশাসন ব্যপদেশে, একাধিক সভা-সমিতি ছিল, কিন্তু সেসকল সভাদি প্রতিষ্ঠানকে 'সমাজ' বলা হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার (নন্দ ? মৌর্য্য ক্ষত্রিয় ?) রাজা হয়, তাঁহার মৃত্যুর পর ২৭৩ খৃঃ পূঃ অশোক মগধের সিংহাসন লাভ করেন।

আদ্য-প্রাকৃত-লোকায়ত-সমাজ

প্রাকৃত অর্থে বাস্তবিক, আরব্ধ ইত্যাদি। প্রাক্‌লোক পূর্ব্বের বা অগ্রের লোক। মানব সভ্যতার পূর্ব্বের বা আদিম কালের লোক।

বৈজ্ঞানিক কথায় আদি পাষাণ-যুগের মানুষ বুঝায়। সেকালের লোকে অগ্নির ব্যবহার জানিতনা, পশু চর্ম্ম পরিধান করিত এবং পর্ব্বতগুহায় বংশাবলী ক্রমে একত্রে বাস করিত এবং প্রত্যক্ষে যাহা দেখিত তাহাই বুঝিত, পরিকল্পিত কোন মতাদির ভাবোচ্ছাস তাহাদের ছিল না। তাহাদের চিন্তা করিবার অবকাশ ছিল না যে,—এই পৃথিবী, জল, স্থল, পর্ব্বত, বন পশু-পক্ষী, ফল-মূলাদির কেহ স্রষ্টা আছেন বা থাকা সম্ভব। তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিত সূর্য্য উদয় হয়, আকাশের মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, পর্ব্বত গাত্র ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ছুটিয়া বাহির হয়। বীজ হইতে বৃক্ষাদি জন্মায় এবং বড় হয়, ফুল ফোটে, ফল হয়, ফলের মধ্যে বীজ হয়। নর-নারীর সম্মেলনে নারী সন্তান প্রসব করেন। তাহারা বুঝিত এই প্রকারেই সব হইতেছে, ইহার পৃথক স্রষ্টা বা নির্ম্মাতা অন্য কেহই নাই। প্রাকৃতজনসুলভ প্রাথমিক ধারণা ইহাই।

তাহারা পশু মারিয়া মাংস খায়, বৃক্ষ লতাদির ফল-ফুল-মূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। নারীর গর্ভে পুত্র-কন্যা উভয়ই জন্মায়। সুতরাং বীজ মৃত্তিকা ও জল এই তিনের সংযোগে উদ্ভিদ জন্মায় এবং ইহারই ফল-ফুল-মূল হয়। অতএব এসকল কে সৃষ্টি করিয়াছে বা না করিয়াছে সে খবর পাইবার ইচ্ছাই তাহাদের তখন হয় নাই। শিশু জন্মলাভ করিয়া মাতৃস্তন্য-পান করে। মাতাই সে দুগ্ধ দেন এবং সন্তান-সন্ততিকে পান করান। মানুষের মতই পশু মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। ইহা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া জন্মের কারণ বুঝিত এবং অদৃশ্য কোন স্রষ্টার চিন্তা তাহাদের মনে উদয় হইত না। মাতৃ-গর্ভে সন্তান বড় হয়। খাদ্যের জন্য পশুশিকার করে, গাছ হইতে ফল পাড়িয়া ও মাটি হইতে মূল তুলিয়া খায় ও ছেলেপিলেকে মানুষ করে। নর-নারী যথাকালে সম্মিলিত হয়। গুহায় বাস করে, ক্রমে অগ্নির ব্যবহার শিখে, এ আগুন দাবদাহে বনে

উৎপন্ন হয়। আগুনের প্রকৃতি বুঝিয়া, গুহায় আনিয়া রক্ষা করে, শুষ্ক কাঠের দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া রাখে, সেই আগুনে পশু-পক্ষী-ফল-মূল দগ্ধ করিয়া ভোজন করে। অগ্নি কাহারও সৃষ্ট কিনা এ ধারণা তাহাদের ছিল না বা হয় নাই। তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিত পাহাড়-পর্ব্বতের বনে তৃণাদি দগ্ধ হইতে, শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে আগুন হইতে, কাঠে কাঠে ঘষিত হইয়া আগুন হইতে। আবশ্যক হইলে তাহারা স্বহস্তে কাষ্ঠ ঘর্ষণে আগুন জ্বালিত। পাথরে পাথর ঘষিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির করিয়া তৃণাদির সাহায্যে আগুন জ্বালিত। অগ্নির উৎপাদন তাহারাই করিত, সুতরাং অগ্নির স্রষ্টা যে পৃথক আছেন এ ভাব তাহাদের মানসপটে কখন উদয় হইবার অবকাশ পায় নাই। তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিত নর-নারী সংযোগে মানুষ জন্মায়। সুতরাং মানব সৃষ্টির পৃথক একজন অদৃশ্য কর্ত্তার কল্পনা তাহারা করিত না। পিতা-মাতাই সন্তানের স্রষ্টা। এক এক বংশের নর-নারীরা এক এক গুহায় একত্রে বাস করিত, শীতে আগুনের চতুর্দ্দিকে বসিয়া আগুন পোহাইত, পরস্পর আদ্য-প্রাকৃত-ভাষায় কথা বলিত, মাংস ফল-মূল পোড়াইয়া খাইত। বন্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গুহা মুখে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিত। লাঠি, পাষাণ-অস্ত্র লইয়া সমর্থেরা হিংস্র পশুদের সহিত প্রায়ই মল্লযুদ্ধ করিত। তখন হিংস্র পশুগুলিই তাহাদের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দী ছিল। পশুরা যে গুহায় বাস করিত, পাষাণ যুগের মানুষেরা সেই গুহা নিজেদের অধিকারে লইয়াছিল। অধিকার লইয়াই তখন পশু-মানবে সংগ্রাম হইত।

এক এক গুহাবাসী একবংশীয় পরিবারবর্গ যেন 'সমাজ' বদ্ধ ভাবেই থাকিত। পিপ্ড়া এবং মৌমাছিদের মতই পাষাণ-মানবের গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক ভাব ছিল। তাহারা এক কর্ম্মী ও এক ধর্ম্মীই ছিল। এইরূপভাবে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছিল। পাষাণ

যুগের এই প্রকার বংশ-আগত ভাব প্রবাহকেই, পরবর্ত্তী কালে 'লোকায়ত' ধর্ম্ম বলিয়া দার্শনিকেরা নাম দিয়াছেন।

লোকায়ত অর্থে 'লোক-আয়ত'; আয়ত—(আ+যত—যত=যত্না সং—"আ—যম-কর্ত্তৃ-ক্ত" অর্থ—দীর্ঘ, বিস্তৃত, আকৃষ্ট, সংযতা "আ-যত-কর্ত্তৃ-অন্"—সম্যক যত্ন। দীর্ঘকালে জনগণ মধ্যে সম্যক যত্নে যে কর্ম্ম-নীতির প্রচলন হইয়াছে, বা দীর্ঘকালে মানব বংশ পরম্পরায় যে সংসারযাত্রা বা জীবন ধারণ ব্যাপারের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে উহারই নাম "লোকায়ত ধর্ম্ম"। লোক পরম্পরায় আগত ভাবধারা। এ ভাব ধারায় স্রষ্টা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানেরই উন্মেষ হয় নাই অথবা ছিলনা। দার্শনিকেরা অর্থ দিয়াছেন চার্ব্বাক মত, নাস্তিক্য।

পাষাণ যুগের মানবের আস্তিক্য-নাস্তিক্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না, তাহারা স্রষ্টা বা ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তা করিতেই শিখে নাই। তথাকালে প্রবল নৈয়ায়িক চারুবাক (চার্ব্বাক ?) সম্প্রদায়ও জন্মলাভ করেন নাই। ভগবান কপিলদেবের (পঞ্চশিখ সামাজিক ?) আবির্ভাবও হয় নাই। স্থতরাং প্রকৃতি-পুরুষ বিচার জ্ঞান তখন ছিল না। সেই পাষাণ-আদ্য বা পরবর্ত্তী নবীন-পাষাণ কালের বংশগত সমাজ ও সামাজিক পদ্ধতিরই অলোচনা করা হইতেছে।

বর্ত্তমান সভ্যেতর সামাজিকগণের মধ্যেও সকল দেশেই লোকায়ত পদ্ধতি-বিশেষ, কতক কতক সমানে চলিতেছে। চলিতেছেনা ইহা বলিবার উপায় নাই। সামান্য চেষ্টা করিলেই দেখা যাইবে যে, লোকায়ত-পদ্ধতি সকল সমাজেই জাড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এক এক গৃহবাসীর দলে সমভাবধারা প্রচলিত ছিল,—এই জন্য সেই দলকে লোকায়ত সামাজিক বলা চলে। সমাজ শব্দটি প্রাচীন নয়। বেদে সমাজ সম্বন্ধে উক্তির অভাব। বৈদিক-পূর্ব্ব ভারতের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাকৃত সামাজিকদের মধ্যে বংশাগত পদ্ধতিক্রমে যে প্রাকৃত জ্ঞানের

উন্মেষ হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই ছিল না। তাহারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সে পাষাণ-মানবীয় যুগের কল্পনা, বৈদিক (যাজ্ঞিক) সামাজিকেরা তাঁহাদের আদি-শাস্ত্রে স্বীকারই করেন নাই। তাঁহারা মানব কুলের উৎপত্তি ও গতি অলৌকিকরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মানুষ একেবারে সভ্য-ভব্য হইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু বৈদিক মত ইহা নহে। তাঁহাদের শাস্ত্রীয় মতে বুঝায় তাঁহারা সভ্যতা লইয়াই প্রকট হইয়াছেন। এ সভ্যতা অনাদি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এমত গ্রহণ করেন নাই। দেখা যায় প্রাকৃত পাষাণ-যুগের অবসানের দীর্ঘকাল পরে, যাজ্ঞিকগণের আবির্ভাব হয়, সুতরাং তাঁহাদের শাস্ত্রে পাষাণ-যুগের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

একটি নিরক্ষর বন্যপ্রকৃতির মানবদের সমাজ প্রতিষ্ঠার শ্রুতিমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া, আদি-মানবের বিষয় লিখিত হইল। বহুকাল ধরিয়া বৈদিকগণ শ্রুতি-কথারই আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছিলেন। সেগুলি যেমন শ্রুতি-জাত-শাস্ত্র, তদ্রূপই বন্য-প্রকৃতির নিরক্ষর মানবদের শ্রুতিগত উপাখ্যানও শাস্ত্র। সামাজিক পরম্পরাগত শ্রুতির প্রতি যেমন তাঁহাদের বিশ্বাস, তথাকথিত অসভ্য জাতিরও তদ্রূপ। একের শ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য এবং অন্য সম্প্রদায়ের শ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য নয়, নিরপেক্ষভাবে একথা বলা চলে না। মূলে সৃষ্টির আদি কথা কাহারও বিদিত থাকা সম্ভব নয়। কারণ আদিতে কোন মানবই ছিল না, যিনি সৃষ্টির বিষয় চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছেন। জ্ঞান ও সভ্যতার উন্মেষ সহকারে বিবিধ কল্পনামূলে রচিত উপাখ্যান বিশেষ 'দর্শন-শাস্ত্র' নামে কথিত হইয়া থাকে। বন্য সরলপ্রকৃতির মানবদেরও সেই রকম পরিকল্পিত শ্রুতি-বিশেষ দর্শন। মূলের সন্ধান না পাইয়া প্রথম সূত্র অলৌকিক রহস্যজালে আবৃতই হইয়াছে। যেমন 'বীজ

আগে না গাছ আগে' এ কথার মীমাংসা এইরূপে নিরাকৃত হয় না। সৃষ্টিকর্ত্তার আরোপ না করিলে এতাদৃশ অবৈজ্ঞানিক প্রশ্নের শেষ হয় না। সেইরকম ব্যাপার বলিয়া, কি বর্ব্বর জাতি, কি সভ্যতা অভিমানী জাতি, সকলেই অলৌকিক রহস্য দ্বারা সৃষ্টির গোড়াপত্তন করিয়াছে। প্রথমে বন্যজাতি-বিশেষের সৃষ্টি প্রকরণ উপাখ্যান অবলম্বনে দেখা যাউক, তাহাদের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতি কি বলে? দেখা যাইবে সৃষ্টির আদিকথা সকলেরই একরূপ। কেন এমন হয়? কালক্রমে আদি সৃষ্টি কথাকে, জ্ঞানবানেরা দার্শনিকতত্ত্ব দ্বারা সাজাইয়া লইয়াছেন কিন্তু প্রশ্নের শেষ হয় নাই। লোকে তর্ক করে, রচা কথা স্বীকার করে না।

চিরকালই কি লোকে অন্ধ-বিশ্বাসী হইয়া থাকিবে? একজনে অবৈজ্ঞানিকভাবে যাহা বলিবে, তাহা ঘষিয়া মাজিয়া না দেখিয়া, স্বীকার করিবে কেন? এই জন্য শাস্ত্রীয় অলৌকিক ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিক কষ্টিতে কষিয়া যাহা ঝুটা বিবেচিত হইতেছে, শিক্ষিত নবীন-সম্প্রদায় তাহাই ত্যাগ করিতেছেন। আধ্যাত্মিক গবেষণা করা পরান্নে পুষ্টদেরই শোভা পায়। ইহলোকে যতই লোক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে, ততই পারলৌকিক সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেছে। জীবিতকালে যাহা হইল না মৃত্যুর পরে তাহা হইবে। "বর্ত্তমান নাহি জানি কেবল ভবিষ্যৎ মানি" এ প্রকার চিন্তাশীলতা, লৌকিক জগতের নয়।

হড়-শ্রুতি

(সাঁওতালদের পুরাণ ও নীতিশাস্ত্র)

স্বজাতি-প্রিয়, জাতীয়ভাবে বিভোর সরল জাতি হড়। লোকে ইহাদিগকে সামতাল, সন্তাল, সাঙতাল ইত্যাদি নাম দিয়াছে।

ইহাদের কোন লিখিত শাস্ত্র নাই। লোক পরম্পরাগত শ্রুতি আছে। সৃষ্টি, জাতি ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা হইতেছে। ইহাতে ভূমি ও মানব আবির্ভাবের বিষয় হইতে সমাজ প্রতিষ্ঠার কৌতুকাবহ উপাখ্যান পাওয়া যাইবে। ইহাদের শ্রুতিতে অন্য কোন জাতির শ্রুতি-কথা এ পর্য্যন্ত মিশ্রিত হয় নাই। তাহাদের চিরন্তনাগত প্রবাদই চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক প্রভাব ইহাতে আদৌ প্রবেশ করে নাই। তাহাদের শ্রুতিমতে তাহারা আদি-মানব (হড়=মানব), এই আদি মানব হইতেই সকল মাবব (হড়রেন) প্রকট হইয়াছে। একজানি (মনোজেনেষ্টিক) মত ভারতে প্রসিদ্ধ। ইয়োরোপ, মিশর, চীন ইত্যাদি দেশেও—একজানি মত প্রচলিত। এইসকল একজানি মত সমাহারে 'বহুজানি' (পলি-জেনেষ্টিক) মতের পরিপোষণ করে। দেশে-দেশে চলিত একজানি মতবাদ, পৃথিবীতে বহুজানি মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। বাইবেলের, আবেস্তার, চীনের ও ভারতের পৃথক পৃথক একজানি মতের সমাহারে পৃথিবীর বহুজানি ভাবের বিকাশ। বহুজানি মতই সমগ্র পৃথিবীর।

"সেদায় সানাম্ এখেন্ দাঃগি তাঁহেকানা। সেরমা থন্, মারাং-বুরু তোড়ে-সুতাম্তে টিল্উ-আং আঁড়গো লেনায়। আর দাঃ-চেতান্রে সোনেগর-মাচি বেল্কাতে এ ভুড়ুপ্ এনায়। উনিআ বারেয়া হড়মো-মাইলাখন্ হাঁস, হাঁসিল্-চ্যাড়ে কিন্ জানাম্ এনা। মারাং-বুরুআ হুকুম্তে ওনা সেনেগর-মাচি, পয়রানি-বাহা দারে এনা। ওনা পয়রানি-বাহা-স্যাকাম্ চেতান্রে, উনকিন্ বারেয়া চ্যাড়ে কিন্ বেলে কেদা। উন্রে ধারৃতী বেনাও-লাগিঃৎ—মারাংবুরু আড়ি আড়ি রাজকায়েমেতাং কোআ। তায়ান্-রাজা, কাটকোম্-রাজা, কাটকোম্-রাজা, ইচাঃ রাজা, গোংহা-রাজা এমান্দ বাংকো দাড়ে আদা-(আং+আ)। মেন্খান্ হড়-রাজা আর কেঁচুয়া-রাজা কিন্ দাক্কে আদা, কেঁচুয়া-রাজা পয়রানি-

বাহা-ডার্ ভিৎরি ভিৎরিতে অল্অকাতে হাসা এ বুরুজ্ রাকাব্ কেদা ; আর্ হড়-রাজা দেয়া চেতান্রে ওনা হাসাকয় আতাং কেদা। নোংকাতে ধার্তি বেনাও এনা। ওনা বারেয়া বেলেখন্—পিল্চু-হাড়াম, আর্-পিল্চু, বুড়্হি,-কিন্ জানাম্ এনা। হুকিন্গি সানাম্ হড়রেন্ আগিল্ এংগা আপা।" (হড় শ্রুতির প্রত্যেক শব্দ-পদাদি ধাতু-মূলীয়)

বাংলা অনুবাদ—সৃষ্টির আগে এসবই জলময় ছিল। স্বর্গ থেকে মারাং-বুরু* (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা), রেশমী দড়িতে বাঁধা সোনার 'মেচে' —(সিংহাসনে, শ্রেষ্ঠ-আসনে) বসিয়া,—যেমন মই বাহনে নামা যায়, সেই রকমে নামিয়া জলের উপরে (পৃষ্ঠে-চেতানরে) অধিষ্ঠান হইলেন বা জলের উপরে সোনার সিংহাসন স্থাপন করিলেন (বেলকাতে—বেল, স্থাপন, দুড়ুপ—বসা, উপবেশন); তাঁহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইতে, দুই টুক্রা মলা (জলে পড়ায়) পড়িল এবং উক্ত মলা দুটিতে হাঁস ও হাঁসিনী জন্মিল। মারাং বুরুর আদেশে ঐ স্বর্ণ-সিংহাসন এক ঝাড় পদ্ম-গাছে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল (হংস-হংসীর স্থানের জন্য); হংস-হংসী (যোগে) দুটি ডিম পাতার উপর পাড়িল। এদের জন্য ভূ-ভাগ (সৃষ্টির কারণে) অনেক অনেক রাজা (জলচর শ্রেষ্ঠ)-দিগকে ডাকিলেন—অর্থাৎ বলিলেন। কুমীর রাজা, কাঁকড়া রাজা, চিংড়ী-রাজা শামুকরাজা প্রভৃতি রাজারা কেহই পারিল না। কিন্তু (মেস্থান্) কাছিম-রাজা এবং কেঁচো-রাজা এরা দুই জনে পারিয়াছিল। কচ্ছপ

* নামান্তর লিটা, চালদীয়—অসিরীয়দের উপাখ্যানে—লিটা দেবীর উল্লেখ আছে, তিনি পর্ব্বতের উপরে স্বর্ণ-সিংহাসনে বসিয়া জল-বিভাগ শাসন করিতেন। বৈদিক বরুণ রাজার অনুরূপ নীতা দেবী (নীত ?) পৌরাণিক দেবতা। মারাং—প্রধান, সকলের শ্রেষ্ঠ, বড়। বুরু (বুর+উ)—স্বর্গবাসী শ্রেষ্ঠ বা বড় গুরু এবং পাহাড়, পর্ব্বতও বুঝায়। মারাংবুরু—পরেশনাথ পাহাড় শ্রেণী। ইহার তাৎপর্য্য অর্থ—সকলের আদি'ও শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য-চন্দ্র অর্থও হয় (হড় ভাষায়)

রাজা দেহের পৃষ্ঠে মাটি (হাসাকয়) ধারণ করিয়াছিল, কেঁচো রাজা পদ্মের মৃণালের ছিদ্র দিয়া মাটি আনিয়াছিল।

(কেঁচো মাটি তুলিয়া কাছিম (হর) পিঠে রাখিয়াছিল), ইহাতে মাটির ডিপি (বুরুজ) হয়; এইরূপে ধরিত্রী সৃষ্ট হইল। ঐ দুটি পাখীর ডিম হইতে, পিলচু-হাড়াম এবং পিলচু বুড়ী জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে এরাই সকল নর-নারীর (এংগা-আপা) সর্ব্বপ্রথম পিতা-মাতা (প্রকট প্রাপ্ত হন)।* ইহারাই নরনারীর আদি মাতা-পিতা।

হংস অর্থে—পুং—"হন-কর্ত্তৃ-অন্" (নুক্) আভিধানিক অর্থ ভেষজ। 'হন-কর্ম্ম স'—হংস, হাঁস। পরব্রহ্ম, নির্লোভ মতি, অজপামন্ত্র; মৎসর ইত্যাদি শব্দের পরবর্ত্তী হইলে—শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী—হংসী।" বিষ্ণুর দেহের মল হইতে যেমন মধু-কৈটভ জন্মিয়াছিলেন, হড়-শ্রুতির হংস-হংসীও তদ্রূপ ডিম (আদিবীজ) রূপে জন্মিয়াছিলেন। মারাং বুরু অর্থে সূর্য্যও বুঝায়, সূর্য্য, বিষ্ণু এক অর্থ। কোন দিক্ হইতে কাহারা কোন অর্থ গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রীয় উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। হংস শব্দে সূর্য্য (শ্বেতচ্ছদ—হাঁস) বিষ্ণু, বৎসর ইত্যাদি অমরকোষ, নানার্থবর্গ ৬৯২।

'বেল' নামক দেবতা (চালদীয়, বাবিলোনীয়)—ভারতেরও—পৃথিবীর বৃক্ষাদি শোভা-সম্পদের দেবতা। বেল অর্থে নির্ম্মাতা। বেল-মডিক বৈদিক দেবতা, তাহার ঋঙমন্ত্রও আছে, তিনি দক্ষিণ আকাশের পিতৃগণের দেবতা। উক্ত মন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাই বৈদিক গ্রন্থের টীকায় পাওয়া যায়। যাহাই হউক তিনি পিতৃগণের দেবতা বিশেষ (বেল-উ-চি-স্থান দ্রষ্টব্য)

* রাঢ় দেশে পৃথিবী-ব্রত নামক একপ্রকার ব্রত নারীরা করেন, ইহাতে পদ্ম-পাতার উপরে কেঁচোর-মাটি রাখা হয়। শূন্য-পুরাণে (ধর্ম্ম পূজা পদ্ধতি) "কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা তিল পরিমাণ—তাল পরিমাণ"—ছড়া গম্ভীরার সৃষ্টি প্রকরণে গীত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত হড়-শ্রুতির ধরিত্রী নির্ম্মাণ ও আদি মাতা-পিতার আবির্ভাবের উপাখ্যান পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বসহ তুলনীয়।

বংশবৃদ্ধি-বিবাহ ও সমাজ প্রতিষ্ঠার হড়-শ্রুতি

পৃথিবী সৃষ্ট হইল, উদ্ভিদ জীবাদি জন্মিল, আদি মাতা পিতা (আদম-ইভার মত) অরণ্যে বাস করিলেন। এ ভূখণ্ডের অধিকারী কেহই ছিল না। ইহা তখন স্রষ্টার আনন্দ-বন নন্দন কাননই ছিল। যথাকালে আদি মাতার গর্ভে সাতটি পুত্র (সপ্তঋষির মত) এবং সাতটি কন্যা জন্মিলেন। ছেলে-মেয়েরা উপযুক্ত হইলে পর, আদি মাতাপিতার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হইত,—ছেলেমেয়েদের বিবাহের কথা লইয়াই ঝগড়া হইত। এদের বিবাহ ত দিতে হইবে—মা কেবল এই কথা তুলিলে, স্বামীর সহিত কলহ হইত।

একদিন হাঁড়িয়া মদ (বারুণী-মদ—ভেতো-মদ) খাইয়া আদি মাতাপিতা ও পুত্রকন্যারা সকলেই মাতাল হইয়াছিল (হড়েরা এই মদ প্রতিদিন পান করে, ইহাই আদি-মদ)। সেই সময়ে ছেলে-মেয়েদের বিবাহের কথা লইয়া পিতা মাতার কলহ উপস্থিত হয়, শেষে পুত্র কন্যাদিগকে দুইজনে ভাগ (হাটিং) করিয়া লয়। পিতার ভাগে সাতটি ছেলে, এবং মা লইলেন সাতটি কন্যা। সেই হইতে পিতার সম্পত্তি ছেলে এবং মাতার সম্পত্তি কন্যারা পায়)। শ্রুতি—যথাঃ—এয়ায় গোটে কুড়ী, এয়ায় গোটে কোড়া। মিদ্ দিন্ দঁ, পিলচু বুড্‌ডী পিলচু হাড়াম, হাঁড়ি জুঁকে কেদাকিন্ বুলি না কিন্ কুক্‌রিও (ঝগড়া) এনাকিন্ গিদরা হাটিংকে কোয়া কিন্ কেড় উনি হাতাও কো পিলচু হাড়াম্ বুড়ী হাতাও কো কুড়ী।”

দৈবগতিকে একদিন, পিতা পুত্রদিগকে লইয়া শিকারে গেলের, মা

তাঁর কন্যাদিগকে লইয়া শাল-পাতা (শাকাম্‌-পাতা) তুলিতে বনে গেলেন। মেয়েরা বনের মধ্যে একটি বৃহৎ বট গাছের তলায় গিয়া, উহার একটা ডালে বসিয়া দোল খাইতে লাগিলেন এবং বির-সেরিং অথবা বাপলো সেরিং গাহিয়া তালে তালে দোলা (হড়মাত্রেই ভালবাসে) চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে লীলো, লীলো, লীলো (বাহবা বাহবা) বলিয়া চিৎকার করিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে ছেলেরা একটা হরিণকে তীরবিদ্ধ করায়, সে দৌড়িয়া পলাইল; কিন্তু তাহার ক্ষতস্থান হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ায়, সেই চিহ্ন দেখিয়া, পিতাসহ ছেলেরা হরিণের গতিপথ ধরিয়া ছুটিল। এদিকে হরিণটা দৌড়াইয়া সেই বটতলায় আসিয়া পড়িয়া গেল এবং মরিল। দেখিতে দেখিতে পিপড়ার সারি আসিয়া হরিণের ক্ষতস্থানে জমিল। এই ব্যাপার দেখিয়া মেয়েরা নূতন গান ধরিল সে গান "বাপ্‌লা সেরিং"*—মিলনের গান।

সাতভাই দূরে থেকেই বহিনদের "বাপলা-সেরিং" শুনিতে পাইয়া, হরিণের সন্ধানে সেই বড়-গাছের তলায় উপস্থিত হইল। এবং সমবেত ভাবে নৃত্য-গীতে যোগদান করিল এবং তালে তালে "ডুংগুর-ডুংগুর"

---

* সেরিং—গীত, গান। বির (বন) সেরিং - বনের গান, খোলা প্রেমের গান—অশ্লীলতা হেতু গ্রামে গান করা চলে না বা বনের গান। গান কয়েক প্রকার যথা—

লাগড়ে সেরিং—যে গান সকল সময়ে গীত হইতে পারে।

বাপ্‌লা সেরিং—বিবাহের গান—এ গান না হইলে বিবাহই হয় না।

তো তোঃৎ সেরিং—ধানের বীজ তুলিবার গান।

রহয় সেরিং—ধান রোপণের সময়ের গান।

হ্যাড়্‌ হ্যাৎ সেরিং—নিড়ানের গান।

কারাম্‌ সেরিং—শরতের গান।

সহরায় সেরিং—কালী পুজার সময়ের গান।

মাং মোড়ে সেরিং ও বাহা সেরিং— বসন্তের গান (বাহা ফুল)

শব্দে নৃত্যসহ তাল দিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ পিতামাতার বিদ্যমানে ভ্রাতা ভগিনীদের এই মিলন নৃত্যগীত অতিশয় মনোহারী হইল।

মিলনের নৃত্যগীতে কানন মুখরিত হইয়াছে, এমন সময়ে পার্শ্বের কেঁদ-বন (বন-গাবের বন—যে গাছের পাতায় তামাকের বিড়ি বাঁধে) প্রান্তের একটি বড়-ঝাঁকড়া কেঁদ তলায় প্রেমের দেবী আহ্লাদিনী চন্দ্রমা (চন্দ্র) পতি সূর্য্যদেব সহ দেখা দিলেন। চন্দ্র দেবীর আহ্বানে সকলে নৃত্যগীত ছাড়িয়া দৌড়াইয়া, কেঁদ-তলায় গেল। মিলনের দেবী প্রেমের দেবী ভাই-ভগিনীদিগকে বলিলেন,—তোরা বয়স অনুসারে ভাই-বোনে দাঁড়া। তাহারা জোড় মিলিয়া দাঁড়াইল। তখন দেবী বলিলেন—তোদের জোড়া মিলাইয়া দিলাম, স্বামি-স্ত্রী ভাবে বাস কর। তখন তাহারা জোড়ে জোড়ে বনান্তরালে গমন করিল, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র-কন্যা দুইটি-যুগলে চন্দ্র-সূর্য্যের সেবা পূজায় নিযুক্ত হইল (যেন ইহারাই চন্দ্র আরাধনার আদি যুগল, চন্দ্রবংশ বা)। এই মিল হয়েছিল 'খাড়েরা' বনে,—পুত্রেবা 'সুড়ুক্' বনে শিকারে গিয়াছিল।

পরমা সুন্দরী শ্বেতবর্ণা (সিনী, সিনীবালী) চন্দ্র দেবী এবং রবি ঠাকুরের (মারাং-বুরু) পূজাদি কেঁদ গাছের তলাতে ছোট ভাই বন দম্পতি যুগলেই করায়, দেবী তাহাকে উপাধি দিলেন—'মানসরেন' (পুরোহিত) এই ধারা বিবাহ, পূজা শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কর্ম্ম করিবার অধিকারী। মানসরেনগণই হাড়েদের দোষগুণ বিচার করিয়া জাতিতে উঠা-নামার নেতৃত্ব করেন। এই পদবী যেন বৈদিকগণের গোত্রতুল্য।

এক ছেলেকে 'সরেন্ সিপাই' (রাজ সেনাপতি) মারাংবুরু দিলেন। মারাংবুরু (সূর্য্য) অতিশয় ক্রোধী। অন্য জনের উপাধি মুরমু (মুরমু— মুর, অসুর-বিশেষ, যোদ্ধা। 'কিসকু-হড়' উপাধি দিয়া তাহাকে রাজা করিলেন (বীর ক্ষত্রিয়)। একজনকে মুরমু ঠাকুর খেতাব দিলেন,

তিনি রাজার রক্ষী বা মন্ত্রী হইলেন। একজন কিষ্‌ঁড়-হড় বা 'মান্‌ভি-কিষড়'—ইনি শস্য-অধিপতি (জমি জমা ভাগ করিয়া দিবার কর্ত্তা)। এইরূপে মারাংবুরু—সকলকে সাতগোত্রে বিভাগ করিয়া দিলেন। কোন কোন শ্রুতিতে দ্বাদশ গোত্র বিভাগের উপাখ্যান আছে।

বিবাহের যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাই হড়েরা মানিয়া চলে। বিবাহের সময় বাপলা-সেরিং না গাহিলে বিবাহই হয় না। (রাজপুত, বাঙ্গালী ও খোট্টাদি জাতিদের মধ্যে বিবাহে গান ও নৃত্য প্রথামধ্যে গণ্য)। প্রত্যেককে একটি ছাগ ও মুরগী দিতে হয়, বর একখানি কুঠার কনে কুলা পাইয়া থাকে।

উপাধি বা গোত্র পাইবার পরে, সিন্দুর দানের ব্যবস্থা, সিন্দুর পাত্রকেই দিতে হয়। দিবসে সিন্দুর দিবার ব্যবস্থা দেবীর। সূর্য্য অস্তগমনের পূর্ব্বেই এ কার্য্য শেষ করিতে হয়। গৃহে গিয়া কনের কপালে সিন্দুর দিবার জন্য কয়েকজন তাড়াতাড়ি চলিল, একটি পাহাড়ে শুষ্ক নদীখাত পার হইয়া, কয়েক জোড়া ওপারে যাইবার পর, নদীতে বান ডাকিল, নদীর কাণায় কাণায় জল ছুটিল, যাহারা নদীপার হইয়াছিল, ঘরে গিয়া তাহারা সিন্দুর দান করিল। যাহারা নদীপার হইতে না পারিয়া খাঁড়েবা বনে রহিল তাহাদের কনেরা সিন্দুর পাইল না। এই প্রকারে দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল।

যাহারা সিন্দুর পরে তাহাদিগকে বলে 'আংগারিয়া টুরু; যাহারা সিন্দুর পরে না তাহারা সাদাটুরু বা বোগামা টুরু। এদের মধ্যে বিধবায় পুনঃ বিবাহ হয়, সেই স্ত্রী সিন্দুর পরে না।

শ্রেণী বিভাগ বা গোত্র বিভাগ থাকিলেও জাতিতে সকলেই হড়। যেমন 'হিন্দু' বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই বুঝায়। হড় মাত্রেই সকল হড়ের অন্ন, জল ভোজন পান করে, ইহাদের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। ভিন্ন গোত্রে বিবাহ হয়।

এই হড় জাতি অসুর জাতি বিশেষ। ইহারা প্রবাসী হিসাবে ভারতের বাহিরে বহুদূরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস হয়। পারস্য উপসাগরের তাইগ্রীস ও ইউফ্রেতীস নদীর মোহনায় 'হড়মাসিয়া' নামে এক দ্বীপ আছে। ইজিয়ান দেশের এক জাতির মধ্যে 'সিমস্থ-হড়'র নামক জাতি ছিল। সিমস্থ-হড় বা সেমস্থ-হড় ইজিয়ান দেশে পূর্ব্ব অধিবাসী (হলের এঃ হিঃ-পত্র ৫৮)।

হড়েদের রাজা বলিতে 'মোড়ল' (মণ্ডল ?) বা প্রধান ব্যক্তি বুঝায়। বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ডুলে-বাগদীদের মধ্যেও সামাজিক শাসন ব্যাপারে রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদি উপাধিওলালা বংশ আছে। পুণ্ড্র বা পুণ্ডরী জাতির মধ্যেও রাজা, মন্ত্রী, বারিক, প্রামাণিক ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট লোক আছে। সামাজিক ব্যাপারে এসব আবশ্যক হয়। তথাকথিত উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সভায় উপস্থিত থাকা চাই, নচেৎ সে বৈঠক সামাজিক বৈঠক বা সভা নামের যোগ্য হয় না, অথবা তদ্দ্বারা সামাজিক শাসনকার্য্যও হয় না। 'সমাজে' তথাকথিত সভ্যগণ থাকা আবশ্যক। উহারাই সমাজের প্রধান উপকরণ।

বৈদিক সমাজের নমুনা

সভ্যতা লইয়াই সমাজ। কিন্তু এই সভ্যতা বলিতে কি বুঝায় ? ভারতের এক সম্প্রদায় বলেন, আর্য্যেরাই সভ্য, তাঁহাদের ধারণা অন্‌-আর্য্যেরা সভ্য নয় বর্ব্বর। এ উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা বলেন,—ভারতই আর্য্যভূমি। বৈদেশিকেরা বলেন (বাইবেল মতে) ভারতের বাহিরে আর্য্য-ভূমি। প্রথমেই 'আর্য্য' লইয়া এই দ্বন্দ্ব-ভাব বিদ্যমান।

ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণাদি গ্রন্থে দেখা যায়, যাজ্ঞিকেরা বৈদিক-আর্য্য। যাহারা যজ্ঞীয় কর্ম্ম-কাণ্ড বিরোধী তাহারাই অনার্য্য।

সুতরাং যাজ্ঞিকেরাই সেকালে সভ্য ছিলেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহারাদিই সভ্যতা।

সভ্য বলিতে কি বুঝায়? যাজ্ঞিক আর্য্যদের বেদে কিন্তু সভ্য এবং সভ্যতা শব্দের ব্যবহার নাই। ঋগ্বেদের দুই স্থানে মাত্র 'সভেয়' শব্দের ব্যবহার আছে। ২।২৪।১০ এবং ১।৯১।২০ ঋকে আছে।

ঋকার্দ্ধ—"উতাশিষ্ঠা অনু শৃণ্বংতি বহ্ন্যঃ
সভেয়ো বিপ্রা ভরতে মতী ধনা। ২।২৪।১৩

সায়ন ভাষ্যে—"সভেয়ঃ সভায়াং সাধু।" দ্বিতীয় ঋক্ (গদ্যে)

"সাদন্য বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ১।৯১।২০

সায়ন—সভেয়ং ঢশ্ছন্দসি। পাণিনি ৪।৪।১০০ ইতি তত্র সাধুরিত্যর্থে ঢ-প্রত্যয়। সভেয় অর্থে সভায়াং সাধুঃ (সকল শাস্ত্রজ্ঞ) ইহাই সায়নের মত। সভ্য শব্দেও সভায়াং সাধুঃ বুঝায়।*

"সভেয়ং পিতৃশ্রবণং"—সায়ন ভাষ্যে,—"পিতৃশ্রবণং। পিতা শ্রূয়তে প্রাখ্যায়তে যেন পুত্রেণ তাদৃশং। পিতার যশোরাশি যে পুত্র দ্বারা সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, এমন যে পুত্র তিনিই সভ্য, এই সভ্যের আচারই সভ্যতা। সমিতি অর্থে (স্ত্রী) যুদ্ধ এবং সভা বুঝাইত (সভ্য, সজ্জন)।

ঋগ্বেদে ৩৪ স্থানে আর্য্য (আর্য?) শব্দের ব্যবহার আছে এবং

* সংস্কৃতে—সভা (স্ত্রী) "সহ-ভা-অধি-ক্বিপ,"—অর্থ পরিষদ্ জনতা। সভাসদ্ (ত্রি) "সভা-সদ-কর্ত্তৃ-ক্বিপ,"—সভ্য। সভ্য (ত্রি) 'সভা-ষ্য' - সামাজিক। দ্যূতকর। সভ্যতা—(স্ত্রী) 'সভ্য-তা'—সামাজিকতা, ভদ্রতা। ভদ্র (ক্লী) "ভন্দ-কর্ত্তৃ-রক্" মঙ্গল, সৌভাগ্য। ত্রি,—সাধু শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলজনক, অনায়াস। ভন্দ-ধাতুর অর্থ, আমোদ, প্রীতি, কল্যাণ। সহ-ধা—শক্তি, সহন। ভা-ধা দীপ্তি দ, সধা—বিবাদ।

একাধিক বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।* যাহাই হউক যাজ্ঞিক না হইলে আর্য্য বলা চলিত না। ধার্ম্মিক অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম পালন করা চাই। তাছাড়া অন্যান্য শীল থাকা আবশ্যক। কিন্তু অনার্য্যদের শীলতা থাকিলেও তাহারা যাজ্ঞিক না থাকায় যাজ্ঞিকেরা তাহাদিগকে নাস্তিক, বর্ব্বর বোধে অনার্য্য বলিয়াছেন। এপ্রকার উক্তি 'একতরফা' সাম্প্রদায়িক। প্রথমে জাতি বিভাগ ছিলনা। যাজ্ঞিকেরাই অ-যাজ্ঞিকদিগকে স্বধর্ম্মী-কর্ম্মী নয় বলিয়া অনার্য্য নাম দিয়াছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই আর্য্য ও অনার্য্য অর্থের প্রভেদ বিশেষ ছিল না। আর্য্যগণ সভ্য এবং অনার্য্যেরা অসভ্য ইহা কেবল বিদ্বেষমূলক ভাব।

আর্য্য শব্দে বুঝায়—(ত্রি) 'আর্য্য-ঋ' (ঋ-কর্ম্মে-ঘ্যণ্) 'আরাৎ পাপ কর্ম্মভ্যো যাতঃ'। মানী, শ্রেষ্ঠ, গুরু, জ্যেষ্ঠ, স্বামী, সজ্জন।

'কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে যঃস আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥

উচিত আচারী। এই সকল গুণ (বিশেষণে) তাঁহাদেরই কথিত, অপর সম্প্রদায়ের নয়। আর্য্য (ত্রি) 'ঋষি-ঋ'-ঋষি প্রণীত। ঋ ধাতুটি বৈদিক, সুতরাং তাঁহারা সুবিধাবাদী হিসাবে ইহার অর্থ করিয়াছেন। পুংলিঙ্গে বিবাহ বিশেষ, সে বিবাহ প্রথায় কন্যাকর্ত্তা বর হইতে গোদ্বয় গ্রহণ করিতেন "আদায়াকস্ত গোযুগম্"। যাজ্ঞিকদের মতে যেটি পাপ-কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা করিতেন না। তখন

*ঋক্—১।১৩০।৮ "যজমানমার্য্যং" এবং ১।১১৭।২১ ঋকে—'জ্যোতিশ্চক্রথুরার্য্যায়' সায়ন—আর্য্যায় বিদুষে। সায়ন ভাষ্যে—বিদ্বান্ ও স্তোতা অর্থই করা হইয়াছে। (আস্তিক, পরোপকারী, যাজ্ঞিক,—হইলেই সভ্য ও সাধু পদবাচ্য হন) সভ্যতা হইতেছে তথাকথিত সভ্যের আচার ব্যবহারাদি। সভ্যগণের সভ্যতা ধর্ম্মের দিক্ দিয়া গণিত হইত,—মনুসংহিতার ২।৬।১৩টি শীলযুক্ততাই ধর্ম্ম। মহর্ষি হারিত উক্ত ত্রয়োদশ শীলের উল্লেখ করিয়াছেন (দেবপিতৃভক্ততা বিশেষ লক্ষণ)।

যজ্ঞে বহু গো এবং পশু হত্যা করা হইত। যাজ্ঞিকদের মধ্যে 'সমিতা'রা পশু হত্যা করিতেন, বিশেষ প্রকরণে কুশ-রজ্জুদ্বারা পশুকে শ্বাস রোধ করিয়া হত্যা করিতেন। চামড়া তুলিয়া, মাংস প্রস্তুত পূর্ব্বক তাঁহারা রন্ধন করিতেন। শ্বাস রোধে পশুবধ তখন সদাচার ছিল।

"* * মনবে শাসদব্রতান্ ত্বচং কৃষ্ণামরবন্ধয়ং।" ঋক্ ১।১৩০।৮ সায়ন ভাষ্যে—* *"অয়মিন্দ্রো মনবে মনুষ্যায় (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) মনুষ্যাণামর্থায়াব্রতায়ন্ ব্রতমিতি কর্ম্মনামতদ্রহিতান্ যাগবিদ্বেষিণঃ শাসং শিক্ষিতবান্ হিংসিতবান্ (শাসেলেঁট্যডাগমঃ) তথা কৃষ্ণাং ত্বচং কৃষ্ণনাম্নোঽসুরস্য কৃষ্ণবর্ণাং ত্বচমুৎকৃত্যারন্ধয়ং হিংসিতবান্ (রধ হিংসায়াম্)।"

বৈদিক ধর্ম্ম বা যজ্ঞবিরোধীদের জীবিত অবস্থায় চর্ম্ম উত্তোলন পূর্ব্বক হত্যা করা হইত। অন্যত্র দেখা যায় যজ্ঞ বিরোধীদের অপরাধে, তৃণরজ্জুদ্বারা বৃক্ষে বন্ধন করিয়া তৃণরাশিদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া, জীবিত অবস্থায় পোড়াইয়া মারা হইত। এই ব্যাপার (ঘোরতর হিংসামূলক) দেখিবার জন্য যাজ্ঞিকদের আবালবৃদ্ধ বনিতারা সমবেত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইহাও কি সদাচার মধ্যে গণ্য হইত?* যাজ্ঞিকদের তথাকথিত সদাচার হিংসামূলক ব্যাপার। ইহাই যদি সদাচার এবং সভ্যতা হয়, তাহা হইলে কদাচার ও বর্ব্বরতার অর্থ কি

*বৈদিককালের অপরাধের বিচার ও শাস্তি ব্যাপারে হস্তপদাদি অঙ্গচ্ছেদন করা হইত। নারীদেরও নাক-কাণ কাটিয়া দেওয়া হইত। এ সকল বৈদিক ব্যবস্থা তথাকালে বৈদিক-গণের সদাচার এবং সভ্যতার অন্তর্গতই ছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিলে শূদ্র বা দাসগণের স্ত্রীকে লইয়া পতিপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইহাতে যাহার স্ত্রী তাহার কিছুই বলিবার ছিলনা। ইহা বৈদিক সদাচার এবং সভ্যতা। পক্ষান্তরে দেখা যায় বৈদিকের স্ত্রী শূদ্রেও গ্রহণ করিত, একর্ম্মে বিশেষ শাস্তি হইত। সেই বৈদিক নারীর গর্ভের সন্তানেরা চণ্ডালাদি জাতি মধ্যে গণ্য হইত। লিঙ্গছেদন বা জীবিত দগ্ধ করা হইত।

হইবে? অতএব সভ্য সদাচরী যাজ্ঞিকগণের সদাচার তাঁহাদেরই কল্পিত ব্যবহার। প্রকৃত আচার বলিতে তাঁহাদেরই আচরণ (সৎ অসৎ বিচার ছিল না) যাহাই হউক, তাহাই সদাচার বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তথাকথিত সদাচার সর্ব্ববাদিসম্মত সদাচার নহে। বৈদিক সদাচার প্রকৃত সদাচার না হইলেও, তাঁহাদের মতে ঐসবই ছিল সদাচার। এবং পিতৃ যশ কীর্ত্তন হেতু পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত হিংসামূলক ব্যাপার সদাচার বলিয়া কীর্ত্তন করিতেই হইত। নচেৎ সভ্য পর্য্যায়ভুক্ত হওয়া চলিত না।

বৈদিকাগুকালে কোন যাজ্ঞিকই লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কারণ তাঁহাদের বর্ণ-মালা ছিল না। প্রথমে ভারতে জাতিভেদ বা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ভেদও ছিল না। পুরাণাদিতে দেখা যায়, দ্রাবিড়রাজন মনু (বৈবস্বত নামান্তর সত্যব্রত, মনুব প্রকৃত নাম কি অজ্ঞাতই রহিয়াছে) ত্রেতায় (খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় তিন হাজার বর্ষ) যজ্ঞের কর্ম্ম-কাণ্ড প্রচার করেন।

তখনও জাতিভেদ ছিলনা। তিনি রাষ্ট্র-কায়স্থ (রাজ্যাঙ্গ-স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্রদুর্গ-সৈন্য এই সপ্ত প্রকৃতি সমেত অষ্ট এবং পুরোহিত লইয়া নব (রঘু ১ম)। গণ লইয়া প্রথমে নবীন কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রবর্ত্তন করেন। রাজন্য অর্থে ক্ষত্রিয় বুঝায়। এই কর্ম্ম-কাণ্ডের প্রবর্ত্তন কালের পরই, যাহারা পৈতৃক ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করে নাই তাহাদিগকেই ব্রাত্য বা অনার্য্য ইত্যাদি মধ্যে গণ্য করা হয়। ভারতের ধর্ম্মভেদের স্রষ্টা মনু মহারাজ। এই ধর্ম্মভেদ লইয়াই একই জাতির মধ্যে দুইটি বিভাগ কল্পিত হয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের ইহাই প্রথম প্রবর্ত্তন।

বৈদিকেরা বলেন, এই প্রাচীন বৈদিক-সভ্যতা একমাত্র ভারতেই বিদ্যমান বা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অন্য কোথাও ছিল না। খৃষ্টীয় প্রথম

অব্দে বা কিছু পূর্ব্বে মনুসংহিতা (সংগ্রহ) সঙ্কলিত হয়, মনু ইহার প্রণেতা নহেন। মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে যে, সমগ্র ভারতে এই বৈদিক সভ্যতা বিদ্যমান ছিল না। যথা—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেব নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতো ॥ ২।১৭

তস্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তবালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ ২।১৮

ইত্যাদি ক্রমে ২।২৪ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বৈদিক-সদাচার তথাকথিত দেশেই প্রবর্ত্তিত ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশই যাজ্ঞিক-সেবিত সদাচার-দেশ।

মহাভারতে সভাপর্ব্বে দাতাকর্ণ যুধিষ্ঠিরের মাতুলের দেশ মদ্র সম্বন্ধে যেসকল সদাচারের উক্তি সভায় দাঁড়াইয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক রাজন্যদের সদাচারের বিশেষ পরিচয় আছে। মদ্ররাজ পরিবারে দাস, দাসী, রাজা, রাণী, পুত্র বধূ, জামাতা ও কন্যা এবং আত্মীয়গণ একত্রে হাঁড়িয়ামদ (বারুণী ?) মাংসাদি পান-ভোজন করিয়া মাতলামি করিত। ইহাও এক প্রকার বৈদিক সদাচার এবং সভ্যতা ছিল।

মহাভারতে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ ব্যাপারে, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত বৈদিক নর নারী বালক বৃদ্ধ যুবারা আগমন করিতেন। তথায় ভেতোমদ (হাঁড়িয়া) আসব (বিবিধ প্রকার তাড়ি), মৌয়ার মদ এবং প্রচুর মাংস, মাংসের পুরদেওয়া শিংএরা (শৃঙ্গাটক), সরুচাকলী (সরুলী), শিক-কাবাব (শূল বিদ্ধ মাংস), মুগের মেঠাই এবং ভাত-তরকারী পানাহার করিতেন। শেষে অতিরিক্ত মদ-তাড়ি খাইয়া, যজ্ঞভূমিতে মাতাল হইয়া, কেহ উলঙ্গ কেহ অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় এদিকে

ওদিকে পড়িয়া থাকিতেন। এ প্রকারের একাধিক উদাহরণ বেদব্যাস রচিত বলিয়া কথিত পুরাণেই পাওয়া যায়। যাজ্ঞিকদের বর্ণনায় তথাকথিত ব্যাপার-সদাচার এবং সভ্যতার আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় কি? বর্ত্তমানকালে সামতাল, বাউড়ী, মুচী ইত্যাদি জাতিরা হাঁড়িয়া খাইয়া, সেকালের বৈদিকদের মতই মাতলামি করে এবং উলঙ্গ প্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং বমিও করে। বৈদিকগণের সদাচার ও সভ্যতা শিক্ষিতগণের মধ্যে ছিল, অধিকাংশ বৈদিক ছিলেন অশিক্ষিত। মহাভারতে এমনও উপাখ্যান আছে, যোগশিক্ষা দ্বারা বিদ্যালাভ করিবার চেষ্টাও হইত। স্পষ্টই উক্ত আছে শিক্ষা (বিদ্যা) যত্ন ও চেষ্টাসাপেক্ষ। যোগ সাধনা নিরক্ষর ব্যক্তিও করিতে পারে। রামায়ণে শম্বুক নামক শূদ্র যোগী হইয়াছিল। রামচন্দ্রের হাতের খাঁড়া দিয়া বসিষ্ঠ ঋষি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বৈদিকগণ তখন চারিবর্ণের বিভাগ করেন নাই। একই গৃহের গৃহস্থদের মধ্যে কেহ কৃষিকর্ম্মী, কেহ যাজ্ঞিক, কেহ চিকিৎসক হইতেন কেহবা গরু চরাইতেন। মুনিঋষিরা স্বয়ং শিষ্যগণ লইয়া হলচালনা, জমির আলি-বাঁধা ইত্যাদি করিতেন। কেহ বা যজ্ঞে হত পশুর চর্ম্ম দ্বারা বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিতেন। কেহ কেহ ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেন এবং বাণিজ্যও করিতেন। বসিষ্ঠ ঋষি একজন বিশিষ্ট ঋত্বিক এবং তাঁহার সামুদ্রিক পোত ছিল, সমুদ্র পথে বণিক (বৈশ্য) বৃত্তি করিতেন। অনেকেই চামড়ার দড়ি পাকাইতেন।* বৈদিকগণ

* ঋগবেদে বা অন্যত্র এমন বিবরণও আছে—রাজপুত্রেরা দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন রাজকার্য্য করিতেন অন্য ভাই যাজ্ঞিক রূপে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন অর্থাৎ বৈদিক ঋষি ছিলেন। বিদূষী নারীরাও ঋঙ্-মন্ত্রের দ্রষ্টারূপে মন্ত্র রচনা করিতেন। তখন স্ত্রীলোকের বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডে যোগদান দোষাবহ হয় নাই।

বলিয়াছেন পণি নামক বণিকেরা (যাহারা সামুদ্রিক বাণিজ্যে শ্রীলাভ করিত, উচ্চসুদে ঋণ দিত, বহু গোপালন করিত এবং ঘৃত, দুগ্ধ, দধি বিক্রয় করিত) বৈদিকগণের গরু চুরি করিত। ইহার বিপরীত উক্তিও বেদে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞার্থে পশুর জন্য প্রায়ই পণিদের সুরক্ষিত পালের গরু বলাৎকারে আনিতেন। ঋগবেদে রাজা অশ্বমাতি (১০।৬০।৬) এবং দভীতির (২।১৫।৪-৯। এবং ৬।২০।১৩) সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। যজ্ঞার্থে ঋষিরাও পণিদের গরু হরণ করিতেন, সঙ্গে বহু যাজ্ঞিক যোদ্ধাও থাকিতেন। দেখা যায় (ঋক্ ১০।১০২।২) কেবল ঋষিরাই যাইতেন তাহা নয় ঋষি-পত্নীরাও যাইতেন, মুদ্গল ঋষির স্ত্রী ইন্দ্রসেনার বীরত্বকাহিনী ঋগ্‌বেদে খ্যাত আছে। সহস্র নামক জনৈক ধনাঢ্য পণির গোধন হরণ করিতে গিয়া, যথারীতি যুদ্ধের পর ইন্দ্রসেনা গাভীসকল লইয়া শত্রুদের মধ্য দিয়াই রথে চড়িয়া দ্রুত রথ চালাইবার সময় তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বায়ুবেগে উড়িয়াছিল। যজ্ঞার্থে পরধন অপহরণে ঋষিদের কোন বাধাই ছিল না। তাঁহারাই ছিলেন নীতিশিক্ষক এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তখনকার ইহাই ছিল সদাচার ও সভ্যতা।

তখনকার কালে রাজারা যে যজ্ঞ করিতেন, উহার ব্যয় নিজেরাই বহন করিতেন। যাজ্ঞিক ঋষিরা মধ্যে মধ্যে যজ্ঞ করিতেন, কোন কোন যজ্ঞ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিত। এইরূপ যজ্ঞ 'বারোয়ারি' হিসাবেই হইত। যজ্ঞীয় উপাদান রাজা-প্রজা সকলেরই নিকটে চাঁদা আদায়ের মত করিয়া লওয়া হইত, যজ্ঞ সমাধা হইবার পূর্ব্বেই যদি উপকরণের অভাব হইত তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যজমানের আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য অযাজ্ঞিক বহু পশু এবং ধনশালী বৈশ্য বা শূদ্রের নিকট চাহিয়া না পাইলে, যাজ্ঞিকেরা দল বাঁধিয়া আবশ্যক মত পশু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতেন। তখন ঐ সকল বৈশ্যাদির

সম্পদ্ অসুরস্ব* বলিয়া লুণ্ঠন করা হইত। এবং বৈদিক রাজাও এপ্রকার পরধন হরণে কোন বাধা দিতেন না †।

মহাভারতের একটি উপাখ্যান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ দুর্য্যোধন বোধ হয় যজ্ঞার্থে গো-দান করিতে করিতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। জনৈক যাজ্ঞিক তাঁহার নিকট যজ্ঞার্থে গোসকল প্রার্থনা করিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক গোপালদিগকে মৃত গরু দিবার আদেশ করেন। যাজ্ঞিকপ্রবর এই কারণে দুর্য্যোধনের মৃত্যু কামনায় মারণ অভিচার করিয়াছিলেন।

যজ্ঞে দীর্ঘকাল ধরিয়া নর-নারীর একত্রে মদ্য-মাংস পান-ভোজনে এবং মত্ততায় সমাজে দোষ প্রবেশ করে অবগত হইয়া সম্রাট অশোক পশুবধ ও মদ্যপান প্রথা রহিত করণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ উৎসব করিতে নিষেধ করেন নাই, কেবল যজ্ঞস্থানে পশুবধ এবং মদ্য-মাংস পানভোজন নিষেধ করিয়াছিলেন।

বৈদিক সমাজে (?) খ্যাত আছে বুদ্ধদেব যজ্ঞ নিন্দা করিয়াছিলেন। ভাগবতে যজ্ঞ (কর্ম্ম-কাণ্ড) নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধদেবের নামগন্ধও নাই। মহাভারতীয় কালে চারুবাক্ (চার্ব্বাক) নামক বিদ্বান ও নৈয়ায়িক আর্য্য ঋষিরা, যাজ্ঞিকগণের কর্ম্মকাণ্ডের

* মহাভারতে—দুর্য্যোধন সৈন্যসামন্তসহ বিরাট রাজার গোধন হরণ করিতে গিয়াছিলেন।

† কিন্তু ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন ।১১।১৮।

১ অযজ্বনোস্তু যদ্বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে ॥১১।২০।

২ ন তস্মিন্ ধারয়েদ্দণ্ডং ধার্ম্মিকং পৃথিবীপতিঃ।
ক্ষত্রিয়স্য হি বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা ॥১১।২১।
সেই প্রকার প্রজারক্ষক রাজাকে বৈদিক শাস্ত্রে ধার্ম্মিক বলা হইত। বৈদিক সদাচার ও সভ্যতার ইহাই হইল আদর্শ। এই প্রকার ব্যবহারে যশ ও ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত।

উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, শাস্ত্রে আছে দুর্য্যোধনের চার্ব্বাক্ রাক্ষস (পণি) নামে এক প্রিয় সখা ছিলেন। চার্ব্বাক কাহার নাম নহে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ঘোরতর বিরোধী নৈয়ায়িক সঙ্ঘ বিশেষ।

আরও তথাকালে বৈদিক সামাজিকদের মধ্যে একদল বিদ্বান ও চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ঋষি ছিলেন, যাঁহারা উপনিষৎ নামক শাস্ত্রে, কর্ম্মকাণ্ডের বিষময় ফল দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই নিন্দা করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের সভাপতিত্বে যে ব্রহ্মধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আচরণকারীদের বিরাট সভা হয়, তাহাতে ব্রহ্ম-উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্ম-উপাসনামূলক উপনিষৎ শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত হয়। মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মুণ্ডক ২য় খণ্ডের ৭ম মুণ্ডকে আছে—

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরংযেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দতিমূঢ়া জরামৃত্যুংতে পুনরেবাপি যান্তি ॥৭॥"*

ক্রমেই কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী মতবাদীর দল বৃদ্ধি হইতেছিল। বৈদিক-সমাজ বলিতে কোন একটি সমাজ ছিল না। মূলে বৈদিক বলিতে এক যাজ্ঞিক কর্ম্মকাণ্ড আচরণকারিগণকেই বুঝায়। এই কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আবার একাধিক বিভাগ ছিল। ব্রহ্ম উপাসক বৈদিক এবং যাজ্ঞিক বৈদিক এক নয়। দুই সমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পৃথক। চারুবাক্ (চার্ব্বাক ?) এবং সাংখ্যযোগী (পঞ্চশিখ-সম্প্রদায়) একই বৈদিক সমাজের পৃথক শাখা। এক বৈদিক সামাজিকগণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার উন্মেষে পৃথক পৃথক সমাজের উদ্ভব হয়। সুতরাং বৈদিক বলিতে একটি কিছু বুঝায় না।

---

* (শঙ্কর-কৃপা নামক টীকা) "এই অষ্টাদশ অর্থাৎ ষোড়শ পুরোহিত, যজমান ও তৎপত্নী এই অষ্টাদশাশ্রয় যজ্ঞরূপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শাস্ত্র কর্ত্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই সমস্ত অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় মনে করিয়া প্রশংসা করে তাহারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অষ্টমটিও পাঠ করিলে দেখা যাইবে—যেমন "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮॥" এই কর্ম্মকাণ্ডও তদ্রূপ।

'আর্য্য' উপাধিটি বৈদিকগণ নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে যাজ্ঞিক আর্য্যসংখ্যা নগণ্যই ছিল। লোক-সংগ্রহের জন্য, সঙ্ঘ-শক্তি বৃদ্ধির জন্য, তাঁহারা বাধ্য হইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মী বিভিন্ন সমাজের লোক-দিগকে 'ব্রাত্য-স্তোম' নামক সংস্কার দ্বারা আর্য্য-সমাজভুক্ত করিয়া লইতেন।

আর্য্য-সমাজ একাধিক জাতির সমাহার

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণব-সমাজ যেমন বিভিন্ন জাতীয় সঙ্ঘমাত্র এবং 'ভেক' নামক সংস্কার দ্বারা, বিভিন্ন ধর্ম্মী একাধিক জাতির একধর্ম্মে দীক্ষা দ্বারা একধর্ম্মী করিয়া এক ভেকধারী বৈষ্ণব-সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন আর্য্য-সমাজেও হইয়াছিল। আর্য্যগণ বিভিন্ন জাতির সঙ্ঘমাত্র এক যাজ্ঞিক ধর্ম্ম-আচারণকারী। বিভিন্ন জাতির এক-ধর্ম্মে অবস্থান বুঝায়। 'ভেক' ধারণের মতই বৈদিক-আর্য্যেরা "ব্রাত্য-স্তোম"* নামক সংস্কার দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় পৃথক পৃথক ধর্ম্মের লোকদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইতেন।

---

* ব্রাত (পু) "বৃ-কর্ম্মে-অতচ"-অর্থ সমূহ। দল-(মাঘ)। পু-'ব্রত-ষ্ণ'-শ্রমজীবী। ক্লী—'ব্রাত-ষ্ণ' মজুরি। শ্রম। ব্রাত্য (ত্রি) 'ব্রত-ষ্ণ' অর্থ সংস্কারহীন। সাবিত্রী-ভ্রষ্ট-(মনু)। সাবিত্রী (মন্ত্র ?) ত্যাগীরাই ব্রাত্য। অতএব সংস্কারহীন (বৈদিক) জনগণকে সাবিত্রী দান করাই ব্রাত্য স্তোম। বৈদিক আর্য্যেরা সাবিত্রী ত্যাগী হইলে, বৈদিকমতে ব্রাত্য হয়। বৈদিকেরা অন্য ধর্ম্মী অন্য জাতিবিশেষকে সাবিত্রী দিলেই আর্য্য বৈদিক হন। স্তোম (ই) 'স্তোম—কর্ম্ম—অল্' রাশি, সমূহ, 'যজ্ঞ,' ভাবে স্তবা ক্লী ধন। মস্তক, শস্য। ত্রি—বক্র, নত। স্তোম ধাতুর অর্থ শ্লাঘন্।

সমূহ জনগণকে যজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা আর্য্যত্বে স্থান দান বুঝায়। আসুরীয়, চালদীয়, বাবিলোনীয় পৌরাণিক বিবরণে পাওয়া যায়। অসুর রাজ্যের দেবালয়ে অবিথনেরা পূজারীর কর্ম্ম করিত। বিশেষ কারণে রাজা স্বয়ং পুরোহিত হন এবং পূর্ব্ব পূজারীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। তাহারা কতক ভারতে আসিয়া খুব সম্ভব বৈদিকগণ কর্ত্তৃক ব্রাত্যস্তোম সংস্কারে আর্য্য বৈদিক দলভুক্ত হয়। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল, তাঁহারাই সম্ভবত শ্বেতকায় আর্য্য। আদি আর্য্য ভারতীয়।

ব্রাত্যস্তোম দ্বারা আর্য্য-বৈদিকগণ স্ব-সমাজের লোকবল বৃদ্ধির জন্য একাধিক পণি-নামক অবৈদিকদিগকে বলাৎকারে বৈদিক-সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। যখন ভারতে রীতিমত জাতি নির্দ্দেশিত হয় নাই (পূর্ব্বে একজাতিই ছিল) তখন পণি নামক বণিক-সম্প্রদায়, সমুদ্রপথে দেশবিদেশে বাণিজ্য করিত। তাহারা প্রধান নেতাদের অধীনে উত্তর ও পূর্ব্ব-ভারতে বাস করিত। ঋক্‌বেদে কতিপয় পণি-নায়কের নাম পাওয়া যায়। বৃসয়, তুগ্র, পিপ্রু, বিতস্থ, দসোনি, ইরহ, শরৎ, নববাস্তব, ধুনি, চুমুরি, প্রমগন্ধ, ব্রিবু। এইসকল নেতাদের মধ্যে বৃসয় সরস্বতী তীরে, ব্রিবু গঙ্গাতীরে, এবং প্রমগন্ধ কীকটে বাস করিতেন। ইহারা সকলেই ধনী এবং ইহাদের রাজ্যও ছিল।

যজ্ঞার্থে গো এবং অর্থাদি ব্যাপার লইয়া পণিদের সহিত যাজ্ঞিকদের প্রায়ই বিবাদ হইত। ইহাদের ধনসম্পদ্ রক্ষার্থে প্রচুর সৈন্য থাকিত।* সরস্বতী তীরে বৃসর সহ যাজ্ঞিকদের যুদ্ধ হয়। (যজ্ঞ-আহব, যুদ্ধও বুঝায়), যাজ্ঞিক যোদ্ধারাই যজ্ঞের রক্ষক।† অগস্ত্য (১।১৮২।৩,৫ ১৮৪।৪ ঋক্) গৃৎসমদ্ (২।২৪।৬), বসিষ্ঠ (৭।৬।৩।১৯-৯), বিশ্বামিত্র (৩।৫৮,২৫৩,১০) প্রভৃতি কুড়ি বাইশ জন ঋষি পণিগণের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইহাদের সকলেরই বহু শিষ্য (যোদ্ধা-বিশেষ) ছিল, বিশ্বামিত্রের ত প্রবল 'সুমহাবল ব্রাহ্মণ পরিষদ্' নামে যৌধের দলই ছিল। এক এক বৈদিক ঋষি প্রকৃতপক্ষে এক এক জন সেনাপতি বিশেষই ছিলেন। প্রায়ই বিরুদ্ধবাদীদের সহিত এবং গো-ধনাদি যজ্ঞার্থে সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। পণিদের পক্ষেও একাধিক ঋষি ছিলেন, কেতু, আগ্নেয় (ঋ—১০।১৫৬।৩) সংযু, ব্রার্হস্পত্য (৬।৪৪) ইহাদের নাম ঋগবেদে পাওয়া যায়।

* ভাগবতে দেখা যায় নন্দের গোষ্ঠে খড়্গধারী রক্ষীরা অবস্থান করিত।

† হ্বে ধাতুজ—আহব যুদ্ধ (স্পর্দ্ধা, আহ্বান)। হু ধাতুজ—আহব, যজ্ঞ (ধাতুঅর্থে-হোম, ভক্ষণদা, ন ও প্রীণন)

কেতু ঋষি পণিদের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অগ্নির (যজ্ঞের) নিকট প্রার্থনা করিতেন। পণি ব্রিবু—যাজ্ঞিকগণের সাহায্য করিতেন এবং পরে তিনি* স্বয়ং যাজ্ঞিক হইয়া পড়েন। ঋগবেদে সংযু বার্হস্পত্য ঋষি তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন।

"গঙ্গাতীরবাসী ব্রিবু, সকল পণির শ্রেষ্ঠ সংযু, বার্হস্পত্য স্বয়ং সংযুর নিকট গো প্রার্থনা করিবামাত্র এক হাজার গো তৎক্ষণাৎ দান পাইয়াছিলেন। মনুসংহিতায় (১০।১০৭) ব্রিবুর সুখ্যাতি আছে। এই ব্রিবু উক্ত বার্হস্পত্য ঋষির নিকট ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সংস্কৃত না হইলে ঋষিরা তাঁহাকে যজ্ঞ করাইতেন না। বার্হস্পত্য তাঁহার পুরোহিত থাকাই সম্ভব। কালে বৈদিক সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন একাধিক পণি। পণিনেতা যখন যাজ্ঞিক হইলেন তখন তাঁহার অনুগত জনগণও ব্রাত্য-স্তোমদ্বারা আর্য্য-যাজ্ঞিক সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একাধিক জাতীয় প্রধানেরা সদলবলে আর্য্য-যাজ্ঞিক হন। অতএব আর্য্য একটি সম্মিলিত মিশ্র জাতি, কিন্তু ধর্ম্মযাজ্ঞিক। আর্য্য-যাজ্ঞিক সমাজ মিশ্র জাতীয় সঙ্ঘ বিশেষ। ঠিক এই প্রথাটি বৈষ্ণব (ভেকাশ্রয়ী) সমাজের পক্ষেও খাটে। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ† এই প্রকার একাধিক জাতির সমষ্টি। দেখা যায় অনেক যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল ভাব-শুদ্ধির দ্বারাই বৈদিকেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোক এই ভাব-শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞে পশু বধ এবং মদ্য-মাংস পানাহার নিষেধ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবও কোন কোন বৈদিককে জীব হিংসায় বিরত করিয়া নিরামিষ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। বৈদিক-যাজ্ঞিকেরা হিংসামূলক যজ্ঞ করিতেন। ভাগবতে এই হিংসামূলক যজ্ঞের বিরোধী উক্তিই পাওয়া

* এইরূপ ব্যাপার বাইবেলে মোজেসের ছিল।

† সঙ্ঘ শব্দটি বৌদ্ধগণের প্রিয়।

যায়। উপনিষৎ বিশেষে এই কর্ম্ম-কাণ্ডের নিন্দাই করা হইয়াছে, এবং যাজ্ঞিকদিগকে 'মূঢ়' বলা হইয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্ম-অন্ধ—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥

(মুণ্ডক, ১ম। ২য় খণ্ড)

বৈদিক শাস্ত্রে যাজ্ঞিকদিগকে অন্ধ, মূঢ় ইত্যাদি বলা অধিক ক্ষমতার কর্ম্ম। তখন ব্রহ্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল।* যাজ্ঞিক প্রতাপ হ্রাস হইয়াছিল।†

বৈদিকগণ ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সঙ্ঘ-বল বৃদ্ধি করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নত হইয়াছিলেন। পারে প্রাচীন নীতি ত্যাগ করিয়া কেবল বিভাগ দ্বারা নিজেরাও হতবল হইলেন এবং জাতীয় একতার বিলোপ সাধন করিয়া দেশবাসীরও পতনের হেতু হইলেন। "বার রাজপুতের তের হাঁড়ী"—দুৎমার্গ প্রবেশ করাইয়া, 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইয়া দ্রুত মৃত্যুর পথেই ধাবিত হইতেছে। বহুজাতি এক ধর্ম্মী কর্ম্মী হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে জাতীয় উন্নতির আশা নাই। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বৈদিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা (সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাব কালে) চারিবর্ণের কল্পিত বিভাগ করেন। একজাতি, চার বা ততোঽধিক বিভাগ হয়।

বৈদিক-সমাজ বিভাগ হইতে হইতে ভারতে শতশত বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির সঙ্ঘ বিভাগ হইয়াছে। শত শত ধরণের ব্রাহ্মণ-সমাজ সমগ্র ভারতে বিদ্যমান। পরস্পর পরস্পরের নিন্দা কুৎসায় ব্যস্ত।

* ইহার পরেই বেদ বিরোধী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

† বর্ত্তমানে 'আর্য্য সমাজ' নামে এক সম্প্রদায়, ব্রাত্যস্তোম দ্বারা বিভিন্ন বিজাতীয় জনগণকে বৈদিক (হিন্দু) সমাজভুক্ত করিয়া লইতেছেন। ইহাতে সঙ্ঘশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। সংসারে সঙ্ঘবলেরই বিশেষ আবশ্যক। শক্তিবৃদ্ধি না হইলে মৃতপ্রায় জাতির উদ্ধার নাই।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা বাঙালী ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, এই প্রকার সমাজ বিভাগ হেতু,—জাতীয় শক্তি ক্ষীণতর হইয়াই যাইতেছে। সকলেই ভাবে আমরা শ্রেষ্ঠ, মূলে কে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয় না। বর্ত্তমানে কোন সমাজই একটি নয় বহু সমাজে বিভক্ত। সুতরাং সকল সামাজিকেরাই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ সমাজও শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্যক্তিগত সভ্যতাই সমষ্টিগত সভ্যতা। সভ্য জাতিরও যেমন সমাজ আছে, তদ্রূপ নিম্নশ্রেণীর জনসঙ্ঘেরও সমাজ আছে। বরং তাহাদের সমাজ অনেকটা দৃঢ়। উন্নত জাতির সমাজ ক্রমশ অদৃঢ়ই হইতেছে। বৈদিকগণের জাতিতত্ত্ব কিছু অদ্ভুত ধরণের। বৈদিক-যাজ্ঞিকের দাসী গর্ভজ পুত্র বৈদিক হন, দাস কন্যামৎস্যগন্ধায় ঋষি পরাশরের ঔরসজাত পুত্র ব্রাহ্মণ। রক্তমিশ্রণ দোষাবহ হয় নাই, এই প্রকার রক্ত সংমিশ্রণের একাধিক উদাহরণ, বৈদিক সামাজিকগণের পক্ষে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বৈদিক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জাতিতত্ত্বে মিশ্র শোণিতের অভাব নাই। সুতরাং বৈদিক সামাজিকগণের সমাজকে মিশ্র-জাতীয় সমাজ বলিলে বিশেষ দোষাবহ হয় না।

"নিরমল কুলখানি যতনে রাখিনু আমি
কালাতাহে সাধিলেক বাদ।"*

* রক্ত মিশ্রিত হয় নাই, এমন একটি জাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। পণি, গ্রাক শক, হূণ, পারসিক জাতির মিশ্রণে আর্য্য সমাজ গঠিত। পারসিক আবেস্তাশাস্ত্রে বৈদিক শাস্ত্রের বিরোধী কথাই পাওয়া যায়। ইহা না পাইলে, একা বৈদিকশাস্ত্র হইতে, বৈদিক জাতির স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না। তক্ষশীলার হাটে বৎসরে বৎসরে একাধিকবার য়ুরোপীয় নারী বিক্রয় হইত। বড়লোকেই তাঁহাদিগকে ক্রয় করিতেন, তাঁহাদের গর্ভজ সন্তানেরা পিতৃ জাতি রূপেই গণ্য হইয়া গিয়াছেন। বৈদিক কালেও এই রূপ মিশ্রণের অভাব হয় নাই। ব্রহ্মপুরাণীয় জাতিতত্ত্ব একেবারে আধুনিক এবং অধিকাংশ কল্পিত।

ব্যক্তি ও সমাজ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ (নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগো, আমেরিকা), গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ, সহযোগী, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

(১)

প্রত্যেক সমাজে ব্যক্তির "অধিকার" সম্বন্ধে লোকের ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। "অধিকার" সম্বন্ধে আধুনিক ভাবের স্ফুরণ হইতে আধুনিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ-হিত অনুষ্ঠান উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের সমাজ-হিত-সাধনের মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে আধুনিক মতাবলী জানা আবশ্যক। আমরা এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অধিকার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির নূতন ধারণার পরিচয় লাভ করিতে যাইয়া দেখা যায় যে, এই নব জাগরণের পশ্চাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান: ইংল্যণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূম্যধিকার লইয়া বিবাদ; ইয়োরোপের প্রধান জাতিগুলির মধ্যে কলকারখানার সৃষ্টি; বিগত দেড়শত বৎসর-ব্যাপী রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও সাধারণতন্ত্রের আন্দোলন; ভাবের আদান প্রদানের জন্য নূতন নূতন উপায় অবলম্বন; গমনাগমনের সুবিধার সৃষ্টি; নূতন দেশে বসতিস্থাপন; সাম্যবাদের প্রচার; ধন-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি; শ্রমিক সঙ্ঘের উৎপত্তি ও শক্তিসঞ্চয়; জনহিতসাধন-কল্পে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি, ইত্যাদি। এই ঘটনা-

গুলিতে অনেক উৎকট ভাব, চিন্তা ও কল্পনার, উদ্দাম কার্য্যকারিতার, যুক্তির ও অযৌক্তিকতার, বীরত্বের ও ভীরুতার, এবং সহযোগের ও বিবাদের নিদর্শন পরিস্ফুট আছে বটে, কিন্তু সমাজ-সংস্কার ও সমাজ হিতসাধন সম্বন্ধে ঐসকল ঘটনার ভিতর দিয়া একটি প্রচ্ছন্ন নূতন তত্ত্বের আভাষ সর্ব্বদা পাওয়া যায়। মানুষের "অধিকার" সম্বন্ধীয় ভাবকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ-সংস্কার ও সংগঠনের ঐ নূতন তত্ত্ব বিকাশলাভ করিতেছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচারিত হয়। এডমাণ্ড বার্ক এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করায় টমাস পেইন্ ফরাসী ঘোষণার সমর্থন করিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্বে টমাস্ জেফারসন্ মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ভাব উপনিবেশগুলিতে প্রচার করিতেছিলেন; এর চরম পরিণতি হইয়াছিল উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা ঘোষণায়। এইরূপ ঘোষণা ও প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য দেশবাসীর মনে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে নূতন ভাবের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ উক্ত ভাবের বিকাশ হইতে থাকে। আধুনিক সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও সমাজ-হিত-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের অধিকার সম্বন্ধীয় নূতন ভাবের জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করা চলে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন দ্বারা অধিকারের নূতন ব্যাখ্যা ও পুনর্ব্যাখ্যা চলিতেছে। আধুনিক সমাজ-হিত-প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের অধিকার-সম্বন্ধীয় প্রাচীন মতের উচ্ছেদ-সাধন করিয়া নূতন অর্থ ও ভাব প্রচার করিতেছে; ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্ত্তে সামাজিক স্বার্থের আদর্শ গ্রহণ করিতেছে। সামাজিক আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, উহা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে। কখন বা দাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন-যুদ্ধে, কখন বা সাম্যতন্ত্রের প্রচারে, কখন বণিক-শ্রমিকের কলহে, কখন বা সোহ্বিয়েট

প্রজাতন্ত্র স্থাপনে, কখন হয়ত ব্যবস্থাপক সভায় শ্রমিকের দৈনিক কার্য্যকাল নিরূপণে উহা ব্যক্ত হইতেছে। আবার প্রতীচ্যের বাহিরে কোথাও বা সামাজিক আন্দোলনের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের চেষ্টায়, অসবর্ণ বিবাহের আইনে, বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আগ্রহে, বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির একীকরণ প্রচেষ্টায়, স্বরাজলাভের উৎসাহে, উপকূল সংরক্ষণ প্রস্তাবনায়, বৈদেশিক মূলধনের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা স্থিরীকরণের যুক্তি অবলম্বনে, সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের কল্পনায় এবং বহুবিধ পাশ্চাত্য ভাব ও আদর্শ গ্রহণে। যে-ভাবেই সামাজিক আন্দোলন প্রকাশ পাউক না কেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধিকারের সমস্যাটা বর্ত্তমান আছেই। অধিকারের নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা আদর্শের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা পাশ্চাত্য জাতির অভিপ্রায়।

(২)

কিন্তু অধিকার সম্বন্ধে যে চিরদিন মতভেদ ও বিরোধ চলিতেছে ও চলিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজা মনে করেন, ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকারের বলে তিনি রাজত্ব করেন, সুতরাং প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সে বিদ্রোহ নিবারণের অধিকার তাঁহার আছে। প্রজা মনে করেন, রাজার রাজত্ব সম্পূর্ণ প্রজার সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে; রাজা যদি প্রজার সম্মতি না লইয়া কর ধার্য্য করেন, তাহা হইলে রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার অধিকার তাঁহার আছে। শ্রমিক বলেন, জীবন-ধারণের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার তাঁহার আছে। ধনিক বলেন, তাঁহার ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তিনি কাহাকেও দিতে পারেন না। অভিজাত বলেন, তাঁহার বংশগত মর্য্যাদার অধিকার তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সাধারণ বলেন, সমাজে তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে; তাঁহার

অধিকার কাহারও অপেক্ষা কম নহে, ইত্যাদি। চিরকাল অধিকার সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ চলিতেছে। কিন্তু আজ বিভিন্ন মত থাকা সত্ত্বেও সমাজ-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ভিতর দিয়া অধিকারের পরিচয় নূতনভাবে পাওয়া যাইতেছে। এ পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভালরূপে পাওয়া যায় নাই। ফরাসী দার্শনিক তুর্গোৎ মানুষের অভাব ও অধিকারের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সম্বন্ধ যে কি করিয়া আসিল তাহা বিচার করেন নাই। ইনি ভগবানের উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া খালাস পাইয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, ভগবান মানুষকে অভাব দিয়াছেন ও ঐ অভাব মিটাইবার জন্য তাকে শ্রম করিতেই হইবে এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে তিনি কাজ করাটা প্রতি মানুষের অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান অধিকারের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে না। ব্ল্যাকষ্টোন তাঁহার কমেণ্টারিজ্‌এ অধিকার সম্বন্ধে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজ অথবা রাষ্ট্র চুক্তির ফল মাত্র, সুতরাং মানুষ জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ত্তানুযায়ী কতক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। এই স্বাধীনতার কিয়দংশ জনসাধারণের হিতের জন্য সমাজের বা রাষ্ট্রের কাছে অর্পিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ অধিকার আ্যাখ্যা প্রাপ্ত হয়; অথবা অর্পিত জন্মগত স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অপরাপর যেসকল সুবিধা প্রদান করেন, সেগুলিকে অধিকার আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এ ব্যাখ্যা কতক পরিমাণে গ্রহণীয়, সম্পূর্ণরূপে নহে; কেন না সমাজ বা রাষ্ট্র যে চুক্তির ফল তাহা আজ কেহ স্বীকার করেন না। সামাজিক অঙ্গীকারবাদ বা সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট থিওরি আজ একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৩)

আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের লেখকগণ অধিকারের

সঙ্গত ব্যাখ্যা দানে সমর্থ হইয়াছেন। "ফোকওয়েজ" (লোকের ধরণধারণ) নামক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক সামনার বলেন, অধিকার দেশাচার বা লোকাচার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা জীবন-সংগ্রাম ক্রীড়ার নিয়মস্বরূপ। অধিকার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা চিরকাল একরূপ থাকে না। অধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সভ্যতার সৃষ্টি হয় নাই, সভ্যতার ফলে অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ আদিকাল হইতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইতেই প্রকারান্তরে অধিকারের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের জনৈক খ্যাতনামা ইতিহাস-লেখক বলেন, জনসাধারণের সমর্থন হইতে অধিকার উৎপত্তি লাভ করে; ইহা অতীতে যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনই সত্য। এ ব্যাখ্যায় অধিকারের প্রকৃত তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে বুঝা যাইতেছে যে, অধিকার সমাজের দেওয়া জিনিষ; জনসাধারণ যাহা সমর্থন করে না তাহা অধিকারের আমলে আসিতে পারে না।

(৪)

অধিকার সম্বন্ধে একদা হাক্সলি যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই :—

মানুষ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সভ্য সমাজে শিশু যে কাহারও পদতলে দলিত হইয়া মারা যায় না, তার কারণ শিশুর সুকৃতি নহে, শিশুর আত্মীয়দের স্নেহ ও মমতা এবং সমাজের ব্যবস্থিত আইনই শিশুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। শিশু এমন কিছু করিয়া পৃথিবীতে আসে নাই যে, লোকে বাধ্য হইয়া তাহার লালন-পালনের ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সমাজে এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়াই শিশু লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হয়। শিশু বড় হইয়া উপার্জ্জন করে, ধন-সম্পত্তির মালিক হয়; কিন্তু এ বিষয়েও

সমাজের সহায়তা ভিন্ন সে কিছু করিতে পারে না। সমাজ মানুষকে উপার্জ্জন করিবার এবং সম্পত্তির মালিক হইবার অধিকার প্রদান করে বলিয়াই সে স্বীয় অধিকারের গৌরব করিয়া থাকে। সমাজ সমর্থন করিলে বলবান্ দুর্ব্বলের সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে; সমাজের সমর্থন নাই বলিয়াই একের সম্পত্তি অপরে জোর করিয়া হস্তগত করিতে পারে না এবং করিলেও উহাতে অধিকার বর্ত্তে না।

(৫)

তবেই দেখা যাইতেছে, অধিকার জিনিষটা সমাজের সৃষ্টি। সমাজ যাহা সমর্থন করে না তাহা অধিকার পদ-বাচ্য হইতে পারে না। সমাজে বাস করিয়া সমাজের অমতে জোর করিয়া 'অধিকার' লাভ করা চলে না। দুর্ব্বল সমাজে এরূপ অধিকার সম্ভবপর হইলেও সমাজ সবল হইয়া উঠিলেই ইহার অবসান হইতে পারে। সমাজের বিগত ও বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া প্রতিপন্ন ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার বাহিরে কেহ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজের অভিজ্ঞতায় চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; সুতরাং চোর, দস্যু, নরহন্তা প্রভৃতির শাস্তির ব্যবস্থা সমাজ করিয়াছে; সমাজের অননুমোদিত কার্য্যের কর্ত্তা সমাজদ্রোহী আখ্যায় অভিহিত হইয়া নিন্দিত হইতেছে। সুতরাং মানুষ সমাজে বাস করিয়া সমাজের অনুমতিক্রমে যেসব সুবিধা ভোগ করিতে পায়, সেগুলিই মাত্র অধিকার পদ-বাচ্য। সমাজ শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে যাইয়া ভুল করিতে পারে এবং এই ভ্রমের জন্য সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে পারে। তথাপি সমাজের সমর্থিত ভ্রান্ত মতই আইনে কিংবা দেশাচারে বা লোকাচারে পরিণত হইয়া লোকের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। যতদিন ভ্রমের সংশোধন না হয়, ততদিন অধিকারের পরিবর্ত্তন হয় না। আবার ভ্রম সংশোধিত হইলে লোকের অধিকার

সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হয়। সুতরাং যে কোন বিষয়েই হউক, অধিকারকে চিরস্থায়িরূপে গ্রহণ করা চলে না। অধিকার পরিবর্ত্তনশীল। প্রাচীন সমাজে লোকের যেসকল অধিকার ছিল, আজ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ সমাজ-হিত সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস অন্যরূপ হইয়াছে; অনেক নূতন সামাজিক অভাবের ও সমস্যার উৎপত্তি এবং উহাদের পূরণের ও সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অধিকারের পরিবর্জ্জন ও নূতন অধিকারের আগমন ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতেও এরূপ হইবার সম্ভাবনা। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের অধিকারেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সমাজের সমর্থন ব্যতিরেকে উহা হইতে পারে না। মানুষ পরস্পরের সহিত নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে; ইহার ফলে তাহাদের সামাজিক জীবনের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মানুষ যদি সমাজের বাহিরে একাকী বাস করে, তবে তাহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে না, সে যাহা খুসী তাহা অবাধে করিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যখন দশজনে একত্র হইয়া বাস করে, তখন প্রত্যেকের অপর নয় জনের দিকে চাহিয়া সংযম অবলম্বন করিতে হয়; পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলে মিলিয়া যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করে, প্রত্যেককে তাহা মান্য করিয়া চলিতে হয়। যদি কেহ নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে অপর নয় জন মিলিয়া তাহাকে শাসন করিয়া থাকে; নিয়ম-ভঙ্গকারী নয় জনের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইবার সামর্থ্য রাখে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সঙ্ঘের কল্যাণে কতক পরিমাণে খর্ব্ব করিতে হয়; সুতরাং সমাজবাসীর সামাজিক জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে তাহার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। মানুষের সামাজিক জীবন আছে বলিয়া তাহার অধিকার-অনধিকার সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক হয় এবং সমাজই তাহার বিচার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে যুগে যুগে লোকের অধিকার পরিবর্তিত হয়। সমাজই এই পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকে। নূতন অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাইয়া সমাজ প্রাচীন অধিকারের পরিবর্তন বা পরিবর্জ্জন ও নূতন অধিকারের সৃষ্টি সাধন করিতে পারে।

(৬)

বেন্থাম্ মনে করিতেন রাষ্ট্রের অনুমতি ব্যতীত অধিকার উৎপত্তি-লাভ করিতে পারে না। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে। অপরাপর সামাজিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অধিক থাকায় অধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ বিচারের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যাহা খুসী তাহা বিচার না করিয়া অতীত অভিজ্ঞতার এবং সমাজ-প্রদত্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং অধিকারকে সমাজের কর্তৃত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা চলে না। রাষ্ট্র ও সমাজ এক জিনিষ নহে; এক না হইলেও রাষ্ট্রকে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করা যায় না। রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত। সুতরাং যাহা সমাজ দ্বারা সমর্থিত ও সমাজের পক্ষে বিধেয় বলিয়া গণ্য না হয় তাহা অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সমাজের সকল অধিকার এক শ্রেণীর নহে। ইন্দ্রিয়-ভোগের অধিকার বিদ্যালাভের অধিকার হইতে স্বতন্ত্র। সেনা-বিভাগে প্রবেশাধিকার ও ভূম্যধিকার এতদুভয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। এক অধিকার অপর অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সমাজ-হিত বিশ্বাসের সাহায্যে অধিকারের বিচার হয়। হয়ত এক প্রকার অধিকার বর্ত্তমান থাকার ফলে সমাজে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, পক্ষান্তরে অপর এক প্রকার অধিকারের ফলে সমাজ উপকৃত হইতেছে। এ স্থলে শেষোক্ত অধিকার প্রথমোক্ত অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সমাজ-মঙ্গলের আদর্শ সকলের কাছে সমান না-ও হইতে পারে, কাজেই সমাজ-মঙ্গল সম্বন্ধে সকলের বিশ্বাস এক না হওয়ারই কথা। বস্তুতঃ, দেশের ও

সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্নরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। এজন্য অধিকারের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সকলে একমত হয় না। এক সম্প্রদায় যে অধিকারকে সমাজের পক্ষে হিতকর মনে করেন, হয়ত অপর এক সম্প্রদায় সে অধিকারকে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া গণ্য করেন। এক সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-নীতির পক্ষপাতী, অপর এক সম্প্রদায় হয়ত উহার বিরোধী। এক সম্প্রদায় বিশেষ কোন নূতন অধিকার দ্বারা সমাজের ও দেশের উন্নতি হইবে বলিয়া মনে করেন, অপর এক সম্প্রদায় হয়ত ঐরূপ অধিকার দ্বারা সমাজের ও দেশের অপকার সাধিত হইবে ভাবিয়া উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। সমাজ-হিত সম্বন্ধে শ্রমিকের যেরূপ বিশ্বাস ধনিকের সেরূপ নহে; ধনিকের যেরূপ বিশ্বাস হয়ত জনসাধারণের বিশ্বাস সেরূপ নহে। ঈশ্বরবাদী সমাজ-হিত সম্বন্ধে যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করেন, নিরীশ্বর-বাদীর হয়ত সে বিশ্বাসে আস্থা নাই। ফাণ্ডামেণ্টালিষ্ট খৃষ্টানগণ সমাজের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর মনে করেন হয়ত মডার্ণিষ্ট খৃষ্টানগণ তাহা করেন না। ভূম্যধিকারী ও প্রজার বিশ্বাসের সমতা নাই; শাসকের ও শাসিতের বিশ্বাসের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জ্ঞানী ও অজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক, সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসে আস্থাবান, সর্ব্বত্র এরূপ দেখা যায়। সমাজ-মঙ্গল বা দেশোন্নতি সম্বন্ধে বিশ্বাসের সমতা না থাকায় অধিকার লইয়া দলে-দলে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বা জাতিতে-জাতিতে বিরোধ চলিতে পারে। তাই প্রতি সমাজে বা দেশে একদল রক্ষণশীলরূপে এবং অপর দল উন্নতিশীল-রূপে দেখা দিতেছেন। কিন্তু অধিকারের মূলে সমাজ-হিতের বিশ্বাস বর্ত্তমান।

শিক্ষা-দীক্ষা ও নূতন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে মানুষের বিশ্বাস যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়; কাজেই অধিকারও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া

থাকে। আজ সভ্য-জগতের কোন লোক, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি আপন অধিকারকে চিরস্থায়ী সত্যরূপে বা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। মহত্তর আদর্শের ঊর্দ্ধে নীচ আদর্শ বেশী দিন দাঁড়াইতে পারে না। প্রতিপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রবল পক্ষ বহু দিন আপন অধিকার বজায় রাখিতে পারেন; কিন্তু প্রতিপক্ষ যে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিবে তাহা বলা যায় না। জনসাধারণের অধিকার সাম্প্রদায়িক অধিকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোন কারণে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখিতে পারেন, কিন্তু এ অধিকার আজ সভ্যজগতে সমর্থিত ও বিধিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হয় না। আজ সম্পত্তিশালী ব্যক্তি হয়ত ইহা ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন যে, সম্পত্তির উপর তাঁহার অধিকার চিরস্থায়ী নহে। সম্পত্তি যদি দেশ বা সমাজ-মঙ্গলের প্রতিকূল হয়, তবে উহা সমাজকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে।

সমাজে যেসকল অধিকার প্রচলিত আছে, জনসাধারণের হিতের জন্য প্রয়োজন অনুসারে উহাদের রক্ষণ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন কিংবা নূতন অধিকারের সৃষ্টি-সাধন, সমাজ-সংস্কারের ও সমাজ-সংগঠনের অন্যতম কার্য্য। প্রজাস্বত্ব আইন, বিধবা-বিবাহ আইন, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ আইন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন, বিদ্যালয়-স্থাপন, স্বরাজ্যলাভের প্রচেষ্টা, কারখানা আইন, মজুর-সঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কংগ্রেসের অধিবেশন, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ সমিতি, নারীরক্ষা সমিতি, পল্লী-উন্নতি সমিতি প্রভৃতির প্রত্যেকটিই কোন না কোনরূপে ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজ-সম্পর্কীয় অধিকারের ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট। একের অধিকার বৃদ্ধি করিতে যাইয়া যখন অপরের অধিকার খর্ব্ব করা আবশ্যক হয়, তখন উদার ও অনুদার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু উন্নতিশীল

সমাজে এ বিরোধ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যে অধিকার ন্যায়ের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার জয় অবশ্যই হইয়া থাকে। উন্নত সমাজে রক্ষণশীল সম্প্রদায় ক্রমশঃ উদার-নীতির পক্ষপাতী হইয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন, ইহা উন্নতিশীল জাতির উন্নতির ও সজীবতার একটি প্রধান লক্ষণ।

(৭)

সমাজের বিশেষ অবস্থায় সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিতে পারে; পূর্ব্বে হয়ত ঐরূপ আপত্তি উঠিবার কারণ ঘটে নাই। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার আছে কিনা তৎসম্বন্ধে একদিন পাশ্চাত্য জগতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এখন সভ্য জগতে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকার আছে। আজ শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে নূতন প্রশ্নও উঠিয়াছে। একটি প্রশ্ন এই,—যেহেতু শ্রমিকদের সহায়তা ব্যতীত ধনিকগণ ধন-উৎপাদনে সমর্থ নহেন, সুতরাং ধনিকদের ব্যবসার পরিচালনায় শ্রমিকদের হাত থাকিবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে যে একদিন ধনিকগণ শ্রমিকদিগের স্বপক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দুই চারিটি দৃষ্টান্তও মিলিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক কল-কারখানার সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রমিকদের এবম্প্রকার অধিকার-বৃদ্ধির পক্ষে প্রশ্ন উঠিবার আবশ্যকতা দেখা যায় নাই। ভবিষ্যতে শ্রমিকগণের অধিকার-বৃদ্ধির পক্ষে কি প্রশ্ন উঠিবে, তাহা আজ নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; কিন্তু প্রশ্ন যে উঠিবে, ইহা অবধারিত। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, লাম্পট্য ও ব্যাভিচার দ্বারা সমাজ-নীতিকে কলুষিত করিবার অধিকার স্ত্রী বা পুরুষের আছে কি না? উত্তর হইয়াছিল—নাই। ইহার ফলে অনেক স্থানে নূতন আইনের বলে গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করার

চেষ্টা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, মদ্যপান দ্বারা সমাজের দুর্নীতি ও অপরাধের বোঝা ভারি করিবার অধিকার যুক্তরাষ্ট্রবাসীর আছে কিনা? উত্তর হইয়াছিল নাই। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভেলষ্টেড্ অ্যাক্টএর উৎপত্তি ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে আইন প্রচলিত হয়। আজ যুক্তরাষ্ট্রে প্রশ্ন উঠিয়াছে, যে-সকল অধিবাসী সমাজের গলগ্রহস্বরূপ অথবা যাহারা পুরুষানুক্রমে সমাজ-বিগর্হিত কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অভিনয় দ্বারা সমাজে অশান্তির মাত্রা বাড়াইতেছে, তাহাদের বংশবিস্তারের অধিকার আছে কিনা? এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা একমত না হইলেও কোন কোন প্রদেশে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে অপ্রকৃতিস্থ ও স্বভাব-অপরাধীদের বংশ-বিস্তারের বিরুদ্ধে আইন হইয়াছে এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের সন্তান-উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে; যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণ উক্ত ব্যবস্থা সমর্থন করিয়াছেন। আজ সুপ্রজনন-বিদ্যার আলোচনার ফলে পাশ্চাত্য-জগতে বংশবিস্তারের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমাজের নূতন অভিজ্ঞতা লাভের ফলে অধিকার সম্বন্ধে নূতন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়।

(৮)

আজ বংশ বিস্তারের অধিকার সম্বন্ধে জাতিগত প্রশ্নও উঠিতেছে। প্রশ্নটি এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উহার উল্লেখে ক্ষতি নাই। প্রশ্নটি এই,—জগতে সকল জাতির বংশ-বিস্তারের অধিকার আছে কিনা? উত্তর হইতেছে, ধরাতলে যেসকল জাতি নিকৃষ্ট, তাহাদের বংশ-বৃদ্ধির অধিকার থাকা সঙ্গত নহে, কারণ নিকৃষ্ট জাতিরা বংশ-বৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পৃথিবীতে নাকি শ্বেত জাতিই উৎকৃষ্ট; সুতরাং কেবলমাত্র এই জাতিই পৃথিবীতে বাস করিবার

অধিকারী। নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে তবে কি উপায়ে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদূরিত করা যায়? উপায় দুইটি। প্রথম উপায়, শ্বেতজাতির রক্ত-মিশ্রণ দ্বারা নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে ক্রমশঃ শ্বেত জাতিতে পরিণত করা। কিন্তু এ কার্য্য সহজ নহে। অ-শ্বেত নিকৃষ্ট জাতির লোকসংখ্যা এতই অধিক যে উহাদিগকে ক্রমশঃ শ্বেত জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিতে বহু সময় ও যত্ন আবশ্যক হইবে। সুতরাং এ উপায় সমীচীন নহে। দ্বিতীয় উপায়, নিকৃষ্ট জাতির উৎপাদিকা শক্তির বিলোপ-সাধন করা। কিন্তু এ কার্য্যে নিকৃষ্ট জাতি স্বীকৃত হইবে কেন? কৌশলে এ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। নিকৃষ্ট জাতিগুলিকে বুঝাইতে হইবে, যদিও এ জন্মে তাহাদের সন্তান লাভের আশা নাই, কিন্তু মৃত্যুর পর যখন তাহারা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহাদের ও শ্বেত-জাতির মধ্যে পার্থক্য থাকিবে না। এইরূপে, জন্মান্তরবাদের সাহায্য গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে কতক অর্থ প্রদান দ্বারা নিকৃষ্ট জাতির লোকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিলোপসাধন পূর্ব্বক পৃথিবীতে কেবলমাত্র শ্বেতজাতির বসতির অধিকার সৃষ্টি করিতে হইবে। এই কল্পনা বিকৃতমস্তিষ্ক-প্রসূত অথবা ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের ফল নহে, ইহার জন্য পাশ্চাত্য-জগতে বেশ একটু প্রচার-কার্য্য বা প্রোপাগ্যাণ্ডা চলিতেছে। মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে আলোচনা হইতেছে, কোন কোন অধ্যাপক পুঁথিও লিখিতেছেন। ফুরিয়ে দাল্‌বে তাঁহার রচিত দি ইনফ্রা অ্যাণ্ড দি সুপার ওয়ার্ল্ড নামক গ্রন্থে সন্তান-উৎপাদিকা শক্তির বিনাশ দ্বারা যে অপকৃষ্ট জাতিগুলির ধ্বংস সাধন করা যাইতে পারে তৎ সম্বন্ধে আভাস দিয়াছেন। পাশ্চাত্য জাতির উর্ব্বর মস্তিষ্কে অনেক কল্পনা স্থান পায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, শক্তিশালী জাতির উদ্ভট কল্পনাও কালে প্রকৃত ঘটনায় পরিণত

হইতে পারে। সুতরাং অধিকার সম্বন্ধে শ্বেত বনাম অ-শ্বেত সমস্যাটাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, উহাতে ভাবিবার ও শিখিবার উপাদান রহিয়াছে।

(৯)

আজ দেড় শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্য জগতে মানুষের অধিকার সম্বন্ধে যে দাবী চলিতেছে অথবা দাবীর পূরণ হইতেছে, তন্মধ্যে প্রধানগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রতিকূল অবস্থা হইতে জনসাধারণের মুক্তিলাভের অধিকার। এ অধিকার-বোধ যে প্রাচীন সমাজে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু সম্প্রতি উহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ প্রাণ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান-বিশারদগণ দেখাইতেছে যে, মানুষের উন্নতির প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে বিদূরিত করা হইলে, তাহার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। অসভ্য-জাতির উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় তাহার প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টন। যদি কোন অসভ্যকে শৈশবকাল হইতে সভ্যতার আবেষ্টনের ভিতর যত্নপূর্ব্বক লালন-পালন ও শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তবে তাহার মানসিক বিকাশ দ্রুতবেগে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে সভ্য-পদবাচ্য হইয়া থাকে। সভ্য-সমাজে কোন কোন শ্রেণীর লোক এমনই প্রতিকূল আবেষ্টনের মধ্যে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিতে পারে না। সমাজকে সবল করিয়া তুলিতে হইলে, তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে প্রতিকূল অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। জন-সাধারণের উন্নতি হইলে, সমাজের উন্নতি হয়, ইহাতে সমাজেরই স্বার্থ। তাই আজ সভ্য-সমাজে জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল নানাপ্রকার বিধি প্রচলিত হইতেছে। অনেক কু-প্রথার উচ্ছেদসাধন করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য-সমাজে

দাসত্বপ্রথা আর বর্ত্তমান নাই। কারখানা আইনে কারখানা আবেষ্টনের উন্নতি সাধন দ্বারা শ্রমজীবীদের উন্নতির পথ মুক্ত করা হইতেছে। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য শ্রমজীবীদের চাহিদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, সমাজে বাস করিয়া উত্তমরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে পরিমাণ আয় আবশ্যক, তাহা করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে। এই দাবীর ফলে স্থানে স্থানে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের সর্ব্বনিম্ন বেতন আইন দ্বারা ধার্য্য করা হইয়াছে। পুরুষ শ্রমজীবীদের সর্ব্বনিম্ন বেতন সম্বন্ধেও যাহাতে ঐরূপ আইন প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের অন্যান্য উদ্দেশ্যও আছে; যথা,—শ্রমজীবীদের কার্য্যস্থলে স্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি তাহাদের বাসস্থানের উন্নতি-সাধন ইত্যাদি। শ্রমজীবীদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অনুকূল দাবীগুলি লইয়া কোন কোন স্থানে প্ল্যাটফর্ম্ম অব্ ন্যাশনাল্ মিনিমাম্ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই আন্দোলন একদিন শ্রমজীবীদের উন্নতির অনুকূল আইন প্রবর্ত্তন করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১০)

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মীদের বিশ্রাম-লাভের অধিকাব। এ অধিকার আজ সকল সভ্য সমাজই মানিয়া লইতেছেন। সমাজ দেখিতেছে, উদর পোষণের জন্য মানুষের সকল শক্তি ব্যয়িত হইলে তাহার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। মানুষের সভ্যতার অনেকাংশ তাহার বিশ্রাম-লাভের ফলস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। দরিদ্র কর্ম্মীদিগকে উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হইলে তাহারা অবসর সময়ে আত্মোন্নতি সাধনপূর্ব্বক সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। বিশেষতঃ, পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ না পাইলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, ভগ্নদেহ লইয়া মানুষ পরিবারের বা সমাজের বিশেষ কোন

উপকারে আসিতে পারে না। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিরা শ্রমজীবীদিগের বিশ্রামের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৈনিক কার্য্য-কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে। এক শতাব্দীর মধ্যে শ্রমিকদের কার্য্য-কাল পনর, ষোল, ঘণ্টা হইতে আট, নয় ঘণ্টায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন স্থানে বিশ্রামকাল আরও বৃদ্ধি করিয়া দৈনিক কার্য্যকাল ছয় ঘণ্টায় নামাইবার জন্য শ্রমজীবীদের দাবী চলিতেছে।

(১১)

তৃতীয়তঃ, বিদ্যালাভের অধিকার। শিক্ষার মত মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় যে আর কিছু নাই ইহা আজ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে; জন-সাধারণের শিক্ষা-লাভের অধিকার উন্নত সমাজগুলিতে সমর্থিত হইতেছে। ফলে, পাশ্চাত্য দেশে অবৈতনিক নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন জনসাধারণেরও অনেক কর্ত্তব্য আছে, এ ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

(১২)

চতুর্থতঃ, নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অধিকার। মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে ক্রীড়া প্রবৃত্তি অন্যতম। এই প্রবৃত্তি সুপথে পরিচালিত না হইলে, কুপথে ধাবিত হইতে পারে; কাজেই জন-সাধারণের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য। ক্রীড়াক্ষেত্র, উদ্যান, নির্দ্দোষ নাট্যালয়, সঙ্গীতালয়, সচ্চিন্তা ও সদালাপ সমিতি, সামাজিক মিলনক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপন দ্বারা মানুষের ক্রীড়া প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া সমাজকে পাপ ও অপরাধ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত রাখা যাইতে পারে। নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা দ্বারা সমাজবাসীর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা যায়, সুতরাং তাহাতে সমাজেরই উন্নতি হইয়া থাকে। এই অধিকারের যৌক্তিকতা সকল সভ্য জাতি গ্রহণ করিয়াছেন।

(১৩)

পঞ্চমতঃ, স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার। বহুলোক এক স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করিলে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নানা প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অবস্থার জন্য সঙ্ঘ অথবা সমাজ দায়ী। সমাজের কর্ত্তব্য, প্রতিকূল অবস্থার বিলোপসাধন দ্বারা সমাজবাসীর স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখা। সকল সভ্যদেশেই নাগরিক সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিটি নগর-বাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সমর্থন করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই স্বাস্থ্যরক্ষা-কার্য্য নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা, সংক্রামক ব্যাধির প্রশমন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে। আবাসগৃহের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য সমাজ সচেষ্ট আছেন। অনেক সমাজ-হিতৈষী মনে করেন, ধনী, দরিদ্র প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিবার অধিকার থাকা আবশ্যক। আবাস-গৃহ সম্বন্ধে সমাজের এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে কেহ স্বাস্থ্যরক্ষার একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শের গণ্ডীর বাহিরে বাস করিতে না পায়। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে উক্ত ব্যবস্থা ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার অধিকার সমর্থিত হইতেছে।

আজ শিশুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমাজের দায়িত্ব স্বীকৃত হইতেছে। আজিকার শিশুরাই কিছুকাল পরে সমাজের প্রতিনিধি হইবে, সুতরাং ভবিষ্যৎ সমাজের মঙ্গলের জন্য শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সমাজে নানাপ্রকার শিশুহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। অধিকন্তু শিশুরা যাহাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে সু-প্রজনন-বিদ্যার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য-পদ্ধতি নিরূপণের চেষ্টা চলিতেছে। দুরারোগ্য ঘৃণিত ব্যাধিক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও উন্মাদ রোগগ্রস্ত মাতাপিতার সন্তান লাভের

অধিকার খর্ব্ব করার সঙ্কল্প হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন প্রদেশে বিবাহপ্রার্থী পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সন্তোষজনক নিদর্শনপত্র প্রদর্শন করিয়া বিবাহের অনুমতি লাভ করিতে হয়। বিবাহে সকলের অধিকার আছে, এ কথা আজ উন্নততর পাশ্চাত্য সমাজে স্বীকৃত হইতেছে না। আজ সভ্যতার উৎকর্ষ হেতু সামাজিক নীতির উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে, ইহার ফলে সভ্য-সমাজ অপরাধীদিগের অধিকার কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আজ প্রশ্ন উঠিতেছে, অপরাধের জন্য সমাজ দায়ী নহে কি? মানুষ আপনা-আপনি অপরাধী হয় না, সমাজে প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় এবং অপরাধ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকায় নূতন অপরাধীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমাজের এই ব্যাধির জন্য সমাজই দায়ী; অপরাধী ব্যাধিক্লিষ্ট সমাজেরই সন্তান। সমাজের পক্ষে আপন সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে। সমাজের নিকট অপরাধীর কতক দাবী আছে, ঐ দাবী গ্রাহ্য করা উচিত। এইরূপ আলোচনা ও আন্দোলনের ফলে অপরাধীর প্রতি সামাজিক অত্যাচারের অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক স্থান হইতে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, অপরাধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, কারাগারের সংস্কার সাধনদ্বারা অপরাধীদের স্বাস্থ্যের ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ঋণের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা অপ্রচলিত হইতেছে এবং অপরাধীকে শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান করা পাশবিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অপরাধীকে মানুষের নৈতিক উৎকর্ষের ফল কতক পরিমাণে ভোগ করিতে দেওয়া হইতেছে। দরিদ্র-দের দুঃখ প্রশমনের পক্ষেও উন্নত সভ্যসমাজ একেবারে উদাসীন নহেন। সমাজের সহানুভূতি ও অনুকম্পা-লাভে তাহাদের কতক অধিকার আছে, উন্নত সমাজ ইহা স্বীকার করিতেছেন।

(১৪)

ষষ্ঠতঃ, সামাজিক জীবনে পুরুষের মত স্ত্রীলোককেও সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান। উন্নত পাশ্চাত্য সমাজে এ সম্বন্ধে মতভেদ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ ছিল এবং স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে অনেক স্থানেই পুরুষেরা অনুদার মতের পোষকতা করিতেন। শিক্ষিতা পাশ্চাত্য রমণীদের বহু চেষ্টায় স্ত্রী-জাতির আত্ম-বিকাশের পথ অনেক পরিমাণে নিষ্কণ্টক হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নারী প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে স্ত্রী-জাতির অধিকার লাভের চেষ্টা আরও জয়যুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১৫)

এ পর্য্যন্ত আমরা সমাজে ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাই বলিয়া সমাজের অধিকার অবহেলার বিষয় নহে; বরং উহার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে যে, উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আজ ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে পারে না। আজ সভ্য-জগতে ব্যক্তির অধিকার সমাজের অধিকারের নিম্নে স্থান পাইতেছে। উভয় প্রকার অধিকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, সমাজের অধিকারই প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সমাজ সুস্থ ও সবল না হইলে, সমাজবাসীর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না, সুতরাং সমাজের স্বাস্থ্য ও শক্তির রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য সভ্যজগতে বিধিমত চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফলে সমাজের অধিকার বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পাইতেছে। সমাজের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিয়া আজ কোন ব্যক্তি অধিকার-বিশেষের জন্য দাবী করিতে পারে না। তবে সমাজের স্বার্থ কি, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধানের বিষয়। সমাজের স্বার্থ প্রকৃষ্টরূপে স্থিরীকৃত না হইলে ব্যক্তির স্বার্থ অন্যায়রূপে বিদলিত হইতে পারে।

কাল্পনিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, ধনিকদের সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়ত সমাজ-স্বার্থের অনুকূল নাও হইতে পারে। জনসাধারণের হস্ত হইতে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার কাড়িয়া লওয়া বিধেয় কিনা, তৎসম্বন্ধে সকল সভ্য-সমাজ এখনও একমত হইতে পারেন নাই; ভবিষ্যতেও হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপ বিচার না করিয়া খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে ব্যক্তি ও সমাজ এতদুভয়ের স্বার্থেরই হানি হইতে পারে। অকারণে ব্যক্তির স্বার্থের বিদলন সমাজ-স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না; আবার সমাজ-স্বার্থকে বিদলিত করিয়া ব্যক্তির স্বার্থকে বড় করিয়া তুলিলে সমাজের এবং পরোক্ষে ব্যক্তির অবনতি ঘটে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ ও ব্যক্তি এতদুভয়ের স্বার্থের মধ্যে সন্ধি বা সামঞ্জস্য স্থাপনই সমাজ সংস্কার বা সংগঠনের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সন্ধির আদর্শ, সর্ব্বসাধারণের বা সমাজের মঙ্গল, কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বা ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থরক্ষা নহে। সন্ধি-স্থাপনে সমাজ-স্বার্থের নিকট ব্যক্তির স্বার্থ পরাজয় মানিতে বাধ্য।

এই সমাজ-মঙ্গল আদর্শকে লক্ষ্য করিয়াই সমাজের অধিকার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে। যেসব লোক নানাভাবে সমাজের অনিষ্ট সাধন করে, আত্মরক্ষার্থে তাহাদিগকে বিদূরিত করা সমাজের অভিপ্রায়। প্রাণনাশের পরিবর্ত্তে অধিকারের খর্ব্বতা সাধন দ্বারা অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে সমাজ অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অধিকারের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন বা প্রাণদণ্ড এখনও অনেকস্থানে সমর্থিত হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে সকল সভ্য সমাজে প্রত্যেক লোকের জীবন-ধারণের অধিকার স্বীকৃত হইলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে সমাজের অধিকার কতকটা খর্ব্ব হইবে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে মানব-সভ্যতার নৈতিক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া সমাজই স্বেচ্ছায়

নিজের অধিকার কতকটা খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত হইবে, আশা করা যায়। সুতরাং সভ্য-সমাজের অধিকার উত্তরোত্তর নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইলেও কোন কোন বিষয়ে উহা হ্রাসও হইতে পারে। সমাজ আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতিকল্পে ঘৃণিত ব্যাধি-পীড়িতের, দেশ বা সমাজদ্রোহীর, নরহত্যাকারীর, দস্যুতস্করাদির, দুর্নীতিপরায়ণের বা মদ্যপায়ীর অধিকার খর্ব্ব করিবার অধিকার রাখিলেও সমাজের এবম্প্রকার কার্য্যের মূলে যথেচ্ছচারিতা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক লোক সুস্থ, সবল, মেধাবী, কর্ম্মঠ, নীতি-পরায়ণ, দেশভক্ত ও মানব-হিতৈষী রূপে গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে দেশের ও জগতের কল্যাণে আপনাকে নিয়োজিত করিতে পারে, কেবলমাত্র ইহার জন্যই সমাজের অধিকার-বৃদ্ধির আবশ্যকতা ও স্বার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থ এতদুভয়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ উপস্থিত হইলেও শেষপর্য্যন্ত ব্যক্তির চরম স্বার্থ ও সমাজ-মঙ্গলের চরম আদর্শের মধ্যে প্রভেদ নাই। ব্যক্তির চরম স্বার্থ,—ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ; সমাজ-মঙ্গলের চরম আদর্শও ব্যক্তির চরম বিকাশ সাধন। ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তির ন্যায্য ও যথোচিত অধিকারের বৃদ্ধি সাধন সমাজের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই অধিকার বৃদ্ধি দ্বারা সমাজেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। প্রত্যেক লোকের চরম দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে সমাজের পক্ষে অধিকতর বাঞ্ছনীয় কিছু থাকিতে পারে না।

কয়েদখানার সমাজতত্ত্ব*

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্
গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ

কারাতত্ত্ব

কয়েদখানা সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে কারাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে কারাতত্ত্বের আলোচনা অল্পই হইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহাও কয়েদ-নীতি সম্বন্ধে বড় বড় লোকদের কাহার কি ধারণা তাহার চুম্বক, আর খুব বেশী হয়ত আমাদের দেশে পুরাকালে কি ছিল, এবং মুনি-ঋষিরাও যে ঐ একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা দেখাইতে সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া গবেষণা মাত্র। "বস্তুনিষ্ঠ"ভাবে কারাতত্ত্বের আলোচনাপদ্ধতি এ দেশে একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইয়োরোপের বহু-দেশে, এমন কি, অগ্রসরতম সভ্য দেশগুলিতেও অধিক দিন ইহার প্রচলন হয় নাই। পূর্ব্বে কয়েদ-নীতির মূল ভিত্তি ছিল অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, কিন্তু এখন আর সে ভিত্তি নাই। সভ্যতায় বিকাশের সঙ্গে মনুষ্যজাতির উন্নতি কি অবনতি হইতেছে এই লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং বহু পুস্তকাদি এই লইয়া বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে এক দল বলেন—মানুষ "উন্নতি-শীল এবং অপর দল বলেন মানুষ "অবনতিশীল"। এই দুই মতের সত্যাসত্য বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে; আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, "মনুষ্যত্ব" বিকাশের দিক্ থেকে যখন আমরা দেখি, তখন মানুষকে "উন্নতিশীল" না বলিয়া

---

* "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদে পঠিত (১৩ মার্চ্চ ১৯৩৩)। সেই সময়ে সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এই পরিষদের অন্তর্গত ছিল।

থাকিতে পারি না। একদিন ছিল যখন অসতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করাইয়া, ভীতি জন্মাইয়া মানুষকে সৎ পথে চালাইতে চেষ্টা করা হইত। সেই জন্য পূর্ব্বে অপরাধীকে কয়েদখানায় রাখিয়া খুবই শাস্তি দেওয়া হইত, এমন শাস্তি দেওয়া হইত যাহাতে সে বেশ শিক্ষা পাইয়া যায় এবং পুনরায় সেরূপ কাজ আর না করে। উক্ত মতাবলম্বীদের ধারণা ছিল "শাস্তি" ভীতিপ্রদ না হইলে তাহা কিছুই নয়। আজকাল ঠিক তাহার বিপরীত পথে মানুষের চিন্তাধারা চলিয়াছে। "অপরাধী"কে "নিরপরাধ" ব্যক্তির সঙ্গে একই অবস্থায় আনিবার চেষ্টাই আজিকার কয়েদ-নীতিজ্ঞদের মূল উদ্দেশ্য। মানুষের মধ্যে পার্থক্য রাখিয়া মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করার বিধি উঠাইয়া দিয়া, দুর্ব্বলকে সবল করিয়া লইয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদনই সাধনা।

"অপরাধীকে" সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করার পন্থা আর চলিবে না। এখন তাহাকে সামাজিক করার উপায় অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। সমাজের দ্বার তাহাদের নিকট মুক্ত করিয়া দেওয়াই এখন কয়েদনীতির লক্ষ্য। তাহারাও সমাজের একজন হউক, তাহারাও সমাজকে উন্নত করুক, সমাজকে পূর্ণ করুক, ইহাই উদ্দেশ্য।

আধুনিক কারাতত্ত্বের অঙ্গীভূত বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হইল:

(১) সামাজিক অবস্থার উন্নতি করিয়া অপরাধের মূল কারণ বিদূরিত করা।

(২) অপরাধ-বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন করাইয়া অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা আরও ভাল করা এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করা।

(৩) যদি অপরাধীর আচরণ লক্ষ্য করিয়া বুঝা যায় যে, তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে বা হইয়াছে, তাহা হইলে, তাহাকে সাধারণ অপরাধীদিগের সহিত না রাখিয়া তাহার "সর্ত্তাধীন মুক্তির" ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া।

(৪) অপরাধীকে "শ্রেণীবিভক্ত" করা। প্রথম অপরাধীর সহিত পুরাতন অপরাধীর একত্রে বসবাস বা চলাফেরা কোনমতে যুক্তিযুক্ত নহে। কাজেই প্রথমোক্ত অপরাধীকে শেষোক্ত অপরাধী হইতে পৃথক রাখার রীতি প্রচলন করা।

(৫) শাস্তিবিধান কোন ক্রমেই বিচারকের হুকুম গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া না রাখা। মধ্যে মধ্যে শাস্তির নিগড় খুলিয়া পুনর্বিচার করা দরকার। শুধু তাহাই নহে। আচরণ, মানসিক অবস্থা এবং নিয়মিত পরিশ্রম বিবেচনা করিয়া অপরাধীর শাস্তি এবং তাহার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের আচরণ বিভিন্ন করানো কারাতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

(৬) শিল্প-ব্যবসা শিক্ষা দ্বারা অপরাধী ভবিষ্যৎ জীবনে সমাজের সাধারণ লোকের মত যাহাতে চলিতে পারে এবং নিজের আহার সংগ্রহ করিতে পারে তজ্জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(৭) মানসিক ও শারীরিক বিষয় শিক্ষা প্রদান দ্বারা প্রত্যেক অপরাধীকে তাহার নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা।

(৮) যাহাতে তাহারা সচ্চরিত্র, ঈশ্বরে ভক্তি এবং সামাজিকতা লাভ করিতে পারে, এইরকম নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করা কারাতত্ত্বের অঙ্গ।

(৯) কয়েদের কার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য এবং নিজেদেরও শিক্ষার জন্য কতকগুলি উচ্চ বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা। যাহারা আইন-ভঙ্গকারী তাহারা যদি কয়েদ-পরিচালনার উপযুক্ত হয় এবং কর্ম্মিরূপে আসে, তাহা হইলে খুবই সুবিধা হয়; কারণ ঐ প্রকারের আইনভঙ্গ-কারীরাই কয়েদখানার অতিথি হয়। সুতরাং নিজেদের অতীত জ্ঞানের জন্য অনেক বিষয় তাহারা ভালভাবেই পরিচালিত করিতে পারিবে।

(১০) অপরাধীর প্রতি সাধারণের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য সে

সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া। যাহাতে লোকে অপরাধীকে সমাজে স্থান দিতে পারে এবং নিজেদের মত করিয়া তুলিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা।

শাস্তি সম্বন্ধে কয়েকটী মূল নীতি

শাস্তির মূল নীতি তিনটি :—"রিফরমেটিভ" বা সংস্কারমূলক, ২য়টী "রিটি্বিউটিভ" বা প্রতিহিংসাচরিতার্থমূলক এবং ৩য়টী "প্রিভেণ্টিভ" বা নিবারণমূলক। ইহা ছাড়া আরও দুইটী আছে: "ডেটারেণ্ট" বা "ভীতিপ্রদর্শনমূলক" এবং অপরটী "এক্সপিয়েটিভ্" বা ক্ষতিপূরণ-মূলক।

সংস্কারমূলক নীতি অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য তাহাকে ভাল করা, তাহাকে দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত করা। সেই জন্য উক্ত মতাবলম্বীদের কথায় বুঝা যায় যে, শাস্তির মধ্য দিয়া জ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দেওয়াই হইল চরম কথা। অপরাধীকে হত্যা অপরাধে ফাঁসী দিলে তাহার সংস্কার হইল কোথায়?

প্রতিহিংসা চরিতার্থমূলক নীতি অনুযায়ী শাস্তিয় প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। যাহার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে তাহার এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণগণের মনে যে সাধারণ প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি তাহাই শাস্তির মধ্য দিয়া তৃপ্ত হয়। এখনও শাস্তির মূলে প্রধানতঃ এই প্রতিহিংসাবৃত্তিই কার্য্য করিতেছে।

"নিবারণ"মূলক নীতি অনুযায়ী শাস্তির অর্থ এই যে, আমরা সর্প দেখিলেই মারিয়া ফেলি, কেন না, অতবড় হিংস্র জন্তু জগতে না থাকাই মঙ্গল। কারণ, থাকিলেই কোন সময়ে না কোন সময়ে কাহাকেও দংশন করিবেই। ঠিক সেইরূপ সমাজে অসৎ লোকের অস্তিত্ব-লোপও

বাঞ্ছনীয়, যাহাতে তাহারা সমাজে আর কাহারও অনিষ্ট না করিতে পারে।

"ডেটারেন্ট" বা ভীতিপ্রদর্শনমূলক নীতির কথা এই যে, শাস্তি এমন ভয়াবহ হওয়া আবশ্যক যাহাতে অপরাধী ছাড়া তাহার সমান প্রবৃত্তির লোকেরাও ভীত হওয়ায় সেই কার্য্য হইতে বিরত হয়।

"এক্সপিয়েটিভ্" বা ক্ষতিপূরণমূলক নীতি অনুযায়ী শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, যাহার যতটা ক্ষতি হইয়াছে ততটা পূরণ করা আবশ্যক। শাস্তিভোগ করার অর্থ আইনের ধার শোধ করা। অর্থাৎ অপরাধ+শাস্তি॥ নির্দ্দোষ।

যতগুলি শাস্তির মূলনীতি উপরে আলোচিত হইল তন্মধ্যে সংস্কার-মূলক নীতিই আজিকার সভ্য সমাজের একমাত্র নীতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন অপরাধকে "অপরাধ" বলিয়া গণ্য করা হয় না, মানসিক অসুস্থতা বলিয়া মনে করা হয়। শরীরের নানা রোগ হওয়া সম্ভব এবং তাহার চিকিৎসা হয়। ঠিক তদ্রূপ মানসিক বিকারের জন্য মানুষ অন্যায় করিয়া ফেলে এবং সেই বিকারের চিকিৎসা করিলেই তাহা আরোগ্য হইয়া যাইবে। এইরকম চিন্তাধারার উপর ভর করিয়া যে কারাতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য। এই ধরণের ভাবুকগণ কারাকক্ষগুলিকে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের হাঁসপাতালরূপে সাজাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এমন কি প্রত্যেক অপরাধীর শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা না করিয়া তাহার শাস্তি বিধান করা অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা উক্ত প্রকারের পরীক্ষা এবং মানসিক ও দৈহিক রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য অনুরোধ করেন। জার্ম্মাণিতে দেখা গিয়াছে যে, ট্রেকিওটমি করিবার পর কতকগুলি অপরাধী একেবারে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ হইয়া গিয়াছে। টন্‌সিল অধিক দীর্ঘ হইলে দেখা

যায় নিম্ন প্রবৃত্তি প্রখর হইয়া থাকে। এইসকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সংস্কার করিতে হইলে অপরাধীর নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসা আবশ্যক।

এখন দেখা যাউক বিভিন্ন দেশে বাস্তবিক কিভাবে কয়েদখানা চালিত হইতেছে এবং কারানীতির কতটা বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে।

প্রথমে আমেরিকার কথা বলি—

আমেরিকার কয়েদখানা

আমেরিকার কয়েদখানা সম্বন্ধে লিখিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সেখানকার বিভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থার কথা। প্রত্যেক বন্দিগৃহটিতে বিভিন্ন রকমের বন্দীর জন্য বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা করা আছে। দোষী সাব্যস্ত হইবার পূর্ব্বে একরকম, তৎপরে অপরাধিরূপে গণ্য হইবার পর অন্যরকম ব্যবস্থা; স্বভাবগত অপরাধীদের জন্য ব্যবস্থা আবার অন্য প্রকার।

পুলিস-লক্‌আপ এবং কাউন্টি জেল

আইনভঙ্গ অপরাধে ধৃত অপরাধীদের এই স্থানে আবদ্ধ রাখা হয়। সামান্য অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে পেন্টিনারি বা ওয়ার্কহাউসে রাখা হয়। আমেরিকার কয়েদতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আজিও এখানকার কাউন্টি জেলের উন্নতি একেবারেই হয় নাই। এখনও সেকেলে ধরণের সব ব্যবস্থা লইয়া রক্ষণশীলের দল আকড়িয়া পড়িয়া আছে।

ষ্টেট এবং ফেডারল রিফরমেটরি

এইসকল অনুষ্ঠানে প্রথম দণ্ডিত অপরাধীদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। যেসকল স্ত্রীলোক বা পুরুষের বয়ঃক্রম ১৬-৩০এর মধ্যে,

তাহাদিগকে এই স্থানে গ্রহণ করা হয়। তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক কয়েদীদিগকে অন্যস্থানে বিদ্যাশিক্ষা ও বাণিজ্য-শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, তাহাদিগকে এলমায়রা রিফরমেটরিতে রাখা হয়।

ষ্টেট প্রিজন্‌স্‌ কিংবা ষ্টেট পেনিটেনারিস

উক্ত প্রতিষ্ঠানে সাংঘাতিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ রাখা হয়। এই প্রকারের অপরাধীদিগকে প্রায়ই এক বৎসর কাল উক্ত স্থানে থাকিতে হয়।

প্রিজন্‌ ক্যাম্প

প্রিজন্‌ ক্যাম্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ম্মিত। এখানে বাড়ীঘরগুলি অতি সুন্দর এবং আরামপ্রদ। কয়েদীরা এখানে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত চলাফেরা করে। রক্ষীরা কয়েদীর সহিত একেবারেই অসদ্‌ব্যবহার করে না, বরং তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করে।

রোড ক্যাম্প

আধুনিক কয়েদীদের শাস্তিভোগের জন্য রোডক্যাম্প একটি নূতন ধরণের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে বন্দীর জীবনে এক নব ধারা আসিয়াছে এবং ইহা ভালভাবে পরিচালিত হইলে সমাজের বহু উপকার সাধিত হইবে।

মানসিক বিকারগ্রস্ত যেসকল অপরাধী ধৃত হয়, তাহাদিগের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এখনও যেসব ষ্টেটে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে, সেখানে তাহা স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

আমেরিকার কয়েদখানার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। দি ফেডারল পেনাল বা করেকশনাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের ডিপার্টমেণ্ট অব জাষ্টিসের বিউরো অব প্রিজন্‌স্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

বন্দিজীবনের বৈশিষ্ট্য

এখানে বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ অতি অস্বাভাবিক। প্রধানতঃ স্ত্রীলোক এবং পুরুষভেদে একটি শ্রেণী ভাগ করা হইয়াছে। তাহার পর "পুরাণ পাপী" আর "নয়া পাপীর" দল আলাদা করা হয় এবং তৃতীয়তঃ ধনী ও দরিদ্র অপরাধীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমাজের সহিত বন্দীদের কোন সম্পর্কই থাকে না। সামাজিক জীবনে যে যে প্রভাব বিস্তারিত হয়, বন্দিজীবনে সে সব কিছুই থাকে না, কাজেই তাহাদের অসামাজিক ভাবটিই প্রখর হইয়া উঠে। কয়েদী মাত্রেরই এই ধারণা যে, তাহারা যখন অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, তখন আর তাহাদের সমাজে পুনরায় সমান অধিকার লাভ হইবে না, কাজেই তাহারা সমাজের বাহিরে থাকিবে। কয়েদখানার ব্যবস্থা দ্বারা এইরূপ ভাবকে প্রকট করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কয়েদীদের উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিবার বা তাহাদিগকে ভাল হইবার জন্য উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা নাই।

কয়েদখানার যে আদর্শ হওয়া আবশ্যক, আমেরিকার বন্দিগৃহে তাহার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। বন্দীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনাই কারাকক্ষের আদর্শ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা মার্কিণের কয়েদখানায় নাই। এখানে বন্দীদিগকে ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয় না, সাধারণ নিয়মানুবর্ত্তিতার বাঁধা পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করা হয়। উপযুক্ত

শিক্ষিত ব্যক্তি কয়েদীদের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে থাকা আবশ্যক; কিন্তু আমেরিকায় সে অভাব এখনও রহিয়া গিয়াছে।

একই ধরণের বাঁধা-ধরা নিয়ম সারা মার্কিণের সর্ব্বত্র একই ভাবে চলিতেছে। সর্ব্বত্র বন্দীদের একই সময়ে গাত্রোত্থান, একই সময়ে সাজ করার প্রথা, একই সময়ে জেল হইতে নিষ্ক্রমণ, একই সময়ে আহার করা এবং একই সময়ে কার্য্য করার ব্যবস্থা বর্ত্তমান। আহারের সময় বিশ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে সকলকেই নিস্তব্ধভাবে আহার সারিয়া লইতে হইবে। চতুর্দ্দিকে পাহারার কড়া নজরের মধ্যে আহার করাই বিধি। যদি একখানি রুটি দরকার হয়, তবে একটী আঙ্গুল উঠাইতে হয়, দুইটি আঙ্গুল উঠাইলে বুঝিতে হইবে আলুর দরকার এবং তিনটী আঙ্গুল তুলিলে বুঝিতে হইবে মাংস আবশ্যক।

ব্যায়ামের অবস্থা মার্কিণের সব কয়েদখানায়ই আছে। মার্চ্চ এবং ড্রিল করানোই সাধারণ ব্যায়ামের মধ্যে প্রচলিল। তারপর স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে যাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কেহই কর্ম্মস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না। এখানকার কয়েদের আদর্শ এই যে, কয়েদীদের নিকট হইতে যতটা কাজ আদায় করা যায় ততই ভাল।

তৎপরে বংশীধ্বনি হইলে কাজ ছাড়িয়া সকলে উঠিয়া পড়ে। হাত পা ধুইয়া ব্রেকফাষ্টের নিয়মের মত সকলেই নিস্তব্ধে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া পুনরায় কাজে নিযুক্ত হয়।

বৈকালিক আহারের পর বন্দীদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়া সেই রাত্রির মত ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেকের ঘরে একই সময়ে আলো নিবিয়া যায়। আলো প্রায় রাত্রি ৯টার সময় নিবিয়া থাকে। কাজেই বন্দীদের ইচ্ছামত নিদ্রা যাওয়া হয় না। ৪ × ৭ ফুট ঘরের মধ্যে বন্দিজীবন যাপন করা যে কি ভীষণ তাহা বলা যায় না। শনিবার ৪ ঘটিকার পর হইতে সোমবার পর্য্যন্ত বন্দীদিগকে ঘরের মধ্যে থাকিতে হয়,

কেবল মধ্যে একবার মাত্র ২ ঘণ্টার জন্য প্রার্থনা করিবার ছুটি দেওয়া হয়।

আমেরিকার কয়েদখানায় অপরাধী আসিলেই প্রথমে তাহাকে কয়েদখানার নিয়মাবলী-সম্বলিত একটি পুস্তিকা পড়িতে দেওয়া হয়। যদি কেহ পড়িতে না পারে, তাহাকে নিয়মগুলি শুনাইয়া দেওয়া হয়। আইনের মোদ্দা কথা এই যে, নিয়মানুবর্ত্তিতা একান্ত আবশ্যক এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে মার্কিণে বন্দীদের সংখ্যা সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২৩ সনে প্রিজন্ ও রিফরমেটরির মোট সংখ্যা ছিল ৯৮টী এবং ঐসকল স্থানে লোক-সংখ্যা ছিল বৎসরে ২৮৯,০০০ এবং ১৯২৭ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথমে দেখা যায় যে, প্রিজন্ ও রিফরমেটরির সংখ্যা সমানই আছে, কিন্তু লোক-সংখ্যা ৯৮,২৪৫ হইয়াছে।

আমেরিকায় কয়েদী শিক্ষা

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের মধ্যে প্রায় ৬০টির অধিক কয়েদখানা আছে। তাহাদের মধ্যে ১২টিতে কোনরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য ১২টি কয়েদখানায় যে প্রণালীর শিক্ষা পদ্ধতি আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আর অবশিষ্ট ৩৬টিতে নামে মাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কয়েদীদের শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ বালকবালিকাদের পাঠশালার মত। কোন রকম উচ্চ আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নাই। তাহার কারণ শুনা যায়, অর্থাভাবে শিক্ষকদিগকে বিশিষ্ট উপায়ে তৈয়ারী করা যায় না। কয়েদখানার মধ্যে বিদ্যালয়গুলি অতি অপরিচ্ছন্ন স্থানে অবস্থিত।

স্ত্রীলোক এবং পুরুষের জন্য 'রিফরমেটরিগুলিতে' যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহা অন্যান্য কয়েকখানা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

'রিফরমেটরির' শিক্ষা বিশেষ সুফলপ্রদ না হওয়ার কারণ (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের রিফরমেটরিতে) শিক্ষাপদ্ধতি নহে, শিক্ষা দিবার জন্য আবশ্যক বস্তুর একান্ত অভাব। আবার পুরুষদিগের 'রিফরমেটরি ঠিক উহার বিপরীত। এখানে শিক্ষার সরঞ্জামের আধিক্য সুফল-লাভের অন্তরায়। আর একটা প্রধান ত্রুটি এই যে, 'রিফরমেটরিতে' ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী না থাকায়, সাধারণ শিক্ষা ও 'ভোকেশনাল' শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও উহা উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

কয়েদখানায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, কয়েদীরা জেল হইতে মুক্ত হইয়া সে শিক্ষার কোন ব্যবহারই করে না। ইহার কারণ কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের ঠিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়া তাহারা সে শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না।

শিক্ষা-প্রথা

আমেরিকার প্রত্যেক কয়েদীকে তাহার সাধ্য, স্বার্থ ও সময় অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের প্রাত্যাহিক জীবনের আবশ্যকতা অনুযায়ী এবং উন্নতি করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য যেরূপ বিদ্যাশিক্ষার দরকার, তাহা দিবার ব্যবস্থা থাকে। কোনো কার্য্যোপযোগী 'ভোকেশনাল' শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। শরীর-রক্ষার্থ দেহ-বিদ্যা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। কতকগুলি সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় কেবল সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য। সামাজিক, নৈতিক ও জাগতিক শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

যে কয়েদীর যেরূপ প্রয়োজন, তাহাকে ঠিক তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য একপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতি করিলে মহাভ্রান্তি

হইবে। শিক্ষা বিষয়ে ব্যক্তিগত চরিত্র লক্ষ্য করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক। কয়েদীর পূর্ব্ব ইতিহাস, তাহার বংশ, পূর্ব্বের শিক্ষা, পারিবারিক অবস্থা, দেহের ও মনের অবস্থা, সহ্য গুণ প্রভৃতি নানা দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া, তবে তাহার জন্য বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত করিয়া দিতে হইবে।

জেলখানার পুস্তকাগার

শিক্ষা-প্রথার প্রধান অঙ্গই হইল পুস্তকাগার। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পুস্তকাগারই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ। পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ বিশেষ শিক্ষিত ও প্রবীণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এমন লোক থাকা আবশ্যক, যিনি পুস্তক দিয়া পাঠকের জ্ঞানের প্রয়াস বৃদ্ধি করাইয়া দিতে পারেন। পুস্তকাগারে বহুবিষয়ক অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত থাকিবে।

আর এক কথা, আমেরিকার কয়েদখানায় শিক্ষার মধ্যে কয়েদীর সংশোধনই লক্ষ্য নহে, বয়স্ক লোককে শিক্ষা দেওয়াও ইহার আর একটি চিন্তার বিষয়।

অদূর ভবিষ্যতের লক্ষ্য

কয়েদখানার প্রত্যেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষের কাজের লোক হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের অতিরিক্ত সময়ে আত্মোন্নতির জন্য যতটা শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন ততটা গ্রহণ করা দরকার। শিক্ষাপদ্ধতি একটা বিরাট হ-য-ব-র-ল না হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রত্যেকের জন্য একই রকমের শিক্ষাপদ্ধতি হওয়া একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। চিকিৎসা বিভাগে তিনটি দিক্ থাকিবে, ১ম 'ফোর ফাইলিঙ্গস্', 'টনসিলেকটমি' এবং তৎপরে 'ভেনেরিয়াল ট্রিটমেণ্ট'। শিক্ষাবিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষেরা একটি প্রোগ্রাম তৈয়ারি করিবেন।

তাহাতে সূত্রধরের কাজ, বাণিজ্য-বিষয়ক শিক্ষা, ব্লু-প্রিণ্ট পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

"এ" শ্রেণীর কয়েদীরা সপ্তাহে তিনবার স্কুলে 'ভোকেশনাল' শিক্ষা পাইবার জন্য যে যে বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে শিক্ষণীয় তাহা শিখিতে যাইবে। অবকাশ কালে শরীর সুস্থ ও সবল করিবার জন্য যে বিভিন্ন ব্যবস্থা করা থাকিবে তাহার সদ্ব্যবহার করিবে। বন্দীরা সন্ধ্যার সময়ে 'প্রিজন অডিটরিয়মে' বক্তৃতা শুনিবার জন্য যাইতে পারে কিংবা লাইব্রেরীয়ানের সাহায্যে ভাল পুস্তক পড়িতে পারে, অথবা নিজের অন্য কোন কার্য্যও করিতে পারে।

অগ্রাভিমুখী গতি

ক্যালিফোর্ণিয়া এবং উইস্‌কন্‌সিন ষ্টেট ইউনিভার্সিটী একস্‌টেনশন্‌ বিভাগ কয়েদখানার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে। ওহিওতে ষ্টেট ইউনিভার্সিটীর ভোকেশনাল এডুকেশন বিভাগ কয়েদ-খানার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিতেছে। মিশিগান্‌ ষ্টেট লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষেরা মিশিগান কয়েদ-ল্যাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিনেসোটা এবং উইস্‌কন্‌সিন দুইটি দেশের ভিন্নভিন্ন শিক্ষা-প্রণালী এবং লাইব্রেরী সাহায্য-প্রথা কয়েক বৎসর মধ্যে সুন্দর উন্নতি লাভ করিয়াছে।

পেনসিলভেনিয়ার রিফরমেটরি শিক্ষা-প্রণালী খুব উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং সেখানে কয়েদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। জোলিয়েটের জেলখানার শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতির জন্য ইলিনয়স্‌ ষ্টেটের অধ্যক্ষবর্গ মনোনিবেশ করিয়াছেন। নিউ জারসিতে শিক্ষা লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে এবং ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষেরা পেনাল অধ্যক্ষদিগের সহিত লাইব্রেরী ও শিক্ষা

সম্বন্ধে সহযোগিতা করিতেছেন। নিউইয়র্কে শিক্ষা-প্রণালীর দোষ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা চলিতেছে। ফেডারেল বিউরো অব্ প্রিজন একটি বিভাগ খুলিয়াছে, তাহার কার্য্য শিক্ষা ও লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন করার জন্য আবার আমেরিকান প্রিজন্ এসোসিয়েশনের দুইটি কমিটী আছে, একটি আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ও অন্যটি কমিটী অব এডুকেশন।

মেক্সিকোর কয়েদখানা

তৎপরে মেক্সিকোর কয়েদখানা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

মেক্সিকোর নূতন দণ্ডবিধি সামাজিক দায়িত্বের উপরেই গঠিত হইয়াছে। এখানকার কয়েদতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা যে, অপরাধীর সকল দোষ সমাজেরই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে। কাজেই এইসকল দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইলে অপরাধ-সংস্কারক অনুষ্ঠানের আবশ্যক। এ দেশের লোকের কয়েদ-গৃহই হইল অপরাধ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবলমাত্র অপরাধীকে শিক্ষা দিয়া সংস্কৃত করিলে চলিবে না, যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, যে যে কারণে অপরাধী অপরাধ করিয়াছে, সেই সবেরও উচ্ছেদসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। তারপর অপরাধীকে কেবল দোষমুক্ত করিলেই কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার সময় সমাজের উপযুক্ত করিয়া পাঠান চাই।

মেক্সিকোর নূতন দণ্ডবিধিতে শাস্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখা নাই, কেবল কতকগুলি "অনুজ্ঞা" (স্যাংশন) আছে। এইসকল অনুজ্ঞার মধ্যে কোনরকম দণ্ডবিধি-সংক্রান্ত কিছুই পাওয়া যায় না, ইহাতে পরিষ্কারভাবে সমাজরক্ষণবিষয়ক কতগুলি নিয়ম উদ্ধৃত করা আছে। সমাজ-রক্ষার জন্য যতটা শাস্তি আবশ্যক, ঠিক ততটা পরিমাণ

শাস্তি বিধেয়। কয়েদখানার উদ্দেশ্য অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া নহে, তাহার চরিত্রের সংশোধন করিয়া দেওয়াই উহার লক্ষ্য।

অপরাধিগণের শ্রেণী-বিভাগ করা কয়েদতত্ত্বের একটি প্রধান কার্য্য। নিম্নলিখিত উপায়ে মেক্সিকোতে অপরাধিগণের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে ঃ—

(১) বয়স্ক ও নাবালক অপরাধী পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। (২) পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হইবে। (৩) স্বভাবতঃ অপরাধী ও আকস্মিক অপরাধীর শ্রেণী আলাদা করিতে হইবে। (৪) মানসিক বিকারগ্রস্ত অপরাধী ও পাগল এদেরও বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। (৫) সামাজিক অপরাধে দণ্ডিত ও রাজনৈতিক অপরাধী বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকিবে।

অল্পবয়স্ক অপরাধী

মেক্সিকোর জুভেনাইল কোর্টে কেবলমাত্র অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের বিচার হয়। সাধারণের সহিত তাহাদের বিচার পর্য্যন্ত হয় না। বিচারকদের কার্য্য কেবল আইনগত দোষ নির্দ্ধারণ করিয়া দণ্ডবিধান করার মধ্যে পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহারা সমাজসংস্কারকের চক্ষু দিয়া তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহাদের শিক্ষা ও পিতা-মাতার চরিত্র প্রভৃতি, সমস্তই উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের সংস্কারের জন্য যে সদ্‌ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহারই আজ্ঞা দিয়া থাকেন। মানসিক বিকার অথবা নৈতিক অবনতির জন্য যদি কোন যুবক বা বালক-বালিকা ধৃত হয়, তাহাকে অন্যান্য যুবকদিগের সহিত রাখা হয় না। তাহাদের বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যত রকম ব্যবস্থা সম্ভব, সমস্তই করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা, সংস্কারক

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ধ রাখা, মূকদিগের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, বিশেষ নৈতিক উন্নতির জন্য পাঠাগার করা প্রভৃতি নানারকম উপায় অবলম্বন করিয়া মেক্সিকোতে যুবকদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কারাতত্ত্ববিদ্ ও দণ্ডনীতি-বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, মানুষের যে অসাধারণ ভাবে পাপের দিকে যাইবার প্রবৃত্তি, তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানসিক ও দৈহিক দুর্ব্বলতা বা গোলমাল, জন্মগত দোষ এবং গ্লাণ্ডের দোষই প্রধান কারণ।

মদখোর এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য যাহারা ব্যবহার করে, তাহাদের সংশোধনের ব্যবস্থাও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আবার ভবঘুরে, নিষ্কর্ম্মা ও ভিখারীদের কর্ম্মপটু করিবার সুব্যবস্থা আছে। তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত না ভাল হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আবদ্ধ রাখা হয়। এরূপ ব্যবস্থা কোন দেশে আছে কি না সন্দেহ। যাহাতে ভবঘুরেরা কাজকর্ম্মে মন দেয়, তজ্জন্য বাণিজ্য শিখান ও অন্যান্য হাতের কাজ প্রভৃতি শিখান হয়।

অধিকবয়স্ক অপরাধী

নির্জ্জনবাস শাস্তির বিরুদ্ধে আজ সভ্য জগতে সকল দেশেরই এক রকম মত। মেক্সিকোতে এরূপ শাস্তি বন্ধ হইয়াছে; কারণ ইহাতে মনের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে যে, তাহাতে সামাজিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, উপরন্তু কুভাব জাগাইবার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। মানুষকে নিঃসঙ্গ করিয়া রাখিলে তাহার অধঃপতন হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য বন্দিগৃহেও মানুষের সঙ্গী পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সঙ্গী সমানে সমান হওয়া দরকার। একজন ডাকাত একজন চোরের সঙ্গে মিশিলে খারাপ হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। সেই কারণে মেক্সিকোতে এক ধরণের অপরাধীদের এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া

ছোট কুটীরে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকলকে একত্রে রাখা সেখানে নীতিবিরুদ্ধ। বাড়ীগুলি ছোট ছোট পরিষ্কার, আরাম-প্রদ ও শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে।

সহানুভূতি-প্রদর্শক চতুর লোক ইহাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে থাকিয়া অপরাধিগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিরা তাহাদের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন অনুযায়ী সামাজিকতা লাভের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ইহারা বিশ্বাস করেন না যে, একজন অতি বদমায়েস লোক বলিয়াই সে চিরদিন সেইরূপ থাকিবে। তাঁহারা মানুষকে উন্নতির পথ দেখাইয়া তাহার মনুষ্যত্বের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। সুযোগ ও পুরস্কার দান করিয়া বহু অপরাধীকে তাঁহারা ভাল করিয়াছেন।

অপরাধীদিগের চিকিৎসার জন্য তাহাদিগকে পরিশ্রম করান বিধি, কিন্তু তাই বলিয়া পরিশ্রমেরও একটা নিয়ম নাই বলা চলে না। তাহা আবশ্যক, ফলপ্রদ এবং অপরাধীর চরিত্র অনুযায়ী নিয়মিত হওয়া দরকার। চাষীকে চাষীর কাজ শিক্ষা দেওয়া, মজুরকে শিল্পকার্য্যে নিয়োগ করা, বাণিজ্য-সেবীকে আফিসের কাজ দেওয়াই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কয়েদীর নিজের ভার যাহাতে সে নিজেই বহন করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করাই আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে, বন্দীদের মাহিয়ানার ব্যবস্থা থাকায় তাহাদের পরিশ্রম কার্য্যকর হইবে, কয়েদখানায় নিয়মবন্ধন থাকিবে এবং তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে।

কয়েদখানার শাসনকার্য্য

শাস্তির নিয়মপালনের ব্যবস্থা, কয়েদখানার প্রতিষ্ঠান এবং তাহার শাসনকার্য্য সমস্তই সমাজ-রক্ষার প্রধান কাউন্সিল দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা শিক্ষার প্রাথমিক, সেকেণ্ডারী এবং বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া

দেন। বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন। স্বামি-স্ত্রী যাহাতে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারে; তাহার ব্যবস্থা এক বৎসর হয় করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা অতি সুন্দর ফল হইয়াছে।

ইয়োরোপের মধ্যে জার্ম্মাণি ও ইতালীর কয়েদখানা সম্বন্ধে বলিবার মত অনেক-কিছু আছে।

জার্ম্মাণির কয়েদখানা

জার্ম্মাণিতে প্রায় বারটী বা ততোঽধিক রাষ্ট্র আছে, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে চলিতেছে। কাজেই পরস্পরের কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য রহিয়া যাইতেছে। কোন রাষ্ট্র অগ্রসর হইতেছে কোনটি পিছাইয়া পড়িতেছে। সেই জন্য সকল রাষ্ট্রের একরকম উন্নতি হয় নাই। উপরিউক্ত কারণের জন্যই জার্ম্মাণির কারাগার সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রত্যেক রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে হয়। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণিতে ধর্ম্মের মতদ্বৈধ হেতুও কোন রাষ্ট্রে উন্নতি ও অপর রাষ্ট্রে অবনতি হইয়াছে।

মোট তিনটী রাষ্ট্রের কয়েদপ্রকরণ দেখিলেই বুঝা যাইবে তাহার সাধারণ গতি কিরূপ। প্রথমে দেখা যাউক ব্যাভেরিয়ার কয়েদখানা কিরূপ। ব্যাভেরিয়া দেশটী একদিকে যেমন ক্যাথলিক-প্রধান অন্যদিকে তেমনি কৃষি-প্রধান। কাজেই মনে হয়, এ দেশের লোক খুবই রক্ষণশীল হইবে। তাহার পরে থুরিঙ্গিয়ান্ রাষ্ট্রের কয়েদখানা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রোটেষ্ট্যাণ্টপ্রধান এবং ব্যবসাপ্রধান স্থানের ব্যক্তিদের কিরূপ মানসিক গতি। তৃতীয়তঃ, দেখিব প্রুসিয়ার কয়েদখানা। এটীও একটী বাণিজ্যপ্রধান দেশ।

ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত এক কয়েদখানার মেণ্টাল হাঁসপাতালের

অধ্যক্ষ ডক্টর ফার্ণষ্টাইন বলেন যে, অপরাধীর পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া অপরাধীর নিজের পারিপার্শ্বিক জীবনের ঘটনা এবং অবস্থা বিচার করিয়া তাহার "জেনো-টাইপ" বা জন্মগত লক্ষণ জানিতে পারা যায়। যাহা অন্য কোন উপায়েই নির্দ্ধারিত করা সম্ভবপর নহে। এমন কি কোন অপরাধীর একটী বা কতগুলি অন্যায় কার্য্য থেকে কোন রকমে উহা ঠিক করা সম্ভব নহে।

অপরাধীর চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন। গ্রামের শিক্ষক, মোড়ল বা পাদরীর নিকট হইতে যে তত্ত্ব সংগৃহীত হয় তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া ধরিতে পারা যায় না কারণ তাহাও বক্তার নিজের মানসিক অবস্থা অনুযায়ী বিকৃতি লাভ করিয়াই বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।

ব্যাভেরিয়ার ক্রিমিনোবায়লজিক্যাল প্রণালীতে পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় না বলিয়া অনেকে ভুল করেন। কিন্তু খাঁটি জীবতত্ত্ব (বায়লজির) প্রণালী অনুসারে কোন একটি লোকের যদি বংশগত কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহাকে অপরাধী বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া লওয়া হয়। এ রকম ভ্রান্তি উভয় প্রকার চরমপন্থীরই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবতত্ত্ব উভয়ের মিলিত বিশ্লেষণেই অনেকটা সত্য আবিষ্কার করা যায়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানসিক অবস্থার উপরে কিরকম ক্রিয়া করে তাহার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

১৯১২ সনে চৌর্য্য অপরাধে ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৯৩,৯৮৫ জন।
১৯২৩ সনে ঐ অপরাধে ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৩০৮,০০৫ জন।

১৯১২ সন হইতে ১৯২৩ সনের মধ্যে এই বৃদ্ধির কারণ কি হইতে পারে? হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিক্ষেপ, না হয় চৌর্য্য-বৃত্তির সুপ্ত

ভাব। কিন্তু ১৯২৫ সনে যখন ১৯২৩ সনের চেয়ে সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল, তখন দেখি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ জার্ম্মাণির ইন্‌ফ্লেশনের শেষ হইয়াছে।

থুরিঙ্গিয়ান্ প্রণালী

থুরিঙ্গিয়ান্ প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, এখানে "ন্যাচারাল সায়েন্স" বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোন স্থানই নাই। এখানে কতকগুলি দুঃসাহসিক সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়াছে। জেলের অধ্যক্ষেরা প্রতি রবিবারে কতকগুলি বাছাই করা বন্দী লইয়া নির্জ্জনে রক্ষিবিহীন অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের মানসিক অবস্থার অপ্রকাশিত ভাব বুঝা যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ বিপদও প্রচ্ছন্ন থাকে। থুরিঙ্গিয়াতে যে কয়েদখানা-বিচারালয় আছে সেখানে কয়েদীদের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বিচারকের আসন গ্রহণ করে। তাহারাই আইনভঙ্গের জন্য অন্য কয়েদীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকে।

এখানে কয়েদী জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—পর্য্যবেক্ষণ, চিকিৎসা, রক্ষণ।

থুরিঙ্গিয়ার নূতনত্বের মধ্যে তাহার সমাজ-সেবা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রুসিয়ান রিফর্ম

প্রুসিয়াতে কয়েদখানা নিম্নোক্ত প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে: (১) এণ্ট্রান্স প্রিজন্। (২) অ্যাড্‌ভান্সড্ প্রিজন্। (৩) ডিস্‌চার্জ প্রিজন্। আবার এণ্ট্রান্স প্রিজন্‌কে সাত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: ১। নাবালকের শিক্ষাগার। ২। সামান্য অপরাধে ধৃত আসামীর ঘর। ৩। অল্পদিন মেয়াদীর আবাস। ৪। পূর্ণবয়স্ক আইনভঙ্গকারীর বিশেষ

আবাস। ৫। অসংশোধনীয় কয়েদীর ডেরা। ৬। মানসিক বিকৃত অপরাধীর চিকিৎসালয়। ৭। রাজনীতিক বা সামাজিক নিয়মভঙ্গ অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের আবাস।

এইসকল কয়েদখানার সঙ্গে "ক্রিমিনোবায়লজিক্যাল বিউরো" বা কয়েদীদের অপরাধতত্ত্ব, শারীরিক এবং মানষিক তত্ত্ব গবেষণা করিবার জন্য একটী করিয়া সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে।

থুরিঙ্গিয়া, সাক্সনিয়া এবং হামবুর্গ কয়েদখানা-বিষয়ে প্রুসিয়ার চেয়ে অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছে। প্রুসিয়ার মিনিষ্টি অব্ জাষ্টিস্ ব্র্যাণ্ডেনবারে নূতন ধরণের একটী কয়েদগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আধুনিক কলকারখানা বসাইয়া কয়েদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং যতটা সম্ভব রক্ষিসংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইবে।

ইতালীর কয়েদখানা
শাস্তি ও সাধারণের নিরাপত্তা

শাস্তি অনুষ্ঠানের জন্য দুইটী ধারা দেখা যায়। এক দিক্ দিয়া নিয়োগের ব্যবস্থা এবং অপর দিক্ দিয়া সাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। দণ্ডনীতির এবং সাধারণের নিরাপত্তার দিক্ হইতেও কয়েদীজীবনের উন্নতি সাধন বিশেষ আবশ্যক। ইতালীর কয়েদ সংস্কারকবর্গের উক্ত আদর্শ আজ জগতের মধ্যে এক নূতন আলোক আনিয়া দিয়াছে। সমাজের উপযোগী হইল কি না দেখিবার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষকে মানুষ হইতে দেওয়ার অবকাশ ও অবসর দেওয়াই ইতালীর কয়েদতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণের নিরাপত্তা চিন্তা তদ্দেশীয় কয়েদ-সংস্কারকের লক্ষ্যের বাহিরে যায় নাই। সাধারণের নিরাপত্তার জন্য দোষী ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণকে পৃথক্ করা তাঁহাদের রীতি। সেই জন্য অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দণ্ডবিধান কৌশল

তাঁহারা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অনির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল সেই বিষয়ে পরিদর্শন করিবার জন্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি বিশেষরূপ ব্যবস্থার জন্য এক শ্রেণীর বিচারকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। উক্ত প্রকারের বিচারক কেবলমাত্র কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্যই নিয়োজিত হন।

তত্ত্বাবধানকারী বিচারক বা সারভেলান্স জজ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্য এক দল বিচারক নিয়োজিত হন। তাঁহাদের কার্য্য মাত্র কয়েদীদের পরিচালনা করা এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করা।

ইতালীর পেনাল প্রেসিডিওরের ৬৩৫ ধারা অনুসারে সারভেলান্স জজ বা তত্ত্বাবধানকারী বিচারকের হাতে সাধারণের নিরাপত্তার জন্য উপায়গুলিও আছে। পিউনিটিভ বন্দীর উপরে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইতালীর আইনযন্ত্রের মতানুযায়ী যে বিচারক শাস্তি দান করে, তাহার শাস্তি-প্রয়োগ বিষয়েও অধিকার আছে। উক্ত পেনাল কোডের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী, শাস্তি প্রয়োগ করা, রোড ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা, উক্ত ক্যাম্পের সময়ে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া ব্যক্তি-হিসাবে ব্যবস্থা করার ক্ষমতা একমাত্র সারভেলান্স জজেরই থাকে। নিম্নে সারভেলান্স জজের কর্ত্তৃত্ব ও এলাকা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সারভেলান্স জজের কর্ত্তৃত্বের এলাকা

কয়েদীদের শাস্তিভোগের সময়ে তাঁহাদের উপর সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, কয়েদখানার কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত উক্ত জজের কার্য্যের গণ্ডগোল হওয়ার

সম্ভাবনা আছে। সেই গোলমাল যাহাতে না হয় তাহারই জন্য উভয়ের কার্য্যের এলাকা সুন্দরভাবে পৃথক করিয়া দেওয়া আছে।

(ক) উক্ত বিচারকগণের কয়েদীদিগকে এক কয়েদখানা হইতে অপর কয়েদখানায় পাঠাইবার ক্ষমতা আছে, অবশ্য তাহাদের কয়েদ-ভোগের সময়ে।

(খ) তাঁহারা যে-কোন কয়েদীকে যদি আঠার বৎসরের অধিক বয়স হয়, তাহা হইলে বিশেষ সেক্‌শনে ভর্ত্তি করিতে পারেন।

(গ) একত্রে থাকিলে যদি কোন কয়েদী দ্বারা অন্য কয়েদীর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহার জন্য উক্ত বিচারক বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(ঘ) কয়েদখানার মধ্যে কয়েদীদিগকে যে সামাজিক করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে পাঠাইবার ক্ষমতা উক্ত প্রকার জজেরই আছে।

(ঙ) কয়েদীদের ডিসিপ্লিন্ প্রিজনে পাঠানো বা তথা হইতে সাধারণ কয়েদীর আগারে পাঠানোর ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানকারী বিচারকের হস্তেই ন্যস্ত আছে।

(চ) তাঁহারাই মানসিক বিকারগ্রস্ত কয়েদীকে ক্রিমিন্যাল ইন্‌সেন এসাইলাম (পাগলা কয়েদী আশ্রমে) বা স্যানিটোরিয়ামে (স্বাস্থ্যাবাসে) বা হাউস অব কাস্‌টডিতে পাঠাইতে পারেন।

(ছ) হয়ত কোন কয়েদীর শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর হওয়া আবশ্যক। উক্ত জজ তাহাকে কঠোর কয়েদখানায় পাঠাইয়া দিতে পারেন বা শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য অন্য কোনরূপ বন্দিগৃহে পাঠাইতে পারেন।

(জ) তাঁহাদের মুক্ত বাতাসে কার্য্য করিতে দিবার ক্ষমতা বা তাহা হইতে বিরত করিবার ক্ষমতা তাহার আছে।

(ঋ) কড়ারে মুক্তি দিবার ক্ষমতাও উক্ত বিচারকের হাতে আছে।

(ঞ) রোগগ্রস্ত কয়েদীদের খরচ বাবদ যে কোন নালিশ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন।

কয়েদীর কর্ম্ম

ইতালীর পেনাল কোডের মতে বন্দিজীবনে পরিশ্রম করার বিশেষ মূল্য আছে। এই পরিশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষকে এক নূতন আদর্শে অভ্যস্ত করিয়া তোলা যায়। পিউনিটিভ ইম্প্রিজনমেণ্টে সশ্রম কারাদণ্ডবিধি আছে। কিন্তু পরিশ্রমের জন্য কয়েদীদেরও পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার দুই প্রকার—প্রথমটী কেবলমাত্র কয়েদীদের জন্য নির্দ্ধারিত, তাহার উপর অন্যের হস্তক্ষেপ অবিধেয়। উক্ত পুরস্কার কোনরূপে হস্তান্তর করা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় প্রকার পুরস্কার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য খরচা হিসাবে লইতে পারা যায়ঃ

(ক) কার্য্যকালীন কোন বস্তু নষ্ট হইয়া থাকার জন্য কিছু টাকা উহা হইতে কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(খ) বন্দীদের রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের খরচা অনুপাতে কিছু টাকা লওয়া হয়।

(গ) বিচারকার্য্যের জন্য যে ব্যয় হয় তাহার জন্যও কিছু টাকা গ্রহণ করা হয়।

মুক্তভাবে পরিশ্রম করিবার অধিকার নিম্নোক্ত দুইপ্রকারের কয়েদীকে দেওয়া হয়ঃ

১। সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর তিনবৎসর অতিক্রম হইলে।

২। যেসকল কয়েদীকে "রেক্লুশনের" আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাদের একবৎসর কারাভোগের পরে। কয়েদীদের জীবনে উন্নতি সাধনার্থ ইতালীর কয়েদে অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মধারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যেরূপ কর্ম্ম বন্দীদের আবশ্যক ঠিক সেই রকমের কর্ম্ম অনবরত যোগান আবশ্যক বলিয়া ইতালীর কয়েদ সংস্কারকদের মত।

মিনিষ্ট্রী অব্ জাস্টিস্ একটী টেক্নিক্যাল লেবার কমিশন্ স্থাপন করেন। তাহাতে ডিরেক্টর জেনারাল অব্ পেনাল অ্যাণ্ড প্রিভেন্টিভ্ ইন্ষ্টিটিউশন্ এবং ফিনান্স, ওয়ার, নেভি, এওরোনটিক্স, কর্পোরেশন এবং ট্রান্সপোর্টেশনের মন্ত্রীরা সভ্য হন। উক্ত কমিশন্ কর্ত্তৃক বন্দীদের কর্ম্মের প্রকৃতি এবং তাহাদের পুরস্কার নির্দ্ধারিত হয়। কমিশন্টী এমনভাবে গঠিত হইয়াছে যাহার দ্বারা বন্দীদের মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক উন্নতি অপ্রতিহত হইবার ব্যবস্থাও হয়, অথচ সাধারণের ছোটখাট বাণিজ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রত্যেক বন্দীর ব্যক্তিগত কর্ম্ম-প্রবণতা দেখিয়া তাহার কার্য্যের ব্যবস্থা করাই কারাতন্ত্রের প্রধান আদর্শ। কারণ সামাজিকতা প্রদানের একমাত্র উপায়ই হইল আদর্শ পরিশ্রম। সেই জন্য দণ্ডবিধানের পূর্ব্বে কয়েদীর পূর্ব্ব জীবনের খোঁজ লওয়া আবশ্যক। তাহার মানসিক গতি ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তৎপরে তাহার বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার ভবিষ্যতের দিকেও লক্ষ্য হারাইলে চলিবে না। এমন কার্য্য তাহাকে করিতে হইবে, যে কার্য্য সে পরেও করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

মুক্তভাবে কার্য্য করার প্রথা দুই প্রকার। প্রথম ওয়ার্কহাউসে কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু দ্বার মুক্ত থাকিবে এবং রক্ষী থাকিবে না। দ্বিতীয় ওয়ার্কহাউস ত্যাগ করিয়া রক্ষিবিহীন অবস্থায় বাহিরে কার্য্য করিবে এবং কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় নিজ নিজ কারাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। কারাপরিচালকবর্গ ইতালীতে কয়েকটী চাষের কলোনি করিয়াছেন। উক্ত কলোনিগুলি সার্ডানিয়া এবং টাস্কান্ আর্কিপ্লেগোতে অবস্থিত। সার্ডানিয়াতে ১০,০০০ একর জমি লইয়া

(১) কান্তিয়াদাস, (২) আইসিলি, (৩) মেনোনি, (৪) কুগাটা, (৫) আসিনেরা নামক পাঁচটি কলোনি ও টাস্‌কানিতে উক্তপ্রকারের তিনটী কলোনি খোলা হইয়াছে—ক্যাপারিয়া, গরগোণা, পিয়ানোসা। এইসকল চাষের কলোনিতে বন্দী শ্রমিকদের উপর কোন লক্ষ্য রাখা হয় না, কোন প্রহরী পর্য্যন্ত থাকে না। তাহারা মুক্ত-আকাশের তলে সম্পূর্ণ মুক্তাবস্থায় কার্য্য করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রথা অনুযায়ী বন্দীদিগকে মুক্তভাবে কর্ম্ম করিবার অবকাশ দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু রক্ষীরা পর্য্যবেক্ষণ করে এবং সময় হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যায়।

কয়েদীদের আহারের বিষয়ে ইতালিতে এমন আইন আছে যে সরকারী খাওয়ার উপরেও যাহার যাহা ইচ্ছা তাহার ব্যবস্থা নিজ নিজ উপার্জ্জিত অর্থ হইতে করিতে পারে।

কয়েদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা

নূতন আইন অনুসারে নিরক্ষরতা বিদূরিত করিবার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করা হইয়াছে। কয়েদের মধ্যে আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। যাহাতে সাধারণ জ্ঞান ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন হয় তজ্জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত বিশেষ পাঠাগারের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ে বা পাঠাগারে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা কয়েদেরই কোন কর্ম্মচারী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুমতি পান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েদখানার মধ্যে চ্যাপলিন আছে, সেখানে পাদরী সাহেব নিয়মিতভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়া থাকেন এবং বন্দীদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন। কয়েদখানায় শারীরিক উন্নতির জন্য ডাক্তারের এবং শরীর-পরিচালনার ব্যবস্থা আছে। এমন কি শিক্ষাপ্রদ চলচ্চিত্রেরও

ব্যবস্থা আছে, যাহাতে কয়েদীদের আনন্দের মধ্য দিয়া মনের উৎকর্ষ লাভ হয়।

নাবালকের প্রতি ব্যবহার

নাবালকের জন্য যে কারাগার আছে তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র শিক্ষা দেওয়া। ইতালিতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে তাহাদের কার্য্যই হইল বিপথগামী যুবকদিগকে সৎপথে আনয়ন করা। ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন্ অব্ দি প্রোটেক্‌শন্ অব্ ম্যাটার্নিটি অ্যাণ্ড ইন্‌ফ্যান্সি, দি বালিল্লা, দি অভান্‌গার্দিস্তি, দি পিক্কলে ইতালিয়ানে প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যুবকদিগকে সর্ব্বদাই ভাল হইবার পথে সাহায্য করিয়া থাকে।

আইনতঃ, ইতালীতে চৌদ্দবৎসরের নিম্নে বালককে শাস্তি দেওয়া হয় না। যুবকদিগের জন্য বিশেষ বিচারালয় আছে, সেখানে উক্ত যুবকদিগের মোকদ্দমা ব্যতিরেকে আর কোন প্রকার মোকদ্দমা গ্রহণ করা হয় না। এইরূপে আইন এবং সামাজিক অনুষ্ঠান উভয়ে মিলিত হইয়া যুবকদিগের জীবন উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

নাবালক বন্দীরা যে কারাগারে থাকে তাহার গঠন অন্যান্য কয়েদখানার মত নহে। তাহারা পাছে মনে করে যে, কয়েদের মধ্যে আছে, সেই জন্য তাহাদিগকে কয়েদীদের সাজ পর্য্যন্ত পরিধান করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত বিদ্যালয় আছে। তাহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তী করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যেই লক্ষ্য রাখা হয়। কথাবার্ত্তা, চিঠিলেখা, প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে যাহাতে তাহারা নিয়ম পালন করিতে শিক্ষালাভ করে তাহারই ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাহাই নহে, নাবালক ভবিষ্যৎ জীবনে কি

কার্য্য করিয়া কালযাপন করিবে, তাহার মানসিক গতি কোন কার্য্যের দিকে যায়, এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া নাবালকের কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করা হয়।

সামাজিকতা বৃদ্ধির উপায়

ইতালীর কারানীতির মূল উদ্দেশ্য এই যে, কারাজীবনের পর বন্দীরা যেন তাহাদের সামাজিক জীবন ঠিক সাধারণের মতই যাপন করিতে পারে। সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। সেই জন্য যেসকল শাস্তি মানুষকে অসামাজিক করিয়া তোলে সে প্রকার শাস্তি পেনালকোড হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন নির্জ্জন কারাবাস প্রথা—তাহাতে মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া দেয়। নির্জ্জন কারাবাস দণ্ডের দ্বারা মানুষের সামাজিকতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। ইতালিতে ইন্‌ষ্টিটিউশন অব্ সোসিয়াল্ রি-এড্যাপ্‌টেশন্ নামক একটী অনুষ্ঠান বন্দীদিগকে সামাজিক করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের অধিক যেসকল কয়েদী বন্দী হইয়াছে, তাহাদিগকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠান হইয়া থাকে।

বিভিন্নদেশের কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ

ইংল্যণ্ড, জার্ম্মাণি, মেক্সিকো, ইতালী, আমেরিকা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশে কয়েদীদের শ্রেণী একই ভিত্তির উপরে নির্ভর করিয়া ভাগ করা হইয়াছে।

ইংল্যণ্ডের কয়েদীর শ্রেণী কিভাবে ভাগ করা হইয়াছে দেখা যাউক।

(ক) স্ত্রী ও পুরুষভেদে একরকম ভাগ করা হইয়াছে। তাহার পর, তাহাদের মধ্যে ছোট বড় অথবা অধিক অপরাধী বা অল্প অপরাধী প্রভৃতি হিসাবে বিভিন্নরূপ বিভাগ দেখা যায়।

(খ) যাহাদিগকে দোষী স্থির করা হইয়াছে এবং যাহাদের দোষ স্থির হয় নাই এরূপ ভাগ।

(গ) পূর্ব্ব-অপরাধ অনুযায়ী, অর্থাৎ নয়া অপরাধী কি পাকা অপরাধী এই হিসাবে শ্রেণী ভাগ করা হয়।

(ঘ) বয়স হিসাবে—অর্থাৎ যদি ধরুন ২০ বৎসরের নিম্নে কেহ অপরাধী থাকে, তাহাকে বুড়াদের সঙ্গে দিলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্য "জুভেনাইল" জেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইতালীর নূতন রেগুলেশন অনুযায়ী বন্দীরা দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ কি অসমর্থ এই হিসাবে একটী শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। কয়েদীদের মধ্যে যাহারা "ভাল" এই ছাপ পাইয়াছে তাহাদের অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে রাখা হয় না। তাহাদের আলাদা শ্রেণী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতালীর পেনাল রেগুলেশনের ১৭৩নং ধারা অনুসারে যেসকল কয়েদী দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ তাহাদেরও ষাণ্মাসিক শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন। ছয় মাস অন্তর প্রত্যেক বন্দীকে ডাক্তার এবং চ্যাপলেন বা পাদরি কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইতে হইবে। যাহারা উক্ত প্রকারের শ্রেণীতে তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়াছে তাহাদিগকে সামাজিক করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বেলজিয়ামের কয়েদব্যবস্থা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) সাধারণ অপরাধীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান।

(খ) অসাধারণ অপরাধীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান।

(গ) শারীরিক অসুস্থ কয়েদীদের জন্য বন্দোবস্ত।

(ক) শ্রেণীকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে—(১) যুবা অপরাধীদের জন্য কারাশিক্ষালয় করা হইয়াছে। (২) পূর্ণ বয়স্কদের জন্য রিফরমেটরি বা সংস্কারক প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে। (৩) যেসকল

কয়েদী সংশোধন-যোগ্য তাহাদের জন্য ফ্যাক্টরী করা হইয়াছে। (৪) দাগী কয়েদীদের জন্য কয়েদ তৈয়ারি হইয়াছে। (৫) অসংশোধনীয় কয়েদীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছে, সমাজ হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

(খ) শ্রেণীকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে—

(১) অপরাধী পাগলের আবাস। (২) অসাধারণ মানসিক বিকৃত অপরাধীর আবাস। (৩) যে সকল অপরাধীর আক্ষেপ রোগ আছে, তাহাদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান। (৪) যৌন-অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে।

(গ) শ্রেণীকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হইয়াছে ঃ—

(১) কারা-হাঁসপাতাল। (২) যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অপরাধীদের জন্য কারা স্যানিটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যাবাস। (৩) নেশাখোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কয়েদী শ্রেণীভেদ—

(১) ছোট বড় বয়স অনুযায়ী একটী শ্রেণী। (২) নূতন ও পুরাণ পাপী ভেদে আর একটী শ্রেণী। (৩) সমাজের পক্ষে গুরুতর অথবা অল্প বিপজ্জনক অপরাধী হিসাবে একটী শ্রেণী। (৪) ভবঘুরে, ভিখারী এবং বেশ্যাদের জন্য আর একটী শ্রেণী।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং বেলজিয়াম দেশের শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন শ্রেণীর অপরাধীকেই তাহারা বাদ দেয় নাই। সকলেরই সংস্কার-সাধনে তাহারা চেষ্টা করিয়াছে।

ইতালীর শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে একটী নূতন জিনিষ দেখা যায় যাহা অন্য কোথাও নাই। তাহা হইতেছে "সোসিয়াল রিহ্যাবিলিটেশন্" বা পুনরায় সমাজের উপযোগীকরণের বিশেষ ব্যবস্থা।

ভারতীয় কয়েদখানা

ভারতবর্ষের কয়েদখানাকে মোট তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। সেণ্ট্রাল জেল। ২। ডিষ্ট্রীক্ট জেল। ৩। সাবসিডিয়ারি জেল।

সেণ্ট্রাল জেলে এক বৎসরের অধিক দণ্ডপ্রাপ্ত লোকই আসে। ডিষ্ট্রীক্ট জেলে প্রায় সকল রকমের অপরাধীই আসিয়া থাকে। যাহাদের অপরাধ নির্দ্ধারিত হয় নাই অথবা যাহাদের অল্পদিনের মেয়াদ হইয়াছে এমনঅপরাধীদের জন্য সাবসিডিয়ারি জেল বা লক্‌আপের ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় রিফর্মেটরিগুলির অবস্থা মান্ধাতার আমলের মতই আছে—কোন উন্নতিই হয় নাই। ছোটদের জন্য জুভেনাইল জেলের ব্যবস্থা আছে। এখানে ১৫ বৎসরের ছেলে অবধি নেওয়া হয় এবং আঠার বৎসর বয়সের অধিক রাখা হয় না।

১৯০৫ সনে আলিপুরে বিশেষ জুভেনাইল জেল খোলা হয়। ১৯০৯ সনে বর্ম্মায় মিকটিলা জেল এবং মাদ্রাজে টান্‌জোর জেল যুবা অপরাধীর জন্য বিশেষভাবে নিম্মিত হইয়াছে। বেরিলিতে ১৯১০ সনে ছোটদের জন্য নূতন কয়েদখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাঞ্জাবে ডিষ্ট্রীক্ট জেলেই যুবা অপরাধীদিগকে বরস্ট্যাল জেলের মত করিয়া রাখা হয়।

শাস্তি ও সভ্যতা

প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ প্রথমে শাস্তির ব্যবস্থা করে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে আজও যে প্রতিহিংসার ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। এ কালের ও পূর্ব্বকালের শাস্তি ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ঐ শাস্তির বিধি

ও উপায়েই লক্ষ্য করি। কেহ "নাক কাটিয়া" দিলে তার "নাক" লইতে হইবে, এ প্রথা এখন নাই, এখন বিচারে আসামীর দোষ প্রমাণিত হইলে, দোষীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শাস্তির আজ্ঞা দেওয়া হয়। সভ্যতার সহিত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিতেছে না, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। এখন "দাসত্বের" দায় নাই অর্থাৎ সামান্য অপরাধ করিলেই "যাবজ্জীবন" দাস হইয়া থাকিতে হইবে, এমন কোন বিধি নাই। বিলাতে এখন আর অপরাধীকে চুরির অপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া, এ কথা বলাও ভুল যে, পূর্ব্বকালের ছোঁয়াচ আজিকার সভ্যতার যুগে একেবারেই দেখা যায় না। এখনও প্রতিহিংসাই মূলতঃ শাস্তির উদ্দেশ্য, যদিও তাহার সহিত আরও নানা উদ্দেশ্যের সংযোগ ঘটিতেছে।

বহু পুরাকালে বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে প্রতিহিংসাই শাস্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহাদেব মধ্যে যাহাকে "কর্ত্তা" বলিয়া মানা হইত, তিনিই অপরাধের বিচার করিতেন এবং তাঁহারই বিচার অনুযায়ী অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। বিচারের পদ্ধতি ছিল বড় অদ্ভুত। যাহার ক্ষতি হইয়াছে, সে বিপক্ষের নিকটে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইত। যদি রামের হাতখানি শ্যাম ভাঙ্গিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করা হইত শ্যামেরও হাতখানি ভাঙ্গিয়া দিয়া। ইহাকে "ক্ষতিপূরণ করা" না বলিয়া "প্রতিহিংসা লওয়া" বলিলেই কথাটা সঙ্গত হয়। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্যত্বের বিকশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার রূপও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মানুষ ক্রমে বুঝিল যে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাই শ্রেষ্ঠ নহে, তাহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনই শাস্তির ভিত্তি হওয়া আবশ্যক। মানবের শ্রেষ্ঠত্ব তাহার সংস্কারেই বৃদ্ধি পায়, প্রতিহিংসায় নহে। এই সংস্কারের উপায়

মানুষ চিন্তা করিতে গিয়া বিভিন্ন শাস্তি-প্রথার বিভিন্ন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিল।

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা যে পাশবিক, তাহা যখন মানুষ বুঝিল, তখন শাস্তির দৃষ্টান্তে মানবের দুষ্প্রবৃত্তি যাহাতে দমন হয়, এমনি উপায় উদ্ভাবনে তাঁহারা প্রয়াসী হইল।

অপরাধ করিয়া অপরাধী যদি অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে তাহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল কোথায়? সমাজের উন্নতি প্রতিহিংসায় নয়, ব্যক্তিগত চরিত্রোন্নতির উপর নির্ভর করে। কাজেই ব্যক্তিগত চরিত্রের যথার্থ উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রতিহিংসার উপরে আরও কিছু দরকার। ভীতিপ্রদর্শন করিয়া সমাজ বা রাজার আইন-ভঙ্গ নিবারণ করাই শাস্তির উদ্দেশ্য হইল। কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন করিয়াও ত মানুষের প্রকৃত সংস্কার হয় না। মানুষ আরও উন্নত হইবার প্রয়াসে তখন শাস্তিকে সংস্কাররূপে দাঁড় করাইতে উদ্যত হইল।

হব্‌সএর দণ্ডনীতিতে প্রতিহিংসাই ছিল মূল তত্ত্ব। কিন্তু সে প্রতিহিংসা রামের বা শ্যামের জন্য নহে, তাহা "কর্ত্তার" আজ্ঞা অবহেলা করার জন্য শাসনকর্ত্তার প্রতিহিংসা।

কিন্তু বেন্‌থাম এবং গোল্‌ড্‌স্মিথের কৃপায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব-ভাগে ইংলণ্ডে বহু অপরাধী প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছে—কেবলমাত্র শাস্তির মূল উদ্দেশ্য অন্য প্রকার হওয়ার জন্য। নতুবা তাহার পূর্ব্বে এমন কি, সামান্য চুরি করিলেও অপরাধীর প্রাণদণ্ড ঘটিত।

বেবিলোনিয়ান আইন অনুযায়ী পূর্ব্বে সামান্য অপরাধেই প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা হইত। কিন্তু হিব্রু আইন জগতের সভ্যতার প্রথম স্তর দেখাইয়া দেয়। হিব্রুরা সহজে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিত না। রোমে শাস্তির দিক্ দিয়া সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এখানে প্রাণদণ্ড বলিতে বুঝাইত রাষ্ট্রিকের রাষ্ট্রিকত্ব নাশ বা নির্ব্বাসন।

আজও কেন যে প্রাণদণ্ডের মত নৃশংস দণ্ডনীতি সভ্য-সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা বলা বড় কঠিন। দণ্ডদ্বারা যদি মানুষের প্রতি মানুষের প্রতিহিংসাই সাধন করা হয়, তাহা হইলে সভ্যতার কি বিকাশ ঘটিল? খুনের অপরাধে খুনীকে খুন করিলেই যদি যোগ্য দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে "হস্তের পরিবর্ত্তে হস্ত লওয়া, অথবা চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু লওয়া" এমন কি কঠোর প্রথা ছিল? এ কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে শাস্তির যোগ্যতা প্রমাণ করার বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে। অপরাধী নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট অবসর ও অবকাশ পায়, এবং আইনতঃ বিচারকও অনেক বিষয়ে বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকেন। কাজেই যথেচ্ছাচার হইবার সম্ভাবনা কম।

"ইতালিয়ান স্কুল" নামক একদল অপরাধবিজ্ঞান-বিশারদ আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের গঠন করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ইয়োরোপে 'ইউনিয়ন অ্যাঁতারন্যাশনাল দ্য দ্রোয়া পেনাল।' নামক একটি প্রতিষ্ঠান জার্ম্মাণ ও বেলজিয়াম প্রভাবে গঠিত হইয়া উঠে।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য, "ইতালিয়ান স্কুলের" সহিত আরও আধুনিক "প্রিভেণ্টিভ ট্রিটমেণ্ট" মতবাদী স্কুলের একটা সামঞ্জস্য করিয়া দেওয়া। আধুনিক "প্রিভেণ্টিভ ট্রিটমেণ্ট" মতবাদীরা বলেন যে, প্রত্যেক অপরাধের মধ্যেই এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে এবং তাহা অনুসন্ধানে নষ্ট করিতে পারিলেই অপরাধীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে। কারণ দুই প্রকার হইতে পারে—প্রথম হইল অন্তর্নিহিত এবং দ্বিতীয় হইল বাহ্য। মানসিক এবং দৈহিক কারণ লইয়া প্রথমোক্ত কারণের উৎপত্তি এবং সামাজিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ধরিয়া হইল শেষোক্ত কারণের উৎপত্তি।

ফরাসী লেখক সালাই উক্ত মতবাদকে বলেন ব্যক্তিগত শাস্তি-প্রথা। ইহাঁদের মতে বন্দী করাও শাস্তির উপযুক্ত উপায় নয়। মানুষকে ধরিয়া কতগুলি বাঁধাধরা কাজের ভিতরে রাখিলেই মানুষের শাস্তির কাজ হইয়া গেল না। তাহার অন্তরের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। অপরাধীকে চিরদিন অপরাধী রাখিয়া দিলে, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় তাহার চক্ষের সম্মুখে না ধরিলে দণ্ডনীতির নীতিত্ব রহিল কোথায়? সভ্যতার উৎকর্ষ হইল কিরূপে? মানবের মানবত্ব প্রকাশিত হইল কেমন করিয়া? "প্রিভেন্টিভ" স্কুল আরও বলেন যে, সমাজের দুর্ব্বলতা দূর করাই অপরাধ-বিজ্ঞানের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া আবশ্যক। সমাজের লোকের মানসিক দুর্ব্বলতা, দৈহিক দুর্ব্বলতা, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিকৃত মানসিক বৃত্তি বিদূরিত করিতে পারিলেই হইবে না। অপরাধ করিবার পূর্ব্বেই যদি তাহার কারণ অপসারিত হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে অপরাধ হইবে? তাঁহারা বলেন, কোন রোগ আরাম করা অপেক্ষা তাহার কারণ দূরীভূত করিয়া না জন্মাইতে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কারাগারের রূপ বদলাইয়া দিতে হইবে, কারাগারকে নিরাপদ স্থান করিতে হইবে, সেখানে বন্ধনের ভয় থাকিবে না, মানুষের হৃদয়ের সকল দ্বারগুলি মুক্ত হইবার উপায় থাকিবে, সেখানে ধর্ম্ম ও নীতির চর্চ্চা দ্বারা মানুষকে তাহার মনুষ্যত্বের রূপ দেখাইয়া দিবে।

এতক্ষণ সামান্যভাবে তত্ত্ব লইয়া গবেষণার চেষ্টা করিলাম, এইবার ইহার বাস্তবিক রূপ কোথায় এবং কি, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। প্রাণদণ্ডই এখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দণ্ড বলিয়া সভ্য সমাজের অপরাধ-বৈজ্ঞানিকদের মত। কাজেই এখন দেখি, এই নিকৃষ্ট প্রথা কোথায় আছে এবং কোথায় নাই এবং যেখানে আছে, সেখানে কি অবস্থায়

আছে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, সভ্যতার দিক্ হইতে কোন্ দেশের মানুষ কতখানি উন্নত হইয়াছে।

১। ইংল্যাণ্ডে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কেবলমাত্র হত্যা অপরাধে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু রাজদ্রোহ অপরাধেও একজনের ফাঁসি হইয়াছিল। ভ্রূণহত্যার অপরাধে ফাঁসির ব্যবস্থা নাই, তবে যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধি আছে।

২। ভারতীয় পেনাল কোডের মতে, সকলেই জানেন, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে অথবা কাহাকেও হত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়।

৩। অষ্ট্রেলিয়ায় বিশ্বাসঘাতকতা, হত্যা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিনাশ করিলে প্রাণদণ্ড হয়।

৪। ডেনমার্কে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহিতা এবং হত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধি ছিল। কিন্তু প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয় না এবং প্রাণদণ্ড বিধি একেবারেই রহিত করার জন্য আলোচনা চলিতেছে।

৫। হত্যার চেষ্টা করিলে, হত্যা করিলে, বিষপ্রয়োগ করিলে, বাড়ীতে অগ্নি দিলে ফরাসীরা প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া থাকে।

৬। জার্ম্মাণিতে হত্যা অপরাধে, যুদ্ধের সময় এবং ১৮৮৪ খৃঃ অঃ ডাইন্যামিক অ্যাক্ট অনুযায়ী কতকগুলি অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে।

৭। জাপানে হত্যা ও রাজদ্রোহ প্রভৃতি অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়।

নিম্নলিখিত দেশগুলি হইতে সাধারণতঃ প্রাণদণ্ড একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র যুদ্ধের সময় অথবা বিদ্রোহের সময় বাদে—অষ্ট্রীয়াতে ১৯১৪ খৃঃ অঃ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত হইয়াছে।

কলাম্বিয়াতে ১৯১০ খৃঃ অঃ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তিত আইন অনুযায়ী প্রাণদণ্ড একেবারে রহিত হইয়াছে। ল্যাটভিয়াতে ১৯১৭ সনে প্রাণদণ্ড রহিত হইয়াছে। লুক্সেমবুর্গে প্রাণদণ্ড বন্ধ হইয়াছে। নেদারল্যাণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফাঁসির নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। প্যানামায় ১৯২২ সনে ফাঁসি প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। পর্টুগালে প্রাণদণ্ড তো উঠিয়া গিয়াছেই উপরন্তু যে দেশে প্রাণদণ্ড আছে, সেদেশের লোক পলাইয়া পর্টুগালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুনরায় তাহাকে আন্তর্জ্জাতিক নিয়মানুযায়ী ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না, এইরূপ আইন আছে।

পর্টুগালের মত সামান্য দেশে সভ্যতা কত বিকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা সাধারণে কোনও দিন অনুসন্ধানও করিতাম না। ইতালীতে আধুনিক যে পেনাল আইন হইয়াছে, তাহাতে মানুষের প্রাণদণ্ড এবং নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ রাখার প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে যে কারণে মানুষ মানুষকে মারে, সেই কারণের মূল দূরীভূত করাই কি সঙ্গত নয়? প্রাণদণ্ড দিয়া যদি জন্মের মত কোন লোককে জগৎ হইতে বিতাড়িত করা যায়, তাহা হইলে অপরাধীর শাস্তি ভোগ হয় না বরং তাহাকে বহু দুঃখের হাত হইতে বাঁচানো হয়। যদি কোন লোক তাহার ভ্রম বুঝিতে পারে, তাহা হইলে মনে মধ্যে যে সংগ্রাম চলে, তাহার যাতনা প্রাণ-দণ্ডের চেয়েও বেশী মর্ম্মান্তিক হয়। ইহা ব্যতীত অনেক সময়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একটা যেন মহত্ত্বের কাজ বলিয়া অনেকে ধারণা করে। এই কাজ মহৎ বা ক্ষুদ্র সে বিষয়ে কোন আলোচনার শক্তি আমার নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, "মরণকে" আলিঙ্গন করা খুব বেশী শক্ত কাজ নয়; তাহা অপেক্ষা কঠিন কাজ এই জগতে প্রতি মুহূর্ত্তের বাধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা। যেদিন আইন এমন কোন পথ দেখাইতে পারিবে, যাহাতে মানুষ তাহার অন্তর্যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে, সেদিন আইনের এবং দণ্ডের সত্যই জয় হইবে। প্রকৃত কারণ নিরাকরণ করাই এখন শাস্তিদানের মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাহ্য কারণ দূর করার জন্য সমাজকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। সমাজ ও শাসনদণ্ডের মিলিত কার্য্যে যে নবপ্রথা উদ্ভূত হইবে তাহাই মানবের কল্যাণকর।

লোক-বাহুল্যের আতঙ্ক*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম এ, বি এল,
গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ

চাই জন্মশাসন না কৃষিশিল্পের উন্নতি বিধান

পিপীলিকা শ্রেণীর মত সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে কোন ষ্ট্যাটিষ্টিশিয়ান্ যখন একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তখন তা আমাদের বিভ্রান্ত করে। ইদানীং লোকবল ও খাদ্য সংস্থান-সংক্রান্ত আলোচনায় এমনি একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। সেন্সাস কমিশনার ডক্টর হাটন্ সরকারী দপ্তরের দলিলপত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতবর্ষ অত্যধিক পরিমাণে

* ৮ই মে, ১৯৩৭ কলিকাতার মহাবোধি হলে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ "জন্মশাসন ও লোকবৃদ্ধি" সম্বন্ধে সংখ্যা, তথ্য ও নজিরাদি-পূর্ণ একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। সভায় বিস্তর জনসমাবেশ হইয়াছিল। গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বিষয়টির অবতারণা-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে লোকবল-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতি অল্পদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক লোক-বল কংগ্রেসের (ইন্টারন্যাশনাল পপিউলেশান কংগ্রেস) বিভিন্ন অধিবেশনে (জেনেভা, রোম, বার্লিন, প্যারিস) ভারতীয় সুধীগণের রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, লোকবিদ্যা মূলতঃ সংখ্যাশাস্ত্র বা মাপজোকের বিজ্ঞান। লোকবল নীতি সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত গঠনের জন্য ভারতের সুধীবর্গ, সংবাদসেবী ও গ্রন্থকারদের পক্ষে জেনেভার লীগ অব্ নেশ্যন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন দেশের জন্ম, মৃত্যু ও জনবৃদ্ধির হার বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তিনি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন। "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত, চৈত্র ১৩৪৩ ও আষাঢ় ১৩৪৪।

জন-বহুল হয়েছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের হেল্‌থ কমিশনার, ডক্টর রাধাকমল মুখার্জ্জী, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ, ডাঃ মনোহরলাল প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জোর মতবাদ প্রচার করে আমাদের আতঙ্কিত করতে চেয়েছেন। যুক্তিটা মোটামুটি এইরূপ—জন্মহার যেরূপ বেড়ে চলেছে, তাতে ২।১ দশকের পরে এই দাঁড়াবে যে, খেতে জুটবে না, কেননা লোকসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়ছে খাদ্য-সংস্থান সে অনুপাতে বাড়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই; অতএব জাতি যদি খেয়ে বাঁচতে চায়, তা হ'লে জন্মশাসন করুক। বার্থ্‌-কণ্ট্রোল বিষয়ক জ্ঞান সাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হোক, এ আমরা চাই, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার জন্য নয়। আতঙ্কের কারণ কতটা আছে সহজ সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে একটু আলোচনা করে দেখা যাক্। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের খবর জানি, তাদের বিয়ের বয়স বেড়ে গেছে; এটা উঠ্‌তির দিকেই; শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থের অনটন প্রভৃতি নানা কারণে আজ বাংলায় অবিবাহিত যুবকযুবতীর সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে সময়ে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে সন্তানের জনক-জননী হ'তে পারত সেই সময়টা (পিরিয়ড্‌ অব্‌ ফার্টিলিটি) সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছে অর্থাৎ কালের হাওয়ায় সন্তান-সংখ্যা তথা লোক-সংখ্যা ১৯২১-৩১ দশকের তুলনায় কম হয়ে আসার কথা। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদের স্কুল-কলেজ যত বাড়ছে অর্থাৎ মেয়েরা যত বেশী সংখ্যায় শিক্ষা পাচ্ছে, ততই দেখি যে, গলির মোড়ে মোড়ে 'সেক্সল,' 'মেন্সল,' 'স্পিটোন' প্রভৃতি এবং 'স্যানিটারী রাবার গুড্‌স' নির্লজ্জভাবে আমাদের দৃষ্টির পথে দাঁড়িয়ে আছে। যুবক বন্ধুদের কাছে শুনি জেলাসহরেও এইসব দ্রব্য ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের জীবনে বার্থ্‌কণ্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট্‌স্‌ প্রাধান্য বিস্তার না করলেও একালের

ইংরাজী-শেখা ছেলে-মেয়েরা জন্মশাসন করতে ভয় পায় না, সফল হয় কি না কে জানে? জাপানের সংস্কৃতি অনেক অংশে ভারতের অনুরূপ; তারাও জন্মশাসনকে প্রীতির চোখে দেখে না, তবু সেখানে তার প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশেও কিছু অন্যথা হবে না। সুতরাং জন্মহার যে দিন দিন বেড়েই যাবে তাই বা বলি কি করে? তা ছাড়া জন্মহারকে প্রতিহত করতে মৃত্যুহার রয়েছে। ম্যালেরিয়া, শিশু-মৃত্যু, প্রসূতী মৃত্যু, মহামারী প্রভৃতি আছে। টিউবারকুলেসিস্ অ্যাসোসিয়েশন্ কিছু আশাপ্রদ কথা বলেন না। তার উপর আছে ভূকম্প, প্লাবন প্রভৃতি। এইসব কথা আলোচনা করলে কি আমরা লোক-বৃদ্ধির আভাস পাই? রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' কাগজে যে ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী জাতির ছবি একাদিক্রমে এঁকেছিলেন, তা হ'লে সেটা কি সব অসত্য? যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, আগামী কয়েক দশকে ভারতবর্ষে মানুষ পঙ্গপালের মত সংখ্যাতীত হবে, তবু আমরা বল্‌ব বাংলার সমস্যা বিভিন্ন, বাংলার লোকসমস্যা আলাদা।

খাদ্য সংস্থানের কথা ধরা যাক্। ভারতবর্ষে যত চাষের উপযোগী জমি আছে, তার হিসাব করে বলা হয়েছে যে, যদি সব জমিই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হ'লেও বাড়তি জনবলের খোরাক জুটবে না। যে যুগে আমরা বাস কর্‌ছি, তাতে সুফলা ও অফলা জমির ভাগ করি কি করে? ইতালীতে গম উৎপাদন করা যায় বা ইতালি গম সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হ'তে পারে, একথা ২।৪ বৎসর পূর্ব্বে কেউ বিশ্বাস করত না; অথচ সেই ইতালীতেই আজ প্রচুর গম জন্মেছে। ইতালীর ল্যাণ্ড রিক্লামেশন্ পলিসি এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান নয়কে হয় করে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে যথেষ্ট বাড়ান যায়। সুতরাং থিয়োরেটিক্যালি

খাদ্য শস্যের উপযোগী জমির অভাব নেই। তাছাড়া প্রাণ ধারণের জন্য কতটা খাদ্য প্রত্যেকের প্রয়োজন তা কি নির্ণিত হয়েছে? 'ডায়েট্' সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নি বল্‌লে অন্যায় হয় না। অধিকন্তু ডায়েটিষ্টদের মতের এত তফাৎ বা এত সহজেই তাঁরা মত পাল্‌টে ফেলেন যে, তাঁদের কথায় কোন বিশ্বাস করা যায় না। রাধাকমলবাবু বলেন "গড়পড়তা ১৯৩১ সনে ভারতবাসী খাদ্য পাইয়াছে ১৬৫৭ ক্যালরী, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততঃ ২,৪০০ ক্যালরী না হইলে চলিবে না।" কি হিসাবে তিনি এই সিদ্ধান্ত কর্‌লেন জানি না। ইয়োরোপীয়দের ক্যালরীর হিসাব ঠিক তার পরেই দেওয়া হয়েছে দেখে মনে হয়, তিনি ইয়োরোপীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ডে এটা স্থির করেছেন। তা যদি করে থাকেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল করেছেন। ডাল-ভাত খাওয়া লোকদের ক্যালরীর পরিমাণ অল্প হয় এবং তার জন্য এফিসিয়েন্সী কিছু মাত্র কমে না, প্রমাণ-স্বরূপ ঘরের পাশে জাপান রয়েছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ও একথা বলেছেন। আর এক কথা—যারা যবের ছাতু খায় তারা ছোলার ছাতুও খেতে পারে। ভুট্টার ও গমের রুটীর মত কার্পাস বীজেরও (কট্‌ন্‌সীড্) রুটী হয়। মার্কিণেরা এ বিষয়ে গবেষণা করেছে। সুতরাং চেষ্টা থাক্‌লেই খাদ্যের নূতন নূতন উৎস আবিষ্কার হতে পারে।

ভারতের লোক যখন প্রধানতঃ কৃষির উপরই নির্ভর করে, তখন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি-জনিত দুঃখ-দারিদ্র্য এড়ানোর প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি করা। ভারতীয় পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন, কিন্তু তা করার পথে যে বাধা আছে তার উল্লেখ করে জন্ম-শাসনকেই আশ্রয় করতে বলেন। ভারতে উত্তরাধিকার ও ভূমি-সংক্রান্ত যে বিধি প্রচলিত আছে তাতে ভূমি খণ্ডিত হ'তে হ'তে আন্-ইকনমিক লিমিটে এসে পৌছেছে এবং এই "ফ্রাগমেন্‌টেশন্" বা

খণ্ডিত হওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা চলে না। অতএব বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে গেলে ভূমিকে "কন্‌সলিডেট্" বা একত্রীভূত করতে হবে। অবশ্য বংশপরম্পরায় জমির অংশ পেতে পেতে জমির ভাগ পাওয়া নিয়ে কলহ সৃষ্টি করা আমাদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা বলে সমস্যাটা এড়িয়ে গিয়ে জন্মশাসনের পক্ষে ওকালতী করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সুতরাং যদি আমরা কল্যাণ কামনা করি দারিদ্র্যকে বনবাস দিতে চাই, তাহ'লে উত্তরাধিকার (সাক্‌সেশন্) আইন ও ল্যাণ্ডল'র সংস্কারের জন্যে উঠে পড়ে লাগব। এ বিষয়ে সরকারের মুখ চেয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। লেজিস্‌লেচার যখন আমাদের হাতে তখন আমাদেরই এ বিষয়ে এগিয়ে আস্‌তে হবে। এবং সেজন্য প্রপ্যাগাণ্ডার দ্বারা সাধারণের মতকেও এর অনুকূল করতে হবে। আমাদের মনে হয়, জন্মশাসন সম্বন্ধে প্রপ্যাগাণ্ডার পূর্ব্বে ভূমির উন্নতিকল্পে কেন সাক্‌সেশন্ ল ও ল্যাণ্ড ল'র পরিবর্ত্তন আবশ্যক তা সর্ব্বসাধারণকে জানান উচিত। ইয়োরোপের দৃষ্টান্তও এরই অনুকূল সাক্ষ্য দেয়।

লোকবৃদ্ধিজনিত দারিদ্র্য নিবারণের আর এক উপায় হচ্ছে শিল্পের উন্নতি-সাধন। ডক্টর মনোহরলাল বলেছেন "অকৃতকার্য্যতার দ্বারা ব্যবসায়ের বহুদর্শিতা ও জ্ঞান অর্জ্জন কর্‌বার সাধ্য আমাদের নেই।" একটা প্ল্যানিং দরকার। খুব ঠিক কথা। যেসব বিষয়ে আমাদের সুবিধা আছে এবং বহির্ভারত হ'তে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা অল্প, সেই সব শিল্পেই আমাদের প্রথম নজর দেওয়া উচিত। হেভি ইন্‌ডাষ্ট্রী যাতে গড়ে ওঠে তার চেষ্টা আবশ্যক। যদি তা না করি তাহ'লে বৃথা অর্থ নষ্ট হবে এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে তা মোটেই কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। "মোটর তৈয়ারীর জন্য লাগে ৪০।৪৫ রকম লোহা বা ষ্টীল; এর মধ্যে পনর রকম ষ্টীলও ভারতে প্রস্তুত হয় কিনা সন্দেহ।"

এরূপ ক্ষেত্রে মোটর তৈয়ারীর কল্পনা না করে বিভিন্ন টাইপের ষ্টীল্ ও এঞ্জিন তৈরীর চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নতুবা কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় হয় এবং তাতে লোকের দারিদ্র্যের পথ সুগম করে দেওয়া হয়। আসলে দেখতে হবে ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ওয়েষ্টফুল হচ্ছে কি না। প্ল্যানিং (ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল) যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তা হ'লে লোকবল-বৃদ্ধির আতঙ্ক কেটে যাবে।

লোক-হ্রাসের সম্ভাবনা

লক্ষ্ণৌ সহরে লোকবল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটা ভারতীয় কন্‌ফারেন্স হয়ে গেছে (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী) এই বৈঠকে রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ সংখ্যা-তালিকার সাহায্যে ভারতীয় লোকবৃদ্ধি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করিতে চেয়েছেন এবং লোকবৃদ্ধির প্রতিকারের ঔষধও বলে দিয়েছেন।

পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত ব্যাধি ও দাওয়াই দুইই পরখ্ করে দেখা যাক্। সেন্সাস্ রিপোর্টে জন্ম-সংখ্যা ও মৃত্যু-সংখ্যা প্রতি দশ বৎসর অন্তর দেওয়া থাকে এবং মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা বেশী থাকলে বলি যে, লোকবল বেড়েছে। শুধু কোন বৎসরের জন্ম-সংখ্যা দেখে জনবলের-প্রজনন শক্তি কি তা বলা যায় না। সমস্ত আয়ুষ্কালের মধ্যে মাত্র কয়েক বৎসরই মানুষ জনক-জননী হ'তে পারে। সুতরাং কোন্ বৎসরে কত লোক জন্মাবে তা নির্ভর করে কোন্ বয়সের কত লোক জনসমষ্টিতে আছে তার উপর; এটা আবার নির্ভর করে কোন্ বয়সে কত লোক মরে এবং কোন্ বয়সে প্রজনন-শক্তি কত তার উপর। একটা বয়স অতিক্রম করলে মানুষের মৃত্যুহারও বাড়ে; সুতরাং একটা জনসমষ্টির 'এজ্ কম্পোজিশন্'এর উপর মৃত্যু-সংখ্যাও নির্ভর করে।

সুতরাং কোনো বৎসরের মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্ম-সংখ্যার আধিক্য দেখে এটা জোর করে বলা যায় না যে, ভবিষ্যতেও লোকবল একই ভাবে বাড়বে। জীবনের যে সময়টায় নারী সন্তানবতী হয় সেই সময়ের বিভিন্ন বয়সের জন্ম-হারের সঙ্গে প্রত্যেক বয়সের নারীর বাঁচবার সম্ভাবনা কতখানি তা জানবার দরকার হয়। রাধাকমল বাবুর লেখায় এ ভাবের আলোচনার চেষ্টা দেখি না। সুতরাং তাঁর আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত নয় এবং তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

অতিমাত্রায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি বল্‌তে আমাদের অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা কি বোঝেন তাও স্পষ্ট করে বলেন নি। বস্তুতঃ অতিবৃদ্ধি দারিদ্র্যেরই নামান্তর। দারিদ্র্যের সঙ্গে জনবল-বাহুল্যের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। জাতিগত আচার ব্যবহার, আহার প্রভৃতির উপর লোকের জীবন-যাত্রা-প্রণালী নির্ভর করে। সুতরাং বিভিন্ন দেশের জীবন-যাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন। তাই ইয়োরোপীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ডে ভারতবাসীর জীবন-যাত্রা-প্রণালী 'নিম্ন' শ্রেণীর মনে হতে পারে, তা বলে তাহা হেয় নয়। ভারতবাসীর যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড, জীবনযাত্রা-প্রণালী তার চেয়ে নীচু হলে দেশ জনবহুল হয়েছে বলা চল্‌তে পারে। রামমোহন রায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জীবনযাত্রা-প্রণালীর যে চিত্র এঁকেছেন তা এই—"বঙ্গদেশে লোকে সাধারাণতঃ ভাত, সামান্য তরকারী, লবণ, মরীচ ও মাছ খাইয়া জীবনধারণ করে। আমি কখনো কখনো এও দেখেছি যে, অপেক্ষাকৃত গরীব লোকেরা কেবল ভাত ও লবণ খায়'। এই একশত বৎসরে লোক-সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তা বলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লাইফ্‌ কিছু খারাপ হয় নি, বরং উন্নতই হয়েছে। সেন্সাস রিপোর্টেও সে কথা বলা হয়েছে। দেশ-ভেদে দারিদ্র্যেরও প্রকার-ভেদ দেখা যায়। যে আয়ে এক দেশে এক-জনকে ধনী বলা যায়, সেই আয়ে হয়ত অন্য দেশে গরীব নামেই চলে। সুতরাং বর্ত্তমান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে বা ১৮৩১ সনের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে ভারত এখনও

অনেক লোক পুষতে পারে—তাকে পশ্চিমা ষ্ট্যাণ্ডার্ডে গরীবিয়ানা বললেও।

ভারতের লোকবৃদ্ধির হার ঠিক করা কঠিন। প্রত্যেক বারই সেন্সাস নেবায় সময়ে নতুন নতুন অঞ্চল জুড়ে দেওয়া হয়; অধিকন্তু সেন্সাস গ্রহণেরও কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। গত ষাট বছরের সেন্সাস রিপোর্ট দেখলে জানা যায় যে, প্রত্যেক দ্বিতীয় দশকে লোকবৃদ্ধির হার হাজার করা দু'য়ের নীচে দাঁড়িয়েছে—

১৮৭২—১৮৮১	...	১·৫	হাজার করা প্রতি বৎসর
১৮৮১—১৮৯১	...	৯·৬	,,
১৮৯১—১৯০১	...	১·৪	,,
১৯০১—১৯১১	...	৬·৪	,,
১৯১১—১৯২১	...	১·২	,,
১৯২১—১৯৩১	...	১০·২	,,

বৃদ্ধির হারটাও কোন দশকে সমান নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষের লোক-বৃদ্ধির কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। এরূপ ক্ষেত্রে লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তা বিবেচ্য। শিল্পোন্নতির প্রথম যুগে বিলাত, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইতালী প্রভৃতি দেশে লোকবৃদ্ধির হার কিছু বেড়েছিল; ভারতও যখন শিল্পনিষ্ঠ হ'তে চলেছে, তখত ভারতেও অনুরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তারপর বৃদ্ধিহার রুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। ভারতের অতিরিক্ত লোক বাড়ার সম্ভাবনা কত অমূলক তা বোঝানোর জন্য অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার একটা তালিকা তৈরী করে দেখিয়েছেন, কত বৎসরে বিভিন্ন দেশের লোকবল দ্বিগুণিত হবে। তাঁর রচনা ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে রোমে ১৯৩১ সনে, আর ইংরেজি ভাষায় ১৯৩২ সনে। বর্ত্তমান বাড়তির হার অনুসারে ভারতবর্ষে ১০১·৬

বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হ'তে পারে, অথচ পঞ্চাশ বৎসরের কম সময়ে দ্বিগুণিত হবে রুশিয়া, মিশর, আর্জ্জেন্টিনা, চিলি, জাপান ও পোল্যাণ্ডে, আর ৫০ হতে ৭৫ বৎসর মধ্যে ক্যানাডা, হল্যাণ্ড, বুল-গেরিয়া, পর্ত্তুগাল, অষ্ট্রেলিয়া, লিথুয়ানিয়া, রুমানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইতালি ও স্পেনে এবং ৭৫ হতে ১০০ বৎসরের মধ্যে মার্কিণ, ডেনমার্ক, হাঙ্গারী, চেকো-শ্লোভাকিয়া ও নরওয়েতে। অধ্যাপক সরকারের এই হিসাব অনুসারে ভারতের চেয়ে দুনিয়ার অন্য দেশেরই ভয়ের কথা বেশী।

দেশের লোক কি রকম বাড়বে তা অনেক অংশে নির্ভর করে সন্তানোৎপাদনের শক্তি-সম্পন্ন নরনারীর অনুপাতের উপর। যদি মেয়েদের বেলায় ১৫ হ'তে ৪৫ পর্য্যন্ত জননী হবার আর পুরুষের বেলায় ২০ হ'তে ৫০ পর্য্যন্ত জনক হবার বয়স বলে ধরি, তা'হলে দেখতে পাই যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রতি সহস্র পুরুষের স্থানে ১০৫৯ মেয়ে আছে, হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই বলে ঐ বয়সের ৮৩,১৩,৭৭৩ জন বিধবাকে বাদ দিলে পুরুষ-নারীর অনুপাতটা দাঁড়ায় ১০০০ : ৮৯৭। জৈনদেরও বিধবা বিয়ে নেই; তাই পুরুষের তুলনায় ২০% মেয়ে ওদের মধ্যে কম; শিখদের মেয়ে-সংখ্যা ১৫% কম। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা আরো বেশী (১০০০ : ১০২৬); ক্রিশ্চানদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা আরো বেশী (১০০০ : ১০৮০)। এইসব হিসাবই 'রিপ্রডাকৃটিভ্ পিরিয়ডের'। এ থেকে অনেকটা বোঝা যায়, কেন হিন্দুব'চেয়ে বা জৈনদের চেয়ে মুসলমানদের বা ক্রিশ্চানদের মধ্যে জন্মহারটা বেশী। অধিকন্তু হিন্দুদের মধ্যে অল্প-বয়স্ক ও অধিকবয়স্ক বিধবাদের সংখ্যা বেড়েছে—

বিধবার বয়স	১৯২১	১৯৩১	% পরিবর্ত্তন
০—১	৫৯৭	১০৮১	+ ৮১
১—২	৪৯৪	১৩৪২	+ ১৭২
২—৩	১২৫৭	২৬২৯৫	+ ১১৪২
৩—৪	২৮৩৭	৭০৭৮	+ ১৫০
৪—৫	৬৭০৭	১১,৪৭১	+ ৭১
১৫—৪০	৫.৮১৭.৭৮১	৫,৯৮১,০৯৬	+ ৩ (কিছু কম)

সুতরাং বিধবার সংখ্যা যদি এইভাবে বাড়ে, তাহ'লে পরবর্ত্তী ২।৩ দশকের সেন্সাস গ্রহণের সময় হিন্দুর সংখ্যা যে ভয়াবহ রকম বাড়বে তা কি বলা যায়? এমনিইত দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা বেশী এবং এটা যদি থেকেই যায় বা ছেলের সংখ্যা তুলনায় আরো বাড়ে তা হ'লে পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে এবং তার ফলে মেয়েদের বিবাহের বয়স নেমে যাবে; তা ছাড়া বিধবা বিবাহের চলন না থাকার জন্য বিপত্নীকগণ বিবাহ করলে স্বামি-স্ত্রীর বয়সের বেশী পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক এবং তার ফলে সন্তান-সংখ্যা কম হওয়াই সম্ভব।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। তিরিশ বৎসর বয়সের পর মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা কম হয়ে আসে—প্রতি সহস্র পুরুষে—

বয়স			মেয়েদের সংখ্যা
১৫-২০	...	...	১০১২
২০-২৫	...	...	১০২৪
২৫-৩০	...	...	৯০৬
৩১-৪০	...	...	৯৪৫
৪০-৫০	...	...	৭৯৮

এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কয়েকটী সন্তানের জননী হবার পরও মেয়েদের মধ্যে বেশী মৃত্যু হয়। সুতরাং যে সময়ে তাদের জননী হবার প্রকৃষ্ট সময় সেই সময়েই তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এর গুরুত্ব আরো বেশী করে উপলব্ধি করব যখন এটা স্মরণ রাখব যে, গড়ে ভারতীয় বিবাহিত নারীর ৪টী জীবিত সন্তান হয় এবং তার মধ্যে মাত্র ২·০টী বাঁচে। এরূপ ক্ষেত্রে লোক-বৃদ্ধি সম্বন্ধে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত?

আমরা দিন দিন সহরমুখো হ'য়ে পড়ছি; সেন্সাস রিপোর্টে সহরের সংখ্যাও বেড়েছে দেখছি। সহরগুলিতে সাধারণতঃ পুরুষ-সংখ্যা বেশী। কিন্তু এও লক্ষ্য করবার মত যে, সহরে প্রতি সহস্র বিবাহিত পুরুষের অনুপাতে বিবাহিত নারীর সংখ্যা ঢের কম—

		বিবাহিত নারী প্রতি হাজার বিবাহিত
বোম্বাই	...	৪৯৯
কলিকাতা	...	৩৬৫
মাদ্রাজ	...	৯৩৬
লাহোর	...	৬৪৬
দিল্লী	...	৭৫৪
করাচী	...	৬৭৯
হাওড়া	...	৪৪৭
কানপুর	...	৭৩১
বেনারস	...	৭৭৬

অর্থাৎ অধিকাংশ বিবাহিত পুরুষই স্ত্রীকে গ্রামের বাড়ীতে একলা রেখে সহরে একলা থাকেন। যতই ভারত শিল্পনিষ্ঠ হ'তে থাক্‌বে এ ধারা ততই অধিকতর পরিমাণে চল্‌বে এবং স্বামী ও স্ত্রী পৃথক বাস করলে সন্তান-সম্ভাবনাও কম হয়ে আস্‌বে।

এ পর্য্যন্ত যা আলোচনা করলাম তাতে অতিমাত্রায় লোক-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কত অল্প তাই দেখাতে চেষ্টা করেছি।

জন্মশাসন-আন্দোলনের দৌড়

এইবার তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ যে, লোক-বাহুল্যের যে আতঙ্ক পণ্ডিতরা দেখিয়েছেন, তা সত্য। কিন্তু তা হ'লেও কি জন্মশাসনই তার ঔষধ? জন্মশাসন বল্‌তে কি বুঝায়? নর-নারীর যৌন-সম্পর্কের ফলে অনেক সময়েই পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্তান জন্মে; জন্ম-শাসন প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা নারী নিজের দেহের উপর সেই অধিকার লাভ করে, যাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর তাকে জননী হতে না হয়। অতএব জন্ম-শাসনের মূল কথা হচ্ছে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান-সন্ততি প্রজনন, প্রজনন-রোধ বা 'বার্থষ্ট্রাইক্' নয়। লোক-বাহুল্যের প্রতিকাররূপে জন্ম-শাসন প্রবর্ত্তন করতে চাইলে বুঝতে হবে, জন্ম-শাসন বলতে আমরা জন্মরোধই বুঝ্‌ছি ইচ্ছানুযায়ী প্রজনন বুঝ্‌ছি না। জন্ম-শাসনের এটা হ'ল বিকৃত অর্থ।

এই বিকৃত অর্থে জন্মশাসন ব্যবহার কর্‌লেও যে তার ফলে লোক-বৃদ্ধি কম্‌বে, তা বলা যায় না। জন্মের চেয়ে মৃত্যুর পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবেই লোকসংখ্যা কম্‌তে পারে। ধরা গেল ব্যাপকভাবে জন্মশাসন গ্রহণের ফলে জন্মহার কমেছে; কিন্তু তা বলে যে লোকবৃদ্ধির হারও কমবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না; কেন না সেই সময়ের মধ্যে যদি মৃত্যুহারও কমে এবং জন্মহারের তুলনায় বেশী কমে, তা হ'লে জন্মহার কম হওয়া সত্ত্বেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সেন্সাস অনুসারে ১৯০১-১০ দশকে ভারতে মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ৪৩; আর ১৯২১-৩০ দশকে দাঁড়ায় ২৫। সুতরাং সেন্সাস অনুযায়ী মৃত্যু-হার আমাদের দেশে কমে আসছে। সেন্সাস অনুযায়ী ১৯০১-১০ দশকে

ভারতে জন্মহার ছিল ৩৮; ১৯২১-৩০ দশকে দাঁড়ায় ৩৫। সুতরাং এই হিসাবে দেখ্‌ছি যে, ১৯০১ থেকে ১৯৩০এর মধ্যে জন্মহার কম্‌লেও ভারতের লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে; কারণ মৃত্যুহার তুলনায় অনেক বেশী কমেছে। অতএব শুধু জন্মশাসন দ্বারাই লোকবৃদ্ধি কম্‌বে না।

জন্মরোধের তিনটি উপায় আছে:—(১) পুরুষ-নারীর যৌন সম্পর্ক পরিহার (২) বন্ধীকরণ (ষ্টেরিলাইজেশন) (৩) কৃত্রিম উপায়ে বাধা সৃষ্টি—রাসায়নিক দ্রব্য, রবার যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার। জন্মশাসন বল্‌তে এই তৃতীয় প্রক্রিয়াই বুঝায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত যে-সকল জন্মশাসনের উপকরণ পাওয়া যায়, তা' যে-দামে বিক্রী হয়, সাধারণ লোকের পক্ষে তা' কিনে ব্যবহার করা সাধ্যাতীত। বিলাতের কথা বলতে গিয়ে জর্জ্জ রিলি স্কট্ বলেছেন যে, সেখানকার মজুরশ্রেণীর নারীরা বার্থকণ্ট্রোল মেথড্ অবলম্বন কর্‌তে পারে না; কারণ, প্রথমেই হয়ত ১০ শিলিং (প্রায় ৭৲) খরচ করতে হয়, আর নয় ত সপ্তাহে ১ শিলিং থেকে ৩ শিলিং (৵০ হ'তে ২।০) পর্য্যন্ত খরচ করতে হয়। আমাদের দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সেটা আরও কত দুঃসাধ্য! তা ছাড়া এদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী, তাই বই পড়ে যে কিছু জ্ঞান লাভ কর্‌বে তার উপায় নেই। ডাক্তাররাই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং লোকে উপদেশই বা নেবে কার কাছ থেকে?

অবশ্য এর প্রতিকারকল্পে বার্থকণ্ট্রোল আন্দোলনকারীরা বল্‌ছেন যে, স্থানে স্থানে ক্লিনিক্ (হাঁসপাতাল) খোলা হোক, তাহ'লেই জন্মশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞের কাছে শিক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে, তা মনে হয় না। বিলাতের সোসাইটী ফর্ দি প্রভিশান্ অব্ বার্থকণ্টোল ক্লিনিকস্ ১৯৩১ সনের এক হিসাব দাখিল করেছেন; তাতে দেখিয়েছেন কোন্ সহরের

ক্লিনিকে এক বৎসরে কত মেয়ে জন্ম-শাসন-সংক্রান্ত উপদেশ নিতে এসেছিল—

ওয়াল্‌ওয়ার্থ	...	১৪৭৭
গ্লাস্‌গো	...	২৯৭
ম্যান্‌চেষ্টার	...	৩৯৯
অক্সফোর্ড	...	৩১
কেম্‌ব্রিজ	...	১২২
নর্থ কেন্‌সিংটন্‌	...	৬৫৩
উল্‌ভারহ্যাম্পটন	...	১৭৬
ইষ্ট লণ্ডন	...	৭১৭
অ্যাবার্ডিন	...	৯৩
বার্মিংহাম্‌	...	৬২৪
ব্রিষ্টল্‌	...	১০৬

কয়েক বৎসর ধরে আন্দোলন চলার পরেও বিলাতের মত প্রগতি-প্রবণ দেশেই মেয়েরা গাদায় গাদায় এসে জন্মশাসনের পুঁথি পড়ে যায় নি। সেরূপ ক্ষেত্রে এদেশে যে সবাই জন্মশাসনকে বরণ করে নিয়ে জন্মরোধ করে বস্‌বে, তা বলা যায় কি? অধিকন্তু বন্ধ্যাত্বকে আমরা এতই ঘৃণার চোখে দেখি যে, মেয়েরা যে অস্থায়ী বন্ধ্যাত্বও স্বেচ্ছায় বরণ করে নেবে তাও মনে হয় না। প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ ম্যাগ্‌নাম হার্শফিল্ড ভারতভ্রমণে এসে দেখেছিলেন যে, মেয়েরা তাঁর কাছে বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার উপায় জান্‌তে চায়, জন্মশাসন কি ক'রে করা যায়, তা জান্‌তে চায় না। এ থেকেও বোঝা যায়, জন্মশাসনকে এ দেশের মেয়েরা কি চোখে দেখে।

ডাঃ নর্ম্যান হেয়ার "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্‌ সেক্সুয়াল নলেজ" গ্রন্থে বলেছেন যে, বাজারে প্রায় শতাধিক জন্মশাসনের উপায় প্রচলিত

আছে; এর মধ্যে অনেকগুলিই বিশেষ হানিকর, কয়েকটা মাত্র দোষদুষ্ট নয়। অধিকন্তু সকলের পক্ষে একই উপায় কার্য্যকর হয় না; তাই জন্মশাসন যদি কর্‌তেই হয়, জন্মশাসনের উপায় অবলম্বনের পূর্ব্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণের মনে যৌনসংক্রান্ত বিষয়ে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে ব'লে সাধারণে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়ার পরিবর্ত্তে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। তার ফলে বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতারিত হয়। রাস্তার মাঝে মাঝে জন্মশাসনের পেটেন্ট মেডিসিনের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যেরকম নির্লজ্জভাবে আমাদের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করে, তাতে বুঝা যায় যে, জন্মশাসন কর্‌তে এ দেশের কেউ কেউ এখন ভয় কিংবা সঙ্কোচ বোধ করছেন না। কিন্তু কোন্‌টা নিরাপদ, দোষদুষ্ট নয়, তা জান্‌বার উপায় নেই। ক্লিনিক হয় ত' এ বিষয়ে কিছু সাহায্য কর্‌তে পারে। কিন্তু ভাব্‌বার কথা এই যে—এই "নিরক্ষর" "অর্দ্ধশিক্ষিত" দেশে জন্ম-শাসন আন্দোলন চালালে বিজ্ঞাপনের জোরে সত্যিকারের নির্দ্দোষ দ্রব্যের (হার্মলেস্ কন্‌ট্রাসেপ্‌টিভ্‌স্) বদলে দোষার্হ (হার্মফুল) পণ্য সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবারই সম্ভাবনা। কেন না এ বিষয়ে গোপনভাব অবলম্বনই স্বাভাবিক, অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে কেউ যাবে না।

বাল-মাতৃত্ব ভারতে কতটা?

জন্মশাসনের আন্দোলনকারীদের একটা যুক্তি এই যে, আমাদের মধ্যে মৃত্যুহার অধিক বলে জন্মহারও অধিক; কেন না তা না হ'লে সৃষ্টি থাকে না; এবং মৃত্যুহার অধিক হবার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল বাল্য-বিবাহ এবং তার ফলে মেয়েদের অল্প বয়সে মাতৃত্বলাভ।

১৯২১-৩০ সনের বাঙ্গালা দেশের সেন্সাসে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, বাৎসরিক এক হাজার মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে—

বসন্ত রোগে	১৫'৭ পুরুষ	১৫'৯ নারী
আমাশয় ও পেটের পীড়ায়	২৪'০ ,,	২৩'২ ,,
ফুসফুসের পীড়ায়	৩৫'৫ ,,	২৪'০ ,,
ওলাউঠায়	৫৯'০ ,,	৫৯'৯ ,,
জ্বরে	৭১২'৫ ,,	৭৬৮'৫ ,,

মারা যায়। আর গ্রামের প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে ১৫'৯ জন মরে জ্বরে। আবার জ্বর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

ম্যালেরিয়া	...	৭'৬৮
এন্টারিক্ ফিভার	...	০'২৩
হাম ...	...	০'০৬
রিল্যাপসিং ফিভার	...	০'১১
জালাজ্বর	...	০'২৩
অন্যান্য ...	...	৭'৫৯
মোট		১৫'৯

কোন্ রোগে কত লোক ভোগে তার কোন হিসাব পাইনি, তবু মৃত্যু-তালিকা দেখে এটুকু অনুমান করা যায় যে, জ্বরব্যাধি বাঙ্গালীর মধ্যে খুব বেশী প্রবল এবং তার মধ্যে ম্যালেরিয়াই প্রধান। ম্যালেরিয়া ভোগার ফলে শরীর যে কতখানি নিস্তেজ হয়ে যায়, তা' যাঁরা ভুগেছেন তাঁরাই জানেন। জ্বরভোগের উপর যদি জননীত্ব চেপে বসে, তা হ'লে যমের কবলে পড়া অবশ্যম্ভাবী। এরূপক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কোনটা? মাতৃত্ব না জ্বরের অত্যাচার? যদি ঔষধের বিধান দিতে হয় তা হ'লে

জ্বরের প্রতিষেধক নির্দ্দেশ করাই কি বেশী যুক্তি-সঙ্গত নয়? তা না হলে গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া হয় না কি?

বাল-মাতৃত্ব যে কতটা ব্যাপক তাও ভেবে দেখা দরকার। মিষ্টার ব্যাল্‌ফুর ২৯২৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরের একটা হিসাব দেন; সেটা এই (টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া, ১লা 'অক্টো' ২৭—হার্শফিল্ডের 'উওম্যান্ ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট' গ্রন্থে উদ্ধৃত):—

"প্রথম প্রসবের জন্য বোম্বাই হাসপাতালে ৩০৪টি হিন্দুনারী আসেন। তাঁদের বয়স ছিল গড়ে ১৮·৭ বৎসর; ৮৫·৬%এর বয়স ১৭ বা অধিক; ১৪·৪%এর বয়স ১৭র কম। সব চেয়ে যার বয়স কম ছিল তার বয়স ১৪; এরূপ মেয়ে ছিল মাত্র তিনটি। এই হিসাবের সঙ্গে আমি মাদ্রাজের মেটার্নিটি হস্পিট্যালের ১৯২২-২৪ খৃঃ-এর হিসাব মিলিয়ে দেখেছি। সেখানে এই সময়ের মধ্যে ২১৩২টি নারীর প্রথম সন্তান জন্মে; গড় বয়স ছিল ১৯·৪ বৎসর; ৮৬%এর বয়স ১৭ বা ততোহধিক ছিল, আর ১৩·৮% এর বয়স ১৭র কম। সব চেয়ে কম যার বয়স তার বয়স ১৩। আর ১৪ বৎসরের মেয়ের সংখ্যা ছিল ২২টি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (উত্তরাঞ্চল সুদ্ধ) ২৯৬৪ জন প্রসূতীর হিসাব নিয়ে দেখেছি: এই হিসাবে মাত্র ১০ জন প্রসূতীর বয়স ১৫র কম ছিল।" সুতরাং ব্যালফুরের এই হিসাব থেকে বুঝা যায় যে, ভারতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত বলে যে বাল-মাতৃত্ব ব্যাপক, একথা সত্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাল-মাতৃত্ব হয় বটে, তা বলে সেটা সার্ব্বজনীন নয়।

এবার লোকবৃদ্ধির কথা আলোচনা করে দেখা যাক্। এই লোক-বৃদ্ধি কতটা ভয়ের কারণ এবং তার জন্য জন্মরোধের আন্দোলন চালান প্রয়োজন কি না, তা বিচার করা যাক্। সেন্সাসের হিসাব অনুসারে ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ এই পঞ্চাশ বৎসরে লোকসংখ্যা বেড়েছে ৯৮,৯৪১,৪৪৮।

১৮৮১ খৃঃ	...	২৫৩,৮৯৬,৩৩০
১৮৯১ ,,	...	২৮৭,৩১৪,৬৭১
১৯০১ ,,	...	২৯৪,৩৬১,০৫৬
১৯১১ ,,	...	৩১৫,১৫৬,৩৯৬
১৯২১ ,,	...	৩১৮,৯৪২,৪৮০
১৯৩১ ,,	...	৩৫২,৮৩৭,৭৭৮

কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রের লোকসংখ্যা গণনা করা হয়েছিল, ১৯৩১ খৃঃ-এ তার চেয়ে ৪২৬,০৫৫ বর্গমাইল বেশী স্থান অন্তর্ভূক্ত করা হয়; সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরে প্রকৃত জনবল বৃদ্ধি ৯৮,৯৪১,৪৪৮ নয়, তার চেয়ে কম (৯৮,৯৪১,৪৪৮—১০,৩০১,০৩৫)। এই বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বা ভয়ঙ্কর কোন রকমেই বলা চলে না, ইয়োরোপের দেশগুলির তুলনায় তা মোটেই বেশী নয়।*

(১৮৮০-১৯৩০) পঞ্চাশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রে লোক বেড়েছে ১৮৬%

,,	,,	জাপানে	,,	৭৪·১ ,,
,,	,,	গ্রেট-বৃটেনে	,,	৫৪·১ ,,
,,	,,	ইটালীতে	,,	৪৬·৮ ,,
,,	,,	সুইট্‌সারল্যাণ্ডে	,,	৪৩·৫ ,,
,,	,,	জার্ম্মাণিতে	,,	৪২·২ ,,
,,	,,	ভারতবর্ষে	,,	৩৯·০ ,,
,,	,,	বাংলায়	,,	৩৭·৯ ,,

স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও ফ্রান্স ছাড়া আর সব দেশেই পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী।

দুই দশকের লোকবৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষ্য করে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে

* অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রণীত "বাড়তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) গ্রন্থের "জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধির হারে বাঙালী জাতি" অধ্যায় (৪১৪ পৃষ্ঠা) এবং "দি সোশিঅলজি অব্ পপিউলেশন" গ্রন্থ (কলিকাতা ১৯৩৬) দ্রষ্টব্য।

উপনীত হওয়ায় বিপদ আছে, কেন না, দিন দিন সেন্সাস গ্রহণের উপায়ের উন্নতি হচ্ছে ; তার ফলে এই দশকে যেটা হ্রাস বা বৃদ্ধির উন্নতি বলে মনে হচ্ছে, তা হয় ত প্রকৃত পক্ষে ঠিক তার উল্টা। সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ও হায়দ্রাবাদের লোকের বাঁচার সম্ভাবনা বা এক্স্‌পেক্‌টেশন অব্‌ লাইফ লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৩১ সনের তুলনায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই বেশী দিন বাঁচার সম্ভাবনা আশা করা যেত। অথচ ১৯৩১এ যে সেন্সাস নেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, ১৯২১এর তুলনায় মোট লোক-সংখ্যা ১৫¾% বেড়েছে ; আর সমগ্র ভারতের বৃদ্ধির হার মাত্র ১০½%। সেন্সাস কমিশনারের মতে এরূপ হবার কারণ এই যে, ১৯৩১এ সেন্সাস গ্রহণের প্রণালী অনেক উন্নত হয়েছে। অতএব লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক দেখানোর পূর্ব্বে এ কথাটাও স্মরণ রাখতে হবে।

সন্তান-প্রসবের বয়স

মেয়েদের ১৫ হ'তে ৪৫ বৎসরই সন্তানপ্রসবের বয়স সাধারণতঃ ধরা হয়। ১৯৩১এর সেন্সাস হিসাবে ভারতের লোকসংখ্যা এই বয়সেই সমধিক।

	শতকরা লোকসংখ্যা		
	০—১৫ বৎসর	২৫—৫০ বৎসর	৫০ এর বেশী
ভারতবর্ষ	৩৯.৯	৫০.৫	৯.৬
বাঙ্গালা	৪০.৮	৫১.১	৮.১
মুসলমান	৪২.২	৪৯.৩	৮.৫
খৃষ্টান	৪১.৭	৪৯.২	৯.১
ইহুদী	৩৭.৭	৫৩.৬	৮.৭
হিন্দু	৩৯.২	৫০.৯	৯.৯
শিখ	৩৯.৫	৪৮.২	১২.৩
জৈন	৩৬.৭	৫১.৭	১১.৬
পার্শি	২৭.২	৫৬.৭	১৬.১

ত্রিশ বছর পরে লোকসংখ্যা কি দাঁড়াবে মনে হয়? ১৫-৫০ বৎসর বয়সের যাঁরা তাঁরা পঞ্চাশের উর্দ্ধে গিয়ে পরবেন; অর্থাৎ এ যুগের অর্দ্ধেক লোক বুড়ো বলে আখ্যাত হবেন। লাইফ-টেব্‌লে দেখা যায়, পঞ্চাশোর্দ্ধে মৃত্যুর হার হচ্ছে শতকরা ৪·২০ থেকে ৭০·৯৯ পর্য্যন্ত, বা গড়ে শতকরা ২০। এর ফলে সমগ্র জাতেরই মৃত্যুহার এখনকার তুলনায় বেড়ে যাবে। ১৯৩১ সনের সেন্সাসে জন্মহার হ'ল হাজার করা ৩৫ ও মৃত্যুর হার হাজার করা ২৪; কিন্তু ২৪ বেড়ে যদি ৪০ হয় (যেহেতু বয়স যত বাড়তে থাকে, মৃত্যুহারও তত বাড়ে—তাই জনসমষ্টির মধ্যে প্রবীণের সংখ্যা বেশী হলে মৃত্যুহারও বেশী হয়) তা হলে এখনকার জন্মহারে লোকবৃদ্ধি না হয়ে বরং কমেই যাবে। ১৫-৫০ বয়সের লোকসংখ্যা ৫০·৫%; এই ৫০%ই অর্থাৎ জনসংখ্যার অর্দ্ধেকই বুড়োর কোঠায় উঠলে মৃত্যুহার হবে ২০%। অতএব সাধারণভাবে (সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায়) মৃত্যুহার হাজার করা ৪০ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। অন্য দিকে আবার জন্মহারটাকে মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে না করে সন্তান-উৎপাদনের-শক্তিসম্পন্ন লোকের অনুপাতেই যদি দেখি, (অর্থাৎ ১৫-৪৫ বয়সের লোকের অনুপাতেই ধরি) তা হলে দেখব যে, ত্রিশ বছরে যত মেয়ে জন্মেছে (মেয়ে বলছি এই জন্য যে, সন্তানসংখ্যা তথা লোকসংখ্যা তাদেরই সংখ্যার উপর নির্ভর করবে) লোকসংখ্যাকে অব্যাহত রাখতেই হয় ত' সমর্থ নয়। অধিকন্তু বিবাহিত নারীর ৬% প্রায় বন্ধ্যা থেকে যায়। সুতরাং এই রকম নানাদিক্ থেকে আলোচনা করে দেখার পূর্ব্বে লোকবৃদ্ধির ভয় দেখান যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। উপরে যে হিসাব দিয়েছি তাতে বুঝা যাচ্ছে, পার্শীদেরই বেশী ভাবরার কথা; কি করে লোক বাড়ে, তার চিন্তাই বেশী করা দরকার। সুন্ত্‌বার্গের থিওরী অনুসারেও এই কথাই সত্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

লোকেব সংখ্যা যদি পঞ্চাশোর্দ্ধ-বয়স্কের দ্বিগুণ না থাকে তা হ'লে লোক বৃদ্ধি না হয়ে বরং লোকহ্রাসই হয়। এখানে পার্শীদের মধ্যে ০-১৫ বয়সের সংখ্যা ২৭·১% আর ৫০ বর্ষের অধিক বয়সের লোকের সংখ্যা ১৬·১%। অতএব স্থুন্ত্‌বার্গের থিওরী অনুসারে পার্শীদের জনসংখ্যা বাড়ানোর উপায় চিন্তা করাই বেশী দরকার।

আর এক ভাবেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, প্রতি বিবাহিত নারীর গড়ে ৪টি করে জীবিত সন্তান জন্মে, কিন্তু তার মধ্যে ৭০% বেঁচে থাকে। বৃটিশ-ভারতে মোট নারীর সংখ্যা ১৯৩১ সনের হিসাবে ১৬৯,৫৫৪,০০০; আর প্রতি হাজার নারীর মধ্যে ৪৯৩ জন বিবাহিত। অতএব মোট বিবাহিত নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩,৫৮৯,১২২। এখন প্রত্যেকের গড়ে ৪টি করে সন্তান হবে ধরলে, সন্তানসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩৪,৩৫৬,৪৮৮ এর মধ্যে। আবার ৭০% সেন্সাস অনুসারে বেঁচে থাকছে। নারীর প্রজননশক্তি ৩০ বৎসর ধরলে, এই হিসাব থেকে বুঝা যায়, ত্রিশ বৎসর পরে লোকসংখ্যা না বেড়ে বরং কমবে।

নারীর সংখ্যা

দেশের পুরুষ ও নারীর অনুপাতের উপরও লোকবৃদ্ধির নির্ভর করে। পুরুষের তুলনায় যদি নারীর সংখ্যা বেশী থাকে, তা হ'লে লোক বাড়ারই সম্ভাবনা, আর কম হ'লে সন্তান-জন্মের সংখ্যাও কমে যায়। দেখা য্যয় যে, আদিম বর্ব্বর জাতিদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর অনুপাত প্রায় সমান; কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম; তার মধ্যে আবার শিখদের সব চেয়ে কম—

শিখ	প্রতি হাজর পুরুষে	৭৮৪ নারী
মুসলমান	,,	৯০৪ ,,
হিন্দু	,,	৯৫৩ ,,
জৈন	,,	৯৪১ ,,
(ট্রাইব্যাল) আদিম	,,	১০০৯ ,,
ভারতবর্ষ	..	৯৪১ ..

কিন্তু শুধু নারীর সংখ্যা দেখলেও ঠিক ধারণা হবে না। "রিপ্রো-ডাকৃটিভ পিরিয়ড্" বা সন্তান-উৎপাদনশীল বয়সের অনুপাত দেখ্লে অনুমানটা আরও ঠিক হবে। ২০ থেকে ৫০ বৎসর বয়সের পুরুষের তুলনায় ১৫ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সের নারীর সংখ্যা দেখলে জানা যায় যে, উপরে নারীর যে অনুপাত পেয়েছি তার চেয়ে নারীর সংখ্যা অনেক বেশী।

প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা

বয়স	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০	৩০-৪০	৪০-৮০
ভারতবর্ষ	৯৯১	২০২৩	৯৫২	৮৮৯	৮৬৬
হিন্দু	৯৮৩	১০২৬	৯৭৩	৯১২	৮৮৬
মুসলমান	১০১২	১০২৪	৯০৬	৮২৪	৭৯৮
খৃষ্টান	১,০০৩	১০০১	৯৪৫	৯০৩	৮৭১
আদিম জাতি	১,১৩৯	১১৪৫	১০২৬	৯৫৭	৮৯১

দেখা যাচ্ছে যে. আদিমজাতি ছাড়া সব জাতের মধ্যেই মেয়ের সংখ্যা রিপ্রোডাক্‌টিভ পিরিয়ডে কম; তবু লোক-সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, কিন্তু কেন, তার কোন ঠিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। ২৫ বৎসর বয়সের পরও মেয়েদের সংখ্যা কমে যাওয়া দেখে মনে হয় যে, শুধু প্রথম সন্তান জন্মের সময়টাই এদেশের মেয়েদের পক্ষে কাল-স্বরূপ নয়; দুই-তিন সন্তানের জননীও বহু পরিমাণে সন্তান-প্রসবের

ধাক্কা সামলাতে পারে না প্রজননশক্তিসম্পন্ন নারীর সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে ৫৪,৪৭৩,৪৪৮ আর পুরুষের সংখ্যা ৫১,৪৫০,২৬৬ ; অর্থাৎ ১০০০ পুরুষের তুলনায় ১০৫৯ নারী আছে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নেই বলে যদি বিধবাদের বাদ দেওয়া যায় (৮,৩১৩,৭৭৩) তা হলে অনুপাতটা দাঁড়ায় ৮৯৭ নারী : ১০০০ পুরুষ। জৈনদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নেই বলে নারীর সংখ্যা তুলনায় কম। শিখদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম হ'লেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। মুসলমানদের মধ্যে ও খৃষ্টানদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। দেখা যায় যে, যে-জাতের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা যত বেশী তার বৃদ্ধির হারও তত বেশী ; তাই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা বেশী বেড়েছে। এবারকার সেন্সাসে খৃষ্টান ও শিখরা খুব বেড়েছে দেখা যায় ; এই দুই জাতির মেয়েদের অনুপাত পুরুষের তুলনায় গত দুই দশকে খুব উচ্চে ছিল ; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও ১৯১১-১৯২১ দশকে নারীর অনুপাত বেড়েছিল, তাই এবারকার সেন্সাসে তাদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে লক্ষ্য করা যায়। ১৯১১ সনের পর আর কোন জাতের মধ্যে নারীর অনুপাত বাড়তে তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে নারীর অনুপাতটা দিন দিন বেশ কমে যাচ্ছে ; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে তাদের অতিবৃদ্ধি কম্‌বে না কে বল্‌তে পারে ?

জাতি	শতকরা বৃদ্ধি ১৯২১-১৯৩১	প্রতি ২০—২৫ বৎসর বয়সের ১০০০ পুরুষে ১৫—৪৫ বৎসর বয়সের নারী
খৃষ্টান	৩২	১০৮০
মুসলমান	১৩	১০২৬
হিন্দু	১০	৮৯৭ (বিধবা বাদে)
জৈন	৬	৮১০ ,,

মেয়েদের বিয়ের বয়স যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে সন্তান জন্মের সংখ্যাও কমে আস্‌বে, এইরূপ মত কোনো কোনো লোকশাস্ত্রী মহলে প্রচলিত আছে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও এইরূপ বিশ্বাস করেন। কিন্তু ৫৬৮,৬২৮ পরিবারের ইতিহাস নিয়ে যা দেখা গেছে, তাতে ঠিক এর উল্টোই ধারণা হয়। কম বয়সে ছেলে হ'লে সে ছেলের বাঁচার সম্ভাবনা কমে যায়; পক্ষান্তরে একটু বেশী বয়সে বিয়ে হ'লে যে-কটা ছেলে-মেয়ে জন্মায় তাদের অধিকাংশই বাঁচে। ত্রিশের বেশী বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে, তাদের পাঁচটা সন্তান গড়ে জন্মেছে।

বিবাহের সময় পত্নীর বয়স	গড়ে কয়টি জীবিত সন্তান জন্মেছে	গড়ে কয়টি সন্তান জীবিত আছে
০—১২	৩.৮	২.৮
১৩—১৪	৪.২	২.৯
১৫—১৯	৪.১	২.৯
২০—২৯	৪.৩	৩.১
৩০ ও বেশী	৫.১	৩.৬

সুতরাং এই হিসাব থেকে মনে হয় যে, মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ালে সন্তানসংখ্যা কম্‌বে না, পক্ষান্তরে জীবিত সন্তানের সংখ্যাই বেড়ে যাবে।

প্রবাস-জীবন ও লোকসংখ্যা

ভারতবর্ষ থেকে কত লোক বিদেশে গেছে তার একটা হিসাব নীচে দিলুম (১৯২১-৩১)

কোথায় গেছে	সংখ্যা
মালয়	৫১০,০০০
সিংহল	৩৬৫,০০০

কোথায় গেছে	সংখ্যা
ফিজি	১৫,০০০
পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব-আফ্রিকা	৪,০০০
যুক্তরাজ্য	৪,০০০
অন্যান্য দেশ	১২,০০০
মোট	১,০০০,০০০

ভারত থেকে যারা বিদেশে গেছে, তাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী—

১৯৩১ সনে ভারতীয়ের সংখ্যা

ধর্ম্ম	বৃটিশ মালয়	সিংহল
হিন্দু	৫০৯,২০২	৭৪৩,৩২৬
শিখ	১৮,১০০	×
মুসলমান	৫৬,৫০৬	২০,৭৭৮
খৃষ্টান	৩৬,৬১৪	১১,৪২৮
বৌদ্ধ	×	২,২৬০
অন্যান্য	৩,৫০৭	৩৭৮

আমাদের দেশের মধ্যেও এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে লোকে অন্নের চেষ্টায় যায়। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে বিহার উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশ থেকে আসাম অঞ্চলে যথেষ্ট কুলী আমদানি হত। এখন সেটা কিছু কমেছে; কিন্তু তার স্থান নিয়েছে ময়মনসিংহ জেলা। গোয়ালপাড়া ও নওগাঁর অনেকেই এই বাংলার মুসলমান। তা ছাড়া, এদেশের লোকের মধ্যে সহরমুখো হবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। মোট ৬,৫১০,১৫১ বা লোক-বৃদ্ধি যা হয়েছে তার ১৯·২% গত দশ বৎসরে সহরেই বেড়েছে। বাংলা প্রদেশে লোক বেড়েছে

৭'৩%, কিন্তু তার মধ্যে সহরে বেড়েছে ১৫'৮% ও গ্রামে ৬'৭%। পাঞ্জাবে লোক বেড়েছে ১৪'০%, আর তাব মধ্যে সহরে ৩৮'৭% ও গ্রামে ১১'০%। সব প্রদেশ সম্বন্ধেই এই ধরণের হিসাব দেওয়া যায়। আবার সহরগুলোয় দেখা যায়, বিবাহিত নারীর সংখ্যার চেয়ে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যাই বেশী; তাতে বুঝা যায়, সহরে অনেক বিবাহিত পুরুষ পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকেন। লোকবৃদ্ধির হিসাব করবার সময় আমাদের এসব কথায়ও খেয়াল রাখতে হবে। যেসব লোক কর্ম্মের সন্ধানে দেশান্তরে গমন করেন, কি সহরে যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের বয়স ২০ থেকে ৫০ এর ভিতর হয়ে থাকে; কেন না, যতদিন শরীরে শক্তি থাকে ততদিনই কর্ম্মের সন্ধানে অজানা দেশে পাড়ি দেওয়া যায়, অথচ এই বয়সটাই সন্তান-প্রজননের উৎকৃষ্ট বয়স। সুতরাং যে দেশ বা জাতি বাহির পানে বেশী ছোটে, তাদের মধ্যে সন্তান-জন্মের সংখ্যা কম হওয়াই স্বাভাবিক। এই হিসাবে হিন্দুর লোকসমস্যা মুসলমানের লোকসমস্যার সঙ্গে এক নয়, বা পাঞ্জাবীর লোকসমস্যা ও বাঙ্গালীর লোকসমস্যা এক নয়। সুতরাং সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা বাড়ছে দেখলেও ব্যাপকভাবে জন্মশাসনের ব্যবস্থা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

নিট প্রজননের হার

যাঁরা লোক-বিজ্ঞানচর্চ্চায় যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কুচিন্‌স্কি অন্যতম। তিনি যে সূচী বা ইন্‌ডেক্‌স্ বার করেছেন, তা লোকবৃদ্ধির আলোচনায় নতুন আলোকপাত করেছে। লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য কুচিন্‌স্কি দুটি প্রণালী বা মেথড্ ব্যবহার করেন। প্রথম প্রণালীতে তিনি শুধু প্রজনন-শক্তি বা ফার্টিলিটী পরিমাপ করেন; একে "গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান রেট" বলে। কোন নির্দ্দিষ্ট-সময়ে কোন

নির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্তান-জন্মের যে হার, সেই হার হিসাবে কোন নারীর সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার বয়সের মধ্যে যে কয়েকটি মেয়ে-সন্তান জন্মান সম্ভব, তাই হ'ল "গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট"। যে কয় বৎসর সন্তানোৎপাদন-ক্ষমতা থাকে, সেই কয় বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে প্রত্যেক নারীর গড়ে যে কয়জন সন্তান জন্মে, তা যোগ করলে এটা পাওয়া যায়। গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান রেট যদি একের কম হয়, তা হলে লোকসংখ্যা কম্‌বেই। কুচিন্‌স্কি হিসাব করে দেখেছেন যে, ১৯২৭ সনে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান রেট্ দাঁড়িয়েছে ০'৯৮। এখন যদি কোন নারীই ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মারা না যান, তা হ'লেও ইংল্যাণ্ড-ওয়েলসের লোকসংখ্যা ক্ষয় পাবে, যদি ইতিমধ্যে 'গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্' এক বা তার বেশী না হয়। 'গ্রস্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেটে একজন নারীর গড়ে কত সন্তান জন্মাবে তার হিসাব পাই। এইসব সন্তানদের মধ্যে যারা ভবিষ্যতে জননী হবে তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সংবাদই পাই না। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্তান-জন্মহার ও মৃত্যুহার যা থাকে, তার উপর ভিত্তি করে, প্রত্যেক সদ্য-প্রসূত মেয়ের ভবিষ্যতে গড়ে যে কয়জন মেয়ে-সন্তান জন্মাবে তা লক্ষ্য করে লোকবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই যে গড় হিসাব, একে বলে নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্। এও অতি সহজ উপায়ে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব। শুধু তার জন্য প্রয়োজন বাৎসরিক সন্তান-জন্মহারের সঙ্গে লাইফ্ টেব্‌লে নারী জীবিত থাকার যে হিসাব থাকে, তার সমন্বয়স্থাপন। নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্ "এক" হওয়ার অর্থ এই যে, একজন জননীর বদলে অপর একজন জননী জন্মাবে। এর বেশীও নয়, কমও নয়। যে দেশ বা জাতির 'নেট্ রিপ্রোডাক্‌শান্ রেট্' এক, সে দেশ বা জাতি বাড়বেও না, কমবেও না, অবশ্য যদি সন্তানজন্ম হার ও মৃত্যুহারে নড়-চড় না হয়। একের বেশী যদি নেট

রিপ্রোডাক্‌শান্‌ রেট্‌ হয়, তবেই বুঝতে হবে যে, লোকবৃদ্ধি হবে। এইভাবে ভারতবর্ষেরও নেট রিপ্রোডাক্‌শান্‌ রেট্‌ নির্দ্ধারণ না করে লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক সৃষ্টি করা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কাজ।

লোকের চাপ ও অপটিমাম

এবার দেখা যাক "অপটিমাম্‌"* পপিউলেশনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে কি না। অর্থাৎ লোকের চাপ এত বেশী হয়েছে কি না, যার বেশী আর ভারতবর্ষ বহন করতে পারে না। "অপটিমাম"এর কথা আলোচনা করতে হলে "ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্‌ লিভিং" বা জীবনযাত্রার ধারার কথা ভাবতে হয়। এই বিষয়ে বিনয়বাবুর "সোশিঅলজি অব্‌ পপিউলেশন" গ্রন্থের বিচার-প্রণালী গ্রহণ করা গেল। প্রত্যেক বর্গ-মাইলে কত নরনারী বাস করে দেখলে "অপটিমাম" পাওয়া যায়। শুধু প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা বাড়ছে কি কমছে দেখেই বলা যায় না যে, অতিবৃদ্ধি বা অতিক্ষয় হচ্ছে। তার সঙ্গে দেখতে হবে মাথাপিছু আয় কমছে, না বাড়ছে, তথা জীবনযাত্রার ধারা নিকৃষ্টতর হচ্ছে, না উৎকৃষ্টতর হচ্ছে। নীচে যে হিসাব দিলুম, তাতে বুঝা যাবে যে, ইয়োরোপের অনেক দেশের তুলনায়ই ভারতের লোক-বসতি ঘন (ডেন্‌স) নয়।

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক-সংখ্যা (১ কিলো = ⅝ মাইল)।

বেলজিয়াম	...	২৬৬
হল্যাণ্ড	...	২৩২

* "উত্তম সংখ্যা" বলা যাউক। এখানে "উত্তম"-সংখ্যায় বুঝিতে হইবে গরিষ্ঠ অথচ সর্ব্বোচ্চ-আয়-বিশিষ্ট। অপ্‌টিমাম শব্দটার পারিভাষিক অর্থ এরূপ বিচিত্র যে, ইয়োরামেরিকার লোকেরাও অনেকবার মুখস্থ করার পর এইটা হজম করতে সমর্থ হয়। কাজেই "উত্তম" এই মামুলি শব্দটাই অপ্‌টিমামের প্রতিশব্দ রূপে চালাইতেছি। "আর্থিক উন্নতি" সম্পাদক। লোক-ঘনত্বের সামাজিক ফলাফল অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গ্রেটবৃটেন	...	১৯৭
জাপান	...	১৬৯
জার্ম্মাণি	...	১৩৪
ইটালী	...	১৩৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	১০০
অষ্ট্রিয়া	...	৮০
ভারতবর্ষ	...	৭৬
ফ্রান্স	...	৭৬
রুমাণিয়া	...	৬১
বুলগেরিয়া	...	৫৯

প্রতি বর্গমাইলে লোকের বাস বাড়লেই যে দেশের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দেবে এবং লোকের আয় কমে গিয়ে জীবনযাত্রার ধারা নিকৃষ্টতর হবে, এ রকম কোন কথাই নেই; কেন না ভারতবর্ষের তুলনায় ইয়োরোপের প্রায় সব দেশেই বসতি ঘন। তা বলে তাদের মাথাপিছু আয় কম নয়। ১৯২২ সনের মার্কিণি জরীপে পাওয়া যায়—

দেশ	মাথা-পিছু আয় (ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	২৮২
গ্রেটবৃটেন	২১৩
ফ্রান্স	১৭৯
জার্ম্মাণি	১১৪
ইটালী	৮৫
রুশিয়া	৪২
জাপান	৩৫
ভারতবর্ষ	১৪

সেন্সাস অনুসারে ভারতে লোকের চাপ নীচের হিসাব অনুযায়ী বেড়েছে—

	সন		
	১৯৩১	১৯২১	১৯১১
ভারতবর্ষ	১৯৫	১৭৬	১৭৪
আসাম	১৫৭	১৩৬	১২০
বাংলা	৬৪৬	৬০২	৫৮৭
বিহার-উড়িষ্যা	৪৫৪	৪০৯	৪১৫
বোম্বে প্রেসি	১৭৭	১৫৬	১৫৯
মধ্য-প্রদেশ	১৫৫	১৩৯	১৩৯
দিল্লী	১১১০	৮৫২	৭২২
মাদ্রাজ	৩২৮	২৯৭	২৯১
পাঞ্জাব	২৩৮	২০৯	১৯৭
যুক্তপ্রদেশ	৪৫৬	৪২৭	৪৪০

দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক দশকেই লোক বেড়েছে, কিন্তু বিদেশের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝা যায়, এখনও তা ভয়াবহ রূপ ধরে নি।

ইয়োরোপে হিসাব করে স্থির করা হয়েছে যে, প্রতি বর্গমাইলে ২৫০ জন পর্য্যন্ত লোক চাষের উপর নির্ভর করতে পারে; আমেরিকার সিদ্ধান্তও অনুরূপ; ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পোর্ট-রিকো দ্বীপে প্রতি বর্গমাইলে ৪০০ লোক চাষের উপর নির্ভর করে থাকে। আমরা দেখেছি যে, ভারতে প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ১৯৫। অতএব ভাবনার কারণ এখনও উপস্থিত হয় নি। অধিকন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জমির চেয়ে ভারতের জমি উর্ব্বর; আর লোকের অভাব কম। ভারতের লোক-সংখ্যা নিয়ে যদি আলোচনা করতে হয়, তা হলে কৃষিজীবীর সংখ্যার

উপরই নজর দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রদেশে লোকসংখ্যা তথা কৃষিজীবীর সংখ্যা বিভিন্ন বলে, বিভিন্ন প্রদেশের লোকসমস্যাও বিভিন্ন। দিল্লী, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশেই লোকের চাপ বেশী। দিল্লী প্রদেশে ৫০ বৎসরে (১৮৮১-১৯৩১) ৮১% লোক বেড়েছে; দিল্লী সহরে প্রতি বর্গমাইলে ৫৮২৭৩ লোকের বাস ও গ্রাম্য-অঞ্চলে ৩৭২। অতএব সহর বাদ দিলে দিল্লী প্রদেশে লোক খুব বেড়েছে বলা যায় না। আর দিল্লী সহর ভারতের রাজধানী নতুন করে হওয়ায় বাইরের থেকে বহুলোক সেখানে এসে বাস করছে; তার জন্য অপাততঃ বাড়ীর অভাব কিছু অনুভূত হলেও মোগল বাদশাদের আমলে যে পরিমাণ লোক দিল্লী সহরে বাস করত তার চেয়ে বেশী নয় বোধ হয়। তারপরই হল বাংলা দেশ। বাংলা দেশেই সবচেয়ে ঘন বসতি। নীচে একটা হিসাব দিচ্ছি—

দেশ	বর্গমাইল লোকসংখ্যা	শতকরা বাড়তি ১৯২১-৩১
বাংলা	৬৪৬	+৭·৩
কুচবিহার	৪৪৮	−০·৩
ত্রিপুরা	৯৩	−২৫·৬
হাওড়া জেলা	২১০৫	
চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ	৪৬	+২২·৯
ঢাকা	৯৩৫	
মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশন	২৪১৩	
লৌহজঙ্গ থানা	৩২২৮	

ভারতের অন্য সব প্রদেশের চেয়ে বাংলায় লোকের চাপ বেশী হলেও, সমগ্র বাংলা দেশে তা এক নয়, বা সব অঞ্চলেই সমান হারে লোক বাড়ে নি। বরং দেখছি কুচবিহার রাজ্যে লোক কমেছে। কুচবিহারে যা লোক কমেছে তার ষোল আনাই হিন্দু; হিন্দু কমেছে

৪·৭৬% ; তার স্থান অধিকার করেছে মুসলমান চাষী। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫·৬% লোক বেড়েছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ের দিকে ২২·৯% লোক বাড়লেও ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে খুব কম লোকের বাস। আবার হাওড়া জেলা ও মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে লোকের চাপ খুব বেশী।

বাংলার কয়েকটা জেলায় লোক কি রকম বেড়েছে-কমেছে দেখুন।

	চাপ শতকরা	
জেলা	১৮৯৪-১৯২৪	২৯১৪-৩১
বর্দ্ধমান	+২·৯	+৯·৫
হুগলী	+৪·৪	+৩·১
মুর্শিদাবাদ	+১·৮	+১০·২
নদীয়া	−৮·৯	−·৮
যশোহর	−৮·৩	−২·৯
বাখরগঞ্জ	+২০·৬	+১২·৯
ফরিদপুর	+১৯·৬	+৬·৪
ঢাকা	+৩০·৮	+৮·৭
ময়মনসিংহ	+৩৫·৪	+৬·১
নোয়াখালি	+৪০·২	+১৫·৯
ত্রিপুরা	+৪৩·২	+১৩·৩

দেখা যাচ্ছে যে, সব জেলায়ও লোক বাড়েনি ; নদীয়া ও যশোহরে বরং বেশ কমেছে। সুতরাং জেলা হিসাবেও বাংলা দেশের সমস্যা বিভিন্ন।

চাষের জমি

আবার চাষের জমির দিকে তাকালেও এমনি বিভিন্নতা পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান, হুগলী নদীয়া প্রভৃতি জেলায় চাষের জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে ; তাই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বেশী

দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার কোন্ অঞ্চলে কত জমি চাষ হয়, তার একটা হিসাব দিতেছি—

	চাষযোগ্য জমির শতকরা কত ভাগ চাষ হয়	চাষযোগ্য জমি পতিত%	চলতি পতিত%
পূর্ব্ববঙ্গ	৯০	৭	৩
উত্তরবঙ্গ	৭১	১৪	৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬১	২৬	১২
মধ্যবঙ্গ	৫৮	১৮	২৪

এই থেকে বেশ বুঝা যায়, পূর্ব্ববঙ্গ এখনও যত লোক পুষতে পারে, তার চেয়ে বেশী লোক পুষতে পারে পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ। মিষ্টার এ ই পোর্টার বলেছেন যে, বাংলায় চাষযোগ্য যত জমি আছে তার মাত্র ৬৭% ভাগ চাষ করা হয়; যদি এখন চাষযোগ্য সব জমি চাষে লাগান যায় ও ৩০% ফসল বাড়ান যায়, তা হ'লে যে-সংখ্যক লোক এখন বাস করছে (১৯৩১ খৃঃ) তার দ্বিগুণ লোকের অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভব। সুতরাং আপাততঃ বাংলাদেশ সম্বন্ধে লোকবৃদ্ধির ভয় করবার প্রয়োজন নেই। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

বর্ত্তমানে ভারতীয় জমির উৎপাদিকা শক্তি অন্য দেশের তুলনায় কি রকম, তা নীচে দেওয়া হল—

হেক্টর প্রতি—কুইণ্টালে হিসাব

(হেক্টর = ৭৷৷০ বিঘা, কুইণ্টাল = ১০০ পাউণ্ড)

	মিসর	ক্যানাডা	জাপান	জার্ম্মাণি	বেল-জিয়াম	ডেনমার্ক	ইটালী	ভারত
গম	২০'১	১১'০	১৬'৯	২১'৯	২৬'৮	৩০'২	১৫'৩	৬'৭
ভুট্টা	২৩'৪	২৪'৪	১২'৫	×	×	×	১০'৮	৯'৩
চাউল	২৭'৮	×	৩৩'৮	×	×	×	৪৮'৫	১৪'১
আলু	১০৩'৫	৮৪'৭	৯০'৩	×	২৫১'৯	১৮৬'৮	৬৮'৬	×

এই হিসাব থেকে দেখছি যে, ইয়োরামেরিকার দেশগুলির তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতের মাটী বর্ত্তমানে কম উর্ব্বর। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে ভারতের মাটী সত্যই অনুর্ব্বর নয়, বরং বিশেষ উর্ব্বর। এ পর্য্যন্ত মাটীর উর্ব্বরতা বারাবার কোনই চেষ্টা হয় নি; সুতরাং চেষ্টা করলে এদেশেও ফসল ৪।৫ গুণ বেশী পাওয়া যেতে পারে। এক সময়ে এই কথাই প্রচলিত ছিল যে, ইটালীর মাটীতে গম জন্মায় না; কিন্তু আজ ইটালীয়ানরা ভারতের ডবল ফসল পাচ্ছে। সুতরাং ভারতেই বা তা কেন হবে না? এ ভাবে দেখলেও বুঝা যায় যে, সত্যিই যদি এখন কিছুকাল লোক বাড়ে তা হলেও ভাবনার কারণ নেই। ১৯৩৭ সনে দিল্লীতে শস্য-উৎপাদনের পরিকল্পনা বা "ক্রপ প্ল্যানিং" সম্বন্ধে এক বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতে চাউল বা গম অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদন করা হয় না; তা বলে নতুন জমি এই দুটী শস্য উৎপাদনে লাগানোর কোন প্রয়োজন নেই, বা জমিচাষের বহরও কমানোর দরকার নেই। এই বৈঠকের আলোচনা থেকে এটা বুঝা গেছে যে, চেষ্টা করলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেশ বাড়ানো যায়। আরও বুঝা গেছে যে, খাদ্যশস্যে টান ধরার সমস্যার চেয়ে বাহুল্য হবার ভয়টাই বেশী। সুতরাং লোকবৃদ্ধির ফলে খাদ্যে টান ধরবে মনে করার কারণ দেখা যাচ্ছে না।

জীবন-যাত্রা প্রণালী

একটা দেশের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং' বা জীবনযাত্রার ধারা ক্রমশঃ যদি নিকৃষ্টতর হতে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে লোকবৃদ্ধি অবাঞ্ছনীয় হয়ে উঠছে। দেখা যাক্ ভারতের জীবনধারা নিকৃষ্টতর হচ্ছে কি না। ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং বললে কি বুঝায় বলা শক্ত, কেন না, এখানে প্রদেশভেদে জীবন-যাত্রার ধারা এতই বিভিন্ন যে, একটা

সাধারণ মান স্থির করাই শক্ত। শুনা যায়, বাংলাদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং-ই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। সুতরাং বাংলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডই দেখা যাক্। এ পর্য্যন্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড নির্দ্ধারণের কোন বৈজ্ঞানিক চেষ্টা হয়েছে বলে জ্যনি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলার আর্থিক জরীপ করার জন্য বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ কতকগুলো প্রশ্নের খসড়া করেছিলেন, কিন্তু সেও এ পর্য্যন্ত খসড়াই রয়ে গেছে। তার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার পারিবারিক ব্যয়-তালিকা দেখে একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জী খাড়া করেছিলেন; সেটা এই—*

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
খাদ্য	৯৫·৪	৯৪·৫	৮৪·৫	৭৯·০	৭৭·৭	৭৪·০
বসন	৪·০	৩·০	১২·০	৯·০	৯·০	৪·৭
চিকিৎসা	×	১·০	১·০	৫·০	৫·৯	৮·০
শিক্ষা	×	×	×	×	১·০	৩·৩
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	·৬	২·০	২·৫	৪·০	৫·০	৮·০
বিলাস সামগ্রী	×	×	১·০	১·০	১·৪	২·০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দেখা যাচ্ছে সব শ্রেণীর মধ্যেই খাওয়া-পরার খরচটাই বেশী; বিলাসিতার ব্যয় নাই বল্‌লেই হয়; মধ্যবিত্তের মধ্যেই বিলাস-ব্যয় খুব বেশী। খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই পূর্ব্বেই দেখেছি। ভারত দিন দিন বস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। তার ফলে বস্ত্রের দরুণ যে

* অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জীর "দরিদ্রের ক্রন্দন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মোটা টাকাটা বিদেশে চলে যাচ্ছিল, তার বেশীর ভাগ দেশের লোকেরই হাতে থাকছে এবং প্রত্যেক বৎসর যে পরিমাণে কাপড়ের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, তাতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়েও কোন দুর্লক্ষণ আপাততঃ নেই।—

১৯২৫—২৯=১০০

ভারতীয় কলে	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সূতাকাটা	৯১	১০৭	১০৭	৮৬	১১০	১১৫	১২৮	১৩৪	১২২
বয়নশিল্প	৯০	১০৪	১১০	৮৬	১০৯	১১৪	১৩০	১৩৫	১২৫

ভারত কৃষি-প্রধান দেশ, তাই কৃষিজ পণ্যের দর পড়লে সবাইকে ভুগতে হয়। ১৯২৫-২৬ এর পর যে দুর্য্যোগ দেখা দেয়, তাতে ভারতকেও কাবু করে; কিন্তু সে দুর্য্যোগ কেটে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে, অন্ততঃ তার তীব্রতা নেই। এই দুর্য্যোগের সময়টাকে সাধারণ অবস্থা বলে ধরে নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে, আর্থিক বিবর্ত্তনের এ একটা ক্ষণস্থায়ী রূপ। কিন্তু এই দুর্য্যোগ সত্ত্বেও বাংলার লোকের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং খাটো হয় নি, বাংলার সেন্সাস কমিশনার জোরসে এই মত দিয়েছেন। ভারতের আমদানি (বিশেষতঃ বিলাস দ্রব্যের) তালিকা দেখ্‌লে ও অঙ্গরাগ-শিল্পের উন্নতি দেখলে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। দূরতম পাড়াগাঁয়েও লোককে টর্চ্চ হাতে, ছাতা মাথায়, জুতা পায়ে, কামিজ গায়ে বায়স্কোপে যেতে দেখা যায়। রেডিও, বাস, বৈদ্যুতিক আলো, পাকা-বাড়ী আমাদের প্রাচীন গ্রাম্যজীবনকে বদলে দিতে চলেছে। এই সব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতার নামান্তর কিনা এবং তাতে গ্রামে সরলতার বদলে কুটিলতা দেখা দেবে কিনা, সুতরাং তা কাম্য কিনা, এ প্রশ্ন আমার নয়, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং বলতে যা বুঝায় তাঁরই একটা আভাস দিচ্ছি। গ্রাম-

সংগঠনের সরকারের যে প্রোগ্রাম, তাও ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং উন্নত করবার জন্য। সকল লোকের দারিদ্র্য একেবারে ঘুচে যাবে, এ কখনও হয় না, অন্ততঃ বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে তা অসম্ভব। পূর্ব্বে যে লোকে এর চেয়ে স্বচ্ছন্দভাবে থাকত, এমন কথা তোলা এখানে অবান্তর; আমার বলার কথা এই যে, এখনকার জীবনধারা যতই খারাপ হোক, তা পূর্ব্বের চেয়ে কিছু বিভিন্ন; এবং লোক বেড়েছে বলেই যে দারিদ্র্য বেড়েছে তাও নয়।

দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং শুধু জন্মহার কমিয়ে বাড়ান যায় না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং বাড়াতে হলে চাই মাথাপিছু আয় বাড়ানো। দেশ যত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, মাথাপিছু আয়ও তত বাড়বে। আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগে ভারতীয়ের মাথাপিছু আয় তথা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং বাড়ছে কিনা বা বাড়বার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে হলে দেখতে হবে, ভারত যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করছে কিনা। ১৯১৩-১৪ সনে ভারতীয় কলে ১,১৬৪,৩০০,০০০ গজ কাপড় উৎপন্ন হয়েছিল; ১৯৩৩-৩৪ সনে সেটা দাঁড়ায় ২,৯৪৫,০০০,০০০ গজ; অর্থাৎ বিশ বৎসরে কাপড়ের কলের উৎপাদন ১৫৩% বেড়ে গেছে। ১৯২৮ এর তুলনায় ১৯৩৩ সনে ষ্টিলের উৎপাদন ৭৫% বেড়ে গেছে। আর ভারতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, বৈদ্যুতিক নানাবিধ যন্ত্র, রবার টায়ার, ষ্টোভ, অ্যাস্‌বেস্‌টাস্, সিমেণ্ট, রং প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। ভারত এত দিন শুধু কাঁচা মালই রপ্তানি করে এসেছে; এ যুগে কারখানাজাত পণ্যও প্রতিযোগিতায় বিদেশে বেচতে সমর্থ হয়েছে। ১৯১৩-১৪ সনে মোট রপ্তানির ২৩% ছিল কারখানাজাত মাল; ১৯২৮-২৯ সনে তা দাঁড়ায় ২৭%। সুতরাং ভারত ক্রমশঃ যন্ত্র-নিষ্ঠ হয়ে উঠছে তাতে ভুল নেই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারত গড়ে ৫৬,১১৪,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বিদেশ থেকে আমদানি করেছে; ১৯২৮-২৯ সনে তা দাঁড়ায় ১৮৩,৬০৪,০০০ টাকা।

এ থেকে বুঝা যায়, ভারতে নতুন নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯২৬-২৭ সনে ভারতের কোন্ অঞ্চলে কত কোম্পানী ছিল তার হিসাব—

বোম্বে	...	৮১২টি কোম্পানী
বার্ম্মা	...	২৮৩ ,,
যুক্তপ্রদেশ	...	২১৫ ,,
বাংলা	...	২৬৫২ ,,
মধ্যপ্রদেশ	...	৪৯ ,,
মান্দ্রাজ	...	৬৬২ ,,
পাঞ্জাব	...	১৭৩ ,,
বিহার-উড়িষ্যা	...	৮২ ,,
আসাম	...	১১৬ ,,

ভারতের এই যন্ত্রনিষ্ঠা দেখে মনে হয়, লোকবৃদ্ধির ভয় করবার এখনো কোন সঙ্গত কারণ উপস্থিত হয় নি ; কেন না, উৎপাদিকা শক্তি বাড়লেই অভাব পূরণের উপায়ও বাড়ে। স্যর লিও চিওজা মানি তাই বলেছেন।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই বুঝতে পারি যে—

(১) বার্থকণ্ট্রোল লোকবৃদ্ধি রোধ করবার সম্যক্ উপায় নয়। ধনীই হোক্ আর নির্ধনই হোক্, কুকুরের ছানার মত যে মানুষের এক গাদা সন্তান হবে, এ বাঞ্ছনীয় নয় ; তেম্নি আবার সন্তান আদৌ না হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। এই হিসাবে জন্ম-সংযমের কিছু মূল্য আছে, কিন্তু মাত্রা ছাড়ালেই জাতির ধ্বংস। ভারতের মত নিরক্ষর জনসমাজে ব্যাপকভাবে বার্থ-কণ্ট্রোলের আন্দোলন চালালে সুফলের চেয়ে কুফল ফলাই বেশী সম্ভব।

(২) ভারতে অত্যধিক লোক বাড়্ছে এমন কথা মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই ; এ ভয় অমূলক।

(৩) খাদ্যাভাব হবার যে আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, চেষ্টা করে খাদ্য-উৎপাদন দ্বারা সে আশঙ্কা দূর করা চলে।

(৪) ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ নিকৃষ্টতর হবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে আধুনিক ধনোৎপাদনের উপায়গুলি যেরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড উৎকৃষ্টতর হবারই কথা। আধুনিক অর্থনীতিকের মতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ উঁচু হলে সন্তানের সংখ্যা আপনি কমে আসবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষা ও অর্থের জোরে সমাজে উচ্চ আসন দখল করে আছেন, নিরক্ষর অনুন্নত জাতির তুলনায় তাঁদের সন্তানসংখ্যা কম। সুতরাং যদি জন্ম সংহত করতে হয়, তা হ'লে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লাইফ্ বাড়ানো আবশ্যক।

(৫) সমাজের যে-অংশের সন্তান হওয়া একান্ত অবাঞ্ছনীয়, যেমন উন্মাদের, তাদের মধ্যে জন্ম-সংযম করতে হলে বার্থ কণ্ট্রোল আন্দোলন চালিয়ে হবে না, তাদের জন্য চাই 'ষ্টেরিলাইজেশন,' তা স্বেচ্ছামূলকই হোক্ আর বাধ্যতামূলকই হোক্। এই নতুন শব্দে উৎপাদনশক্তির ধ্বংস-সাধন বা অনুর্ব্বরীকরণ এক কথায় বন্ধ্যীকরণ বুঝিতে হইবে।

আশা করি সুধীবর্গ এই আলোচনার আলোকে এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবেন।

মাপজোকের ধরণ-ধারণ

সভাভঙ্গ করিবার সময় অধ্যাপক সরকার যেসমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন, নিম্নে তাহার কয়েকটা উল্লেখ করা হইল :—

"দুনিয়ার সমস্ত দেশের সেন্সাস অর্থাৎ আদমশুমারী বিভাগ ও মাপজোক-গ্রহণের বিউরোগুলায় কেবলমাত্র 'কোরা' ("ক্রুড্") হারই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই-সমস্ত বিবরণীতে লোকবলের 'বয়স-শ্রেণী' অনুসারে লোক-বৃদ্ধির হিসাব করিয়া দেখানো হয় না।

"সন্তানজন্ম হ্রাস পাওয়ায় পূর্ব্বেকার চেয়ে বর্ত্তমানে শিশু (১ বৎসরের নীচে) ও ছেলেপিলের (৫ বৎসরের নীচে) সংখ্যা অর্থাৎ মোট জনসংখ্যায় উহাদের অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ এই "বয়স-শ্রেণীতে"ই (০-৫) মৃত্যু-হার উল্লেখযোগ্য রূপে হ্রাস পাইয়াছে। 'কোরা' মৃত্যুহার দেখিয়া যেরূপ মনে হয় অন্যান্য 'বয়স-শ্রেণী'তে মৃত্যুহারের হ্রাস কিন্তু সেরূপ নয়। 'কোরা' মৃত্যুহারে কেবলমাত্র প্রতি হাজারে প্রত্যেক বৎসর কতজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারই উল্লেখ থাকে এবং উহা এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কোনো ধার ধারে না। সুতরাং কোন দেশের লোকবলের প্রকৃত অবস্থা জানিবার পক্ষে উহা বিশেষ সহায়ক হইতে পারে না। বৎসরের পর বৎসর পরমায়ুর তালিকাগুলা বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত মৃত্যুহার গুনিয়া লওয়া দরকার। লোকবিদ্যা ক্রমেই জীবন-দৈর্ঘ্য-বিষয়ক "অ্যাক্চুয়ারি"-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

"জন্মহারের বেলাতেও 'কোরা' ("ক্রুড্") হার অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক হাজার জন লোকের মধ্যে কতজন জন্মলাভ করিল তাহার পরিচয় বিশেষ লাভজনক নয়। মোটা হিসাবের প্রসব-হার অর্থাৎ ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহিত বা অবিবাহিত প্রত্যেক একশত জন নারীর মধ্যে কত জন বালিকা ভূমিষ্ঠ হইল তাহার পরিচয় দ্বারাই খাঁটি জন্মহারের সন্ধান মিলিতে পারে। সুতরাং বৃদ্ধির হার (অর্থাৎ জন্মহার ও মৃত্যুহারের বিয়োগ ফল) নির্ণয় বিষয়ক বিদ্যা নূতন ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

কলিকাতার মগজ*

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, গবেষক বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান
পরিষৎ, সহ-সম্পাদক "সমাজ-বিজ্ঞান

এই প্রবন্ধে কলিকাতার লোকেরা কিভাবে এবং কি কি বিষয়ে চিন্তা করিতেছে—অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে মাথা খেলাইতেছে এবং কতখানি মাথা খেলাইতেছে আমি তাহারই একটী বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কলিকাতায় যেসকল সভাসমিতি হইয়া থাকে তাহার তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। মাত্র এক সপ্তাহের অর্থাৎ সাত দিনের সংবাদপত্র হইতে সভাসমিতির বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার মগজ পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলা কাগজ "আনন্দ বাজার পত্রিকা" এবং ইংরেজি কাগজ "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" (কখনও কখনও "অ্যাড্ভ্যান্স")এর উপর নির্ভর করিয়াছি। আলোচ্য সপ্তাহ হইতেছে গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে ১২ই ডিসেম্বর রবিবার।

সভা সমিতিগুলি নিম্নলিখিত বিষয় অনুসারে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

ধর্ম্ম

রবিবার—(১) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, আত্মবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা, বক্তা স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ। (২) গীতা সভা—গীতা মন্দির

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে পঠিত (১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭)।

ভবনে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রীর উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা। (৩) গদাধর আশ্রম—শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা। (৪) অনঙ্গমোহন হরিসভা—ভগবান কৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবন লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা। (৫) ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ—নবান্ন উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা। (৬) সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা—শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে "শ্রীশ্রীবামন লীলা" পাঠ ও ব্যাখ্যা—বক্তা শ্রীযুক্ত আশুতোষ তত্ত্ববারিধি। (৭) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা।

মঙ্গলবার—(১) সুহৃদ সম্মিলনে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা।

বুধবার—আদি ব্রাহ্ম সমাজ—ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে উপদেশ—বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। (২) গৌর-গোবিন্দ মঠ—সংকীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ। (৩) রামকৃষ্ণ সোসাইটী—গীতা ক্লাস। (৪) ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিউটের উদ্যোগে ধর্ম্ম সম্মিলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন।

বৃহস্পতিবার—(১) বিবেকানন্দ সোসাইটী, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আলোচনা—বক্তা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার বসু। (২) বিবেকানন্দ মিশন—শ্রীরাম চরিত সম্বন্ধে ধারাবাহিক কথকতা—বক্তা শ্রীমৎ স্বামী উপানন্দ। (৩) ধর্ম্ম সম্মিলন,—হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্ম ও পার্শী ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

শুক্রবার—(১) শ্রীমৎ স্বামী নির্লেপানন্দ কর্ত্তৃক কেনোপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা। (২) ধর্ম্ম সম্মিলন—শিখধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও ইহুদী ধর্ম্ম আলোচনা। (৩) বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মিস্ মার্থা এল্ রুট্ কর্ত্তৃক বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে বক্তৃতা।

রবিবার—(১) অনঙ্গমোহন হরিসভা—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত জীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাব্যালঙ্কার (২) বঙ্গীয় শঙ্কর সভা—অধ্যাপক মাধবদাস কর্ত্তৃক উপনিষদ্ ব্যাখ্যা এবং শ্রীযুক্ত

দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক গীতা ব্যাখ্যা। (৩) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্—উপনিষদে জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা—বক্তা রামচন্দ্র শাস্ত্রী। (৪) শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। (৫) ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলনী সমাজ। (৬) আদি ব্রাহ্ম সমাজ। (৭) শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি—আত্মবিকাশ। (৮) গদাধর আশ্রম।

শ্রমিক

রবিবার—(১) করপোরেশনের কর্ম্মচারী সমিতির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শ্রমিকদের একটী সভা। (২) বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়ন কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির একটী সভা। (৩) উক্ত ইউনিয়নএর সাব কমিটির এক সভা। (৪) বঙ্গীয় প্রেস শ্রমজীবী ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রেস কর্ম্মচারীদের একটী সভা। (৫) নিখিল বঙ্গ দোকান কর্ম্মচারী সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সপ্তম অধিবেশন। (৬) লিলি বিস্কুট ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের সভা। (৭) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কমিটির অধিবেশন।

মঙ্গলবার—(১) ইলেকট্রিক করপোরেশন কর্ম্মচারীদের অভিযোগ সম্পর্কে কমিটির সভা। (২) হাজরা পার্ক—জনসভা—ধুবড়ী—দিয়াশালাই কারখানায় ধর্ম্মঘট এবং ছাত্র ও যুবক জনসাধারণের কর্ত্তব্য আলোচনা।

বৃহস্পতিবার—(১) নিখিল ভারত কৃষক কংগ্রেস সাব-কমিটির অধিবেশন। (২) মনুমেণ্টের তলায় ফেরিওয়ালাদের সভা—সভাপতি ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জ্জী। (৩) কলিকাতা দোকান কর্ম্মচারীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

শুক্রবার—(১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটির অধিবেশন। (২) বঙ্গীয় চটকল মজদুর ইউনিয়নের সাব-কমিটির অধিবেশন।

শনিবার—জুতার কারখানার শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা—সভাপতি ডাক্তার স্বরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি।

রবিবার—(১) প্রাদেশিক ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস। (২) কলিকাতা প্রেস কর্ম্মচারীর সভা।

রাষ্ট্র

রবিবার—(১) ৩নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। (২) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসীদলের অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা। (৩) বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের কার্য্যকরী সমিতির মাসিক অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—নিখিল ভারত সমাজতান্ত্রিক দলের সার্কুলার ইত্যাদি। (৪) উত্তর কলিকাতা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির একটী সাধারণ সভা। আলোচ্য বিষয়—আগামী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীক সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। (৫) বিডন স্কোয়ারে বন্দে মাতরম্ সভা।

মঙ্গলবার—(১) বঙ্গীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন। (২) ২২নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সভা—আলোচ্য বিষয়—(ক) অর্থ (খ) কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ (গ) বিবিধ। (৩) দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভা। বিষয়—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ইত্যাদি।

রবিবার—২২নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির সভা (২) কলেজ স্কোয়ারে জনসভা। আলোচ্য বিষয়—আন্দামান বন্দীদের অনশনের আশঙ্কা। (৩) ইটালী কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। (৪) কাশীপুরে কংগ্রেস ও জনসাধারণের সভা। (৫) আলাপনীর বৈঠক—সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র—বক্তা গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বাস্থ্য

রবিবার—এণ্টালী অ্যাথ্‌লেটিক ক্লাবের সভা।

মঙ্গলবার—৫নং পল্লী স্বাস্থ্য সমিতির তত্ত্বাবধানে কলিকাতা করপোরেশনের প্রচার বিভাগ দ্বারা আলোক-চিত্র সহযোগে নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে বক্তৃতা—৮ই, টাইফয়েড, বসন্ত—ইহার বিস্তার এবং প্রতিকার। ১১ই, বসন্ত।

রবিবার—(১) নিখিল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাপরিষদের এক সাধারণ সভা—(২) ২৩নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতি—আলোচ্য বিষয় বসন্ত রোগ নিবারণ, বক্তা ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি। (৩) পাঁচের পল্লী করদাতৃ সমিতি—আলোচ্য বিষয়, কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃক উক্ত পল্লীতে দুগ্ধ বিতরণের জন্য স্থান নির্ব্বাচন ও বিবিধ।

শনিবার—(১) হোমিওপ্যাথিক বোর্ড—অল-বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল বোর্ডের উদ্যোগে সভা। কবিরাজ এম কে মুখার্জ্জি বি এ, কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদের ফ্যাকাল্টির সহিত ভবিষ্যৎ হোমিও ফ্যাকাল্টির তুলনামূলক আলোচনা। (২) ৩নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতি—টাইফয়েড সম্বন্ধে বক্তৃতা। (৩) ১নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সমিতি—বার্ষিক অধিবেশন। (৪) ছয়ের পল্লী স্বাস্থ্য সমিতি—ব্যায়াম ও তাহার উপকারিতা। দুই দিন—প্রথম দিবসের বক্তা শ্রীগোষ্ঠবিহারী শেঠ, দ্বিতীয় দিনের বক্তা শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। (৫) নয়ের পল্লী স্বাস্থ্য সমিতি—যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার বিষয়ে আলোকচিত্রযোগে বক্তৃতা।

অর্থ

রবিবার :—(১) রাউৎভোগ পল্লীমঙ্গল সম্মিলনীর সভা, নিউপার্ক

ষ্ট্রীট্‌। (২) বরিশাল সেবা সমিতির দক্ষিণ কলিকাতার কর্ম্মিগণের এক বৈঠক।

বৃহস্পতিবার ঃ—বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের "বাঙ্গলার পল্লী সভ্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

শুক্রবার ঃ—দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা।

শনিবার ঃ—টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কৃষি এবং কুটীর শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তা জে আর মজুমদার।

রবিবার ঃ—(১) মাহিলাড়া পল্লীসংগঠন সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সভা। (২) বেকার বান্ধব সমিতির ৫ম বার্ষিক সভার অধিবেশন।

শিক্ষা

রবিবার ঃ—(১) নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন। (২) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আলোচনা করিবার জন্য জনসভা।

মঙ্গলবার ঃ—২৪ পরগণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন।

বুধবার ঃ—জগজ্জ্যোতি পাঠাগার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন।

শুক্রবার ঃ—ওয়াই, এম, সি, এ'র উদ্যোগে ডাঃ এস্‌, পি চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতা। বিষয় ইংলণ্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (২) কমলা বুক ডিপো,—গ্রন্থাগার বুক ডিপো সমিতি কর্ত্তৃক আলোচনা।

শনিবার ঃ—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধিবেশন।

বিজ্ঞান

মঙ্গলবার ঃ—(১) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়শনের উদ্যোগে অনুভূতির বিপর্য্যয় সম্বন্ধে বার্কে হিলের বক্তৃতা। (২) ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের

বাস্তব বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন। সভাপতি ডক্টর বিনয় সরকার। গণিত, জ্যোতিষ ও অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা। (৩) সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়ুর্ব্বেদ শাখার অধিবেশন—নিদান ও আয়ুর্ব্বেদের কয়েকটী বিষয় পাঠ। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন।

শনিবার ঃ—পাট সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তা ডাঃ এইচ, কে, নন্দী।

রবিবার ঃ—নিখিল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাপরিষদের এক সাধারণ সভা। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির উপায় শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ।

সাহিত্য

রবিবার ঃ—কল্যাণসঙ্ঘে শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা। বক্তা কানাই লাল নাথ।

মঙ্গলবার ঃ—সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বাঙ্গলা শাখার অধিবেশন। এই বৈঠকে শ্রীযুত অশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ ও স্বামী সমাধি প্রকাশ এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শনিবার ঃ—সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ। মেঘদূত সম্বন্ধে আলোচনা।

রবিবার ঃ—(১) সাহিত্যের বাজার সম্বন্ধে আলোচনা। বক্তা,—সজনীকান্ত দাস, রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রভৃতি। (২) অভয় পত্রিকার লেখকগণের প্রীতি সম্মেলন—শরৎসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

ছাত্র

মঙ্গলবার ঃ—কলিকাতা ছাত্রসঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। বিষয়,—নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের জন্য সভাপতির নাম স্থির।

বুধবার ঃ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন কার্য্যকরী সমিতি।

বৃহস্পতিবার ঃ—চট্টগ্রাম মুছলিম্ ছাত্র সমিতি (কলিকাতা) সমিতির রজত জয়ন্তী ও ইদ্ সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা।

শনিবার ঃ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসঙ্ঘের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার সভ্যদের এক সাধারণ সভা।

রবিবার ঃ—(১) ছাত্র সমিতি,—কানপুরে ১৪৪ ধারা জারী সম্বন্ধে বিতর্ক। (২) সিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী-সঙ্ঘ।

আন্তর্জ্জাতিক বিষয়

রবিবার ঃ—(১) "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের উদ্যোগে এসিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান রাজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তা ইয়ুসেফ আহম্মদ বাগদাদী। (২) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে ডাঃ মণীন্দ্র মৌলিক কর্ত্তৃক ইটালীর করপোরেটিভ প্রণালীর আলোচনা। দুই সভায়ই সভাপতি ডক্টর বিনয় সরকার।

বুধবার ঃ—(১) ছাত্রছাত্রীর অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে "জেনীভার বিশ্ব-রাষ্ট্র সঙ্ঘ একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা এই বিষয়ে বক্তৃতা। (২) ভারতীয় সংবাদ পত্র সেবী সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ডাঃ বিধান রায় কর্ত্তৃক ইয়োরোপের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

মহিলা

মঙ্গলবার—(১) নিখিল বঙ্গ মহিলা কর্ম্মী সম্মিলন। আগামী অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভা। বঙ্গদেশের সকল মহিলা কর্ম্মী ও মহিলা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য সাদর আহ্বান করা হইয়াছে। (২) দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা কর্ম্মিসঙ্ঘ।

আলোচ্য বিষয় আগামী নিখিল বঙ্গ মহিলা কর্ম্মী সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ইত্যাদি।

শুক্রবার নিখিল বঙ্গ মহিলা কর্ম্মী সঙ্ঘের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা হইবে।

সমাজ

রবিবার—(১) নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মিলন। (২) বারজীবী সম্মিলন।

ইতিহাস

বুধবার—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বক্তৃতা।
বিষয়—(১) ক্যাপ্টেন জেমস ষ্টুয়ার্ট, (২) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ভ্রমণ

মঙ্গলবার স্কটল্যাণ্ড হইতে ফিরিবার পথে, ওয়াই এম সি এ'তে বক্তৃতা।

রকমারি প্রতিষ্ঠান ও আলোচনা

ধর্ম্মবিষয়ে সভা বা সমিতির আধিক্য দেখিয়া এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, কলিকাতাবাসীরা ধর্ম্মচিন্তাতেই মগ্ন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভার সহিত অন্যান্য সকল প্রকার অ-ধার্ম্মিক সভাগুলির তুলনা করিতে হইবে। এই হিসাবে দেখিতে গেলে ধর্ম্ম-সভাগুলির সংখ্যা বেশী নয়। এই সূত্রে আর একটী কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে—রবিবারেই ধর্ম্ম-বিষয়ক সভার সংখ্যা বেশী। পাশ্চাত্য সমাজের রবিবারে গির্জ্জা-গমনের ন্যায় আমাদেরও ঐ দিবসে গীতাসভা, উপনিষদ আলোচনা

প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। দোকান কর্ম্মচারীদের সমিতি, ফেরিওয়ালাদের, জুতা কারখানা শ্রমিকদের সভা, প্রেস কর্ম্মচারীদের সঙ্ঘ, বিস্কুট ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের সভা, চটকল মজুরদের ইউনিয়ন, এই প্রকারের সভাসমিতি শ্রমিক জাগরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সভাসমিতিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কলিকাতায় নানা ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটিগুলি বিশেষ কর্ম্মতৎপর। দুইটী বর্ত্তমান রাষ্ট্র সমস্যার ইঙ্গিত এই সপ্তাহের সভাগুলি হইতে পাওয়া যায়। একটী হইতেছে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত সম্পর্কে, আর একটী হইতেছে আন্দামান বন্দীদের অনশন সম্ভাবনা সম্পর্কে। সমাজতন্ত্রী-দলের দুইটী অধিবেশন এই সপ্তাহে হইয়াছে।

কলিকাতার স্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। আলোচ্য সপ্তাহে স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিকার বিষয়ে বক্তৃতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আর্থিক তরফ হইতে দেখিতেছি যে, পল্লীসম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ ভাবে হইয়া থাকে। পল্লী-সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং পল্লী-সংগঠন সম্মিলনী—আলোচ্য সপ্তাহে দেখা যায়। দরিদ্র-বান্ধব ও বেকার সমিতি দেশের আর্থিক দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচ্য সপ্তাহে একটী প্রধান সমস্যা হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার কথা,—চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা বিশেষ প্রণিধান-

যোগ্য। অন্যান্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে সভাসমিতির কাজকর্ম্ম খুবই অল্প। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যায় না। তবে ছাত্র আন্দোলন ও মহিলা আন্দোলনের নিদর্শন বা প্রমাণ এই সপ্তাহের সভাসমিতিগুলি হইতে পাওয়া যাইতেছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে, নানাপ্রকার সভাসমিতির অনুষ্ঠান কলিকাতায় হইয়া থাকে। তাহাতে কলিকাতার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতার লোকেরা যে নানা এবং নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানে নানা বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করিতেছে তাহার উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। যে সময় লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছি তাহা নিশ্চই যথেষ্ট নয়। আরও দীর্ঘকালব্যাপী সময় লইয়া এরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। মোটের উপর এইরূপ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার ফলে মনে হয় বাঙ্গালী বাড়তির পথে। কেন না পূর্ব্বে কলিকাতার বাঙালীরা এত বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে নাই। এত সব বিষয়ে আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কও কলিকাতায় চলিত না।*

* এই আলোচনা সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল (২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭) :—

সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দত্ত "কলিকাতার মগজ" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ ভূপেন দত্ত সভাপতিত্ব করেন। লেখক প্রবন্ধে কলিকাতার লোকেরা কি কি বিষয়ে চিন্তা করিতেছে তাহার আলোচনা করেন। এক সপ্তাহের (৫ই ডিসেম্বর হইতে ১২ই ডিসেম্বর) দৈনিক খবরের কাগজ হইতে সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ করিয়া বিষয়টির আলোচনা করা হয়। আলোচ্য সপ্তাহে দেখা যায় যে, সর্ব্বসুদ্ধ ১০৬টি সভা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। লেখক বলেন যে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সভার আধিক্য দেখিয়া এইরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, কলিকাতার লোকেরা ধর্ম্ম-চিন্তায় মগ্ন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সভাগুলির সহিত অন্য সকল প্রকারের সভাগুলির তুলনা করা দরকার এবং এইরূপ

তুলনা করিলে ধর্ম্মসভার সংখ্যা আদৌ বেশী মনে হয় না। শ্রমিকদের সভা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। লেখক বলেন যে, কলিকাতায় যেসকল সভার আয়োজন শ্রমিকরা করিয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় যে, তাহারা আপনাদের অধিকার সম্বন্ধে খুব সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকদের সভার পরে রাষ্ট্রিক সভাগুলির স্থান। আলোচ্য সপ্তাহের দুইটি প্রধান রাষ্ট্রসমস্যার প্রতি লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—একটি হইতেছে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত সম্পর্কে, অপরটি হইতেছে আন্দামান বন্দীদের অনশন সম্ভাবনা সম্পর্কে। অন্যান্য বিষয়ের সভাগুলিরও লেখক তালিকা দেন এবং উপসংহারে বলেন যে, আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় যেসকল নানাপ্রকারের সভা সমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, কলিকাতার মগজ খুবই সক্রিয়।

গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, দৈনিক খবরের কাগজ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণা-কার্য্য চালান যাইতে পারে। সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন যে, এইরূপ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা করিলে ভাল হইবে।

জাতপাঁতের মাসিকপত্রিকা*

শ্রীসুশীলেন্দু দাশগুপ্ত বি এস সি, বি এল,
গবেষক, সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষৎ

বাংলা ভাষায় সামাজিক পত্রিকাবলীর বিবরণের সহিত ঐসব পত্রিকায় কি কি বিষয় আলোচিত হয় তাহার একটু নমুন দেওয়া যাইতেছে। সুবর্ণবণিক্ সমাচার ব্যতীত কোন পত্রিকাই আথিক

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সভায় পঠিত (১৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭)। এই সভার বৃত্তান্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল (২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৭), যথা :—

বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের আর এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুশীল দাশগুপ্ত বাঙ্গলার জাতপাঁতের মাসিক পত্রিকাদি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বিভিন্ন জাতি নানা পত্রিকাদির মধ্য দিয়া কিরূপ আলোচনা ও চিন্তা চালাইতেছে, তাহারই আলোচনা ঐ প্রবন্ধে করা হয়।

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ সার্থকতা আছে। জাতিসমূহের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলে জাতিগত সঙ্কীর্ণতা দূর হইতে পারে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, তথাকথিত উচ্চ জাতির উদ্ভব হইয়াছে অতি নিম্নশ্রেণীর জাতি হইতে। অনেক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যারও সমাধান এইরূপে হইতে পারে। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি ও গঠন আলোচনা করা প্রয়োজন। গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বলেন যে, সাধারণতঃ লোকেরা গবেষণা বলিতে বোঝে, অতীতের বিষয় লইয়া আলোচনা। কিন্তু বর্ত্তমানে যে নানা-প্রকারের কর্ম্মবিকাশ বা আন্দোলন চলিতেছে তাহার দিকেও নজর ফেলা দরকার। "একালের" নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাও সমাজ-বিজ্ঞানের পক্ষে বিশ্লেষণের বস্তু। সমাজ-বিজ্ঞানসেবীরা বর্ত্তমান, সমসাময়িক এবং সাম্প্রতিক কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালীর বিশ্লেষণে মনোযোগী হইলে সমাজবিজ্ঞান পুষ্টিলাভ করিবে।

অসচ্ছলতার দরুণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় না। সদ্গোপ পত্রিকা ভাদ্র ১৩৪৩ সনের পর আর প্রকাশিত হয় নাই।

কায়স্থ পত্রিকা

বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ-সভার মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র।

প্রতিষ্ঠা—বৈশাখ ১৩০৮।

কার্য্যালয়—৫, ললিত মিত্র লেন—শ্যামবাজার।

১। নিবেদন—শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী।

(উপবীত ধারণ করিবার নিমিত্ত নিবেদন করা হইয়াছে)।

২। সেকালের ইতিবৃত্ত—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র।

৩। কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয় বর্ণত্ব সিদ্ধান্তকারী ভারতবর্ষের বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা—সম্পাদক।

* * * * * *

পুনা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, চিৎপাবন, বঙ্গদেশ, কাশী, মথুরা, জম্বু, কাশ্মীর ও তিব্বতীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থ ও প্রভু কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

৪। সর্ব্বত্যাগী (উপন্যাস) কুমারী আরতি দত্ত।

৫। পূর্ব্বরাগ—শ্রীভোলানাথ বর্ম্মা।

৬। সমাজ সংবাদ ইত্যাদি।

কায়স্থ-সমাজ

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের মুখপত্র।

সম্পাদক—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রতিষ্ঠা—বৈশাখ ১৩২৬।

কার্য্যালয়—১৪১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈশাখ ১৩৪৪এর বিবরণ :—

১। শিবার্চ্চনায়—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

২। সৃষ্টি ও দার্শনিক মত—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, ন্যায়বাগীশ।

৩। নবরত্ন সভা—শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস।

৪। পরমাত্ম-প্রকাশ—শ্রীশ্যামাচরণ পাল।

৫। কায়স্থ করদ রাষ্ট্র—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

* * পান্নার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ যখন রাজ্যচ্যুত হন, জনৈক কায়স্থ জায়গীরদার এবং জনৈক মাড়োয়াড়ী বণিক্ পান্নারাজ্যের অন্তর্গত কতিপয় তহশীল ভারত সরকার হইতে প্রাপ্ত হন এবং 'করদ নৃপতি' রূপে গণ্য হন। ইহারা মাথুর কায়স্থ শাখাভুক্ত * * *

কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশ কায়স্থ।

কামতা রাজৌলা (বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্গত) কায়স্থ-রাজ-শাসিত।

"অঠগড়" (ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সির অন্তর্গত) এবং "বিটঠলগড়" (ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এজেন্সির অন্তর্গত) কায়স্থ-রাজ শাসিত।

৬। বিবিধ প্রসঙ্গ।

গন্ধ বণিক সমাজ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

সম্পাদক—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, বি, এল, এটর্ণী অ্যাট-ল

ও শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র, বেদান্তরত্ন, এম এ।

প্রতিষ্ঠা—মাঘ ১৩২৬।

কার্য্যালয়—২১ নং মুক্তারাম রো।

কার্ত্তিক ১৩৪৪ এর বিবরণ ঃ—

১। জাতক রহস্য জটাধারী।

২। বিজয়া দশমী (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণধন পাল, বাণীকণ্ঠ।

৩। শারদ প্রাতে (কবিতা)—শ্রীইন্দুভূষণ বণিক।

৪। নিবেদন (কবিতা)—গন্ধকবি গুণানন্দ।

৫। মনের গহনে (গল্প)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাধু।

৬। ছন্দসৃষ্টি (কবিতা)—শ্রীরঘুনাথ বণিক।

৭। আয়ুর্ব্বেদ ও শল্য চিকিৎসা—শ্রীবিধুভূষণ বণিক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কায়-চিকিৎসা ও শল্য-চিকিৎসার বিস্তৃত আলোচনা।

৮। তাজমহল (কবিতা)—শ্রীইন্দ্রনাথ সাধু।

৯। জাপান—শ্রীযোগেন্দ্ররঞ্জন দত্ত, বি-কম।

১০। স্বর্গে বেণের মেয়ে (বেহুলার গল্প)—স্বর্গীয়া পরিতোষবালা দত্ত।

১১। আকাশে বাতাসে (বিজ্ঞান)—শ্রীমান অতুলানন্দ বণিক। আকাশে উঠিবার চেষ্টার ইতিহাস। কিরূপে বেলুন, জেপেলিন, এরোপ্লেন, সিপ্লেন প্রভৃতি একের পর এক আবিষ্কৃত হয় তাহারই বিবরণ।

১২। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষালয় (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)—শ্রীশ্রীনিবাস সাহা।

১৩। জাতীয় সংবাদ।

তাম্বুলী পত্রিকা

সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল।

প্রতিষ্ঠা—বৈশাখ ১৩২১।

কার্য্যালয়—১৯৩ নং পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ এর প্রবন্ধাবলী :—

১। দরিদ্রের সেবা—সম্পাদকীয়।

ধনের সদ্ব্যবহার দীন দরিদ্রের পরিবেষণে, ব্যথিতের ব্যথা হরণে। ধনী তিনি, দীন দরিদ্র যাহার অর্থে পালিত, দেশের জন্য, দশের জন্য যাহার ভাণ্ডার সদাই উন্মুক্ত।

২। মানুষ (কবিতা) শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন।

হাত পা থাকিলে মানুষ হইলে, মানুষ ডালের বানরগুলো
পেট ভরে খেয়ে মানুষ হইলে, শূকরে কেন না মানুষ বল ?

* * * * *

জনমে মানুষ হয় না মানুষ, মানুষ হইতে সাধনা চাই।
পরের লাগিয়া মরিতে যে পারে, মানুষ সে তার তুলনা নাই।

* * * * *

৩। আদর্শ বধূগঠন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

৪। সখা (কবিতা)—শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত।

৫। বিবিধ।

ব্রাহ্মণ-সমাজ

সম্পাদক—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম-এ।

কার্য্যালয়—৪।এ ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতিষ্ঠা—বৈশাখ ১৩৪৩।

কার্ত্তিক ১৩৪৪ এর প্রবন্ধাবলী :—

১। শ্রীশ্রীকালীপূজা বা দীপান্বিতা—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

২। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মতত্ত্ব—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

৩। বিজয়া দশমী ,,

৪। গার্হস্থ্যাশ্রম—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

৫। হিন্দুর রাজভক্তি—পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

৬। প্রাচীন স্ত্রী-শিক্ষার বিকার রহস্য (ঐতিহাসিক গবেষণা)-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি।

মাহিষ্য-সমাজ

সম্পাদক—অধ্যাপক সন্তোষকুমার দাস, এম-এ।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ পাল, বি, এ।

প্রতিষ্ঠা—বৈশাখ ১৩১৭।

কার্য্যালয়—১২৯।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভাদ্র ১৩৪৪ এর বিবরণ ঃ—

১। পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি (কবিতা)—
শ্রীকালিদাস রায়, বি, এ, কবিশেখর।

২। দেশপ্রাণ শাসমল—কুমারী মঞ্জরী শাসমল।

৩। ধর্ম্মশিক্ষা—শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী, বি-এস-সি।

৪। শিশুমঙ্গল—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় রায়, এইচ, এম-বি।

৫। অভিসারের স্মৃতি (কবিতা)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

৬। অনুযোগ (কবিতা)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা, বি-এল।

৭। গান (কবিতা)—শ্রীদেবীপ্রসাদ ভৌমিক।

৮। বাংলার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস। অ্যাড্‌ভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট।

৯। বিখ্যাত পালবংশ (ঐতিহাসিক গবেষণা)।

১০। আজ বড় দিন (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

১১। আমাদের সমাজ—শ্রীবলরাম ধাড়া, বি-এল।

১২। অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক অধ্যায়—
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি, বি-এল।

১৩। অশৌচ সংক্ষেপ বনাম উপনয়ন সংস্কার—
ডাঃ রমেশচন্দ্র তালুকদার।

মাহিষ্যজাতির ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন সংস্কার ও দ্বাদশাহাশৌচ গ্রহণ করার পক্ষে বলিয়াছেন।

১৪। বাংলার বিভিন্ন জেলায় অস্পৃশ্যতার বিভিন্নরূপ—
শ্রীরাধাবিনোধ চৌধুরী।

বঙ্গদেশে ১২৫টী জাতি অনাচরণীয়। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কয়েকটী জাতি স্থান-বিশেষে জলচল, স্থান-বিশেষ নহে। যথা—

১। রাজ বংশী—রংপুর জেলার কতকাংশে ও জলপাইগুড়ি জেলাতে জলচল, অন্যত্র নহে।

২। শাঁখারী—বীরভূমে জল অচল, অন্য সর্ব্বত্র চল।

৩। তিওর—মালদহে জলচল, অন্যত্র অচল।

৪। বেহারা—নোয়াখালীতে জলচল, অন্যত্র অচল।

৫। গোয়ালা—বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম ব্যতীত সর্ব্বত্র জলচল।

৬। উগ্রক্ষত্রিয়—বর্দ্ধমানের একাংশ ব্যতীত সর্ব্বত্র জলচল।

কয়েকটি অনাচরণীয় জাতি কতক পরিমাণে মুসলমান আচার পালন করিয়া থাকে। যথা ভেড়ুয়া, পটুয়া, ধাওয়া, সিকৃরী, বেদিয়া (ইহারা কবর দেয়, আল্লার নাম নেয় ; কিন্তু হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করে)।

যশোহরে—মুচি, কাওড়া, নমঃশূদ্র সাধারণ ইন্দারা ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু অহিন্দুদের পক্ষে কোন বাধা নাই।

বীরভূমে—মুচি, ডোম, হাড়ি, বাউরি ও সাঁওতাল সাধারণ ইন্দারা ব্যবহার করিতে পারে না।

নিম্নলিখিত জেলাগুলির কোন কোন মন্দিরে অনাচরণীয় জাতি পূজক। কিন্তু ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু পূজা দেয়, যথা—বাঁকুড়া জেলায় ছাদাই গ্রামে চণ্ডীমন্দিরে পূজক বাউরি; কনিষ্ঠা গ্রামে সুন্দর রায়ের মন্দিরে পূজক ডোম। হাওড়া জেলায় শিবপুর শীতলা মন্দিরে পুরোহিত যোগী, কিন্তু পরিচালক ব্রাহ্মণ। বর্দ্ধমান জেলায় বামচন্দ্রপুরে চণ্ডীমন্দিরে পুরোহিত ডোম। দিনাজপুর জেলায়—ডোমকালী ও মশানকালী মন্দিরে পূজক হাড়ি, কিন্তু পরিচালক ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুর জেলায়—কাঁথি মহকুমায় তালদা মন্দিরে পূজক জেলে।

কর্ম্ম-অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য, যথা ঢাকা জেলায় কায়স্থ মাঝি নমঃশূদ্রের বাড়ীতে কাজ করে না। সূত্রধরগণ মুচির নিকট নৌকা বিক্রয় করে না। কায়স্থ মাঝিরা নমঃশূদ্র ও মুচিকে এবং নমঃশূদ্র মাঝিরা মুচিকে নৌকায় নেয় না।

ময়মনসিংহ জেলায়—নমঃশূদ্র, মুচি, মালী, মেথরকে মাঝিরা নৌকায় নেয় না।

কুমিল্লা ও খুলনা জেলায়—মুচিকে কোন মাঝি নৌকায় নেয় না।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ এর বিবরণ :—

১। ব্রজবিদেহী মহান্ত স্বামী ১০৮ শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী।

২। মেঘলা দিনে (কবিতা)—শ্রীশম্ভূচরণ মল্লিক।

৩। বন্ধুস্মৃতি (স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র রায়)—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

৪। সদনুষ্ঠান (শ্রীযুগলকিশোর দাস মহাশয় শান্তিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের সন্নিকটে ভিক্টোরিয়া রোডের উপড় একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহারই বিবরণ)।

৫। মহাভারতের কথা ও উপদেশ—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী।

৬। মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী।

৭। অগ্রদূতের অগ্রগতি—শ্রীচুনিলাল নন্দী।

৮। বিবিধ।

সুবর্ণবণিক সমাচার

সম্পাদক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা
ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন।

প্রতিষ্ঠা—অগ্রহায়ণ ১৩২২।

কার্য্যালয়—৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা।

ভাদ্র ১৩৪৪ এর বিবরণ :—

১। শিক্ষা (কবিতা)—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি এল, বাণীকণ্ঠ।

২। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর—শ্রীআশুতোষ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

৩। সমুদ্র (কবিতা)—শ্রীমতী তমাললতা বসু।

৪। ডাক্তার (গল্প)—শ্রীগুরুদাস রায়।

৫। মূকের মতন মৌন রহিয়ো (কবিতা)—শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু।

৬। অনাহূত (উপন্যাস)—শ্রীযতীন্দ্রনাথ আঢ্য, বিদ্যানিধি, সাহিত্য পুরাণরত্ন।

৭। ঝড় (কবিতা)—শ্রীমতী পঙ্কজিনী ঘোষাল।

৮। ভুল বন্ধ ভুল—শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

৯। একা সে (কবিতা)—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম এ, বি এল।

১০। পঞ্চপুষ্প।

১১। অ্যালেক্‌জাণ্ডার গ্রাহাম বেল (জীবনী)—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম এ, বি এল।

১২। প্রেমের পূজা (কবিতা)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়।

১৩। বিয়ের ফুল (গল্প)—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (জীবনী)—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা।

১৫। জাতীয় সংবাদ।

এইসকল পত্রিকার প্রবন্ধপাঠে আমরা ইহাদের মধ্যে এক অভিন্ন ভাবধারা দেখিতে পাই। কেহই নিজেদের জাতের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নাই। কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত নাই। সব পত্রিকারই লক্ষ্য হচ্চে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের "মানুষ" তৈয়ার করা। ধর্ম্মোপদেশ, সাহিত্য, আলোচনা, জীবনী, দেশ-বিদেশের কথা—এই সবই হচ্চে এসকল সামাজিক পত্রিকাবলীর খোরাক। যেমন :—

কায়স্থ সমাজ—সৃষ্টি ও দার্শনিক মতের আলোচনা।

গন্ধবণিক সমাজ—আয়ুর্ব্বেদ ও শল্য-চিকিৎসার আলোচনা এবং পূর্ব্বে আমাদের চিকিৎসা কিরূপ সম্পূর্ণ ছিল তাহারই সুচিন্তিত অভিমত। "জাপানে" ও "আকাশে বাতাসে" প্রবন্ধ দুটি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষোপযোগী।

"তাম্বুলী পত্রিকা"য় "দরিদ্রের সেবা" ও "মানুষ" পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, পত্রিকার চিন্তাধারা কোন্ দিকে।

"ব্রাহ্মণ সমাজে"র প্রবন্ধ কয়টি কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এবং তাহারই বিশ্লেষণ।

"মাহিষ্য সমাজে"র "পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি", "দেশপ্রাণ শাসমল" "শিশুমঙ্গল" এবং "বাংলার বিভিন্ন জেলায় অস্পৃশ্যতার বিভিন্নরূপ" প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুন্দর।

"সুবর্ণবণিক্ সমাচারে"র প্রবন্ধাবলী একটি উচ্চস্থানীয় মাসিক পত্রিকার মত। কবিতা, গল্প ও জীবনীর সমাবেশ।

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক পত্রিকার মাত্র দু'এক সংখ্যা দেখিয়া তাহার পরিচালনা সম্বন্ধে কিছুই বুঝা যায় না। যতটুকু দেখিলাম ততটুকু হইতে সামান্য কিছু সিদ্ধান্ত করিতেছি।

যদিও এই সব পত্রিকার ভিতর জাতে-জাতে ঝগড়া বা সাম্প্রদায়িক কলহের আভাষ নাই, তথাপি ইহা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, হিন্দু সমাজের সকল জাতের ভেতর একটা ভ্রাতৃত্ব বা বন্ধুত্ব ভাব এসেছে। এখনও জাতে-জাতে ঝগড়া, বিসংবাদ যথেষ্ট আছে। তবে সুখের কথা এই যে, এরা পত্রিকার ভিতর দিয়ে জাত-বিদ্বেষ বাড়াবার কোন চেষ্টা করছে না। এবং এর ফল ধরে নেওয়া অনুচিত হবে না যে, শীঘ্রই জাতে-জাতে সংঘর্ষের অবসান হবে। শীঘ্রই আসিছে সে দিন আসিছে।

ছাত্র-আন্দোলনের সামাজিক লক্ষ্য*

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, এম এ (কলিকাতা), বি এ (অক্সফোর্ড),
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেম্বর বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল

স্বাধীনতার সমস্যা

আজ আপনাদের এ সম্মেলনে যে আমাকে ডেকেছেন, সেজন্য আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রীহট্ট বাংলা দেশেরই অংশ। বাংলার সঙ্গে তার প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত ঐক্য বর্ত্তমান। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে শ্রীহট্ট বাংলার বাহিরে। আমরা চাই বাংলার শ্রীহট্ট আবার বাংলায় ফিরে আসুক।

আপনারা আমাকে আজ ডেকেছেন। কি কথা আপনাদের কাছে আমি বলতে পারি? কোন বাণী শোনাবার মত আকাঙ্ক্ষা বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। নেহাৎ ঘরোয়াভাবে আপনাদেরই একজন হিসাবে আজ আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। বর্ত্তমান যুগ-সন্ধির দিনে যে-সমস্ত সমস্যা আমাদের কাছে প্রবলতম, যে সমস্ত সমস্যা জাতির জীবনের সহজ পরিণতিকে জটিল করে তুলছে, তারই সম্বন্ধে আমি দুয়েকটি কথা আপনাদের কাছে নিবেদন ক'রব।

বর্ত্তমান দিনে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্বাধীনতার সমস্যা। সে স্বাধীনতার অর্থ কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয়—সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক—তার বহুদিকের বহুরূপ। ইংরেজ যদি আজ এদেশের শাসনতন্ত্র চালাবার ভার মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেয়,

* সুরমা উপত্যকা মুসলমান ছাত্র-সম্মেলনে (অক্টোবর ১৯৩৭) এবং কুমিল্লা ছাত্র সম্মেলনে (জানুয়ারী ১৯৩৮) সভাপতির অভিভাষণ ("বুলবুল" অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ ও বৈশাখ ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত)।

তবে অনেকে হয়তো তাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলবেন, কিন্তু দেশের বিপুল জনসাধারণের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাহাকার, তাদের সহস্র অপমান ও লাঞ্ছনার কিভাবে অবসান হবে? ইয়োরোপের গত শতকের ইতিহাস একথা আমাদের শিখিয়েছে, তাই ইয়োরোপ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের পরিণতি খুঁজেছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সাম্যের মধ্যে। তাই ইয়োরোপের দেশে দেশে আজ সমাজের বিভিন্ন কর্ম্মধারার মধ্যে রাষ্ট্রের অধিকারের দাবী, শ্রমিক ও ধনিকের সম্বন্ধ স্থাপনে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ, দেশের ধনসম্পদের ব্যবহারে ও পরিপূরণে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার ছড়াছড়ি।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থ নাই; কিন্তু তবু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিণতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় এবং সামাজিক স্বাধীনতায় তার পূর্ণতা। তাই আমাদের প্রথম সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। সে স্বাধীনতার মধ্যে আমরা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ রূপের পরিকল্পনা পাব—স্বাধীনতার বিচিত্র প্রকাশকে সফল করবার সামর্থ্য ও ইঙ্গিত খুঁজে পাব।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন ছাত্র সম্মেলনে এ সমস্ত কথার কি স্থান আছে? কিন্তু ছাত্রহিসাবে আমাদের যেগুলি বিশেষ সমস্যা, তার সমাধানও কি আমরা ছাত্রজীবনের পরিসরের মধ্যে করতে পারি? বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আমরা আমূল পরিবর্ত্তন করতে চাই। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিলাভ ভিন্ন কি সে ক্ষমতা আমরা অর্জ্জন করতে পারি? আমাদের দেশের শিক্ষাধারা পরাধীন দেশের জন্য—স্বাধীন চিন্তার সেখানে অবকাশ অল্প, কারণ স্বাধীন চিন্তা ও রাজনৈতিক পরাধীনতা পরস্পর-বিরোধী। মেকলের সময় থেকে এ সম্বন্ধে ধারণার বেশী বদল হয়নি, এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল রাজকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য কেরাণী

তৈরী—যারা আদেশ নেবে, আদেশ দেবে না ; যুক্তিতর্ক করবে না, বিচার করবে না—কেবলমাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দ্দেশ গ্রহণ করবে।

শিক্ষার শেষে আমাদের যুবকদের সামাজিক ব্যবহারের ও সমাজসেবার প্রশ্ন কি ছাত্রজীবনের সমস্যা, না রাজনীতির প্রশ্ন? শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যা, দিন দিন গুরুতর হ'য়ে উঠছে, অথচ তার সমাধান ছাত্রজীবনের সীমানার মধ্যে নাই—সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নতুন সমাজের পরিকল্পনার কথা এখানে আসে। বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের নৈরাশ্য দূর করতে না পারলে বেকার-সমস্যা মেটাবার আশ্বাস কই? তাই ছাত্র হিসাবে রাজনীতিকে ইচ্ছা করলেও বর্জ্জন করা চলে না—কম্বল তো ছাড়ে না।

আবার অন্যদিক্ থেকেও ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে যোগ বাঞ্ছনীয়। কম্বল ত্যাগ করবার চেষ্টাও ভুল। সমাজের সমষ্টিগত জীবনের প্রতিরূপ রাজনীতি, তাই সমাজে থাকতে হ'লে রাজনীতিকে এড়ানো যায় না। আবার না এড়ালে প্রয়োগ ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য-রেখা টানব কোথায়?

অতএব অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের দিক্ থেকে ছাত্রজীবনে রাজনীতির যোগ বাঞ্ছনীয়—আমাদের দেশে রাজনৈতিক চপলতার কারণ কি এখানে মেলে না?

মুসলমানের শক্তিবৃদ্ধির উপায়

আমার মনে হয় বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রদের বেলায় একথা স্বীকার না করে উপায় নাই। কারণ নেতৃত্বের অভাবে আমরা আজ পিছিয়ে পড়েছি—সে অভাব দূর করতে হ'লে আজ বিশেষ চেষ্টা ও সাধনার দরকার। গত ১০০।১৫০ বৎসরের মুসলমানের ইতিহাস পতনের ইতিহাস, পরাজয়ের ইতিহাস। তাই সেদিনকার মনোবৃত্তি

যাদের আজও আছে, তাঁরা পরাজয়ের চোখে রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেখেন, তাঁদের মনোবৃত্তি কেবলমাত্র সন্তর্পণে সতর্কভাবে আপনাকে রক্ষা করে চলবার মনোবৃত্তি। তাই তাঁদের মুখে এক কথা মুসলমানের জন্য চাই রক্ষাকবচ, চাই বিশেষ বন্দোবস্ত, চাই দুর্ব্বলের অপরের প্রতি নির্ভরতা।

জিন্না-রাজনীতি ও ধামাধরা রাজনীতির মূল কথাও এইখানেই মেলে। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে যোগদানে তাই তাঁরা বিমুখ। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দোহাই দিয়ে তাঁরা বলেন যে, আমরা শক্তিশালী হয়ে তবে ভারতের অন্যান্য জাতির, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে কাজ করব, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়ব। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সম্বন্ধে আমি দু'চারটা কথা পরে বলব।

এখন শুধু বলতে চাই যে, তাঁদের মত যদি আমরা মেনে নিইও, সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা যদি পাইও, তবুও তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতিতে সে স্বার্থরক্ষার উপায় কই? কেবলমাত্র দুই তিনটা কারণ আজ এখানে আলোচনা করব।

তাঁরা বলেন যে, শক্তিশালী হয়ে তারপর আমরা দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দেব। কিন্তু শক্তিশালী হবার উপায় যে কী, সে সম্বন্ধে তাঁরা হয় নির্ব্বাক, নয় অস্পষ্ট। তাঁদের কথায় মনে হয় যে, রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে থেকে, রক্ষাকবচ দাবী করে, বিদেশীর সঙ্গে রফা করে তাদের উপরে নির্ভর করে আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে পারব। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হবার কোন উপায় নেই। জলে না নেমে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, ডাঙ্গার সমস্ত কসরৎই যেমন জলের মধ্যে নিরর্থক, তেমনি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে, স্বার্থত্যাগ করে

দুঃখ সয়ে, বেদনার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে শক্তিশালী হ'তে হবে। ত্যাগ এবং দুঃখ স্বীকার ভিন্ন শক্তি অর্জ্জনের স্বপ্ন বাতুলতা। কাচের ঘরে মোমের পুতুলের মুখে শক্তির কথা শোভা পায় না।

এসম্বন্ধে আরো আমি বলব যে, আজ যদি তাঁরা আবদার ধরে বসে থাকেন ইংরেজের দৌলতে হিন্দুর সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারার বন্দোবস্ত সুবিধামত করেও নেন, তবু সে ভাগবাঁটোয়ারা, সে চুক্তি, সে প্যাক্ট্ যে টিকবে, তার আশ্বাস কোথায়? শক্তি না থাকলে সন্ধির কোন মানে নাই সে কথা আমরা বারে বারে দেখেছি—দেখেছি যে সশস্ত্র রাজ্যও শক্তির ভ্রূকুটিতে সন্ধিপত্রকে ছেঁড়া কাগজের টুকরা বলে অবহেলায় পদদলিত করে, দেখেছি দুর্ব্বল বেলজিয়ামের কোন যুক্তিতর্ক, কোন সন্ধি-প্রতিজ্ঞার দোহাই জার্ম্মাণি শোনে নাই, আজ দেখছি যে শক্তিমান জাপান সন্ধিপত্রকে অবহেলা করেই তার রাজনীতিকে চালনা করছে। তাই হিন্দুর সঙ্গে যাঁরা চুক্তি করতে চান, বলেন যে চুক্তি না হলে, ভাগবাঁটোয়ারা ঠিক না হলে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত নয়, তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে স্বাধীনতা কি কেবলমাত্র হিন্দুরই কাম্য? সে স্বাধীনতায় কি আমাদের দাবী নাই? আর যদি চুক্তিতেই আমরা বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাসের ভিত্তি যে কত দুর্ব্বল তা বারে বারে দেখেও কি আমরা শিখব না?

ইংরেজ যখন এদেশে এল, তখন তাদের শিক্ষা, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে অসহযোগের ফলে আজ আমরা ৫০ বছর পিছিয়ে পড়েছি। আজও কি এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ না দিয়ে আমরা আবার সেই ভুলই করব? আবার ৫০ বৎসর পরে একদিন হঠাৎ চোখ মেলে দেখব যে ত্যাগে, সামর্থ্যে, দুঃখ-সহনের শক্তিতে আমরা আবার সেই ৫০ বৎসর পিছেই পড়ে আছি! বারে বারে ঠকেও কি আমাদের শিক্ষা হবে না?

আরো একটা কথা আপনাদের কাছে বল্‌তে চাই—শক্তি নির্ভর করে মনোবৃত্তির উপরে, চিত্তের তেজ এবং সাহসের উপরে, তা নইলে সাত কোটী লোক কোনদিন দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়ে নিজেকে এমন করে বঞ্চনা করত না। আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু বা মাইনরিটি বলে সর্ব্বদাই ভয় পাই, সর্ব্বদাই মাইনরিটির বিশেষ ব্যবস্থা খুঁজে বেড়াই। কিন্তু সাতকোটী লোককে কি সত্যি সত্যি মাইনরিটি বলা চলে? সাতকোটী লোক দূরের কথা, সাতলক্ষ লোকের মধ্যেও যদি তেজ থাকে, নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তবে পৃথিবীতে কাকে তারা ডরাবে? আমরা এ কথা কেন ভুলে যাই যে, মুসলমানের যেদিন গৌরবের দিন, যে যুগের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস, সে যুগে মুসলমান সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই মাইনরিটি ছিল এবং সে মাইনরিটি সাত কোটীর মাইনরিটি নয়, সে মাইনরিটি ছিল কোথাও সাত শতের মাইনরিটি কোথাও বা সপ্তদশ সহস্রের মাইনরিটি। আজও যে ইংরেজ আমাদের দেশে প্রভুত্ব করছে, সে কি সংখ্যা-গুরুত্ব দিয়ে? বাংলার হিন্দুদের যে প্রতিপত্তি, তাও কি সংখ্যার জন্য? তাই আজ আপনারা মুসলমানের যৌবনের প্রতীক—আপনাদের ভুলতে হবে যে আপনারা মাইনরিটি, আপনাদের ভুলতে হবে যে আপনারা দুর্ব্বল। আপনাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে ঘোষণা করতে হবে যে, আমরা অপরের উপর নির্ভর করে থাকব না; আমাদের মুক্তি, আমাদের অদৃষ্ট আমাদের নিজের হাতে গড়ব। আমি পূর্ব্বেও বলেছি এবং আবার বলি যে দুর্ব্বল আমরা নই, ভীরু আমরা নই, অশক্ত আমরা নই,—কেবল মাত্র আমাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে ভীরু নেতৃত্ব, দুর্ব্বল নেতৃত্ব, অশক্ত নেতৃবৃন্দ—যাঁরা নিজের দুর্ব্বলতা ঘাড়ে চাপিয়ে সমাজকে হীনবল করে ফেলছেন। আগেই বলেছি তাঁদের দৃষ্টি গত শতাব্দীর দৃষ্টি, তাঁদের মনোবৃত্তি পরাজয়ের মনোবৃত্তি, গ্লানি ও ব্যর্থতার মধ্যে

তাঁরা গড়ে উঠেছেন বলে সেই পরাজয়, সেই গ্লানি ও সেই ব্যর্থতা তাঁদের দৃষ্টিকে কলুষিত করে রেখেছে। মুসলমানের আজ দুর্ভাগ্য যে সেই ভীরু এবং পরাজিত নেতৃবৃন্দ আজ মুসলমান তরুণকে এসে বলছেন যে, তারা দুর্ব্বল তারা অশক্ত।

তাঁদের আপনারা বিদ্রোহদৃপ্ত কণ্ঠে বলুন যে, আপনাদের যুগ জাতির জাগরণের যুগ। জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনের আবহাওয়ার মধ্যে আপনাদের জন্ম, তার মধ্যে গত শতাব্দীর গ্লানি ও পরাজয়ের কোন স্থান নেই। আপনারা তরুণ, আপনারা দেশের ভবিষ্যৎ—পনেরো-বিশ বৎসরের পরের রাজনীতি আপনাদের রাজনীতি, সেই ভবিষ্যৎ-বিজয়ের পূর্ব্বাস্বাদে আপনারা দৃপ্তকণ্ঠে বলুন যে, দুর্ব্বলতার গ্লানি আপনাদের নেই,—বলুন যে দেশের তরুণকে যারা দুর্ব্বল বলে বলে দুর্ব্বল করে ফেলে, তারা দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু।

বিগত যুগের দৃষ্টি দিয়ে যে সমস্ত ক্ষীণচিত্ত নেতা আপনাদের বলেন যে আগে শক্তিশালী হয়ে তারপরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা যোগ দেব, তাঁদের যুক্তির ব্যর্থতা আমরা আগেই দেখেছি, দেখেছি যে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার স্বপ্ন বাতুলতা, দেখেছি যে শক্তির উৎস স্বাধীন মনোবৃত্তি, সতেজ চিত্তবল, যার বলে মানুষ একা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পায়, নিজের অন্তরের সত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আর কারু অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সন্তর্পণে বিপদ এড়িয়ে চলে শক্তিসঞ্চয় যদি সম্ভবও হত, তবু তার সময় কই? একথা আজ আমাদের ভুললে চলবেনা যে, আমাদের দেশ পৃথিবীর একটী অংশ। তাই বিশ্বরাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাতের প্রবাহ এড়াবার আমাদের কোন উপায় নেই। ইচ্ছে থাকলেও তাই শক্তিসঞ্চয়ের অবসর কই? আজ যেভাবে পৃথিবীতে বিপদ আসন্ন হয়ে এসেছে, তাতে কবে যে কোন জাতির ভাগ্যে কি ঘটে

তা বলার উপায় নাই, তাই আমাদের নেতাদের মধ্যে যাঁরা সুখস্বপ্ন দেখেন যে, বিদেশের রাজশক্তির ছায়াতলে বসে তাঁরা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, তাঁদের চিন্তাশক্তির অভাবে অবাক হয়ে যেতে হয়। আজ যদি পশ্চিমে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠে, তখন কি মুসলমানের স্বার্থের কথা ইংরেজ একবার ভাববে? ভাবতে পারে? ভাবা উচিত? রোমকশাসনে বিলাতের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, সেকথা কি কেবল ইতিহাসের পাতায়ই লেখা থাকবে? তা দেখেও আমরা শিখব না? পৃথিবীর রাজনীতির পরাবর্ত্তে এমন অবস্থা অসম্ভব নয় যে, ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে দিতে হবে—আত্মরক্ষার তাগিদে, শক্তির অভাবে। আজ যারা সেই রাজশক্তির ছায়ায় শক্তি-সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখছেন, সেদিন তাঁদের দশা কি হবে?

আজ পশ্চিমে রাজনৈতিক যে দুর্দ্দৈব, প্রাচ্যে চীন-জাপানের সমর পরিস্থিতিতে যে বিপদের সম্ভাবনা, তাতে যে-কোনদিন পৃথিবীব্যাপী-মহাযুদ্ধ ঘনিয়ে উঠ্‌তে পারবে। সেদিন ইংরেজ ভারতবর্ষকে তুষ্ট করতে চাইবে, ভারতবর্ষের চিত্ত জয় করতে চাইবে। সেদিন ইংরেজ রফা করবে শক্তিমানের সাথে—দুর্ব্বলের সঙ্গে নয়। সেদিন ইংরেজ সন্ধি করবে তাদের সঙ্গে যারা নিজের বলে বিশ্বাসী, যারা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণপণ করে শক্তি অর্জ্জন করেছে—সেদিন যারা কেবলমাত্র ভবিষ্যতে শক্তিসঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখে, তাদের দিকে ইংরেজ ফিরেও তাকাবে না।

চাই জনসাধারণের স্বার্থপুষ্টি

তারপরে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা—সে স্বার্থ কার স্বার্থ সে বিচার আমাদের করতে হবে। কার স্বার্থ আমরা চাই—দেশের বিপুল জনসাধারণের, না মুষ্টিমেয় অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর? দেশের

বিপুল জনসাধারণ হিন্দু মুসলমাননির্ব্বিশেষে দরিদ্র, বঞ্চিত, সর্ব্বহারা, —দরিদ্রের স্বার্থ হিন্দুমুসলমান খৃষ্টান-নির্ব্বিশেষে এক, সে স্বার্থ খাওয়া-পরার দাবী, সে স্বার্থ মানুষের ন্যূনতম অধিকার নিয়ে বাঁচবার দাবী। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে তাদের জীবনযাত্রা। সে-জীবনযাপনের অধিকারে স্বার্থের সংঘাত কতটুকু? তাই কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে, মজুর শ্রমিকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-বিরোধ নাই, স্বার্থের সংঘাত লাগে চাকুরীর ভাগাভাগিতে, সমাজসংগঠনের লাভের উপরিটুকু যাদের জোটে, কেবলমাত্র তাদের বেলায়। সেই লাভের ভাগাভাগি নিয়েই কাড়াকাড়ি। সেই কাড়াকাড়ির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরাও কি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজব? দেশের ছাত্রসমাজের সম্মুখে আজ তাই এই দুই পথ—সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারার কাড়াকাড়ি নিয়ে দু'একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, না দেশের বিপুল জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে আপনার মনুষ্যত্বের সাধনার সিদ্ধি। সে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, সাম্প্রাদায়িক স্বার্থসিদ্ধির কাড়াকাড়িতে ছাত্রসমাজের স্বার্থও পূরোপূরি মিটবে না—মিটতে পারে না। সব দেশে সব কালে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরই ভাগ্যে চাকুরী জুটতে পারে—একজনের ভাগে যদি জোটে তবে নিরানব্বই জনই বাদ পড়তে বাধ্য। দেশের ছাত্রশক্তি, দেশের যৌবনশক্তি কি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের সেই অনিশ্চিত লাভের লোভে দেশের বিপুল জনসাধারণের মঙ্গলের পথে বাধা দেবে, দিতে পারে? দেশের ছাত্রশক্তিকে তাই উদার দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত সমস্যা দেখতে হবে—সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীস্বার্থের ক্ষুদ্রসীমানা অতিক্রম করে দেশের বঞ্চিত ও প্রপীড়িত জনসমাজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবাব সাধনায় নামতে হবে। দেশের তরুণদের আজ তাই জিন্না-রাজনীতি বর্জ্জন করে দেখতে হবে নতুন ভারতবর্ষের স্বপ্ন—সে সাধনার মধ্যে

দরকষাকষির চৌদ্দদফা নেই, তাতে রয়েছে দেশের স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। জিন্না সাহেবের চৌদ্দদফার আলোচনা করলেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতির ফাঁকামূর্ত্তি স্পষ্ট প্রকাশ হয়ে পড়ে—সে চৌদ্দদফায় গণস্বার্থের বিন্দুমাত্র কথা নাই, বঞ্চিত চিরদরিদ্র মুসলমান শ্রমিককৃষকের ক্ষুধার হাহাকারের কোন আভাস সেখানে নাই, সেখানে রয়েছে চাকুরীর ভাগাভাগির কথা, সেখানে রয়েছে শ্রেণী-স্বার্থের উলঙ্গ প্রকাশ। ছাত্রসমাজেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই বেশী, কিন্তু তবু তাদের তরুণ মন, তাদের নবীন উৎসাহ দিয়ে আজ তাদের শ্রেণীস্বার্থের কথা ভুলতে হবে, তুলতে হবে জনগণের অস্বীকৃত স্বার্থের নবীন দাবী, তাদের বঞ্চনার হাহাকার মেটাতে হবে। যুগে যুগে মধ্যশ্রেণীর তরুণেরাই পৃথিবীতে জনস্বার্থের দাবী তুলেছে, মেটাবার ভার নিয়েছে, আজ ভারতবর্ষের তরুণদের কাছেও ইতিহাসের সেই দাবী। জনগণের সেই স্বার্থই দেশের স্বার্থ, সম্প্রদায়ের স্বার্থ, জাতির স্বার্থ।

নতুন ভারত

নতুন ভারতবর্ষ সৃজনের সেই স্বপ্ন আমাদের দেখতে হবে—তরুণ মন তরুণ দৃষ্টি দিয়ে আবার আমাদের দেশের ইতিহাসকে নতুন করে যাচাই করে নিতে হবে। সেজন্য ছাড়তে হবে মিথ্যা মোহ, সেজন্য ছাড়তে হবে ঐতিহ্যের ব্যর্থ অভিমান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেশের অতীত ইতিহাসকে দেখব। দেখব তার মধ্যে ভরসার আভাস কোথায়। দেখব জাতির দুর্ব্বলতা বা পরাজয়ের কারণ কোন্ গ্লানির মধ্যে লুকিয়েছিল। নিজের কাছে নিজের দোষত্রুটী ঢাকবার মত মূঢ়তা যেন আমাদের না থাকে—অষ্ট্রিচ পাখীর মতন নিজের মাথা লুকিয়ে আমরা দুনিয়াকে ফাঁকি দিতে পারব না, তাতে কেবলমাত্র

আপনার সর্ব্বনাশের মাত্রাই বেড়ে যাবে। ভুল শোধরাতে হলে ভুলকে আবিষ্কার করা চাই। তাই বুদ্ধির মুক্ত আলোকে যেন আমরা নিজেদের সমস্ত ভুলত্রুটী সমস্ত গ্লানিদোষকে স্পষ্ট করে দেখি।

বুদ্ধির সেই পূর্ণ স্বাধীনতা জাতির উন্নতির প্রথম উপাদান। সেজন্য যেসমস্ত আদর্শ আজ আমাদের কাছে প্রিয়তম তাদেরকেও আবার যাচাই করে নিতে হবে, দেখতে হবে যে, কেবলমাত্র কথার মোহে, কেবলমাত্র আবেগের ধোঁওয়া ও বাষ্পের মধ্যে যেন আমরা আমাদের কর্ম্মশক্তিকে বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ করে না দিই। আজ জাতীয়তার নামে যে বাড়াবাড়ি অনেকস্থলে আত্মপ্রকাশ করে, না বুঝে না শুনে কেবলমাত্র জনতার বুদ্ধিবিভ্রান্ত আবেগের যে মত্তপ্রকাশ,—তাকে দেখতে হবে বিজ্ঞানের মুক্ত দৃষ্টিতে, তাকে দেখতে হবে বিশ্ব-সভ্যতার পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকে। কেবলমাত্র আবেগ, কেবলমাত্র মাতামাতি করে দেশ স্বাধীন হয় না, কোনদিন হয়নি—দেশকে স্বাধীন করতে হলে চাই সুনিয়ন্ত্রিত আবেগ, যুক্তির নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়ে প্রাণপ্রবাহের প্লাবন। যেমন একশত সিপাই অনিয়ন্ত্রিত বিপুল জনপ্রবাহকে পরিচালনা করতে পারে—দেশের স্বাধীনতার সাধনায় আমাদের আবেগকে তেমনি করে সুপরিচালিত করতে হবে।

ভারতের আজ যে সভ্যতা তা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—সে সভ্যতা যুগ্ম সভ্যতা, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রভাব প্রতিফলিত। তাই সে সভ্যতা নিয়ে কেবলমাত্র হিন্দুর মিথ্যা দর্পের কোন অর্থ হয় না—মুসলমানের সে সভ্যতাকে বর্জ্জন করবার প্রয়াস নিরর্থক। হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে আজ আমাদের বুঝতে হবে যে, সে সভ্যতার আজও পরিণতি হয়নি, হয়েছে কেবলমাত্র সুরু। আমাদের সাধনা সেই সভ্যতাকে পরিপূর্ণ করা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মধ্যে তার পরিণতি খোঁজা। সুরমা উপত্যকার ছাত্র-সম্মেলনে

যদি আজ আপনারা সেই স্বাধীনতার সাধনা, সেই সভ্যতার সাধনাকে নিজেদের সাধনা বলে গ্রহণ করেন তবেই আপনাদের এ সম্মেলন সার্থক।

বুদ্ধির মুক্তি

আজ আপনারা যে আমায় ত্রিপুরা জিলা ছাত্র সম্মেলনে ডেকেছেন, সেজন্য আমি একান্ত গৌরব বোধ করছি। কুমিল্লার সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের বহু স্মৃতি জড়িত—পুরাতন সেই সমস্ত দিনের কথা স্মরণ করে আপনাদের এ সাদর আহ্বান আমার কাছে আদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই কলকাতায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদ উপেক্ষা করেও আমি আজ না এসে পারিনি।

বাংলার জাতীয় জাগরণের আন্দোলনের বহুদিক্ থেকেই কুমিল্লা স্মরণীয়। যখন কোন শাসনতন্ত্রকে আমূল পরিবর্ত্তন করবার চেষ্টা হয়, পুরাতন তন্ত্র তখন প্রতিপদে বাধার সৃষ্টি, আঘাতের সৃষ্টি করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে সেই আঘাত সহ্য করে এগোতে না পারলে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গড়বার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সেই দুঃখসাধনায় ত্রিপুরা কোনদিন পিছু-পা হয়নি—জাতির পুরাতন ইতিহাসের সমস্ত গ্লানি দুঃখের আগুনে জ্বালিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার চেষ্টাই ত্রিপুরার গত দুই তিন দশকের ইতিহাস।

ছাত্রগণ জাতির এবং সমাজের অংশ। তাই জাতির জাগরণের আন্দোলনে ছাত্র পরাঙ্মুখ থাকতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসেই তাই আমরা দেখি যে সমস্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রেই ছাত্র তার অংশ গ্রহণ করেছে—আন্দোলনে এনেছে তীব্রতা, এনেছে ক্ষিপ্রতা, এনেছে স্বার্থচিন্তানিষ্কলুষ আত্মত্যাগের প্রেরণা। বহুবার

বহুক্ষেত্রে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে, রাজনীতিনিরপেক্ষ আত্ম-সমাহিত ছাত্রজীবনের পরিকল্পনা কেবলমাত্র স্বপ্নবিলাস। সমাজের নিবিড় সংগঠনের মধ্যে বাস করে যে সংগঠনের চাঞ্চল্য, সে সংগঠনের পরিবর্ত্তন ছাত্রকেও স্পর্শ করতে বাধ্য। তাই রাজনীতিকে এড়াতে গেলেও রাজনীতি ছাত্রকে এড়িয়ে চলবে না।

বিপদও কিন্তু সেইখানে। রাজনীতিকে ছাত্র এড়াতে পারে না, কিন্তু যৌবনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত উদ্দামতা দিয়ে ছাত্র যদি রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলেও দেশের ভবিষ্যৎ সমস্যাময় হয়ে উঠে। ছাত্র এবং যুবক দেশের ভবিষ্যৎ আশার প্রতীক—আজ যারা ছাত্র, কাল তাদেরই উপর পড়বে দেশের রাজনীতি পরিচালনার ভার। বর্ত্তমান জগতে রাজনীতি কেবলমাত্র আবেগ বা বিলাসের সামগ্রী নয়—বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার বিচার করে আজ আমাদের দেশে রাজনীতির ধারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তার জন্য চাই অবকাশ, চাই কঠোর সাধনা, চাই বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও সাধনার সঙ্গে পরিচয়। আবেগ-উদ্বেগের প্রেরণায় যদি ছাত্র আজ রাজনীতির স্রোতে ভেসে যায়, তবে সেই অভিজ্ঞতা, সেই পরিচয় লাভ করবার অবকাশ কই? সেই জন্য আমার বহুবার মনে হয়েছে যে, রাজনীতির আন্দোলনের মধ্যে ছাত্রের পূর্ণ সহযোগিতা প্রথম দৃষ্টিতে কাম্য হলেও দেশের মঙ্গলের দিক্ থেকে সে বিষয়ে সন্দেহ উঠে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের তাগিদে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-হানির সম্ভাবনা তার মধ্যে রয়েছে।

দেশের ছাত্র-আন্দোলনের পক্ষে তাই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা এই দুই বিপদের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে আপনার কর্ম্ম-ধারার নির্দ্দেশ। একপক্ষে রাজনীতিপরাঙ্মুখতা আত্মঘাতী এবং ঘটনার সংস্থানে বোধ হয় অসম্ভব। অন্যপক্ষে রাজনীতিসর্ব্বস্বতাও দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে

হানিকর। তাই ছাত্রকে আজ রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, অথচ রাজনীতির মধ্যে আবেগের প্রাবল্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে চলবে না। আবেগ যৌবনের ধর্ম্ম, অথচ সেই যৌবন-ধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করেই আজ ছাত্রকে আপনার কর্ম্মধারা স্থির করতে হবে।

একমাত্র বুদ্ধির সাধনা, বুদ্ধির স্বাধীনতা দিয়েই তা সম্ভব। তাই আজ ছাত্র-আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হবে বুদ্ধির স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। আমাদের দেশে আবেগের প্লাবন বহুবার আমরা দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখেছি যে, সে প্লাবনে সমাজে কোন বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন হয়নি। যে পরিমাণ উত্তম যে পরিমাণ আশা, যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ এবং সাধনার পরিচয় আমরা পেয়েছি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সে পরিমাণ সার্থকতা মেলেনি। তার একমাত্র কারণ যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দিক্ হীন, তাই চারিদিকে চাঞ্চল্য তাতে জাগে, কিন্তু সম্মুখের অটল পাহাড়ের স্তূপ তাতে ভেসে যায় না। আমরা প্রায়ই শুনি বাড়ীতে যখন আগুন লাগে, তখন অন্য কোন চিন্তার সময় নাই। আবাল-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সবাইকে সেই আগুন নেবাতে এগিয়ে আসতে হবে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে নরনারী শিশু যুবা বৃদ্ধ সবাই মিলে আগুন আগুন বলে হাহুতাস করলে আগুন নেবেনা। সবাই মিলে চারিদিকে ছুটাছুটি করলেও ঘর বাঁচেনা। ঘর বাঁচাতে হলে, আগুন নেবাতে হলে চাই সংগঠন, চাই বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত কার্য্যধারা। বালক বা শিশুকে তখন হয়তো আগুন থেকে সরিয়ে রাখাই প্রয়োজন, কারণ যারা আগুনের সঙ্গে যুঝবে তারা চায় সবল সহযোগিতা, তারা চায় কর্ম্মের নির্ব্বিঘ্ন অবকাশ। আমাদের দেশে যে ভাববিলাস, যে আবেগউদ্বেলতা, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, বুদ্ধির শাসনের মধ্যে তাকে একান্ত ও শক্তিশালী করে তোলাই আজ তাই ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবেই ভাববিলাসের সমৃদ্ধি। যে বিষয়ে জ্ঞান বিশদ, সেখানে ভাববিলাসের অবকাশও নাই। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবালুতার মূলেও তাই সমাজ-সংগঠন ও ও রাষ্ট্র-সংগঠনের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাব। পরিচয়ের তীক্ষ্ণতার ফলে সমাজ বা রাষ্ট্রের যে সমস্ত গলদ এবং অবিচার প্রকাশিত হয়, সে অন্যায় ও ক্রুটীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভাবুকতার প্রয়োজন নাই। আবেগ সেখানে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত এবং সেজন্য একান্ত। একান্ত আবেগ প্রবাহের মধ্যে যে উদ্যম, তার শক্তি বিপুল, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রুটী তার সম্মুখে টিকতে পারে না। তাই ছাত্র-আন্দোলনের গোড়ার কথা বুদ্ধির সাধনা এবং স্বাধীনতা। সে সবল মুক্ত বুদ্ধির প্রতাপে দেশের সমস্ত অভাব-অভিযোগ স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের পথও নির্দ্দেশ করে দেবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে ভাবুকতার যে দুর্ব্বলতা, তার উল্লেখ করেছি। সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনের সঙ্গে পরিচয় নাই বলে, অথবা সে বিষয়ে আমরা ভাবিনা বলেই যে তা সম্ভব, সে কথাও বলেছি। তারই আরও একটা দিকের এখানে উল্লেখ করতে চাই। আমাদের অতীত ইতিহাস যদি আমরা আলোচনা করি তবে দেখতে পাই যে, আমাদের কর্ম্মসাধনা ব্যক্তি, পরিবার বা বড় জোর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ—প্রকৃত জাতির আন্দোলনে সে প্রায় কোনখানেই বিকাশ লাভ করে নাই। তাই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্য প্রাণপাতের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পারিবারিক স্বার্থের জন্যও ব্যক্তি আত্মদান করছে; গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য সাধনারও প্রচুর দৃষ্টান্ত মেলে। কিন্তু জাতি বা দেশের জন্য যে প্রেরণা, তা আমাদের ইতিহাসে অল্পদিনের জিনিষ, এবং সেজন্যই আজও তা আমাদের মজ্জাগত হয়ে ওঠেনি। রাজ-নীতির ক্ষেত্রে আজ বিদেশীর উপস্থিতি আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ

খানিকটা জাগিয়েছে, কিন্তু সেখানে যে সে উপলব্ধি নিগূঢ় নয়, বিদেশীর উপস্থিতিই তার প্রমাণ। একথা নিঃসন্দেহ যে দেশাত্মবোধ যদি প্রকৃতপক্ষে আজ সর্ব্বভারতকে কর্ম্মপ্রেরণা দিত, তবে বিদেশী এক মুহূর্ত্ত এদেশে টিঁকে থাকতে পারত না। আমাদের রাজনৈতিক দলাদলির কারণও খানিকটা এরই মধ্যে মেলে—জাতীয়তার চেয়ে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই আজ পর্য্যন্ত আমাদের মানস-সংগঠনে অধিকতর কার্য্যকর, জাতির চেয়ে গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ ও আবেদন আমাদের কাছে প্রবলতর।

রাজনীতি ক্ষেত্রের বাইরে একথা আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। বিদেশীর উপস্থিতির দরুণ সেখানে জাতীয়তা বোধের পরিচয় খানিকটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি আজ বোধ হয় গোষ্ঠী পর্য্যন্তও পৌছেনি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেরই একমুখী প্রকাশ, কিন্তু নিছক সামাজিক ক্ষেত্রে তার পরিচয় আরো পরিস্ফুট। ব্যক্তি হিসাবে আমাদের মত পরিচ্ছন্ন মানুষ পৃথিবীতে বেশী নাই—স্নান পোষাক সমস্ত বিষয়েই আমরা শুচিতাপ্রিয় কিন্তু, সামাজিক পরিচ্ছন্নতা বোধের কথা তুল্লেই আমাদের আর সেমূর্ত্তি থাকে না। সামাজিক পরিচ্ছন্নতা-বোধ, সামাজিক স্বাস্থ্যচিন্তা আমাদের একেবারে নাই বল্লেই চলে—ব্যক্তি বা বড় জোর পরিবারের ভাবনা করেই আমরা ক্ষান্ত। পরিবার বা গোষ্ঠী পর্য্যন্ত তাই আমাদের একাত্মবোধ পৌছেছে—আজ পর্য্যন্ত দেশ বা সমাজকে তা গ্রহণ করতে পারেনি।

ছাত্র-অন্দোলনের, বুদ্ধির সাধনার অন্যতম লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী অতিক্রম করে সামাজিক বোধের সৃষ্টি। এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত তীক্ষ্ণ এবং নিবিড় হবে, সামাজিক বোধও ততই প্রবল হতে বাধ্য। সমাজের অর্থ-নৈতিক

সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবধারার নিগূঢ় সম্বন্ধ আজ অনস্বীকার্য্য। তাই আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও রূপের বিশ্লেষণের ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বোধের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যতদিন ব্যক্তি বা পরিবার-স্বাতন্ত্র্যই প্রচলিত ছিল, ততদিন ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা পারিবারিক একত্ববোধ সমাজের ভাবধারায় প্রতিফলিত হতে বাধ্য। নিজের অথবা পরিবারের পরিশ্রম যখন সামাজিক অর্থ-নৈতিক জীবনধারার অঙ্গে পরিণত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নতুন লক্ষ্য খুঁজে পায়। তাই আমাদের ইতিহাসে এতদিন যে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় একত্ববোধের অভাব ছিল, তা দূর করবার একমাত্র উপায় সমাজগঠনেব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

সমাজের বিপুল জনজাগরণের মধ্যে আপনার স্থান নির্দ্দেশে তাই ছাত্র-আন্দোলনের সার্থকতা। বুদ্ধির সেই সাধনায় ছাত্র যেদিন বুঝবে যে দেশের যারা মেরুদণ্ড, সমাজের যারা সর্ব্বস্ব, সেই সর্ব্বহারা বঞ্চিত মানুষকে সমাজ-সংগঠনে আপনার স্থান না দিলে দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মুক্তি কেবলমাত্র স্বপ্ন-বিলাস, সেদিনই দেশের ছাত্র-আন্দোলন জয়যুক্ত হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আজ গুরুতর আকার ধারণ করেছে, এবং সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি বহুক্ষেত্রে বহুবার প্রকাশ করেছি—আজ কেবল এইটুকু বলব যে, সমস্যা কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা। ছাত্র-আন্দোলন যদি কেবলমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে ছাত্র-আন্দোলনেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এসে পড়বে, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তা আসছেও। কারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাগবাঁটোয়ারার যে কলহ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোষ্ঠীভুক্ত হিসাবে ছাত্রেরাও সে কলহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ছাত্র-আন্দোলন গোষ্ঠীর সীমানা অতিক্রম করে সমস্ত দেশ এবং

সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থ-নৈতিক সংগঠন বুঝতে চাইবে, এবং সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে নতুন সমাজ সৃষ্টির স্বপ্ন দেখবে, সেই মুহূর্ত্তেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা তার কাছে অর্থহীন হবে।

মূলত ছাত্র-আন্দোলনের সমস্যা তাই এক। বাস্তব জ্ঞানের ভিত্তির উপর আমাদের কর্ম্ম-প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং সেই বাস্তব জ্ঞানের সাধনাই ছাত্র-আন্দোলনের সাধনা। সমাজগঠনের নিবিড় সংযোগ এবং পরস্পর নির্ভরতার ফলে সমাজের নতুন প্রতিচ্ছবি ছাত্র-আন্দোলন এনে দেবে। সমাজের বঞ্চিত এবং চির-নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির স্বপ্ন তারই মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সে মুক্তি কেবল বিদেশীর অধীনতা থেকে মুক্তি নয়, অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক দাসত্বশৃঙ্খল যে বিচিত্ররূপে সমাজের পূর্ণবিকাশকে ব্যাহত করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বাধার সৃষ্টি করে, সেই দাসত্বশৃঙ্খল চূর্ণ করাই ছাত্র আন্দোলনের চরম লক্ষ্য।

স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতি

শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে পৃথিবীর বিপুল বঞ্চিত জনসাধারণের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ বলে গ্রহণ না করতে পারলে ছাত্র-আন্দোলনের কল্যাণ নাই। সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বার্থগত যে বিরোধ, সে বিরোধকে এড়াবার একমাত্র উপায়ও সেইখানে, কারণ সাম্প্রদায়িক সমস্ত কলহের মূল মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালী শ্রেণীসমূহের স্বার্থসন্ধান। পৃথিবীর ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্যের মধ্যেও তার পরিচয় মেলে।

আপনারা সবাই জানেন যে, ছাত্র-আন্দোলন একান্তভাবে বিংশ-শতাব্দীরই অভিব্যক্তি। বিংশশতাব্দীতেও মহাসমরের পূর্ব্বে এর বিশেষ কোন লক্ষণ বা প্রকাশ ছিল না। আমি বলতে চাইনা যে

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কোনদিন ছাত্রদের মধ্যে কোন আন্দোলন হয়নি, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবে ছাত্র তার অংশ গ্রহণ করেনি। আমার বক্তব্য এই যে, ছাত্রেরা পূর্ব্বে এসমস্ত আন্দোলনে যোগ দিলেও ব্যক্তিগত হিসাবেই দিয়েছে—সংবদ্ধভাবে ছাত্র সমাজ পূর্ব্বেকার কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। বর্ত্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই যে সুসংবদ্ধ এবং সংগঠিত ছাত্র-আন্দোলন, মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তার অস্তিত্ব ছিলনা বল্লেই চলে। যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরে এভাবে ছাত্র-আন্দোলন প্রসারলাভ করল কেন, সে কথাও আমাদের বিশেষ করে বিচারের বিষয়।

এই সঙ্গে আর একটী বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ছাত্র-আন্দোলনের পতাকা আপনারা তুলেছেন—সে পতাকার বাণী স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি,—পৃথিবীর দেশে দেশে ছাত্র-আন্দোলনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। আপনারা কি ভেবেছেন যে, আরো বহু আদর্শ আরো বহু লক্ষ্যের মধ্যে এই তিনটীকেই ছাত্র-আন্দোলন কেন বেছে নিলে? সে সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি, যদি এ আদর্শের তাৎপর্য্য বোঝবার চেষ্টা করি, তবে সেই সঙ্গেই ছাত্র-আন্দোলন যে কেন মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই গড়ে উঠ্ল, তারও ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

ছাত্র-আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি—ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধ বিকাশ ঠিক মহাযুদ্ধের পরে। এদুটী জিনিষ মনে রাখলে এবং তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিকভাবে উপলব্ধি করলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্বে।

মহাযুদ্ধের পরে এমন কি অবস্থা হয়েছিল যার জন্য দেশে দেশে ছাত্র-আন্দোলন স্বতউৎস্ফুরিতভাবে আত্মবিকাশ করল? মহাযুদ্ধে

প্রাণ দিয়েছে কা'রা একথা বিচার করলেই ওকথার উত্তর পাওয়া যাবে। প্রতি দেশেই প্রাণ দিয়েছে তরুণেরা—তারা জীবনের আনন্দ, জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসাকে ঢেলে দিয়েছে। কি জন্য? প্রতি দেশেই একই রব—দেশের স্বাধীনতার জন্য? দেশের গৌরবের জন্য, দেশের আত্মবিকাশের জন্য এ মহাযুদ্ধ। প্রতি দেশেই গির্জ্জায়, স্কুলে, কলেজে বক্তৃতামঞ্চে একই ধ্বনি উঠেছে—ন্যায়ের জন্য, সত্যের খাতিরে আদর্শের তাগিদে এ যুদ্ধ। প্রাণ দিয়েছে কিন্তু তরুণেরা—তারা শুনেছে যে, পৃথিবীতে চিরকালের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসানের জন্য তাদের এ উৎসর্গ। যুদ্ধের শেষে কিন্তু দেখা গেল যে, চিরকালের মত যুদ্ধের অবসানের জন্য যে মহাযুদ্ধ, তার পরিণতিতে যে শান্তি, তার ফলে পৃথিবী হতে শান্তির চিরনির্ব্বাসনের ব্যবস্থাই হয়েছে।

যুদ্ধ হতে প্রত্যাগত তরুণেরা দেশে দেশে একথা ভেবেছে। স্বভাবতই এ সমস্যা তাদের মনে উঠেছে যে, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই আত্মরক্ষার জন্য দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করল কেমন করে? প্রত্যেক দেশই বলছে যে, তার অভিযান কেবলমাত্র ন্যায়ের জন্য, সত্যের মর্য্যাদায়। কিন্তু যুযুধান প্রতিপক্ষ দেশ সকলেই যে ন্যায়ের জন্য সত্যের জন্য যুদ্ধ করলে সে ন্যায়ের, সে সত্যের স্বরূপ কি? তাই দেশে দেশে তরুণেরা ভাবতে লাগল—যুদ্ধ হয় কেন? যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কোন অভিলাষ, কোন আদর্শ সাধনের জন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের এ সংগ্রাম?

সেই আত্ম-বিশ্লেষণ, সেই ভাবনার ফলেই ছাত্র-আন্দোলনের জন্ম। সেই জন্যই ছাত্র-আন্দোলন একান্তভাবে যুদ্ধপরবর্ত্তী যুগের বিকাশ। সেই জন্যই ছাত্র-আন্দোলনের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা, শান্তি এবং প্রগতি।

ছাত্র-আন্দোলনের গোড়ার কথা স্বাধীনতা। যুদ্ধে যে সমস্ত তরুণ গিয়েছিল, তারা দেখল যে, এক দেশ অন্য দেশকে অধিকার করে

গ্রাস করতে চায় বলেই পৃথিবীতে অশান্তি, পৃথিবীতে বিপ্লব। মানুষ রাজনৈতিক জীব বটে, কিন্তু রাজনীতিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টাই সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। সাধারণ মানুষ চায় যে, নিরুদ্বেগ শান্তিতে কোনভাবে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেয়, তাই অসহ্য দুঃখ-গ্লানি বা অসুবিধা না হলে সাধারণ মানুষ রাজনীতিতে যোগ দিতে চায় না। পরাধীন দেশে কিন্তু পদে পদে সেই গ্লানি জীবনকে ভারাক্রান্ত করে, পদে পদে বাধা ও নিষেধ চিত্তের প্রকাশকে ব্যাহত করে, সহজ এবং স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে। তার কারণও স্পষ্ট। একদেশ অন্যদেশকে জয় করে অধীন করে রাখতে চায় কেন সে প্রশ্ন তুল্লেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণেই এক দেশ অন্য দেশকে জয় করে।

সাম্রাজ্যের গৌরব, জাতির গর্ব্ব এ সব কারণ যে নাই, তা আমি বলতে চাইনা, কিন্তু সেসব কারণ তো সব দেশেই রয়েছে। তাই এক দেশ অন্য দেশকে জয় করতে চায়, জয় করতে পারে কেবল তখনই যখন আক্রমণকারী দেশ আক্রান্ত দেশকে নিজের পণ্যসামগ্রীর বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। ইংরেজিতে কথা আছে— "ট্রেড ফলোজ্ দি ফ্ল্যাগ" পতাকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা যায়—সে কথার মর্ম্মও এই। প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্যদেশে নিজের উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করে সে দেশের অর্থ নিজে ব্যবহার করবে। প্রত্যেক দেশই চায় যে অন্য দেশের জিনিষ ব্যবহার করে দেশের অর্থ বিদেশে যেতে দেবেনা। দেশ অর্থে অবশ্য এ ক্ষেত্রে দেশের ধনিকদেরই বোঝায়। তারা খোঁজে নিজেদের লাভ এবং সেই লাভের লোভে দেশকে ছেড়ে তারা বিদেশকেও গ্রাস করতে চায়। বিদেশের অর্থ এসে দেশে জমে এবং সেই অর্থের অংশ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের ভাগ্যে জোটে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা চলে যে, একশো বৎসর আগে ইংলণ্ডের গ্রামে সপ্তাহে দুদিন

মাংস খেতে পারত এ রকম লোক বেশী ছিল না। অথচ আজ যার দিনে ছুবেলা মাংস জোটেনা, সে নিজেকে হতভাগ্য মনে করে, আর যার কাজ জোটেনা সেই বেকারও সরকার থেকে সপ্তাহে চৌদ্দ টাকা ভাতা পায়।

ধনতন্ত্রবাদ এমনি করে গড়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে সাম্রাজ্য। কারণ বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করবার জন্য রাজনৈতিক প্রভুত্ব চাই। ইংরেজ আমাদের দেশে যেভাবে তাদের কাপড়, তাদের অন্যান্য সওদা চালিয়েছে, অন্যদেশে কি তা পেরেছে? কিন্তু ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপদও সেইখানে। অন্যান্য দেশ দেখল যে, সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদের দৌলতে ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তখন ফরাসী ভাবল, জার্মাণি ভাবল যে আমরাই বা বাদ যাব কেন? সঙ্গে সঙ্গে সেসব দেশেও ধনতন্ত্রবাদ গড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চাইল নতুন নতুন বাজার, নতুন নতুন সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যলিপ্সু যুযুধান শক্তিসমূহের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পৃথিবী ভরে উঠল।

কেবলমাত্র তাই নয়। কেবল বিভিন্ন দেশেই এমনি ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়নি—একই দেশের ধনতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক স্ফুরণে আত্মবিরোধ প্রকাশ করেছে। আমরা জানি যে, ধনতন্ত্রবাদের শ্রীবৃদ্ধির দিনে দেশের দরিদ্রের ভাগ্যে উদ্‌বৃত্ত অনেকখানির অংশ জোটে। ফলে দেশে জীবিকার মান বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মজুরের মজুরী, জিনিষপত্রের দাম বেড়ে উৎপাদনের খরচ বাড়তে থাকে। তখন ধনিক দেখে যে, তার লাভের পরিমাণ কমে এসেছে, তখন সে খোঁজে পৃথিবীর কোথায় জীবিকার মান নীচু, কোথায় কম মজুরীতে মজুর মিলবে, কোথায় জায়গাজমির দর নামমাত্র। তার স্বাভাবিক পরিণতিতে ধনিকের অর্থ বিদেশে চলে যায়। ইংরেজ চেষ্টা করে যে তার অর্থ ভারতবর্ষে খাটিয়ে মুনাফার মাত্রা বাড়ায়।

মুনাফার মাত্রা তাতে বাড়ে, কিন্তু ধনতন্ত্রবাদের বিপদও ঘনিয়ে আসে। একেতো বিভিন্ন স্বাধীন দেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশে প্রত্যেক দেশই চায় যে কেবলমাত্র তার জিনিষই সমস্ত জগতে চলবে, প্রত্যেক দেশই চায় যে, তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে সূর্য্য ডোবেবে না। তারপরে এসে জোটে অধীন এবং অর্দ্ধ-অধীন দেশে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ—সেখানেও কিন্তু বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী ধনিকেরই স্বার্থ জড়িত। ফলে যুদ্ধ বাধতে আর দেরী লাগে না—মানুষ শান্তি ও প্রগতির বাস্তবরূপ ভুলে গিয়ে মোহের টানে আত্ম-বিনাশে মেতে ওঠে।

যুদ্ধের পরে পৃথিবীর দেশে দেশে তরুণেরা একথা ভাবল। তারা দেখল যে অর্থ-নৈতিক সাম্রাজ্যবাদই পৃথিবীতে যুদ্ধের গোড়ার কথা, এবং পরাধীনতা, বিদেশজয়ের উপরেই সে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠীত। তারা দেখল যে, যতদিন পৃথিবীতে কোন দেশ পরাধীন থাকবে, ততদিন যুদ্ধেরও সঙ্কট ঘুচবে না, কারণ বিজয়ী দেশ তার উপরে প্রভুত্ব করতে চাইবেই, তাকে শোষণ করতে চাইবেই। স্বাধীনতা ভিন্ন সে পরাধীন দেশের দারিদ্র্যও ঘুচবে না, কারণ পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে যে, রাজশক্তির সাহায্য, রাজশক্তির অনুকূলতা ভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় না, এবং পরাধীন দেশে রাজশক্তি দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট করে বিজয়ী দেশেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইবে। তাই পরাধীন দেশ সর্ব্বত্রই দরিদ্র, সর্ব্বত্রই অসন্তোষে ভরা—সঙ্কটের এক একটী সন্ধিস্থল। যতদিন সে বিক্ষোভের কারণ ঘুচবে না, ততদিন যুদ্ধের সম্ভাবনাও দূর হবে না—হতে পারে না।

তাই পৃথিবীর ছাত্র-আন্দোলনের প্রথম এবং গোড়ার কথা—স্বাধীনতা। যতদিন সমস্ত দেশ স্বাধীন হবে না, ততদিন শান্তি আসবে না। কিন্তু অন্য পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও কারণ অন্তর্দ্ধান করে—শান্তি আপনা আপনি পৃথিবীতে

আসে। তাই ছাত্র-আন্দোলনের দ্বিতীয় লক্ষ্য শান্তি স্বাধীনতারই বিকাশের ফলে বাস্তব হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি অবশ্যম্ভাবী। যেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে, শান্তিতে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন ক'রে আত্মবিকাশের চেষ্টা করবে—সেদিন প্রগতির জন্য আর আলাদা সাধনা করতে হবে না, প্রগতি সেদিন নিজে থেকেই মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌বে। সেইজন্যই ছাত্র-আন্দোলনের পতাকায় "স্বাধীনতা" প্রথম ও প্রধান স্থান পেয়েছে—সেই রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা অর্জ্জন আপনাদেরও লক্ষ্য হোক। তাতে কেবল ভারতবর্ষেরই স্বাধীনতা আসবে না—পৃথিবীর নিদারুণ সঙ্কটের অবসানও তার মধ্যে মিলবে।

পেশা-শিক্ষায় রূপান্তর*

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ, ইডি-ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া), অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ সহযোগী, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটদিগের গৌরব যখন অস্তাচল-গমনোন্মুখ সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পরিশেষে অন্ধকারে মিশিয়া গেল, তখন ভারতের সংস্কৃতির যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ও ইংরেজশক্তির অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভারতের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ইয়োরোপের অবস্থার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইয়োরোপ যখন প্রায় সহস্র বৎসর কাল বর্ব্বরতার অন্ধকারে আবৃত ছিল, তখন খৃষ্টান পাদ্রীগণই অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই অজ্ঞানের সহিত সংগ্রাম করিয়া গ্রীক্ ও রোমান সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদিগের পর্ণকুটীরে সংরক্ষিত সংস্কৃতি ঘোর অজ্ঞান তিমিরের অবসানের পর প্রভাতের অরুণের ন্যায় সমগ্র ইয়োরোপে, তৎপরে পৃথিবীর অপরাপর সভ্যদেশে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রীক্ ও রোমান সংস্কৃতি এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান এক অভিনব সংস্কৃতির সৃষ্টি করিল।

ভারতের এই রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়েও তাহার লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য খৃষ্টান মিশনারীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

* "আর্থিক উন্নতি"তে প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৪৩, মার্চ ১৯৩৭)।

ইংরেজ শাসকগণও ভারতের লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ বাঙ্গালীর মধ্যে ভারতীয় কৃষ্টি বিস্তার করিয়া বাংলার নাগরিকদিগকে কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুদ্দেশ্যে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কলিকাতায় মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কলেজ দুইটিতে প্রাচ্য ভাষা, মুসলমান ও হিন্দু আইন এবং ইয়োরোপীয় মেডিসিন শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এ কলেজ দুইটি বাংলা দেশে লুপ্ত কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ক্রমে সমগ্র বাংলা দেশে স্কুল কলেজ সংস্থাপিত হইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভাষারই চর্চ্চা সমধিক হইয়াছিল। তৎপরে উক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে হাইস্কুলে ও কলেজে শিক্ষার কার্য্য পরিচালনার জন্য এক আন্দোলন এডুকেশন কমিটিতে আরম্ভ হইল। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। টমাস বেবিংটন এডুকেশন কমিটিতে এই আন্দোলনের পক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক দেখাইলেন। রাজা রামমোহন রায়ও এই আন্দোলনের পক্ষে যোগ দিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, হাইস্কুলে ও উচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ইয়োরোপীয় কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে।

চিকিৎসা শিক্ষা

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই বৎসরেই লর্ড বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগে বাঙ্গালী যুবকদিগকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

সংস্থাপিত হয়। তখন মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার বিভাগ উঠাইয়া দেওয়া হইল। তৎকালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থ মহিলাদিগকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না। তাঁহারা তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইতেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অনন্যোপায় হইয়া কুমারী অবলা দাস মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে এই জন্য তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত হয়; কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকগণ ইহার বিরোধী হইলেন। পরিশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন সাফল্য লাভ করিলে কুমারী কাদম্বিনী বসু চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। মহিলাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার সুবিধার্থ কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। মিঃ ক্রফ্‌ট, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মহিলাদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি স্কীম তৈয়ার করেন। এই সময়ে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাদিবার জন্য ক্লাস খোলা হয় ও শিয়ালদহে মেডিক্যাল স্কুল সংস্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে ৩১৯, শিয়ালদহ মেডিক্যাল স্কুলে ৫০৬ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজস্থিত হিন্দুস্থানী ক্লাসে ৭২ জন ছাত্র পড়িত।

এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা

বাঙ্গালী ছাত্রদিগের এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে সর্ব্বপ্রথমে ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাস খোলা হয়। পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাস উঠাইয়া দিয়া উহা বিশপ্ কলেজের বিল্ডিংএ নেওয়া হয়। ডিরী কারখানা হইতে ইয়োরোপীয়-

দিগের ইঞ্জিনীয়ারিং ক্লাসও উক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থানে উন্নত প্রণালীতে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা হয়। থিওরেটিক্যাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্টিক্যাল্ শিক্ষারও বিশেষ আয়োজন করা হয়। কলেজের প্রত্যেক ছাত্রকেই রোজ তিন ঘণ্টা করিয়া অদূরবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট কারখানায় প্রাক্টিক্যাল ট্রেনিং পাইবার জন্য কাজ করিতে হইত। ইহাই পরে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নামে খ্যাত হয়। এই কলেজটির পরিচালনার ভার গভর্ণরের মনোনীত কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। এই কলেজটিতে সিভিল, মিক্যানিক্যাল, ওভারসিয়ার ক্লাস এবং মিক্যানিক্যাল্ এপ্রেন্টিস্ ক্লাস ছিল। প্রথমোক্ত দুইটি ক্লাসে পড়িতে হইলে এণ্টান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রবেশ করিতে হইত। শেষোক্ত ক্লাস দুইটিতে পড়িতে হইলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ না করিলেও চলিত। তবে প্রবেশার্থীদিগকে ইংলিশ, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাথমিক বীজগণিত ও ইউক্লিডের প্রথম খণ্ড পড়িতে হইত ও উল্লিখিত বিষয়গুলির পরীক্ষায় পাশ করিতে হইত। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কৃষিবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের আদেশে কৃষিক্লাস শিবপুর কলেজ হইতে পুষাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৃষিশিক্ষা

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার নিম্নরূপ ব্যবস্থায় দুইটি কৃষি বৃত্তির সৃষ্টি করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি কৃতী ছাত্রের প্রত্যেককে ইংলণ্ডস্থিত কোন কৃষি কলেজে কৃষি শিক্ষার জন্য বৎসরে ২০০ শত পাউণ্ড করিয়া ২ বৎসর ৬ মাসের জন্য দেওয়া হইবে। এই বৃত্তিভোগী ছাত্রদ্বয়ের প্রত্যেককে ইংলণ্ডে যাইবার পাথেয়স্বরূপ ১০০০ টাকা দেওয়া হইবে। কৃষি বিদ্যা শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরিবার জন্যও ১০০০

টাকা দেওয়া হইবে। এই বৃত্তি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসী দুইটী ছাত্রকে দেওয়া হইবে। কৃষ্ণনগর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ সেন, এম এ ও বিহারনিবাসী সৈয়দ সকৃওয়াত হোসেন বি এ সর্ব্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান।

সঙ্গীত শিক্ষা

এই সময়ে দেশের ও সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চর্চ্চার আবশ্যকতাও বাঙ্গালী মনীষীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর সি আই ই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা দেশে আধুনিক প্রণালীতে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার মানসে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার এই বিদ্যালয়টিতে মাসিক ২৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। তৎকালে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৪৩ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জিলায় দুইটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭টি ছিল। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে কলিকাতা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্য চলিত। সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা করিয়া সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস বসিত। রাজা স্যর সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর স্বয়ং অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সঙ্গীত বিদ্যালয়ে ১,২০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সকল ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে ১৲ টাকা বেতন দিতে হইত।

আইন শিক্ষা

এই সময়ে আইন শিক্ষাও সাধারণ কলেজে দেওয়া হইত। আইন শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন কলেজ ছিল না বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

"ল" ক্লাস ছিল না। রিপন কলেজ, সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ ও মফঃস্বলের অনেক কলেজে আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন আইন শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল না। ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইত। "ল" ক্লাসের ছাত্রদিগের উপযোগী কোন গ্রন্থাগার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রমে এই অসুবিধা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বি-এল্ পরীক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার উঁচু করিয়া দেন ও এম এল্ ডিগ্রীর ব্যবস্থা করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আর্টস্ কলেজ হইতে "ল" ক্লাস তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৮-১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আর্টস কলেজে আইন শিক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। কেবলমাত্র রিপন কলেজে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা বাহাল রহিল। এই সময়ে জুলাইমাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ল" ক্লাস খোলা হইল।

কারিগরি শিক্ষা

বাংলাদেশে কার্য্যকরী শিক্ষা শুধু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রপরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর নিম্নস্তরের বাঙ্গালীদিগের জন্য পেশা শিক্ষার বন্দোবস্তও নেহাৎ কম ছিল না। তাহাদিগকে নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য টেক্‌নিক্যাল্ ও ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল্ শিক্ষা দেওয়া হইত। কালিম্পং, হাজারীবাগ, রাঁচি মিশন স্কুলে ও শিবপুরে তাহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হাজারীবাগে কয়েদীদিগের পেশাশিক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হয়। আলিপুরস্থিত রিফরমেটরী স্কুল উঠাইয়া হাজারীবাগে স্থানান্তরিত করা হয়। মিস্ত্রীর কাজ, গালিচা নির্ম্মাণ, জুতা নির্ম্মাণ, শেলাই শিক্ষা দেওয়া হইত। শিবপুরস্থিত আর্টিজান্ ক্লাসে কর্ম্মকারের কাজ, সূত্রধরের কাজ ও কলকজার কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

বিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থায় পেশা শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকারী উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে অর্থকরী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য একটি এডুকেশন কমিশন বসান। এই কমিশন অপরাপর অনেক শিক্ষা-সংস্কারের প্রস্তাবের মধ্যে উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে পেশা শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলার ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদিগকে পাঠ্যতালিকার সাহায্যে শুধু কৃষ্টি শিক্ষার দ্বারা কলেজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য তৈয়ার করিত। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালার উচ্চবিদ্যালয়গুলির তিন প্রকার উদ্দেশ্য দাঁড়ায়—কলেজে প্রবেশার্থী-দিগকে সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া। যেসকল ছাত্র কলেজে সংস্কৃতি শিক্ষালাভ করিতে যাইবে না, তাহাদিগকে ইঞ্জিনীয়ারিং বা টেক্‌নিক্যাল্ কলেজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উপযুক্ত করা। হাইস্কুলে পেশা-বিষয়ক শিক্ষা দ্বারা জীবন-সংগ্রামের জন্য তৈয়ার করা। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সময় হইতে বাংলা দেশের উচ্চবিদ্যালয়গুলির প্রধান উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে কলেজে প্রবেশার্থী ও কর্ম্ম-প্রার্থীদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দেওয়া।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাংলার উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায় পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা নিম্নোক্ত কারিকিউলাম হইতেই বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

“বি কে স” শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পাঠ্য-তালি	“এ কোর্স” এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যতালিক		পাঠ্যতালিক
ইংলিশ (আধুনিক)	ইংরেজী	২	ইংরে
×	দ্বিতীয় ভাষা	৩	দ্বিতীয় ভাষা
গণিত শাস্ত্র	গণিত শাস্ত্র	৪	গণিত শাস্ত্র
×	ইতিহাস ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান	৫	ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাইমারী বিজ্ঞান
ড্রইং ও প্র্যাক্টিক্যাল জ্যামিতি	ড্রইং	৬	ড্রইং ও প্রাক্টিক্যাল জ্যামিতি
মেন্সুরেশন প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সার্ভেইং	×	৭	মেন্সুরেশন প্রাথমিক ইঞ্জিনীয়ারিং ও সার্ভে
×	×	৮	বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান এবং ম্যানুয়েলট্রেনিং
মেন্সুরেশন ও মিকানিকস্	×	৯	

কমার্স ও ইণ্ডাষ্ট্রিব পাঠ্যতালিকা	১	পাঠ্যতালিকা
ইংলিশ (আধুনিক)	২	ইংরেজী
×	৩	দ্বিতীয় ভাষা
গণিত শাস্ত্র	৪	গণিত শাস্ত্র
ইতিহাস ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান	৫	ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাইমারী বিজ্ঞান
ড্রইং ও প্রাকৃটিক্যাল জ্যামিতি	৬	ড্রইং ও প্রাকৃটিক্যাল জ্যামিতি
×	৭	মেন্সুরেশন প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে
প্রাথমিক রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান	৮	বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান এবং ম্যাহুয়েল ট্রেনিং
মেন্সুরেশন ও মিকানিকস্	৯	

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কয়েকটি প্রধান অর্থকরী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, উক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর পেশা-শিক্ষার জন্য তখনকার আর্টস্ কলেজগুলিতে ভকেশন্যাল ক্লাস খোলা হইয়াছিল। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ হইতে ভকেশন্যাল ক্লাসগুলি আর্টস্ কলেজ হইতে উঠাইয়া স্বতন্ত্র টেক্‌নিক্যাল ও প্রফেশন্যাল কলেজে নেওয়া হয়। নিম্নস্তরের কর্ম্মীদিগকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরীর উপযোগী করিবার জন্য নানা প্রকার স্বতন্ত্র টেক্‌নিক্যাল স্কুল খোলা হয়। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় কৃষ্টি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে বাংলার সামাজিক, আথিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক অভিনব পরিবর্ত্তন আসিল। বাংলার শিক্ষানায়কগণও সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কারিকিউলামের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলেন। এই ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইল। ক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে স্বদেশী যুগের সৃষ্টি হইল। এই আন্দোলনের প্রভাব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাথমিক স্কুলে পরিলক্ষিত হইল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার জন্য কারিকিউলামে বিজ্ঞান ও পেশা-শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাস্থিত প্রেসিডেন্সি কলেজে ডে কমার্স ক্লাস ও সান্ধ্য কমার্স ক্লাস খোলা হইল। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে কমার্স ক্লাস উঠাইয়া দিয়া "কলিকাতা গভর্ণমেন্ট কমার্শ্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্" স্থাপন করা হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব

বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৯১০) বাংলায় টেক্‌নিক্যাল

ও শিল্প-শিক্ষার বিশেষ সংপ্রসারণ হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের অধীন টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। এই অফিসারটির "সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্‌ডাষ্ট্রিজ অ্যাণ্ড ইন্সপেক্টর অব টেক্‌নিক্যাল অ্যাণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এডুকেশন নামে অভিহিত হইবার কথা হয়। কিন্তু তখন গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন না করিয়া আই সি, এস্ অফিসার মিঃ কামিংকে বাংলাদেশে টেক্‌নিক্যাল ও শিল্পশিক্ষা কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সেই বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে যদিও নিম্নস্তরের বাঙ্গালী যুবকদিগের পেশা শিক্ষার জন্য সীবন বিদ্যালয় ও নানাপ্রকার টেক্‌নিক্যাল স্কুল ছিল, তথাপি বৃটিশ অফিসার ও বাঙ্গালী মনীষীদিগের মন স্বভাবতঃ মধ্যবিত্ত ও সমাজের উচ্চস্তরের যুবকদিগের টেক্‌নিক্যাল ও প্রফেশন্যাল শিক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয় জাগরণে ও সমাজে স্বদেশী দ্রব্যের জনপ্রিয়তায় নিম্ন স্তরের যুবকদিগকে টেক্‌নিক্যাল ও শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন দেখা দিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার কৃতী সন্তানগণ দেশে টেক্‌নিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষার বিস্তারের জন্য "ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন" সংস্থাপন করিলেন। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার সুবিধার জন্য এই কাউন্সিলের অধীনে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ সংস্থাপিত হইল। ইহাই বর্ত্তমানে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নামে সুপরিচিত। এই স্বদেশীযুগে বাংলার বহু কৃতী সন্তান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জাপান গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে যাইয়া টেক্‌নিক্যাল্ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দেশের শিল্পের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা সরকারও দেশের জনসাধারণের মধ্যে

শিল্পশিক্ষা বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিবার জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। বাংলার শিল্পশিক্ষার উন্নতিকল্পে একজন বৃটিশ অফিসারের অধীনে বাংলা সরকারের একটি শিল্পবিভাগ বর্ত্তমান আছে।

বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের কারিকিউলামে বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কার্য্যকরী শিক্ষার ভিতর দিয়া ছাত্রছাত্রীদিগের জীবিকার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য বিজ্ঞান, ম্যানুয়েল আর্টস্, কমার্স ও কৃষি শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মোট কথা, স্বদেশী যুগের প্রভাব সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কারিকিউলামে সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার ১৪টি স্কুলে কৃষিশিক্ষার বিশেষ সুবিধা করা হইয়াছে।

শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদিগের মধ্যে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য বে-সরকারী কন্টিনিউয়েশন স্কুল ও নৈশ-বিদ্যালয় আছে। এই স্কুলে নানাপ্রকার পেশা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিবিষয়ক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে ও কলিকাতায় কন্টিনিউয়েশন স্কুল বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে ২৮টি কন্টি-নিউয়েশন স্কুল বর্ত্তমান ছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে ৬,০৪৭ জন ছাত্র অর্থকরী শিক্ষা লাভ করিতেছিল। ইহাদের শিক্ষার জন্য বৎসরে ব্যয় হয় ১৫,৬৭২ টাকা।

চাই পেশা বাছাইয়ের ব্যবস্থা

এতক্ষণ আলোচনার পর আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে বাংলার অর্থকরী শিক্ষায়ও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "স্কুল, কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা-তালিকায় নূতন নূতন অর্থকরী শিক্ষার সন্নিবেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মনীষীদিগের যত্ন সত্ত্বেও চিত্তবিজ্ঞানের প্রভাব এখনও অর্থকরী শিক্ষার উপর দৃষ্ট হইতেছে না। অর্থকরী শিক্ষাকে প্রকৃত পক্ষে অর্থকরী করিতে হইলে বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে ভোকেশন্যাল ও এডুকেশন্যাল গাইডেন্সের অর্থাৎ পেশা-বাছাই ও বিদ্যা-বাছাইয়ের প্রবর্ত্তন নেহাৎ আবশ্যক। প্রায় দুই বৎসর হইল বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক আলোচনা* অনুষ্ঠিত হয়। পেশা-বাছাই পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে মার্কিণ রাজ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জুনিয়র হাইস্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ভোকেশন্যাল গাইডেন্স বিউরো আছে। উপযুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে উপযুক্ত পেশা মনোনীত করিতে ও শিক্ষা লাভ করিতে সহায়তা করাই পেশা-বাছাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনকে প্রকৃতপক্ষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে পেশা-বিষয়ক তদন্ত ও জরীপের প্রয়োজন আছে। পেশা-তদন্ত দ্বারা সমাজে ও দেশে কত প্রকার পেশা আছে ও ইহাদের বিশেষত্বই বা কি এবং কি গুণ থাকিলে কোন্ পেশা আয়ত্ত করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। শুধু পেশার বিষয়ে বিশেষ খবর রাখিলে চলিবে না; ছাত্র বা ছাত্রীর মেধাশক্তি এবং বিশেষ শক্তির পরিচয় নেওয়াও উচিত। তজ্জন্য পেশা-বাছাইয়ের অফিস প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য বুদ্ধি ও উৎকর্ষ মাপিবার বন্দোবস্ত করিবে। তৎপর ছাত্রছাত্রীদিগের গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া ও পেশার বিশেষ খবর রাখিয়া পেশা-বিষয়ক পরামর্শদাতা তাহাদিগকে উপযুক্ত পেশা ও বিদ্যা বাছাইয়ের সাহায্য করিবেন। পেশা বাছাই হইলে পর ছাত্রছাত্রীদিগকে হাইস্কুলে মনোনীত পেশা-বিষয়ক বিদ্যা শিখানো

* "পেশা-বাছাইয়ের মার্কিণ-রীতি" (৮ জুলাই ১৯৩৪)।

হইবে। যদি কেহ মনোনীত বিদ্যায় ভাল ফল দর্শাইতে না পারে, তবে তাহাকে পুনরায় উপযুক্ত পেশা বাছাই করিতে সাহায্য করা হইবে।

বাংলার ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বিদ্যা-তালিকা এমনভাবে গঠন করা উচিত যাহাতে আই এ বা আই এস্-সি কোর্স সমাপনান্তে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত সময় ও অর্থ নষ্ট না করিয়া তাহাদিগের মনোনীত পেশা শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মার্কিণ রাজ্যের কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাসে প্রাক্-পেশা বিদ্যা শিখানো হইয়া থাকে। এই ক্লাসেই ছাত্রছাত্রীদিগের মনোনীত পেশা শিক্ষার উপযুক্ততা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাক্-পেশা বিদ্যার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা (কোর্স) না থাকাতে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মনোনীত পেশার উপযুক্ততা পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে বাংলার কলেজগুলিকে প্রাক্-পেশা কলেজে পরিণত করা উচিত।

উপসংহারে এই মাত্র বলিতে চাই যে, বাংলা দেশের অর্থকরী শিক্ষার সংপ্রসারণ হইলেও ইহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। সুনিপুণ শ্রমিক ও কারিকরশ্রেণী আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। কলিকাতায় অনেক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীই চীনা মিস্ত্রী নিযুক্ত করেন। আর জুতা নির্ম্মাণ ব্যবসাত চীনাদেরই একচেটিয়া হইয়া আছে। যদি বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে এই বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে উপযুক্ত শিল্প শিক্ষাদ্বারা দেশী মুচী, মিস্ত্রী, কারিকর শ্রেণী তৈয়ার করিতে হইবে।

শিক্ষা-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী,

"রেগুলাস," "লিওনিদাস," "লিঙ্কল্ন্" ও

"গারফীল্ড" ইত্যাদি জীবনচরিত-প্রণেতা

সমাজ-সংস্কারের জন্য কি কি চাই এ সম্বন্ধে সমাজশাস্ত্রীদের ভিতর দলাদলি আছে। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে সমাজের ভিতর নানাপ্রকার উঠানামা ও অদল-বদল সাধিত হয় এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আশুতোষের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-সংস্কারের ফলে বাংলাদেশে কিরূপ সমাজ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমানে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আজকাল বাঙালী সমাজের নানা স্তরে ও নানা শ্রেণীতে যেসকল অবস্থা দেখা যায় তাহার জন্য বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিক্ষাপ্রণালী অনেকাংশে দায়ী। অবশ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের পরিবর্ত্তনসমূহের একমাত্র কারণ বলিলে ঠিক বলা হইবে না। আর্থিক কারণ, রাষ্ট্র-নৈতিক কারণ, নৈতিক কারণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণও উল্লেখ করিতে হইবে।

আশুতোষের শিক্ষা-নীতি

শিক্ষা-সংস্কারক বলিলে আমরা এ যুগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝিয়া থাকি। তাঁহার জীবনে সমাজ-সংস্কারের কয়েকটা মহত্বপূর্ণ ঘটনাও দেখা যায় সত্য। কিন্তু মোটের উপর দেশের লোক

আশুতোষকে শিক্ষা-সংস্কারকরূপেই জানে। তবে শিক্ষা-সংস্কারকরূপেই আশুতোষ সমাজ-সংস্কারের কাজও করিয়া গিয়াছেন।

আশুতোষ কাগজের পৃষ্ঠে কলম দিয়া তাঁহার অন্তরের প্রায় অনেক কথাই খুদিয়া যান নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেইসব বেদনার কথা ইচ্ছা করিলে আর একরূপে তিনিও লিখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু আশুতোষ তাহা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে উহার প্রয়োজন ছিল একভাবে, আশুতোষের যুগে উহার প্রয়োজন ছিল অন্যরূপে। বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তা দিয়াছিলেন আশুতোষ সেই চিন্তার রূপ ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন। এদেশে সেই যুগে বঙ্কিমের চিন্তায় যেমন সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হইয়াছিলেন, ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-এর প্রভাবও আবার এদেশের সকল শিক্ষিতকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সমাজ-সংস্কারের সেই যুগ যেমন আশুতোষের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিকে পাইয়া সার্থক হইয়াছিল, সেই যুগের সেই বহুবহু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিচরণক্ষেত্রে আসিয়া আশুতোষও ধন্য হইয়াছিলেন। চিন্তার এবং কর্ম্মের নানা কাহিনী বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সংস্কারের সেই যুগ অতুলনীয় হইয়া থাকিবে। আশুতোষের চিন্তায় ও কর্ম্মে বঙ্কিমযুগের স্বদেশমন্ত্র অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে বাঙালী সমাজের ভিতর যে সমুদয় নূতন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি তাহার ভিতর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব কতখানি তাহাই বিশ্লেষণ করিতেছি। আশুতোষের কার্য্যাবলীর ব্যাখ্যা হয়ত তাহার রচনাবলীর ভিতর নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে যেসকল সামাজিক ঘটনা দেখা যাইতেছে সেই সমুদয়কে তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যাবলীর ব্যাখ্যা স্বরূপ গ্রহণ করা চলিতে পারে। ভাইস-চ্যান্সেলার-রূপে আশুতোষ যেসকল বার্ষিক বিবরণীর সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক পৃষ্ঠা বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন একমাত্র তাহার উপর নির্ভর করিলে

আশুতোষের শিক্ষা-নীতি ও সমাজ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক পরিমাণে অজ্ঞ থাকিব। শিক্ষা-সংস্কারক এবং সমাজ-সংস্কারক হিসাবে আশুতোষকে বুঝিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, নিম্নলিখিত কয়েকটী নীতিকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার শিক্ষাসংস্কার দেখা দিয়াছিল। সেই নীতিগুলি এইরূপ,—(১) পোষ্টগ্র্যাজুয়েট অধ্যাপনা, (২) জ্ঞানের সকল বিভাগে গবেষণা, (৩) মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া উচ্চশিক্ষা দান, (৪) ব্যাপকভাবে সাধারণ শিক্ষাবিস্তার। এইসকল কথা অতি সুবিদিত। নূতন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এই সমুদয়ের সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের যোগাযোগ দেখিব।

কোনো জাতি নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত অপরের ভাষায় চিন্তা করিতে পারে না। সেইজন্যই, আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সভ্য হিসাবে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পর, ১৮৯১ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায়, এণ্ট্রান্স হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। সেদিন তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেইদিন হইতে তাঁহার চেষ্টা বিরত ছিল না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাঁহার সেই চেষ্টা আজ জয়ী হইতে চলিয়াছে।

১৯০৫ সনের যুগে বাঙালী শিক্ষানায়কগণ এই বাংলা ভাষার মারফতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রিপন কলেজের উচ্চশ্রেণীসমূহে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপে সেই যুগে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" নূতন চিন্তার সঙ্গে নূতন কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিয়াছিলেন। সেখানে সকল কার্য্যই বাংলাভাষায় নির্ব্বাহ হইত—কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান বাংলাভাষাকে বাদ দিয়া চলিবার উপায় ছিল না।

কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত সমাজের সংস্কারের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন।

হয়। তারপর যখন যখন সেই শিক্ষা দেশবাসীর পক্ষে অপ্রচুর এবং অনুপযুক্ত মনে হয়, তখন তখন এক একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজে আবির্ভূত হইয়া শিক্ষা-সংস্কারে মন দেন।

এইসকল সংস্কারকগণের আসল লক্ষ্যই থাকে সমাজ-মঙ্গলের দিকে। সমাজ-মঙ্গলের চিন্তাটা সামনে রাখিয়া কেহ উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেন ধর্ম্মকে, আর কেহ গ্রহণ করেন শিক্ষাকে অথবা আর কোনো কিছু। শিক্ষাব্রতী আশুতোষ সমাজ-সংস্কারের এক বিরাট উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষাপ্রচারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই কথাটা নথীপত্র ঘাঁটিয়া প্রমাণ করা যাইবে কি না জানি না। কেন না আশুতোষের বর্ণনাবলী আমরা বেশী দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলীর ফলসমূহ হইতে তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্য কিছু কিছু বুঝিতে পারি।

সাধারণ শিক্ষাদ্বারা সর্ব্বাগ্রে তিনি দেশের লোকের দেহ-মন শুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই ভাবে চলিতে থাকিলে সময়ে লব্ধসুযোগ উচ্চ-নীচ বিদ্বেষ, অভিজাতের প্রতি অনুন্নতের পুরুষানুক্রমিক অযথা মর্য্যাদাদানের বিধান দূর হইয়া যাইবে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করা আজ আর মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়। জাতি বর্ণবিধিহীন বিদ্যালয়ে সমবেত হইলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ এক বিরাট স্রোতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিয়া কোনো দেশের অধিবাসিগণ এক জাতি রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সেই জন্যই, তিনি, কেবল হিন্দুর অথবা মুসলমানের নয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের, অস্পৃশ্য অন্ত্যজের, উচ্চনীচের, ইতরভদ্রের এক বিরাট জাতি—যাহার কল্পনা তিনি তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষীদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে চিন্তায় এবং শিক্ষায়

লাভ করিয়াছিলেন তাহারই—চিন্তা করিতেছিলেন। সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপ দিবার নিমিত্তই তিনি দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবার বার্ত্তা প্রচার করিলেন, অসংখ্য শিক্ষক, প্রচারকরূপে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, বিভিন্ন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সমবেত হইতে লাগিলেন, ভক্তরূপে অসংখ্য ছাত্র দলে দলে সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। কে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহা তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল না। বাঙ্গালী হিসাবে কেহ কাহাকেও বঞ্চনা করিবে না অথবা কেহ কখনও বঞ্চিত হইবে না এমন বিষয়ই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। দেশবাসী হিসাবে প্রত্যেকেই দেশকে সকলের চেয়ে উচ্চে স্থান দিবে, দেশের স্বার্থই সকলের একমাত্র স্বার্থ হইবে ইহাই ছিল তাঁহার শিক্ষার নিয়ম এবং শিক্ষিতের জন্য বিধান।

স্ত্রীশিক্ষায় সমাজ-সংস্কার

আশুতোষের পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তাবীর এবং কর্ম্মবীরগণ যে প্রয়োজন বোধে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, আশুতোষ উহাকে আরো শক্তিশালী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যাহারা নানা কারণে বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবে না তিনি তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটী করেন নাই। পিতৃগৃহের বিদুষী কন্যা স্বামিগৃহে যাইয়া যে শিক্ষিতা পত্নীরূপে সংসারকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে এবং শত শত বক্তৃতা ও প্রচারের চেয়ে একমাত্র তাহাদের দ্বারাই যে কুসংস্কারগুলি সহজে দুর হইতে পারে ইহা তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছিল বলিয়াই, তিনি নারীদের জন্য শিক্ষার সকল কঠোর বিধি দুর করিয়া দিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে অনুন্নত সমাজ—যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কেবল অজ্ঞতা আর অশিক্ষা বিরাজমান ছিল, জ্ঞানের একটি ক্ষীণ

আলোকরশ্মি কস্মিন্‌কালেও যেখানে দেখা যায় নাই, সেখানে আজ নারীর গতিবেগ বেশ দেখা যাইতেছে। সেসকল সমাজের নারীরা নানা কারণে নিজেদের উচ্চশিক্ষা লাভ হইল না বলিয়া আক্ষেপ না করিয়া শত শত বালিকাকে একত্র করিয়া শিক্ষাদানে মাতিয়া রহিয়াছেন। ইহার ফলে বালক এবং যুবকগণ লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য হইতেছে। ঐসকল শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা আজ আরও উন্নত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, উন্নত জীবন যাপন করিবার বাসনা তাহাদের অন্তরে জাগিয়াছে।

নারীরা শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইলে ঘরের বাহিরে আসিতে বাধ্য হইবে। তখন ঘরে বন্ধ থাকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যলাভ হইবে। স্বাস্থ্যলাভ তাহাদের শ্রেষ্ঠ কাম্য হইবে। চিন্তানায়কগণের এই চিন্তা আজ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। উন্নত শিক্ষিত নারীরা ত বটেই, তথাকথিত অনুন্নত সমাজের শিক্ষিত নারীরাও আজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উপদেশ তাহারা গ্রহণ করিতে পারিতেছে।

সধবা অবস্থায়, শিক্ষিতা নারী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অভাবগ্রস্ত স্বামীকে সাহায্য করিতে পারে; বৈধব্য জীবনে, নিজের শিক্ষার বলে, পরের গলগ্রহ না হইয়া, অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা সন্তান-দিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিবে, এই চিন্তাটা আশুতোষের মনে প্রবল হইয়াই দেখা দিয়াছিল। আমাদের সমাজের বুকে নারী-সমস্যাটা অনেকদিন হইতেই এক জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়া বসিয়া আছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই ভীষণ চাপ সরাইয়া দেওয়াটাই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং নারীকে মুক্তি দিয়াই এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। আশুতোষ তাহা করিয়াছেন।

তথাকথিত অনুন্নত সমাজের নারীরা স্বভাব-চরিত্রে, আদব-কায়দায় উন্নত শ্রেণীর অনুকরণে ক্রমেই উন্নত হইতেছে। ইহাদিগকে এখন আর নীচঘরের মনে করিবার উপায় নাই। উঁচুঘরের কন্যা এবং ভগিনীর স্থানে আসিয়া উহারা দাঁড়াইতেছে। এইভাবে শিক্ষার ভিতর দিয়া, সমাজ-সংস্কারের ফলে কতকগুলি মানুষ অযথা অমানুষের জীবনযাপন না করিয়া উন্নত সমাজের উত্তম নাগরিকের জননী হইবার যোগ্যা হইতেছে।

বাঙ্গালী সমাজের আনাচে-কানাচে, ভিতরে-বাহিরে এমন আরও অনেক অনুন্নত সমাজ রহিয়া গিয়াছে যাহারা, সংস্কৃত জীবনযাপন করিবার জন্য লালায়িত। আজ সাঁওতাল-কোল-ওরাঁও-মুণ্ডা প্রভৃতি "আদিম জাতির" নরনারী আর দূরে থাকিতে রাজি নয়। ইহারা শিক্ষিত এবং সংস্কৃত হইলে, ইতঃপূর্ব্বে বহু বহু রকমের রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে যেমন বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাদের সংমিশ্রণের ফলেও তেমনি আর একবার নূতন সমাজ-গঠন স্বরু হইবে। এইসকল আদিম জাতির স্ত্রীমহলে শিক্ষা-প্রসারের ফলে রক্ত সংমিশ্রণ বাড়িতে থাকিবে। তখন নবজীবন লাভ করিয়া বঙ্গসমাজ শক্তিশালী হইবে।

তথাকথিত উচ্চ-নীচে বিবাহ

বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর ছাত্রের মিলনের ফলে পুরুষে-পুরুষে অথবা নারীতে-নারীতে সাধারণ প্রীতি জন্মিতে বাধ্য। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিয়া রাখা উচিত যে, সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ এবং সর্ব্বশ্রেণীর নারীর পারিবারিক দিক্ হইতে মিলনের উপায়টাও এইখানেই রহিয়াছে। আজ যেসকল বালকবালিকা তথাকথিত নীচ ঘরে রহিয়াছে সাধারণ শিক্ষার ফলে তাহারা তথাকথিত উচ্চ ঘরের সন্তানদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে

পারিতেছে। কালে বিবাহাদিও সম্ভব হইবে। আর্থিক অভাব আরো প্রবল হইলে তথাকথিত উঁচু ঘরের ছেলেরা তথাকথিত নীচ ঘরের শিক্ষিতা কন্যাকে, নীচ ঘরে সঞ্চিত অর্থের জন্য, বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে। তথাকথিত নীচঘরে বিবাহিত উচ্চ ঘরের যুবা নিজ বিদ্যাবুদ্ধির জোরে ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহাতে আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি দেখা দিবে। অপর দিকে, তথাকথিত নীচঘরের শিক্ষিত পাত্র অর্থের বলে অভিজাত বংশের দরিদ্র পিতার কন্যাকে বিবাহ করিবে। উচ্চ সমাজের আদবকায়দা আচার ব্যবহার লইয়া গিয়া সেই কন্যা স্বামীর সমাজকে শিক্ষা দিতে পারিবে। আবার ধনবান নীচঘরের পুত্রের অথবা গুণবতী নীচঘরের কন্যার নিজেদের যোগ্যতার বলে উঁচুঘরে আসাও সম্ভব হইবে। এইভাবে পরস্পর আদানপ্রদানের ফলে সমাজ একটা গুণ-সাম্যের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, আশা করা যায়। অবশ্য যতদিন না ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার হইতেছে ততদিন বিক্ষিপ্ত-ভাবে ক্বচিৎ কখনো বিবাহ ঘটিতে পারে। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের ফলে সমাজের খানা-ডোবা বুজিয়া যখন এক সমান হইয়া যাইবে তখন মিলনের পক্ষে আর কোন বাধাই থাকিবে না।

এইভাবে ভাঙ্গাভাঙ্গি সুরু হইলে, সমাজের জীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন পণপ্রথাও উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। অবাধ রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে সমাজে শক্তিশালী সন্তান দেখা দিবে। গুরু পুরোহিতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। সমাজ-সংস্কার ইতিমধ্যেই কিছু কিছু এই আকারে দেখা দিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে বিষম চাপ অন্যান্য দেশ সম্পূর্ণরূপে অথবা অনেকাংশে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে, একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই আমরাও সমাজের এই ভীষণ পাপ, অবনত জাতির পক্ষে এই অমোঘ অভিশাপ দূর করিতে

পারিব। সমাজ শিক্ষিত হইলে গতানুগতিক প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া, নিজ বিদ্যাবুদ্ধির বলে যখন যাহা শুভ তাহা গ্রহণ এবং যাহা দুষ্ট তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকে।

অসবর্ণ বিবাহ

মতবাদটা প্রবল না হইলেও, এদেশের কোনে কোনে চিন্তাশীল ব্যক্তির মত যে, অসর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ভিন্ন অন্য সকল জাতির মধ্যেই চলিত হউক ; অর্থাৎ সমাজে দুই শ্রেণী থাকুক, (১) উপরোক্ত তিন শ্রেণীর দ্বারা গঠিত এক শ্রেণী (২) নমঃশূদ্র-মাহিষ্য-রাজবংশী এবং অপরাপর সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত এক শ্রেণী। তাঁহারা দেখিতেছেন নারীর অভাবে অনেক হিন্দু সম্প্রদায় ধীরে-ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে, হয়ত আর বার দুই লোক-গণনার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহারা এই দুনিয়া হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এইসকল মনীষিগণ দূরে দূরে থাকিয়া নিজ নিজ চিন্তার সাহায্যে সমাজকে সৎপরামর্শ দিতেছেন মাত্র। ইহা কার্য্যকরী হইতে পারে কিনা তাহা তাঁহারা জানেন না। হিন্দুসমাজের যে অংশটা নিতান্ত অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত, কাজে-কাজেই রক্ষণশীল একমাত্র, তাহাকে বংশলোপের নামে, ধর্ম্মলোপ করিয়া, উদার হইবার সৎপরামর্শ দিতেছেন। ইহা তাহারা মানিয়া লইতে পারে কি ? তাঁহারা জানেন না, হিন্দুসমাজের উন্নত অংশ যে ভাবে যাহা করিয়া থাকে, তাহারা ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়া চলে। বিধবা-বিবাহ সমাজের উন্নত অংশে তেমন প্রচলিত নহে বলিয়া, তাহারাও উহাকে নিন্দা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং বর্জ্জন করিয়া 'সভ্য' সাজিতেছে। নিম্নস্তরের ভিতরেও নিম্নস্তর সৃষ্ট হইতেছে, এইভাবে উচ্চনীচের গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া তাহারাও আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে এবং তাহাদের ভিতরেও যে কুলীন-অকুলীন থাকার জন্য গৌরব বোধ

করিয়া থাকে, ঐ সকল সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ সে খবর রাখেন কি? ইঁহারা সমাজকে 'প্রাণগতিক মঙ্গলে'র অবস্থায় দেখিতেই চাহেন, উহাকে জীবিত দেখিতে চাহেন না। কেননা, তাঁহাদের সামনে সমাজটা সমগ্রভাবে ধরা দেয় না। হিন্দু-হিসাবে সকল হিন্দুই যে এক, এ ধারণা তাঁহারা মগজে স্থান দিতে পারেন না।

খাঁটি সমাজ-সংস্কারের জন্য চাই গোটা হিন্দু সমাজের সকল স্তরে অসবর্ণ বিবাহের পাঁতি। সেই পাঁতির জন্য আর পুরুত ঠাকুরদের নিকট গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িবার দরকার নাই। আর্থিক তাড়নায় আর শিক্ষার প্রভাবে অসবর্ণ বিবাহ ক্রমেই সার্ব্বজনীন হইয়া পড়িতেছে। এই দিকে বাঙালী জাতের গতি আরও বাড়িয়া চলিবে।

খণ্ডদ্রষ্টারা হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই, উন্নত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উন্নত নয়, সেখানে পথে-ঘাটে যোগ্যপাত্রের ছড়াছড়ি নাই; আবার অনুন্নত অংশে সকলেই অনুন্নত নয়, উন্নত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার সেখানেও মিলে। উন্নত-অনুন্নতের গণ্ডীটা কিছু চিরস্থায়ী নয়। সুযোগ পাইলে অনুন্নতও উন্নত হইতে পারে, আবার সুযোগ-প্রাপ্তি বন্ধ হইয়া গেলে উন্নতও অবনত হইয়া যাইতে পারে। পুরুষানুক্রমে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মস্তিষ্কে 'জং' ধরিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ নানাভাবে জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা মস্তিষ্ক মাজ্জিত হইতে থাকিলে, একদিন ইহারাই উন্নত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইবে। আজিকার উচ্চ অথবা আজিকার নীচটাই বড়ো কথা নয়, চিরদিনের জন্য সমাজ কিভাবে শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে উহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। সেই জন্যই এযাবৎ চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষিগণ ঐ দিকেই মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তায় শিক্ষা-সংস্কার এবং সমাজসংস্কার এক এবং অভিন্ন বিবেচিত হইয়াছে।

নারীত্বের ফলাফল

যে আশুতোষকে সকলে সামনাসামনি দেখিয়াছে তিনি ছিলেন, প্রাচীন সমাজের লোক। কাজেই, অনেক সময়ে তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ সমাজের গণ্ডী দিয়া রাখিতেন এবং সেজন্য গর্ব্বও বোধ করিতেন। কিন্তু যে আশুতোষকে সকলে দেখিবারও ধরিবার সুযোগ পায় নাই তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশে জাত বর্ত্তমানযুগের উদার ব্রাহ্মণ যুবক। কাজেই, আমরা দেখিতেছি. আশুতোষ ছিলেন, রক্ষণশীল প্রাচীন এবং উদারনীতিক নবীন সমাজের মাঝামাঝি এক তেজস্বী পুরুষ অথবা প্রাচীন দেহে নবীন মন লইয়া আবির্ভূত এক শক্তিশালী যুবক। এই শক্তিশালী যুবকই সকল রকম আধুনিক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি চাহেন নাই, কোনো নারী হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ-কান এবং মস্তিষ্ক থাকিতে একটা জীবন্ত পিণ্ডের মতো নিজের বাঁধাধরা পথে দিবারাত্র গড়াইতে থাকে। এই জন্যই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার দ্বার চওড়া করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে অল্প পরিমাণ বিদ্যা লইয়া পুরুষ নারীর উপর, স্বামী স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে, আশুতোষ সেই পুরুষ স্বামীর বৃথা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান ভাঙ্গাইবার কৌশলটী নারীকে বলিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এক জড় পিণ্ডের সহিত আর এক জড়পিণ্ডের ঠোকাঠুকি হইত এখন প্রত্যহ মানুষের সহিত মানুষের সঙ্গলাভ ঘটিবার সুযোগ দেখা গিয়াছে। এইরূপ নারীত্বের প্রভাবে পুরুষ আর নারী এক সঙ্গেই মানুষ হইতে পারিতেছে। বিবেকানন্দ-প্রচারিত "মা আমায় মানুষ কর" মন্ত্রটা এক নতুন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতেছি।

আশুতোষ জানিতেন, এইসকল শিক্ষিত যুবকযুবতী সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্তির পর, কিছুকাল প্রাচীন সমাজের চোখের সামনে,

নিজেদের জন্য নিজেরা স্বাধীনভাবে পরিচয় গড়িয়া তুলিতে থাকিবে। প্রাচীন সমাজের ভিতরকার গোপন ব্যভিচারের চেয়ে ইহাকে তিনি কোনো অংশেই মন্দ মনে করিতেন কি না সন্দেহ। বরং যুবকযুবতীর এইরূপ মিলনের ফলে ক্রমে ক্রমে দাম্পত্য জীবন গড়িয়া উঠিলে, সমাধি-প্রাপ্ত গুরুগিরির পরে ক্ষয়িষ্ণু পৌরোহিত্যের দৌর্ব্বল্যজনিত আস্পর্দ্ধাটা বিনষ্ট হইয়া যাইবে ইহা তিনি আশা করিতেন।

শিক্ষিত বেকার ও স্বদেশীর জোয়ার

শিক্ষা-সংস্কারের ফলে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অবশ্য পূর্ব্বের তুলনায়। এই সামান্য ফলটুকুতেই দেশে সীমাবদ্ধ চাকুরীর ক্ষেত্রে অসংখ্য চাকুরী-প্রার্থীর ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। এই ভিড় এই হুড়াহুড়ি খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কেননা, লোকের অভাব আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু আগে অভিযোগ ছিল না, এখন অভিযোগ দেখা দিয়াছে; আগের লোকেরা এক অদৃশ্য শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শুকাইয়া মরাটাই নিজেদের ধর্ম্ম বিবেচনা করিত। আজকার লোকেরা আর কাহারো উপর পূরাপূরি নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিতে রাজি নয়। তাহারা বেশ ভাল রকমেই বুঝিয়াছে সমস্ত দুনিয়াটা যেভাবে চলিতেছে, ঠিক ঠিক সেইভাবে চলিতে পারিলে, আর বেশি কিছু না-হোক, অন্তত কেহ না-খাইয়া শুকাইয়া মরিবে না। এই বোধ যে জাগিয়াছে, এই চেতনা যে দেখা দিয়াছে ইহা শিক্ষা-সংস্কারকরূপী সমাজ-সংস্কারকদেরই চেষ্টার ফল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বেশী বেশী শিক্ষা-প্রচারের ফলেই বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা আমাদের মতো জড় সমাজের পক্ষে বিষম ভাবনার কথাই বটে। কেন না, যাহারা এতদিন আরামে

দিন কাটাইতেছিল তাহাদের আরামে ক্রমেই ব্যাঘাত ঘটিতেছে, আবার পরোক্ষে এক বেকারও আর বেকারের অসুবিধা ঘটাইতেছে। ইহাতে কাড়াকাড়ির মাত্রাটা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহা ধ্বংসের কারণ নয়, বাঁচিবার উপায়। 'কি করা উচিত', 'কোন্ দিকে যাওয়া উচিত' এরূপ চিন্তা এই উপায়ে এখন একে একে ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে। যে উৎসাহী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ হইবে সে বাঁচিয়া যাইবে। আর যাহার সে যোগ্যতা নাই সে মরিবে। এই মরায় দুঃখ নাই। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারাই হইবে সমাজের আসল শক্তি। শিক্ষা প্রচারের শ্রেষ্ঠতা এইখানেই, আর যে শিক্ষা বাঁচিবার কৌশল বলিয়া দিতেছে, জীবনে উদ্যম আনিয়া দিতেছে, উহাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। আজ এই শিক্ষার বিস্তারের ফলেই চাকরীর বাজার মন্দা হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার ফাঁপিয়া উঠিতেছে। অনেক অভাব ত্রুটীর ভিতরেও নানারকমের কলকারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার স্থলে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। আজ জাতির বিচার লইয়া কেহ কর্ম্মক্ষেত্রে পিছে পড়িয়া থাকিতে রাজি নয়।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারটা বাড়াইয়া দিতেছে কাহারা? বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ-হওয়া মার্কা-মারা অথবা ফেল-হওয়া "শিক্ষিত-বেকারেরা"। এই কথাটা কি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই ধরণের "শিক্ষিত বেকারে"র দলই "প্রোলেট্‌কুল্‌ট্" অর্থাৎ মজুর-সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতেছে। সংস্কৃতি-সম্পন্ন মজুর অর্থাৎ মস্তিস্কশালী অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত এবং সিকি-ভুক্ত নরনারীই ঐসকল দেশে আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লব ঘটাইতেছে। আমাদের বাংলা দেশেও শিক্ষিত বেকারেরাই নবীন আর্থিক ও সামাজিক ভাঙন-গড়নের বিপুল যন্ত্রস্বরূপ কাজ করিতেছে।

কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ

জননি! রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।” কবির বেদনায় ব্যথিত আশুতোষ বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শুধু তাহাই নয়, অন্য সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি ইহাকেই একমাত্র কর্ম্ম বিবেচনা করিলেন। যাহাতে ইহারা শুধু খাদ্যের জন্য, উদরান্নের জন্য নয়, অন্য সকল দিক্ হইতে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়া সমাজকে শক্তিশালী করিতে পারে তাহার জন্য, তিনি স্বেচ্ছায় দেশের ভিতর জীবন্ত বেকার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন। কেন না, তাহা না হইলে ইহারা সংস্কারগত পৈতৃক ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া কিছুতেই ঘরের বাহির হইবে না। আশুতোষ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, অনাহারের দৈন্যের চাবুক খাইয়া ইহারা ঘরের বাহির হয় কি না। তিনি কি লক্ষ্য করেন নাই, পিঠে কাপড়ের বোঝা বাঁধিয়া কোন্ মুল্লুক হইতে এদেশে চীনারা আসিয়া পয়সা লইয়া যাইতেছে? তাই তিনি চাহিয়াছিলেন, সকল অভুক্ত ক্লীব বাঙ্গালী যুবককে “গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া” করিতে এবং এই বিশ্বমাঝে যে যেখানে পারুক নিজের স্থান করিয়া লউক, বিদেশের পয়সা লুটিয়া দেশে আনিতে শিখুক, বিদেশী হইয়া মানুষ হউক। তাঁহার সমাজ-সংস্কারের চরম পরিণতি বোধ হয় এইখানেই। কোনো পিতা পুত্রের জন্ম দিয়াই খালাস হইয়াছেন; আশুতোষ তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, জীবনের সম্বল অনেকখানিই তাহার ঝোলায় ভরিয়া দিয়াছেন।

অপরাধ ও শাস্তির আকার-প্রকার*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

[অপরাধতত্ত্বের গোড়াপত্তন

অপরাধ ও তাহার শাস্তি, এই লইয়া মানুষের আলোচনা-গবেষণার সুরু ঠিক যে কবে হইয়াছিল তাহার সন-তারিখ বলিয়া দেওয়া শক্ত ব্যাপার। মানুষের সমাজ-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই সৃষ্টি হয় সেই সমাজে আইনের। আইন মানিয়া চলাই বিধি; কিন্তু ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সে আইন মানুষ ভাঙেও। এবং আইন কেহ ভাঙিলেই সমাজ তাহাকে সাজা দিবে, নহিলে তাহার আইনের মর্য্যাদা বা মানে থাকে না। কাজেই অপরাধ আর তাহার দণ্ডের গোড়াপত্তন হইয়াছিল সমাজ ও আইনের সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

মানুষের মনে যে চিন্তা ও ধারণা থাকে তাহার হিসাব ও হদিশ বাঁচিয়া থাকে তাহার রচিত পুঁথিতে। সেই প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত পুঁথিপত্র দেশে-দেশে মানুষ লিখিয়াছে তাহার মধ্যে কাজেই আইনের ব্যতিক্রম ও সমাজের হাতে তাহার সাজা লইয়া আলোচনার মালমশলা প্রচুরই রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনো পুঁথিখানা বা একেবারেই অপরাধতত্ত্ব লইয়া লেখা, কোনোখানা বা অন্য পাঁচটা কথার সঙ্গে-সঙ্গে অপরাধতত্ত্বের কথাও দু'চারটা বলে।

---

* বিনয়বাবুর ইংরেজি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। ইংরেজি প্রবন্ধ "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (জানুয়ারি ১৯৩৭)। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক, অধ্যাপক অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ (ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল) এই রচনার বাংলা সংস্করণ বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদে উপস্থিত করেন (৭ মে, ১৯৩৮)।

অপরাধতত্ত্বের আলোচনার দিক্ দিয়া পৃথিবীর অর্থাৎ মানুষ-জাতির একেবারে প্রথম যুগের কয়েকখানা বইয়েরই নাম করা চলে :—

প্রাচীন মিশরে—ফারাওদের নীতিগ্রন্থ।

পশ্চিম এশিয়ার—আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া দেশের শাস্ত্র।

ভারতে—বৈদিক সাহিত্য।

চীনে—চাও-লি (= 'শাসনতন্ত্র' খৃঃ পূঃ ১২০০ সন) গ্রন্থ।

ইহার পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রবচন ও শাস্ত্রের পুঁথিগুলা ত অপরাধ-তত্ত্বের আলোচনা ও মালমশলায় ঠাসাই। এই যুগের যে বইগুলার নাম প্রথমেই করা যায় তাহারা হইতেছে :—

হিন্দুদের—ধর্ম্মস্মৃতি-ও অর্থনীতি-শাস্ত্র

বৌদ্ধদের—বিনয়-পিটক

রোমানদের—আইনের লিপি ইত্যাদি।

কাজেই অপরাধতত্ত্বের গোড়া খুঁজিতে হইলে একেবারে সেই অতি-প্রাচীন কাল হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

এইসব বইয়ে কিন্তু নিছক গবেষণা হিসাবে অপরাধতত্ত্বের আলোচনা বা তথ্যসন্ধান বিশেষ নাই। সে আলোচনা হইয়াছে বিশেষ করিয়া আধুনিক জগতেই।

অপরাধতত্ত্বের আলোচনায় যে-ক'টা কথা মূলতঃ আসিয়া পড়ে তাহাকে মোটামুটি তিনটা ভাগে ফেলা যায় :—

(১) অপরাধ ও অপরাধীর স্বরূপ।

দেশের বা সমাজের সাময়িক আচার ও আইন, সে আইন—তা যাই হউক—ভাঙার নাম অপরাধ। এই হইল সাধারণভাবে অপরাধের সংজ্ঞা।

দেশ-কাল-পাত্রভেদে আইন এক হয় না; অপরাধেরও তাই কোনো নির্দ্দিষ্ট চেহারা নাই। একদেশে যাহা অপরাধ অন্য দেশে

সেটা অপরাধ না-ও হইতে পারে ; এক সময়ে যাহা অপরাধ আরেক সময়ে হয়ত সেইটাই হয় বিধি ; একের পক্ষে যেটা অপরাধ অন্যের পক্ষে হয়ত সেইটাই কর্তব্য।

অপরাধী কে ?

যে অপরাধ করিয়াছে। ইচ্ছায় করিয়াছে বা অনিচ্ছায় দায়ে পড়িয়া, জানিয়া করিয়াছে বা না-জানিয়া, এ তর্কে কিছু যায় আসে না। আইন জানিতাম না বলিয়া আইন-ভাঙার সাজাকে এড়ানো যায় না, এই হইল আধুনিক যুগের আইনজ্ঞদের মত।

পণ্ডিতদের মতে অপরাধী প্রধানতঃ মোটের উপর দুই রকমের হইতে পারে—আকস্মিক-অপরাধী ও স্বভাব-অপরাধী। কেহ বা হঠাৎ একটা অপরাধ করিয়া ফেলে, কাহারো বা সেই অপরাধ করাটাই স্বভাব ; একজন একবার অন্যায় করিয়াই অনুতাপ করে, অন্ততঃ আবার সেটা করিতে চায় না, আরেকজন অন্যায় করাটাকেই পৌরুষের পরিচায়ক ও তাহার নিত্য-নিয়মিত কাজ বলিয়া ধরিয়া নেয়। অপরাধীদের শ্রেণীবিভাগ লইয়া পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে বিস্তর। তাহার ভিতর সম্প্রতি প্রবেশ না করিলেও চলিবে।

(২) দণ্ড।

অপরাধ করিলে সমাজ তাহাকে দণ্ড দেয়। সমাজের হাতে যদি দণ্ড না থাকে তবে তাহার আইনের কোনো স্থায়ী বা নিশ্চিত জোরও থাকে না। দণ্ডের ভয় আছে বলিয়াই লোক আইন মানিয়া চলে। এবং লোকে আইন মানিয়া না চলিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিই ধ্বসিয়া পড়ে। এইখানেই দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা —দণ্ড আইনকে বাঁচাইয়া রাখিবার যন্ত্র, তাহার ঠেক্‌নো।

কিন্তু দণ্ড দিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? একজন একটা অপরাধ করিয়াছে, সমাজ বা রাষ্ট্র তাহাকে তার জন্য সাজা দিল। এই সাজার

সম্ভাব্য ফল বা উদ্দেশ্য কি হইতে পারে ? এ বিষয়ে সকল পণ্ডিতের মত এক নয়।

যে উদ্দেশ্য লইয়া দণ্ড দেওয়া হইতে পারে তাহাকে মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ফেলা যায়। উদ্দেশ্য অনুসারে অবশ্য দণ্ডের বিধি এবং রীতিরও তারতম্য হয়।

(ক) দণ্ড আইন-রক্ষা করিবার যন্ত্র।

আইন সমাজের খুঁটি, দণ্ড তাহার ঠেক্‌নো। দণ্ডের বিভীষিকা মানুষকে আইন ভাঙিতে নিরুৎসাহ করে। একজন অপরাধীর উপরে কঠোর শাস্তি আসিয়া পড়িলে আর পাঁচজন সেই অপরাধ করিতে ভয় পাইবে। এবং এই জন্যই অপরাধের গুরুত্বের অনুপাতে দণ্ডেরও গুরুত্ব বাড়ানো বা কমানো দরকার।

(খ) দণ্ড অপরাধীর উপরে সমাজের প্রতিশোধ।

যে লোক সমাজের আইন ভাঙিল সমাজের একটা অপরিহার্য অঙ্গে সে আঘাত করিয়াছে। দণ্ড সেই আঘাতের প্রতিঘাত। সমাজ বে-আদবি সহ্য করিবে না, পাল্টা আঘাত করিয়া বুঝাইয়া দিবে, তাহাকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। অনেক সময়ে এই প্রতিঘাতের নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা মানুষকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে—সমাজের শক্তির এই অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কম নাই।

অতি সামান্য অপরাধে নির্ব্বাসন, অঙ্গচ্ছেদন ও মৃত্যুদণ্ড অনেক দেশেই এককালে চলিত ছিল, শুধু অপরাধের গুরুত্ব দিয়া তাহার মানে বোঝা যায় না। এখানে দণ্ডের অর্থ ও যৌক্তিকতা বুঝিতে হইলে শুধু এই যুক্তিটাই দেখিতে হইবে—অপরাধী সমাজের শুধু আইনই ভাঙে নাই, তাহার আত্মসম্মান ও অভিমানেও আঘাত করিয়াছে। দণ্ড সেই স্পর্দ্ধার প্রতিশোধ।

(গ) দণ্ড অপরাধীর অনাচার হইতে সমাজকে বাঁচাইবার বর্ম্ম।

যে লোকটা একবার অপরাধ করিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই অপরাধটা করিবার প্রবৃত্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল। আর-একবার সেই অপরাধ সে করিবে না এমন কোনো কথা নাই। তাহার সেই সম্ভাব্য আঘাত ও অবাঞ্ছিত আচারণ হইতে সমাজকে বাঁচাইবার খুব দ্রুত ও নিশ্চিত উপায় হইতেছে তাহাকে সমাজের ভিতর হইতে বাহিরে সরাইয়া নেওয়া—তাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াই হউক, জেলে আটকাইয়া রাখিয়াই হউক, আর ফাঁসি দিয়াই হউক। অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের উপরে নির্ভর করিবে বিচারকের সিদ্ধান্ত—সে সমাজের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক হইতে পারে? সেই অনুসারে তাহার উপরে বিধিনিষেধ চাপানো হইবে। জামিন মুচলেকা নেওয়া গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়া থাকে।

(ঘ) দণ্ড অপরাধীর সংশোধনের উপায় ও অবসরের স্রষ্টা।

অপরাধ যে করিয়াছে সে ভুল করিয়াছে। সেই কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া দিলে সে ভবিষ্যতে শোধ্রাইতেও পারে। কিন্তু বুঝাইতে ত সময় লাগে—এই সময় তাহাকে কোথায় রাখা যায়? তাহাকে জেলে পুরিয়া সমাজকে আপাতত নির্ব্বিঘ্ন করো, তারপর ধীরে সুস্থে তাহার স্বভাব ও বুদ্ধি-বিবেচনা শোধরাইবার চেষ্টা করো। অনেক সময় শুধু দণ্ডের চেতনাই লোককে সাবধান করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। একবার জেল-দাগি হইয়া আসিয়া আর একবার জেলে যাইবার ভয়েই সে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করিবে না আশা করা যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে শিক্ষাও দেওয়া চলে—স্বভাব শোধ্রাইবার শিক্ষা এবং যে কারণে অপরাধ সে করিয়াছিল সেই কারণটাকেই দূর করিবার মতো আধ্যাত্মিক নৈতিক বা অর্থকরী শিক্ষা। স্রেফ্ খাইতে না পাইয়া যে হতভাগ্য চুরি করে তাহাকে শোধ্রাইবার উপায় তাহাকে ছ্যাঁচা লাগানোই নয়; ছ্যাঁচায় তাহার পেট ভরিবে না। তাহাকে আপাততঃ

জেলে পূরিয়া অন্যের সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্ন করো; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকে এমন একটা কাজের শিক্ষা দিয়া দাও যেন ভবিষ্যতে চুরি না করিয়াও সে খাইতে পায়। সমাজের ভিতর থাকিয়াও সে ভাতের যোগাড় করিতে পারে নাই, তাহার দায়িত্ব খানিকটা অন্ততঃ সমাজেরই; সেদিক্ হইতে এই শিক্ষা সে সমাজের কাছে দাবিই করিতে পারে। জেলের মধ্যে খাটিয়া সে নিজের খোরাক উপার্জ্জন করিবে, সঙ্গে-সঙ্গে সেই খাটার মধ্য দিয়াই ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে আয় করিয়া খাইবার মতো কাজ একটা শিখিবে। ইহাতে সমাজের তরফ হইতে আপত্তি অসম্মতি বা ঔদাসীন্য দেখাইবার কোনোই কৈফিয়ৎ নাই।

(৩) অপরাধের নিবারণ ও অপরাধ-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ।

অপরাধ সমাজের দেহে দুষ্ট ব্রণ। সমাজের স্বাস্থ্যের খাতিরেই তাহার ভিতর হইতে অপরাধের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির উচ্ছেদ করা আবশ্যক। অপরাধের প্রবৃত্তির মূলে অনেকগুলা কারণ থাকে; ইহার কতকগুলি পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের ফল, কতকগুলি বা অপরাধীর শারীরিক গঠনজাত ও পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত নৈতিক দুর্ব্বলতার ফল। কাজেই সমাজদেহকে অপরাধের ব্রণ হইতে নীরোগ করিতে হইলে অপরাধ প্রবৃত্তির মূল কারণকেই দূর করিতে হইবে—তা সে আর্থিক অবস্থা ও ধনবিভাগের উন্নতি করিয়াই হউক আর অপরাধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াই হউক।

মোটামুটি এই হইল অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক কালের সব মতামত।

এবারে দেখা যাক এই মতামত পৃথিবীতে কি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। একদিনে অবশ্যই মানুষের জ্ঞান ও চিন্তা এতটা অগ্রসর হয় নাই। কয়েক শতাব্দী আগে দণ্ড ছিল সমাজের প্রতিশোধ ও প্রতিপ্রহার; এখন দণ্ডকে মনে করা হয় অপরাধীকে শোধ্রাইবার

উপায় (কাজে অবশ্য প্রাচীন যুগের বর্ব্বরোচিত দণ্ডপ্রথার অনেকখানিই এখনো পৃথিবীতে টি`কিয়া আছে ; কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক)। আমাদের আপাততঃ আলোচ্য বিষয় অপরাধতত্ত্বে চিন্তাধারার প্রগতি এবং অপরাধ ও দণ্ডের আকার-প্রকার।

প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রও চিন্তাধারা,—এই দু'য়ের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান তাহা পার হইতে কয়েক শতাব্দীই লাগিয়া গিয়াছে ; হয়ত দণ্ডনীতির চরম উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার এখানো বহু-বহু বছর বাকি আছে।

অপরাধ ও শাস্তি বিষয়ক ধারণা ও মতামত যেভাবে বিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার দিয়াছেন, ১৯৩৭ সনের জানুয়ারি সংখ্যা 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায়। প্রবন্ধের নাম—"দি সোশ্যিঅলজি অব্ ক্রাইমস্ অ্যাণ্ড্ পানিশ্‌মেণ্ট্স্।" বর্ত্তমান প্রবন্ধ বস্তুতঃ তাঁহার সেই ইংরেজি প্রবন্ধেরই বঙ্গানুভাষ। শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত।]

অপরাধতত্ত্বে ক্লাসিক যুগ
(১৭৬৪-১৮৭৫)

আধুনিকযুগের গোড়ার দিকে অপরাধীর দণ্ড তথা কারা-প্রথার সংশোধনের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িল। এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রথম বই লিখিলেন ইংল্যাণ্ডের সুধী মিন্‌শাল্। ১৬১৮ সনে লণ্ডন হইতে তাঁহার বই 'কারাগার ও কয়েদিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও বিবরণ' (সার্টেন্ ক্যারেক্‌টার্স্ অ্যাণ্ড্ এসেজ্ অব্ প্রিজ্‌ন্ অ্যাণ্ড প্রিজনার্স্) প্রকাশিত হয়।

ইহার পর দ্বিতীয় বইখানি লেখা হইল প্রায় এক শতাব্দী পরে, ১৭০২ সনে। এই বইখানিও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানির নাম 'লণ্ডন শহরে ও উপকণ্ঠে নিউগেট্ ও অন্যান্য কারাগারের

সংস্কারের প্রচেষ্টা' (এসেজ্ টুওআর্ড্স্ দি রিফর্ম্মেশ্যন্ অব্ নিউগেট্ অ্যাণ্ড আদার প্রিজ্ন্স্ ইন অ্যাণ্ড অ্যাবাউট লণ্ডন); লেখক ইংল্যণ্ডের পণ্ডিত ব্রে।• এই বইখানা আসলে একটা বিবরণী। 'ক্রিশ্চান্ জ্ঞানোৎসাহিনী সভার (সোসাইটি ফর্ দি প্রোমোশ্যান্ অব্ ক্রিশ্চিয়ান্ নলেজ্) তরফ হইতে সেই সময়ে ইংল্যণ্ডের কারাগারগুলি পরিদর্শনের একটা ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রে তাঁহার বিবরণী রচনা করেন।

মিন্শাল্ ও ব্রে কারাপ্রথায় যে সংস্কারের কথা তুলিয়াছিলেন, কাজে কিন্তু সেই সংস্কারের চেষ্টা স্থরু হয় আরো অনেক পরে। ১৭৭৩ সনে বৃটেনের পার্ল্যামেণ্ট একটি নূতন আইন প্রণয়ন করে; এবং আইনের বলে ম্যাজিষ্ট্রেট্দিগকে, জেলখানাগুলিতে কয়েদিদের ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য পাদ্রি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইংল্যণ্ডে এই প্রথম কারা-সংস্কারের প্রয়োজন ও নীতিকে সরকারি-ভাবে স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল।

ওদিকে ইয়োরোপের অন্যত্রও অপরাধতত্ত্বের দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িতেছিল। ১৭৬৪ সনে ইতালীয় দার্শনিক ও মানব-হিতকামী বেক্কারিয়া (১৭৩৫-৯৪) একখানি বই বাহির করিলেন। এই বইয়ের নাম 'অপরাধ ও শাস্তি' (দেই দেলিত্তি এ দেল্লে পেনে)। পূরা সওয়া-শতাব্দী পরে বেক্কারিয়ার বই পড়িয়া ফরাসী অপরাধ-শাস্ত্রী গাব্রিয়েল্ তার্দ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ১৮৯০ সনে তার্দ্ তাঁহার 'দণ্ড-দর্শন' (লা ফিলোজোফী পেনাল্) বই লেখেন; এই বইয়ে তিনি বেক্কারিয়াকে উদারনীতিক 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সন্তান' বলিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছেন।

বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সুশৃঙ্খল যুক্তির দিক্ দিয়া বেক্কারিয়ার বইখানাই আধুনিক যুগে অপরাধতত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম বই। অপরাধ-

তত্ত্বের তিনি অগ্রদূত। রাষ্ট্রশাস্ত্রে রুশো, অর্থশাস্ত্রে অ্যাডাম্ স্মিথ্ ও সমাজ-দর্শনে হার্ডার্'এর যে স্থান, অপরাধতত্ত্বে বেক্কারিয়ার স্থানও সেই-রূপ।

অপরাধ-প্রবৃত্তির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বেক্কারিয়া মানুষকে স্বাধীনচেতা বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন; মানুষ নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতে পারে; অপরাধ সে করে দস্তুর মত ভাবিয়া-চিন্তিয়া, তাহার কাজের সুবিধা-অসুবিধা লাভ-লোকসান বিবেচনা করিয়া তবেই। অতএব তাহার অপরাধের দণ্ডও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের অনুপাতে। অপরাধীর প্রবৃত্তিই বিচারকের দেখিবার বস্তু; তাহার বয়স, স্বাস্থ্য, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির দোহাই দিয়া দণ্ডের কোনোরকম তারতম্য করা চলিবে না—এই হইল বেক্কারিয়ার মত।

ক্লাসিক্ যুগের বইয়ের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠার দিক্ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য বই লেখেন ইংরেজ সমাজ-সেবক হাওআর্ড্ (১৭২৬-৮৬)। হাতে-কলমে কাজের ক্ষেত্রেও এই বইখানার প্রভাব প্রচুর হইয়াছিল। হাওআর্ডের বইয়ের নাম ছিল "ইংল্যণ্ড ও ওয়েলস্'এ কারাগারের অবস্থা" (দি ষ্টেট অব্ প্রিজন্স্ ইন্ ইংল্যণ্ড অ্যাণ্ড ওয়েল্স্); ১৭৭৭ সনে লণ্ডনে বইখানি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে ইংল্যণ্ড ও ওয়েল্স্ ছাড়া, বৃটেনের বাহিরের কয়েকটা বিদেশী জেল ও হাঁসপাতালেরও বিবরণ ছিল। উত্তরকালে কারা-সংস্কারের যে আন্দোলন পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহার দিক্ হইতে প্রথম প্রামাণ্য বই হইল হাওআর্ডের এই বইখানা। আরো একটা কারণে হাওআর্ডের নাম মনে রাখিবার মতো। দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য আসলে শোধ-তোলা বা শাস্তি দেওয়া নয়, সংশোধন করা,—এই নীতির স্রষ্টা তিনিই বলিয়া। বন্দীশালা বা কারাগার জায়গাটা যে বস্তুতঃ একটা অনুতাপাগার বা সংশোধনাগার, এই কথাটাও মূলে হাওআর্ডেরই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কারাসংস্কার আন্দোলন বেশ জোর চলিতেছিল। ১৮২৫ সনে নিউ-ইয়র্ক শহরে প্রথম কিশোর-সংশোধনাগার স্থাপিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিনব কারাগার প্রথা লইয়া ইয়োরোপে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া এ বিষয়ে খোঁজখবর লইয়া আসিবার জন্য ১৮৩৫ সনে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রুশিয়া ও বেলজিয়াম্ হইতে তদন্ত-সমিতি (কমিশন্) পাঠানো হইল।

জেলখানায় সকল রকমের কয়েদি একসঙ্গে থাকে। জেলের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া তাহারা জোট পাকায়। পুরানো পেশাদার ও ঘাগি আসামীরা নূতন ও তরুণ অপরাধীদের পটাইয়া পাকা অপরাধী করিয়া তোলে। এই অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তখন প্রতিটি কয়েদিকে আলাদা-আলাদা খুপ্‌রিতে রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত,—যেন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে না পারে। এইরূপ আলাদা-খুপ্‌রি-বিশিষ্ট জেল্‌কে বলা হয় "সেলুলার" জেল্। পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া প্রদেশে ইহার প্রথম চলন করা হয় বলিয়া প্রথাটারই নাম হইয়া গেল পেন্‌সিস্‌ভ্যানিয়া সিষ্টেম্।

ইয়োরোপ হইতে যে বিশেষজ্ঞরা গিয়াছিলেন, এই প্রথাটা স্বভাবতই তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহাদের নির্দেশক্রমে ইয়োরোপের দেশে-দেশেও স্থানিক প্রয়োজন অনুসারে অদল-বদল করিয়া লইয়া এই রীতির চলন করা হইল।

ভারতবর্ষে প্রথম কারা-তদন্ত কমিটি বসানো হয় ১৮৩৬-৩৮ সনে,—ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যখন কারা-সংস্কারের এই হিড়িক চলিতেছিল ঠিক তাহার মাঝখানে। পৃথিবীতে তখন জার্মাণ অপরাধশাস্ত্রী কার্ল রোডার্‌'এর (১৮০৬-৭৯) মতামতেরই রাজত্ব। এই কারাকমিটির মারফৎ তাঁহার সেই মতবাদ ভারতেও মানিয়া লওয়া

হইল। 'রোডার্'এর মত হইল,—দণ্ডের উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীর সংশোধন ও শিক্ষা, যেন অপরাধের পুনরাবৃত্তি সে না করে। নীতি হিসাবে এই মতকে মানিয়া নিবার অর্থ ই,—অন্ততঃ মতবাদের দিক্ হইতে,—উদার নীতি ও সংস্কার-পন্থাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছিয়া কারাসংস্কারের আন্দোলন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। ১৮৪৬ সনে জার্মাণির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে আন্তর্জ্জাতিক কারা-সংস্কার-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। চতুর্থ অধিবেশন হইল লণ্ডনে, ১৮৭২ সনে। ভারতে দ্বিতীয়বার জেল-কমিটি বসিল ১৮৬৪ সনে। ওদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আর একটা নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। শিশু-সংশোধনাগারের সৃষ্টি সে-ই করিয়াছিল (১৮২৫); সেলুলার জেলও তাহারই আবিষ্কার; এবারে আরেকটা অভিনব প্রথার সে পত্তন করিল, 'অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সাজা' প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া। ১৮৬৭ সনে মিশিগান্ প্রদেশে এই প্রথার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়।

'অনির্দ্দিষ্ট সাজা'র প্রথা টা সংক্ষেপে এই :—

সাজা দিবার সময়ে কয়েদিকে কতদিন জেলে থাকিতে হইবে তাহার সময় বাঁধিয়া দেওয়া হয় না। সে সাজা খাটিয়া যায়; এদিকে কিছুদিন পর-পর তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ, আচার-ব্যবহার, মতিগতি প্রভৃতির খতিয়ান করা হয়। তাহার মতিগতি শোধরাইয়া গিয়াছে মনে হইলেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে স্বভাব শোধরাইয়া যাইবার প্রমাণ মিলিবার পরে আর কয়েদিকে জেলে পচিতে হয় না। বহুকাল ধরিয়া জেলে পচিবার ফলে যে মানসিক অবনতি ও নৈরাশ্য আসা সম্ভব, ইহাতে তাহার ভয় কম হয়; স্বভাব ভাল হইবার চেষ্টাকেও দ্রুত ও নিশ্চিত করিয়া তোলে।

মিশিগানে এই প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন ও পরীক্ষা হয় বেশ্যাদের

লইয়া। পরে সকল দেশে অন্যান্য কয়েদিদের সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে।

১৮৭৫ সনে নিউ-ইয়র্কের এল্‌মায়রা নগরে প্রাদেশিক সংশোধনাগার স্থাপিত হয়। বেকারিয়া ও হাওআর্ডের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই এক শতাব্দী ধরিয়া যে কারা-সংস্কার আন্দোলন পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছিল, তাহার মধ্যে এই সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠা অতি বড় কীর্তিস্তম্ভ।

১৭৬৪ হইতে ১৮৭৫ সন—এই কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দীকে অপরাধ-তত্ত্বের ইতিহাসে ক্লাসিক্ যুগ বলা যায়; কারণ অপরাধতত্ত্বের আলোচনায় বিবিধ প্রথা ও মতামতের রচনা ও রটনার এই সময়েই পত্তন হইয়াছিল।

বস্তুনিষ্ঠ অপরাধতত্ত্বের যুগ
(১৮৭৬—১৯০০)

অপরাধতত্ত্বের ক্লাসিক মতবাদের মধ্যে যে সংস্কারের ধুয়া ছিল তাহার গোড়ার যুক্তি ছিল মানবতা। অপরাধীও আসলে মানুষ। শিক্ষা ও সাহায্য দিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলো, তাহার অপরাধ-প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে। এই মানবতায় বিশ্বাসের প্রথম প্রতিবাদ আসিল ইতালি হইতে।

ইতালির দার্শনিক লম্ব্রোসো ১৮৭৬-৭৮ সনে তাঁহার "অপরাধ-প্রবণ মানুষ" (লুঅমো দেলিঙ্কোয়েন্তে) লিখিলেন। ইহার অল্প পরেই তাঁহার দুই সহকর্মী ফেরি এবং গারোফালো তাঁহাদের বই বাহির করিলেন। ফেরি-প্রণীত 'অপরাধের সমাজতত্ত্ব' (লা সচিঅলজিয়া ক্রিমিনালে) প্রকাশিত হইল ১৮৮১-৮৪ সনে। ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হইল গারোফালোর 'অপরাধতত্ত্ব' (লা ক্রিমিনলজিয়া)।

লম্ব্রোসো, ফেরি ও গারোফালো এক নূতন মতের প্রচার করিয়া বসিলেন। ক্লাসিক্ মতটার দোষ দেখাইয়া ইঁহারা সেটাকে বলিলেন ভাবুকতাময়, দর্শননিষ্ঠ ও অতিপ্রত্যাশী। ইঁহারা যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাকে বলা হয় বস্তুনিষ্ঠ মতবাদ।

লম্ব্রোসো ও তাঁহার অনুগামীদের মতে, মানুষকে স্বাধীন-চেতা বলা চলে না। মানুষ অপরাধ করে নানা কারণে; অপরাধের প্রবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের পিছনে তাহার এমন সব বাস্তব, শারীরিক ও রক্তগত প্রভাব কাজ করে যাহার উপরে মানুষের নিজের কোনো হাতই থাকে না। অপরাধের প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবগত বা রক্তগত; শুধু শাস্তির ভয়ের সাধ্য নাই তাহাকে সংযত করিয়া রাখে। শিক্ষার জোরে অপরাধীর মন ফিরানোও অসম্ভব; শিক্ষা বরং তাহাকে পাকা অপরাধীই করিয়া তুলিবে, কারণ শিক্ষার ফলে যে জ্ঞান তাহার বিকাশ হইলে তাহাকে সে অনায়াসে নিজের কুকর্মের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। অতএব অপরাধীকে সংশোধনের কোনো সহজ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা নিতান্তই বৃথা।

রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বনাম রাষ্ট্রিক ন্যায়বিচার সমস্যা লইয়া একদা গডউইন্ ও ম্যাল্থাসে তুমুল বিরোধ হইয়াছিল; বেক্কারিয়া ও হাও-আর্ডের মতবাদের বিরুদ্ধে লাম্ব্রোসো যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন তাহাও কতটা সেই গডউইন্-ম্যাল্থাস্ বিরোধেরই অনুরূপ।

লম্ব্রোসোর মতে অপরাধীর জন্ম সমাজে অবশ্যম্ভাবী; জীবসৃষ্টির দিক্ হইতে মানুষের মধ্যে আইন-ব্যতিক্রমী ব্যক্তির সৃষ্টি মধ্যে-মধ্যে হইবেই। অপরাধী স্বভাবজ; শুধু পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাবে নয়, এমনি জন্মগত কারণেই মানুষ অপরাধ-প্রবণ হইতে পারে, হয়।

লম্ব্রোসো মূলতঃ শুধুই অপরাধ-শাস্ত্রী। অপরাধতত্ত্বের বিশ্লেষণ ছাড়া, শাস্তি-সংস্কার বা সংশোধনের আলোচনা তিনি প্রধানভাবে

করেন নাই। কিন্তু তবুও দণ্ড-প্রথার অনেক খুঁটিনাটি, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুগের দণ্ড-আইনের মধ্যে যে উদারনীতির সাক্ষাৎ মেলে, তাহার মূলে অনেকখানিই প্রেরণা যোগাইয়াছে লম্ব্রোসোর বিশ্লেষণ। লাম্ব্রোসোর মতে অপরাধের মূল খুঁজিতে হইবে জীবতত্ত্বে—অপরাধীর দৈহিক ও মানসিক গঠন ও উৎপত্তির মধ্যে। অপরাধ ও অপরাধী সমাজ-বিবর্ত্তনেরই অপসৃষ্টি।

এই বিশ্লেষণ মানিয়া নিলে কাজেই অপরাধ-প্রতিরোধের উপায়-চিন্তাও আসিয়া পড়ে। অপরাধীদেরকে সমাজ হইতে ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একা রাখা, শাস্তির অঙ্গ হিসাবে পরীক্ষামূলক কাজের ভার দিয়া অপরাধীকে পর্যবেক্ষণে রাখা, প্রভৃতি প্রথাকে লম্ব্রোসোর মত হইতে উদ্ভূত বলা চলে। ১৮৭৫ সনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ব্রক্ওএ 'সংশোধনাগার' আন্দোলনের পত্তন করেন। ১৯১২ সনে নিউইয়র্ক হইতে তাঁহার রচিত 'কারারক্ষীর পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা' (ফিফ্‌টি ইয়ারস্‌ অব্‌ প্রিজন্‌ সার্ভিস্‌) প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে ব্রক্ওএ স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের প্রেরণা অন্ততঃ আংশিকভাবে তিনি লম্ব্রোসোর মতামত হইতেই পাইয়াছিলেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত সংশোধনাগারের দেখাদেখি ইংল্যাণ্ডেও ১৯০২-০৮ সনে বোর্‌ষ্টাল্‌ প্রথার পত্তন হয়। ইহার জন্মের ইতিহাসও কাজেই কতক পরিমাণে লম্ব্রোসোর মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট।

লম্ব্রোসো অপরাধ-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপেই দেহতথ্য ও জীবতথ্য-সঞ্জাত বলিয়াছেন এমন মনে করিলে কিন্তু ভুল হইবে। মানুষের প্রবৃত্তি-গঠনে মনস্তত্ত্ব এবং সামাজিক পরিবেষ্টনেরও যে হাত আছে একথা তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণে মানসিক প্রবৃত্তি গঠনে জীবতত্ত্বের প্রভাবের উপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে ঠিকই; হয়ত উচিতের বেশি জোরই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবু

চিত্তবৃত্তি-গঠনে অন্যান্য শক্তির, যথা পরিবেষ্টনের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহাকে অজ্ঞ বা অন্ধ বলিতে আমরা পারি না।

লম্ব্রোসোর যাঁহারা সমসাময়িক শিষ্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও এই চেতনা চক্ষে পড়ে। ফেরি ও আরো অনেক বিশ্লেষক সমাজ-পরিবেষ্টনের প্রভাবকে স্পষ্টই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ হিসাবে ফেরি লম্ব্রোসোর কতকটা বিরোধী-সমালোচক; লম্ব্রোসোর মতবাদকে তিনি তাঁহার অ-জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়া পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছেন। লম্ব্রোসো ছিলেন ছাঁকা কথায় ও মাপা ওজনে কথা বলার পক্ষপাতী, তাঁহার মতামত পরিষ্কার কাটাকাটা কথায় বলা। ফেরি বলিলেন, মানুষের প্রবৃত্তি ও তাহার বহিঃপ্রকাশ অনির্দিষ্ট ও অনির্দ্দেশ্য। আর্য্যা ও অঙ্ক কষিয়া তাহার ঠিক হিসাব বাহির করা সম্ভব নয়। কাজেই ফেরির বইখানা কতক পরিমাণে লম্ব্রোসোর বাঁধা-হিসাব প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। ফরাসী পণ্ডিত তার্দ্ এবং ওলন্দাজ পণ্ডিত বঙ্গার্'এর মতো ফেরিকেও অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতা বলা যায়।

লম্ব্রোসো যে 'জন্ম-অপরাধী'র ধারণা করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিকরা তাহা খুব সহজে মানিয়া নেন নাই। ১৮৮৫ সনে প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক অপরাধ-নৃতত্ত্ব কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়; সেখানে লম্ব্রোসোর মতবাদ লইয়া বিরাট্ তর্কাতর্কির সৃষ্টি হয়। ১৮৯২ সনে ব্রুসেল্সে এই কংগ্রেসের আর একটি অধিবেশন হয়; এখানেও সেই তর্কাতর্কি, মতবিরোধ চলে। সে যুগে লম্ব্রোসোর ভক্তদের মধ্যে নাম করা যায় প্রধানতঃ ইংরেজ যৌনতাত্ত্বিক হ্যাভলক্ এলিস্ ও জার্ম্মাণ পণ্ডিত ব্লয়্লার্এর। ১৮৯০ সনে এলিসের বই 'অপরাধী' (দি ক্রিমিন্যাল্) বাহির হয়। ১৮৯৬ সনে বাহির হয় ব্লয়্লার'এর বই 'জন্ম-অপরাধী' (ড্যার্ গেবোরেনে ফ্যার্ব্রেখার)। লম্ব্রোসোর বিরোধী

মতাবলম্বীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফরাসী দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক তার্দ্‌, জার্ম্মাণ সমাজতাত্ত্বিক ফ্রান্‌ৎস্‌ ফোন্‌ লিস্‌ট্‌ এবং জার্ম্মাণ নৃতাত্ত্বিক আডোল্‌ফ্‌ রেয়্‌র্‌।

১৮৮৯ সনে লিস্‌ট্‌'এর বই 'অপরাধ-আইন সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী' (স্‌ট্রাফ্‌রেখ্‌টলিখে আউফ্‌সেট্‌সে উণ্ড্‌ ফোর্‌ট্রেগে) বাহির হয়। রেয়্‌র্‌'এর বই বাহির হয় ১৮৯৩ সনে; ইহার নাম ছিল 'নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে অপরাধীর স্বরূপ' (ড্যর্‌ ফ্যর্‌ব্রেখার ইন্‌ আন্‌থ্রোপোলোগিশার্‌ বেৎসীহুং)।

পৃথিবীতে যে সংস্কার-প্রচেষ্টার পত্তন হইয়াছিল অপরাধের বিশ্লেষণ ও মূলকারণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের এই মতবিরোধ কিন্তু তাহার পথে বাধা জন্মায় নাই। সংস্কার-আন্দোলন বেশ জোর হইয়াই চলিতেছিল

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র 'অনির্দ্দিষ্ট সাজা'র প্রচলন বাড়িতে লাগিল। নিউ ইয়র্কের এল্‌মায়্‌রাতে প্রাদেশিক সংশোধনাগারে ১৮৭৭ সনে ইহার প্রবর্ত্তন করা হয়। ইংল্যণ্ডের জেলখানাগুলিতে ১৮৮১ সনে কয়েদিদের মধ্যে 'সেরা' (ষ্টার্‌) শ্রেণীর সৃষ্টি করা হইল। 'সেরা' শ্রেণীর অর্থ কয়েদিদের মধ্যে যাহারা আচরণে-ব্যবহারে নিয়ম-নিষ্ঠায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহারা একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইবে। ষ্টার্‌ কয়েদিরা খাওয়া-পরা ব্যবহার কর্ম্মভার ও সাজা-রেহাইয়ের ব্যাপারে সাধারণ কয়েদি হইতে কিছু-কিছু বিশেষ সুবিধা পায়। এই সুবিধা এবং সেরা কয়েদি বলিয়া পরিগণিত হওয়ার সম্মান—কয়েদিদের মধ্যে সচ্চরিত্র থাকিবার একটা ঝোঁক জাগাইয়া তোলে।

ভারতে তৃতীয় জেল-কমিটি বসিল ১৮৭৭ সনে। ১৮৮৬ সনে দাগি আসামীদের অন্যান্য কয়েদি হইতে আলাদা করিয়া রাখার প্রথা

প্রবর্ত্তিত হইল। চতুর্থ জেল-কমিটির আলোচনা বসে ১৮৮৮-৮৯ সনে।

এদিকে সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে 'অনির্দ্দিষ্ট সাজা'র প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন চলিতে থাকে।

১৯০০ সন নাগাত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিশু-সংশোধনাগারের সংখ্যা বাড়িয়া ৮৮টা দাঁড়ায়।

১৮৮৬ সনে ফরাসী অপরাধ-শাস্ত্রী তার্দ্‌এর বই 'তুলনায় অপরাধ-বিশ্লেষণ' (ক্রিমিনালিতে কোঁপারে) বাহির হয়। ১৮৯০ সনে বাহির হইল তাঁহার 'দণ্ড-দর্শন' (লা ফিলোজোফী পেনাল্)। এই দুইখানি বইয়ে তিনি লম্ব্রোসো-দলের বস্তুনিষ্ঠ মতবাদের অনেকটা বিরোধিতা করেন। কিন্তু ক্লাসিক্ পণ্ডিতদের 'স্বাধীন চেষ্টা'র ধারণাটাও তিনি পরিত্যাগ করেন।

তার্দ্ অপরাধ-তত্ত্বে একটা নূতন জিনিসের সন্ধান দিলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, সংসারে সকল প্রকার পেশার মধ্যেই অপরাধের প্রবৃত্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সর্ব্ব-শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অপরাধ-প্রবৃত্তির সাড়া পাওয়া যায়। অপরাধ-প্রবৃত্তি থাকে বস্তুতঃ মানুষেরই মনে; ব্যক্তি-বিশেষ বা পেশা-বিশেষের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই।

সংস্কার-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইতালীয় পণ্ডিতদের প্রাণপণ অভিযান সত্ত্বেও সংস্কার-আন্দোলন বাঁচিয়া রহিল। যাঁহারা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাম করা যায় হ্যাভলক্ এলিস্ ও জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফার্গা'র। ১৮৯০ সনে প্রকাশিত হ্যাভলক্ এলিস-প্রণীত 'অপরাধী' (দি ক্রিমিন্যাল্)'এর নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। ১৮৯৬ সনে প্রকাশিত হইল ফার্গা'র বই 'দণ্ড-গোলামির উচ্ছেদ' (ডী আব্‌শাফ্‌ফুং ড্যর স্ট্রাফ্‌ক্নেশ্‌ট্‌শাফ্‌ট্)।

ইহার মধ্যে আবার রুশ পণ্ডিত মাকারেভিচ্ একটা প্রতিক্রিয়া-

শীল মতের পরিচয় দিলেন। ১৮৯৮ সনে ফরাসী ভাষায় লেখা তাঁহার বই 'শাস্তির বিবর্তন' (লেভোলুসিঅঁ দ্য লা পেইন্) বাহির হইল। এই বইয়ে মাকারেভিচ্ বলিলেন, দণ্ডের উদ্দেশ্যে শিক্ষা বা সংস্কার নয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য নিছক প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা।

অপরাধতত্ত্বে উদারনীতির জোয়ার
(১৯০১-১৮)

১৯০১ সনে মার্কিণ পণ্ডিত ব্যারোজ্'এর সম্পাদনায় 'ফ্রান্স জার্মাণি বেলজিয়াম্ ও জাপানের দণ্ডবিধি আইন' প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক দণ্ডবিধির আলোচনার ইতিহাসে এই বই-খানির স্থান অতি উচ্চে। ইতিহাস হিসাবে ইহার প্রামাণ্য ত ছিলই; আরো একটা কাজ এই বইখানা করিল। দণ্ডপ্রথার সংস্কার-সমস্যার দিকে বিশিষ্ট অপরাধতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিল। এদিকে আরেকখানা বইও খুব কাজ দিল। সেখানা হইতেছে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের গবেষণা লইয়া ফরাসী পণ্ডিত বিনে এবং সিমোর একত্রে লেখা। বইখানার নাম 'অস্বাভাবিক লোকদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ করিবার নূতন প্রণালী' (মেথোদ্ নুভেল্ পুর্ লে দিআনোস্তিক্ দু নিভো আঁতেলেকৃত্যিয়েল্ দেজ্ আনর্মো); ১৯০৫ সনে প্যারিসের 'লান্নে প সিকোলোজিক্' পত্রিকায় এই রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। আজকাল ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণ ও আচরণ-ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যেসকল 'বুদ্ধি-পরীক্ষা'র প্রণালীর প্রচলন আছে, তাহার প্রথম পত্তন হইয়াছিল এই বইখানির দ্বারা।

এই সময়কার চিন্তাধারা যে পথ বাহিয়া চলিতেছিল তাহার সন্ধান মেলে তখনকার প্রকাশিত কয়েকখানি বইয়ে। ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কয়েকখানার নাম এখানে করা যায়, যথা:—

(১) ওলন্দাজ সমাজতন্ত্রী লেখক বঙ্গার্'এর লেখা 'অপরাধ-প্রবণতা ও আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধ'। ১৯০৫ সনে বইটি প্রথম বাহির হয়। ১৯১৬ সনে বস্টন্ শহর হইতে 'ক্রিমিন্যালিটি অ্যাণ্ড ইকনমিক্ কন্‌ডিশ্বন্‌স্' নাম দিয়া ইহার প্রথম ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক হব্‌হাউস্'এর লেখা 'নৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ' (মর‍্যাল্‌স্ ইন্ এভল্যুশ্বন্)।

(৩) জার্ম্মাণ অপরাধতাত্ত্বিক আশাফফেন্‌বুর্গ'এর বই 'অপরাধ ও তাহার দমন' (ডাস্ ফ্যব্‌ব্রেখেন্ উণ্ড্ জাইনে বেকেম্প্‌ফুং)। ১৯০৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সনে বস্টন্ হইতে 'ক্রাইম্ অ্যাণ্ড ইটস্ রিপ্রেশ্বন্' নামে ইহার এক ইংরেজি সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

(৪) মার্কিণ সমাজতাত্ত্বিক পার্ম্মেলে'র বই 'নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র,—দণ্ডবিধির সহিত তাহার সম্পর্ক' (প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ অ্যান্থ্রপলজি অ্যাণ্ড্ সোশ্বিঅলজি ইন্ দেয়ার রিলেশ্বন্‌স্ টু ক্রিমিন্যাল প্রোসিডিওর্)। ১৯০৮ সনে প্রকাশিত হয়।

অপরাধতত্ত্বের চিন্তাধারার মধ্যে উদারনীতির প্রবর্ত্তক হিসাবে এই বইগুলি আজও আদর ও শ্রদ্ধা পাইতে পারে।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দুইটি উল্লেখযোগ্য আইনের সৃষ্টি হয়; কার্য্য-ক্ষেত্রে আইনের মধ্যে উদারনীতির প্রচলনের প্রমাণ হিসাবে এই দুইয়ের মূল্য প্রচুর। ইহাদের একটি হইল, ১৯০৮ সনে প্রণীত 'অপরাধ-নিবারক আইন'। এই আইন ১৬ হইতে ২১ বৎসর বয়স্ক অপরাধীদের জন্য বোর্‌ষ্টাল্ জেল্ (সংশোধনাগার) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিল। অন্য আইনটিও ঐ বৎসরই করা হয়, এটির নাম 'শিশু-সম্বন্ধীয় আইন'। শিশুদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের রক্ষক হিসাবে ইহাকে একটা মহামূল্য অনুশাসন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই আইনের গণ্ডী শুধু অপরাধ লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিল না; শিশুদের কারখানায় কাজ, স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি,

অভিভাবকত্ব প্রভৃতি ব্যাপারেও নানা খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এই আইনের অন্তর্গত ছিল।

১৯১০ সনে ওয়াশিংটন শহরে 'আন্তর্জ্জাতিক অনুতাপাগার কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 'অনির্দ্দিষ্ট সাজা'কে নীতিহিসাবে কার্য্যকর ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয়। এই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গোটা-একুশ প্রদেশে 'অনির্দ্দিষ্ট সাজা' প্রথার প্রচলন হইয়া গিয়াছিল।

ভারতে ১৯১১ সনে 'অপরাধ-প্রবণ জাতি সম্বন্ধীয় আইন' (ক্রিমিন্যাল্ ট্রাইব্স্ অ্যাক্ট) প্রণীত হয়। সমাজকে নিরাপদ করিবার জন্য অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তি বা দলগুলিকে সমাজদেহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখার প্রয়োজন। এই আইন তাহার ব্যবস্থা করিল। এই আইনের বলে ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে 'অপরাধপ্রবণ' বলিয়া ঘোষণা করা যায়। ঘোষণার ফলে তাহারা কতকগুলি বিশেষ বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকে। এই আইনের দ্বারা পেশাদার চোর-ডাকাতকে জব্দ রাখা চলে। ভবঘুরে বেদে সম্প্রদায়কে—যাহাদের জাতিগত পেশাই চুরি-ডাকাতি,—বিশেষ-বিশেষ সীমাবদ্ধ জায়গার বাসিন্দা করিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা ইহাতে আছে; সেখানে শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে "সংস্কৃত" ও স্বাবলম্বী করিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়। পাঞ্জাবের 'কল্যাণপুর উপনিবেশ' ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

ইংল্যাণ্ডে 'অভ্যাস-বশ অপরাধী' ও ঘাগিদের জন্য অনুরূপ সংশোধন-প্রচেষ্টার প্রথম পত্তন করা হয় ১৯১২ সনে, ওআইট দ্বীপের 'ক্যাম্প-হিল্'এ।

এই দুটি আইনের সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটি আইনের নাম স্বতই আসিয়া পড়ে, সেটি হইল ব্রিটেনে ১৯১৩ সনে প্রণীত 'মানসিক দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধীয় আইন' (মেণ্ট্যাল্ ডেফিশ্যেন্সি অ্যাক্ট্)। এই আইনের দ্বারা

একদিকে যেমন দুর্ব্বলচিত্ত লোকদের জন্য সুব্যবস্থা হইল, অন্যদিকে তেমনি অনেক লোক অযথা 'অপরাধী' বলিয়া চিহ্নিত হইবার দায় হইতে বাঁচিয়া গেল। এই আইন বলে, দুর্ব্বলচিত্ত লোক তাহার সকল কর্ম্মের জন্য দায়ী নয়, কারণ উত্তেজনার মুখে নিজেকে সংবরণ করিবার শক্তি তাহার নাই। পূর্ব্বে যাহারা উত্তেজনার বশে হঠাৎ আইন ভাঙ্গিয়া 'অপরাধী' বলিয়া চিহ্নিত হইয়া যাইত, তাহাদের অনেকে এই আইনের কল্যাণে 'দুর্ব্বলচিত্ত' বলিয়া অভিহিত হইল, অযৌক্তিক দণ্ড ও 'অপরাধী' নামের দুরপণেয় কলঙ্ক দু'টার হাত হইতেই ইহারা বাঁচিয়া গেল।

ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের আগে প্রকাশিত অপরাধতত্ত্বের গ্রন্থসমূহের মধ্যে যেগুলাকে বিভিন্ন মতামতের বিশেষ নমুনা বলিয়া ধরা যায় তাহাদের কয়েকখানির নাম দেওয়া যাইতেছে, যথা :—

(১) মার্কিণ পণ্ডিত পার্‌সন্'এর বই 'অপরাধের দায়িত্ব' (রেস্পন্সিবিলিটি অব্ ক্রাইম্)। ১৯০৯ সনে নিউইয়র্কে প্রকাশিত।

(২) ফরাসী পণ্ডিত স্যালেই'এর বই 'দণ্ডনীতিতে ব্যক্তিবিচার' (ইন্‌ডিভিজুয়ালিজ্যেশন্ অব্ পানিশ্‌মেণ্ট্)। ১৯১১ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

এই সময়কার উদারনীতিক বিশেষজ্ঞদের মতামতের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নস্থ দু'খানা বইয়ে (ইতিহাসের ধাচে এ দু'খানা লেখা) :—

(৩) স্পেনীয় লেখক দে কুইরস্'এর বই 'অপরাধতত্ত্বের আধুনিক মতাবলী'। মূল স্পেনিশ্ বই বাহির হইয়াছিল ১৮৯৮-১৯০৮ সনে। ১৯১২ সনে বষ্টন্ হইতে ইংরেজি অনুবাদ বাহির হয়; ইহার নাম "দি মডার্ণ থিওরিজ্ অব্ ক্রিমিন্যালিটি'।

(৪) ইংরেজ লেখক ওপেন্‌হাইমার'এর বই 'দণ্ডের যুক্তিবিচার (দি র‍্যাশনেল্ অব ক্রাইম্)। ১৯১৩ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

আর একখানা বইয়ের নাম না করিলে এই তালিকা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বইখানা—

(৫) ইংরেজ লেখক গোরিং'এর লেখা, নাম 'ইংরেজ কয়েদি' (ইংলিশ কন্‌ভিক্ট)। ১৯১৩ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

ফোন্ লিস্‌ট এবং রেয়র্‌'এর অনুকরণে এই শেষোক্ত বইখানা লম্ব্রোসোর 'জন্ম-অপরাধী' ধারণার বিরোধিতা করিয়াছে। এই বইয়ে লম্ব্রোসোর মত অতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে এই ধরণের আরো কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই বাহির হয়, যথা :—

(১) ট্রোড্‌গোল্ড'এর লেখা 'মানসিক দৌর্ব্বল্য' (মেণ্ট্যাল্ ডেফি-শেন্সি)। ১৯১৪ সনে নিউ-ইয়র্কে প্রকাশিত।

(২) মার্‌সিয়ার'এর লেখা 'অপরাধ ও উন্মাদ' (ক্রাইম্ অ্যাণ্ড ইন্‌স্যানিটি)। ১৯১৪ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

(৩) বোল্টন্'এর লেখা 'স্বাস্থ্য ও ব্যাধিতে মস্তিষ্কের অবস্থা' (ব্রেন্ ইন্ হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড ডিজীজ)। ১৯১৪ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

অপরাধীর মনস্তত্ত্ব ও মানসিক অবস্থা লইয়া আলোচনা ও গবেষণার পত্তন করিল এই বই ক'খানা। অপরাধীর মানসিক স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্যের সমস্যা লইয়া ভাবিবার বস্তু প্রচুর আছে; পৃথিবীর আইনজ্ঞ ও শাসনভারপ্রাপ্ত কর্ত্তারা এখন পর্য্যন্ত এই সমস্যার শেষ করিতে পারিয়াছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিজ্ঞদের মাথায় এই সব ঢুকিলে জগতের অপরাধীদের মঙ্গল হইত। এই সমস্যার দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া উপরের বই ক'খানা কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতা দাবি করিতে পারে।

কিন্তু এই সব বইয়ের কথাগুলা বিজ্ঞদের ঝুনা মগজে ঠিক ঢুকিতে

সময় লাগিবে। এ হিসাবে বরং অনেকখানি সহজপাচ্য একখানা বই লিখিলেন লুইস্। তাহার নাম 'অপরাধীকে পর্য্যবেক্ষণের প্রথা' (প্রোবেশন্ সিষ্টেম্)। এখানাও ১৯১৪ সনে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। আইনজ্ঞরা সহজে বুঝিতে ও হজম করিতে পারেন এমন তথ্য ও নীতির আলোচনা এই বইখানায় করা হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের মাঝখানে ভারতে একখানি বই বাহির হয়। বইখানার নাম 'অপরাধ-সংশোধনতত্ত্ব' (ক্রিমিনোকিউরোলজি)। লেখকের নাম টাক্কার্। ১৯১৬ সনে সিম্‌লা হইতে এখানা প্রকাশিত হয়। অপরাধী ও অপরাধ-প্রবণ জাতিদের সংশোধন করিতে মুক্তিফৌজ (স্যাল্‌ভেশ্যন্ আর্মি) যে প্রচেষ্টা চালাইতেছিল, এই বইয়ে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা ছিল। এ বিষয়ে তত্ত্বের দিক্ হইতে সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ আলোচনা করিলেন মার্কিণ লেখক ওআইন্‌স্। তাঁহার বইয়ের নাম 'দণ্ড ও সংশোধন' (পানিশমেণ্ট অ্যাণ্ড্ রিফর্ম্মেশ্যান্); ১৯১৮ সনে নিউ-ইয়র্কে বইখানা প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রতিক অপরাধতত্ত্ব

(১৯১৯-৩৬)

মহাযুদ্ধের পরে জগতে সমস্ত ব্যাপারেই একটা ঢালিয়া-সাজার হিড়িক পড়িল। অপরাধ ও শাস্তি-বিষয়ক মত এবং প্রতিষ্ঠানগুলিও এই হিড়িকের হাত এড়াইল না; সর্ব্বত্রই ইহার সংস্কার ও নবতর সংস্করণের জন্য একটা আলাপ-আলোচনার স্থরু হইল।

অপরাধতত্ত্বের ইতিহাসে এই সময়কার একটা প্রকাণ্ড ঘটনা ১৯১৯ সনে ভারতে জেল-কমিটির প্রতিষ্ঠা। ১৯২১ সনে এই কমিটি তাঁহাদের বিবরণী দাখিল করিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত

জগতের বিভিন্ন দেশে যে সকল উদারনৈতিক মতবাদ ও প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এই বিবরণী তাহার একটা খতিয়ান ভারতের সরকার ও জনসাধারণের চক্ষের সাম্‌নে ধরিয়া দিলেন। এই কমিটি যে উদার-নৈতিক প্রথা ও পদ্ধতির প্রবর্ত্তন অনুমোদন করিয়াছিলেন, সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ বস্তুতঃ কতখানি হইয়াছে সে বিষয়ে সম্প্রতি আলোচনা করিতেছি না। কিন্তু তবু একথাও স্বীকার করিতেই হইবে, কমিটি বিবরণী প্রস্তুত করিতে যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। অপরাধতত্ত্ব ও দণ্ডপ্রথায় যেটুকু উন্নতি ও প্রগতি আধুনিক জগতে হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভারতের সরকারি ও বেসরকারি মহলে জ্ঞান প্রচার করার দিক্ দিয়া দেখিলে এই বিবরণীর দাম খুব বেশী। সম্ভবতঃ এই জ্ঞান-প্রচারের ফলেই ইহার পরবর্ত্তী কালে ভারতে শিশু-বিষয়ক আইন করার দিকে নজর পড়ে। ১৯২১ সনে মাদ্রাজে 'শিশু-আইন' প্রণীত হয়। ১৯২২ সনে বাংলায়ও 'শিশু-আইন' প্রণীত হইয়া যায়। এই দুইটি আইনই মূলে ১৯০৮ সনের বৃটিশ শিশু-আইনের অনুরূপ।

১৯২৬ সনে বাঁকুড়াতে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক অপরাধীদের জন্য বোর্‌ষ্টাল্ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আলিপুরের শিশু-জেলেও সংশোধন-শিক্ষালয় স্থাপিত হয়। এই দুইটি নূতন বস্তুকেই জেল-কমিটির বিবরণীর পরোক্ষ ফল বলা চলে।

কারামুক্ত অপরাধী পুনরায় অসৎ পথে না যায়, সেইজন্য তাহাদের সাহায্য করার জন্য একপ্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ইহাকে বলা হয় 'দণ্ডোত্তর-যত্ন প্রতিষ্ঠান' (আফ্‌টার-কেয়ার ইন্‌ষ্টি-টিউশন্)। ১৯২৮ সনে বাংলায় শিশু ও কিশোর অপরাধীদের জন্য 'দণ্ডোত্তর-যত্ন' সমিতি স্থাপিত হয়। সংশোধন-ব্যবস্থায় প্রগতির চিহ্ন হিসাবে এই ঘটনাটির মূল্য অনেক।

এই সময়ে উদারনীতিক পণ্ডিতদের লেখা যেসমস্ত বই বাহির হইতেছিল তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

(১) মার্কিণ লেখক পার্মেলে'র বই 'অপরাধতত্ত্ব' (ক্রিমিনলজি)। ১৯২০ সনে নিউ-ইয়র্কে প্রকাশিত।

(২) মার্কিণ লেখক সাদার্ল্যাণ্ড্'এর বই 'অপরাধতত্ত্ব' (ক্রিমিনলজি)। ১৯২৪ সনে ফিলাডেল্‌ফিয়ায় প্রকাশিত।

উদার মতের যেসকল বইয়ে বিশেষ-বিশেষ বিষয়েরই শুধু আলোচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে পড়ে :—

(৩) ইংরেজ লেখক রাগ্‌ল্‌স্‌ব্রিজ'এর বই 'ইংল্যাণ্ডে ও অন্যত্র কারা-সংস্কার' (প্রিজন্ রিফর্ম্ অ্যাট্ হোম অ্যাণ্ড্ অ্যাব্রড্)। ১৯২৪ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

(৪) ইংরেজ লেখক বার্ট্'এর বই 'তরুণ অপরাধী' (দি ইয়ং ডেলিঙ্কোয়েণ্ট্)। ১৯২৫ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় হিসাবে প্রামাণ্য বই :—

(৫) ইংরেজ লেখক বেগ্‌বি'র লেখা 'দণ্ড ও ব্যক্তিত্ব' (পানিশ্‌মেণ্ট্ অ্যাণ্ড্ পার্সোন্যালিটি)। ১৯২৭ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত।

(৬) জার্মাণ পণ্ডিত শেফার্'এর বই '১৯০৯ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত প্রণীত জার্মাণির দণ্ডবিধিসমূহ' (ডয়্‌চে স্ট্রাফ্‌গেজেট্‌স্-এণ্ট্‌ভুর্ফে ফোন্ ১৯০৯ বিস্ ১৯২৭)। ১৯২৭ সনে লাইপ্‌ৎসিগ্ শহরে প্রকাশিত।

জার্মানিতে যে উদারনৈতিক চিন্তাধারা বহিতেছিল তাহার পরিচয় শেফার্'এর এই বইখানায় মেলে।

১৯২০ সনে বেল্‌জিয়ামে একটি নূতন আইন প্রণীত হয়। ইয়োরোপে কারা-সংস্কারে উদারনীতি প্রবর্ত্তনের ইতিহাসে এই আইনটির স্থান অসামান্য। এই আইনে ব্যবস্থা করা হইল, প্রতিটি কয়েদির সঙ্গে

ব্যবহারে তাহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক,—যেন তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও চরিত্র-গঠনের কোনোদিক্ দিয়া কোনো অন্তরায় না ঘটে। সকলের প্রতিই এক বাঁধা-ধরণের ব্যবহারের যে-রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তাহার মধ্যে কয়েদির ব্যক্তিত্বকে পিষিয়া মারিবার আয়োজন প্রচুরই ছিল। এই নূতন আইন তাহার অনেকখানিই দূর করিয়াছিল।

প্রুশিয়াতে ১৯২৯ সনে ও ইতালিতে ১৯৩১ সনে ইহার অনুরূপ আইন করা হয়।

ভারতে এবং ভারত সম্বন্ধে অপরাধতত্ত্বের আলোচনা আজকাল কিছু-কিছু বাহির হইতেছে। বিনয়কুমার সরকার-লিখিত 'হিন্দুদের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রতত্ত্ব' (পোলিটিক্যাল্ ইন্স্টিটুশ্যন্স্ অ্যাণ্ড্ থিওরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্) ১৯২২ সনে লাইপ্ৎসিগ্ হইতে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় অপরাধ ও দণ্ডনীতির সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেন। ১৯২৮ সনে মাদ্রাজ হইতে তাঁহার বই '১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী কালের রাষ্ট্রতত্ত্ব' (পলিটিক্যাল্ ফিলজফীজ্ সিন্স্ ১৯০৫) প্রকাশিত হয়। এই বইয়েও, আধুনিক অপরাধতত্ত্বের মতবাদ এবং রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ-নীতির উপরে তাহার প্রভাব লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময়ে সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের বৃত্তান্ত লইয়া যেসকল গবেষণা চলিতেছিল, তাহার মধ্যেও অপরাধতত্ত্বের মালমশলা কিছু-কিছু পাওয়া যায়। এইসকল গবেষণার ভিত্তি মুখ্যতঃ প্রাচীন সংস্কৃত, পালি ও ফারসি পুঁথিপত্র।

১৯২৪ সনে কলিকাতা হইতে এস্, এম্, এড্ওআর্ডস্'এর লেখা 'ভারতে অপরাধ' (ক্রাইম্ ইন্ ইণ্ডিয়া) নামে একখানা বই বাহির

হয়। এই বইয়ে সমসাময়িক দণ্ডনীতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩০ সনে শ্রীযুত আর্, দাশগুপ্তের বই 'প্রাচীন ভারতে অপরাধ ও দণ্ডনীতি' (ক্রাইম্ অ্যাণ্ড্ পানিশ্‌মেণ্ট্ ইন্ এন্‌শ্যেণ্ট্ ইণ্ডিয়া) বাহির হয়। বলা বাহুল্য এই বইয়ে হিন্দুজাতির অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে তথ্যের সন্ধান আছে। পূর্ব্বেকার গবেষকেরা হিন্দুরাষ্ট্রনীতি ও আইন সম্বন্ধে যে চিন্তাধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এই বইখানা তাহারই বিশিষ্ট নিদর্শন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যজগতে অপরাধতাত্ত্বিক মতবাদের দিক্ দিয়া যে প্রগতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার পরিচয় দিয়াছেন প্রশান্তকুমার সেন। দণ্ডের বিবর্ত্তন শাস্তি হইতে প্রতিষেধের পথে (ফ্রম্ পানিশমেণ্ট টু প্রিভেন্‌শান্) তাঁহার বইয়ের নাম। ১৯৩২ সনে লণ্ডনে এখানি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের আলোচনায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে।

'আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ' পরিষদে গবেষণার অন্যতম বিষয় অপরাধতত্ত্ব। গবেষকদের মধ্যে পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম এখানে করা দরকার।* তাঁহার বাংলায় লেখা সুবিস্তৃত প্রবন্ধ 'কয়েদ্‌খানার সমাজতত্ত্ব' ১৯৩৩ সনের মার্চ্চ ও এপ্রিল সংখ্যা 'আর্থিক উন্নতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পরে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁহার আরো কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, যথা:—

১। ১৯৩৪ সনে 'হিতবাদী' পত্রিকায় 'অপরাধতত্ত্ব' (হিতবাদী, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪১)

২। ১৯৩৪ সনে চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় 'সভ্য সমাজে শাস্তির স্থান' (পাঞ্চজন্য, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪১)

---

* বর্ত্তমান গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। ১৯৩৪ সনে 'বসুমতী' পত্রিকায় 'জাপানে অপরাধ-সমস্যা' (বসুমতী, ২৯শে জুলাই, ১৯৩৪)

৪। "আর্থিক উন্নতি" পত্রিকায় 'কারাগারের অর্থকথা' (১৯৩৪)

৫। ১৯৩৫ সনে 'ক্যাল্‌কাটা রিভিউ' পত্রিকায় 'আন্তর্জ্জাতিক আইনে জেলের খাটুনি সম্বন্ধে ব্যবস্থা' (প্রিজ্‌ন্‌ লেবার ইন্‌ ইণ্টার-ন্যাশনাল্‌ লেজিস্‌লেশুন্‌)।

সম্প্রতি বাংলার বাহিরে ভারতীয় গবেষকদের লেখা যেসকল বই বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে দু'খানার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য :—

(১) হাইকারওয়াল্‌'এর লেখা ভারতে 'অপরাধের অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক স্বরূপ' (ইকনমিক্‌ অ্যাণ্ড সোশ্যাল্‌ আস্‌পেক্টস্‌ অব্‌ ক্রাইম্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া)। ১৯৩৫ সনে প্রকাশিত।

(২) তারাপুর'এর লেখা 'ভারতে কারা-সংস্কার' (প্রিজন্‌ রিফর্ম্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া)। ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত।

১৯৩১ সনে 'মার্কিন রাষ্ট্রনীতিক ও সমাজ-নীতিক পরিষদের বিবরণী' (আনাল্‌স্‌ অব্‌ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স) পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির হয়। সম্প্রতি পৃথিবীতে কারা-সংস্কার প্রচেষ্টার যে প্রগতি হইয়াছে এই সংখ্যাটিকে শুধু তাহারই আলোচনা ও বিবরণ দিয়া ভরা হইয়াছিল। এই বিশেষ সংখ্যাটির নাম করা হয় 'আগামী-কালের জেলখানা' (প্রিজন্‌স্‌ অব্‌ টু-মরো)। ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন মার্কিণ অপরাধতাত্ত্বিক সাদার্‌ল্যাণ্ড এবং সেলিন একত্র হইয়া।

জার্ম্মাণিতে বস্তুনিষ্ঠ মতবাদের আসন এখন সুপ্রতিষ্ঠ। ১৯২৭ সনে অষ্ট্রিয়ার গ্রাৎস্‌ শহরের অধিবাসী পণ্ডিত আডোল্‌ফ্‌ লেন্‌ৎস্‌ ও মিউনিক'এর পণ্ডিত টেওডোর ফিয়ান্‌ষ্টাইন্‌ দু'জনে মিলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'অপরাধ-জীবতত্ত্ব

পরিষৎ (ক্রিমিনাল্‌বিয়োলোগিশে গেজেল্‌শাফ্‌ট্‌)। 'জন্ম-অপরাধী' সত্যই হয় কিনা, এই প্রশ্নটাকে নূতন করিয়া বিশ্লেষণ করা হইতেছে। লম্ব্রোসো যেটুকু মালমশলাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার মত খাড়া করিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত প্রমাণের উপর এই নূতন গবেষণার ভিত্তি করা হইয়াছে। লম্ব্রোসো খুব বেশী জোর দিতেন 'রূপতত্ত্ব' বা 'আকৃতিতত্ত্ব'র উপরে। জার্মাণ্‌ অপরাধ-জীবতাত্ত্বিকেরা তাঁহাদের গবেষণার কেন্দ্র করিয়াছেন মানসিক বিকৃতি ও প্রবৃত্তিকে। ১৯৩২ সনে ক্রোন্‌ফেল্‌ড্‌'এর বই 'চরিত্র-তত্ত্ব' (লেয়্‌র্‌বুখ্‌ ড্যার্‌ কারাক্‌টারকুণ্ডে) বাহির হয়। এই বই ও অনুরূপ কয়েকখানি বইয়ে চরিত্রতত্ত্বের আলোচনার আবির্ভাব হইয়াছে। গবেষণার দিক্‌ দিয়া ইহা একটি নূতন বস্তু।

অপরাধীর মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে বির্ন্‌বাউম্‌'এর গবেষণা বৈজ্ঞানিক মহলে বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯২৯ ও ১৯৩১ সনে এই গবেষণার তথ্য প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সনে ক্রেট্‌স্‌মেয়র্‌'এর বই 'শরীরের গড়ন ও চরিত্রতত্ত্ব' (ক্যের্পার্‌বাও উণ্ড কারাক্‌টার্‌) প্রকাশিত হয়। এই বই দৈহিক সংস্থান ও চিত্তবৃত্তির মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া গবেষণার গোড়াপত্তন করিয়া দিয়াছে।

১৯২৯ সনে প্রকাশিত হয় ইয়েনশ্‌'এর বই 'চর্ম্মবিন্দুর অনুবীক্ষণ' (ডী হাউট্‌কাপিলার-মিক্রোস্কোপী)। এই বই বৈজ্ঞানিকদের নূতন চিন্তার খোরাক যোগাইয়াছে; এখন অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করিতেছেন যে, মানুষের দেহচর্ম্মের গঠন ও চর্ম্মস্থিত সূক্ষ্মছিদ্র-সংস্থান দেখিয়া সেই মানুষের মধ্যেকার হীন-প্রবৃত্তি ও অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির সত্যই সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৩৩ সনে বার্লিন হইতে ফোন্‌ রোডেন্‌'এর বই 'অপরাধ-

জীবতত্ত্বের গবেষণা-প্রণালী' (আইন্‌ফ্যিরুং ইন্ ডী ক্রিমিনাল্-বিয়োলোগিশে মেটোডেন্‌লেরে) বাহির হয়। মানুষ ও তাহার ব্যক্তিত্বকে বুঝিবার জন্য যেসকল বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ-প্রণালীর আজকাল ব্যবহার হইতেছে, এই বইয়ে লেখক তাহার একটা খতিয়ান দিয়াছেন। এই অপরাধ-জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা যে গবেষণা চালাইতেছেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ঠিক কোন্ কোন্ রকমের মানুষকে (পুরুষ ও নারী) শিক্ষা ও চিকিৎসার বলে উন্নয়ন বা সংশোধন করা সম্ভব তাহা স্থির করিবার একটা মাপকাঠি বাহির করা। জার্ম্মাণিতে এই আলোচনার দিকে যে এতখানি দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহার মূলে আছে ১৯২১ সনে ব্যাভেরিয়ায় প্রবর্ত্তিত একটি নূতন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হইল, কয়েদিদের মধ্যে উন্নতি ও প্রগতির দৌড় অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করা।

জার্ম্মাণির বর্ত্তমান শাসন নাৎসী দলের হাতে। ইঁহারা অপরাধ-তত্ত্বের যে ধারণা মানেন তাহার মধ্যে জীবতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। হয়ত জীবতত্ত্বের উপরে ইঁহাদের এই ঝোঁক সমীচীনতার মাত্রাও ছাড়াইয়া যাইতেছে। ১৯৩৪ সনে স্টুট্‌গার্ট্ হইতে মেৎস্‌গার্‌এর বই 'অপরাধতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দণ্ডনীতি' (ক্রিমিনাল্‌পোলিটিক্ আউফ্ ক্রিমিনোলোগিশার্ গ্রুণ্ড্‌লাগে) বাহির হয়। এই বইয়ে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন :—"অপরাধের কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পারিপার্শ্বিক বা সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাবকেই মুখ্য বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার ব্যাখ্যা বা সেই ব্যাখ্যার ফলে যে দণ্ডনীতি ও শাসন-পদ্ধতির উদ্ভব হওয়া সম্ভব, তাহাকে নাৎসী সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রের তরফ হইতে আমরা কখনোই মানিয়া নিব না।"

সাওয়ার্'এর মতও কতকটা ইহারই অনুরূপ। তাঁহার মতে

অপরাধের দায়িত্ব মূলতঃ ব্যক্তিগত। 'অপরাধের কারণ হিসাবে বংশানুক্রম ও পরিবেষ্টনের স্থান' (আন্‌লাগে উণ্ড্‌ উম্‌ভেণ্ট্‌ আল্‌জ্‌ ফ্যর্‌ব্রেখেন্‌স্‌ উর্‌জাখেন্‌) প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"অপরাধের প্রকৃত কারণ খুঁজিতে হইবে অপরাধীর নিজেরই মধ্যে ; তাহার নিজস্ব চিন্তা-প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে।"

১৯৩৫ সনের আগষ্ট মাসে বার্লিন হইতে প্রকাশিত জার্ম্মাণ আইনকানুন-পরিষৎ পত্রিকায় (ৎশাইট্‌শ্‌রিফ্‌ট্‌ ড্যর্‌ আকাডেমী ফ্যির্‌ ডয়্‌চেস্‌ রেখ্‌ট্‌) এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৩৫ সনে বার্লিনে আন্তর্জ্জাতিক লোকবিদ্যা-কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে জার্ম্মাণ পণ্ডিত রিস্‌টভ্‌ লোকনীতি ও অপরাধজীবতত্ত্ব (বেফ্যেল্‌কারুংসপোলিটিক্‌ উণ্ড্‌ কুমিনাল্‌-বিয়োলোগী) নামে এক প্রবন্ধ উপস্থিত করেন। নাৎসীরা ১৯৩৩-৩৪ সনে জার্ম্মাণিতে যে রক্তগত জাতি-সংক্রান্ত আইন করিয়াছেন এই প্রবন্ধে রিস্‌টভ্‌ তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আইনটির নাম 'গেজেট্‌স্‌ ৎসুর্‌ ফ্যর্‌হিটুং অ্যার্‌ব্‌ক্রাঙ্কেন্‌ নাখ্‌ভুখ্‌সেজ্‌'। ইহার কথা,—ভবিষ্যৎ জাতির মধ্যে বংশানুক্রমিক ব্যাধির বিস্তার নিবারণ করিতে হইবে। অপরাধ ব্যাধিগ্রস্ত দেহ ও মনের পরিচায়ক। ব্যাধিগ্রস্ত বংশগুলিকে বাড়িতে না দিলে ক্রমে জাতির মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও সেই অনুপাতে কমিয়া যাইবে ; অপরাধ-প্রবৃত্তি ও অপরাধ-প্রবণতাও কাজেই কমিয়া আসিবে। বংশানুক্রমের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ইহা রিস্‌টভ্‌ বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসের ভিত্তি, ১৯৩১ সনে জীবতত্ত্ব-পরিষৎ পত্রিকায় (মিটটাইলুঙ্গেন্‌ ড্যর্‌ কুমিনাল্‌বিয়োলোগিশেন্‌ গেজেল্‌শাফ্‌ট) প্রকাশিত রিয়্যডিন্‌'এর গবেষণাবলী।

জাতির বংশ-বিস্তার চলিবেই ; সমাজদেহের এই বিস্তারকে

নির্দ্দোষ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য যদি ইহার মধ্যেকার দুষ্ট অংশ-গুলিকে কাটিয়া পোড়াইয়া বাদ দিতে হয়, রিষ্টভের মতে সেটাই বর্ত্তমান জগতে ন্যায়সঙ্গত।

প্রচলিত সুজনন-পদ্ধতি, এবং সুজনন-নীতির অঙ্গ হিসাবে আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রজনন-ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়ার যে প্রথার চলন হইতেছে তাহা স্বতই এই জাতি-উন্নয়ন নীতির অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

অপরাধ-বৃত্তির মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া জার্ম্মাণ অপরাধ-জীবতাত্ত্বিকরা কিন্তু শুধু জীবতত্ত্বগত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না। বাস্তব ও শারীর কারণের বাহিরেও অপরাধ-প্রবৃত্তির অন্য উৎস থাকিতে পারে, একথা তাঁহারা স্বীকার করেন। এবং করেন বলিয়াই ইহাদিগকে লম্ব্রোসোর অন্ধ অনুগামী বলা চলে না; বলিতে হয় 'নবীনীকৃত' লাম্ব্রোসোপন্থী,—লাম্ব্রোসোর নবভাষ্যকার বা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যার নবভাষ্য-কার।

ইতালিতে কিন্তু বর্ত্তমানে অপরাধতত্ত্বের যে ধারা চলিতেছে তাহাকে লম্ব্রোসোর নবীনীকৃত ভাষ্য না বলিয়া লম্ব্রোসোর অনুকরণই বলা উচিত। এই গবেষণায় মানসিক বৃত্তি ও সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাব অংশতঃ স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু মূলে ইহার মধ্যে জীবতাত্ত্বিক কারণ-নির্দ্দেশের প্রতিই ঝোঁকটা খুব বেশী করিয়া চক্ষে পড়ে।

এইবার সাম্প্রতিক ইতালির বিশেষজ্ঞদের গবেষণাসমূহ একটু দেখা যাক্।

১৯২৭ সনে মেসিনা হইতে ইতালীয় পণ্ডিত পেন্দে'র বই 'রোগতত্ত্ব ও ঔষধবিজ্ঞান' (ত্রাত্তাত সিস্তেতিক দি পাতলজিয়া এ ক্লিনিকা মেদিকা) প্রকাশিত হয়। লম্ব্রোসোর প্রবর্ত্তিত 'জন্ম-অপরাধী'র ধারণা বর্ত্তমান যুগে যে রূপ নিয়াছে তাহার পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যায়।

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, জন্ম-অপরাধীর কতকগুলি বাস্তব শারীর ও মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকে যাহার ফলে সে অপরাধ-প্রবণ। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে থাকে একদিকে তাহার বংশানুক্রম ও জন্মগত সংস্থান, আর একদিকে থাকে তাহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন। এই আবেষ্টনের সংস্পর্শ ও সংঘাতে জন্মগত ও বংশানুক্রমিক সংস্থান পরিবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ-বিশেষ চরিত্রের সৃষ্টি করে। এইরূপে যে বিচিত্র-চরিত্র অপরাধ-প্রবণ লোকের উৎপত্তি হইল তাহাকে বলা যায় সাংস্থানিক কারণ-জাত অপরাধী।

এই ধরণের অপরাধী 'হঠাৎ-অপরাধী' হইতে পৃথক শ্রেণীতে পড়ে। 'হঠাৎ-অপরাধী' অপরাধ করিয়া বসে আকস্মিক উত্তেজনার বশে, অপরাধ-প্রবৃত্তি তাহার মজ্জাগত নয়। সাংস্থানিক-অপরাধীর অপরাধ-প্রবৃত্তি তাহার দেহ-সংস্থানেই মিশিয়া আছে। কেহ-কেহ ইহাদের নাম দিয়াছেন 'যথার্থ অপরাধী' বা 'স্বভাব অপরাধী'। ইদানীন্তন ইতালির প্রধান অপরাধতাত্ত্বিকেরা এই 'স্বভাব-অপরাধী'র বিশ্লেষণ লইয়া খুব মাথা ঘামাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অগ্রণী হইলেন অত্তোলেংঘি। মতামতের ব্যাপারে তিনি পুরাদস্তুর লম্ব্রোসোর শিষ্য।

১৯৩২ সনে রোম হইতে অত্তোলেংঘির বই 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে গঠিত পুলিস-বাহিনী' (ত্রাত্তাত দি পলিৎসিয়া শিয়েন্তিফিকা) বাহির হয়। এই বইয়ে তিনি সাংস্থানিক অপরাধীকে মানব-সমাজের বহির্ভূত ও সাধারণ মানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বতন্ত্র জীব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই ধরণের অপরাধীর সৃষ্টি হয় সমাজে ও জীব-প্রজননে অপপ্রযুক্ত নির্ব্বাচনের ফলে। পৃথিবীতে প্রজননের স্বাভাবিক গতি সুনির্ব্বাচনের পথে চলে। যথাসাধ্য সুনির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের সাহায্যে যে প্রজনন হয় তাহার ধারা স্বভাবতই বংশের ও জাতির ক্রমিক উৎকর্ষের দিকে। এই সুনির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে

যেখানে অপনির্ব্বাচন ঘটে, সেখানে কাজেই সন্তানের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অধোগামী হয়। অপরাধী এই অপসৃষ্টির ফল।

এই একই মত পোষণ করেন দি তুল্লিঅ। ১৯৩১ সনে রোমে তাঁহার বই 'অপরাধের নৃতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব (মানুয়ালে দি আন্ত্রপলজিয়া এ প্সিকলজিয়া ক্রিমিনালে) বাহির হয়। এই বইয়ে তিনি বলিয়াছেন, সকল সাংস্থানিকঅপরাধীরই স্বরূপ মূলে এক। দূষিত বিকল অপগামী জন্মানুক্রম তাহার প্রকৃতি ও চরিত্রকে অপরাধ-কলুষিত করিয়া তোলে। মানুষের চরিত্রগত অপরাধ-প্রবণতার মূলে থাকে রুগ্ন বিকল জন্মানুক্রম হইতে সঞ্জাত অস্বাভাবিকতা, দৌর্ব্বল্য ও অসামঞ্জস্য—এই দৌর্ব্বল্য ও বৈকল্য তাহার আকৃতি, শারীর-গঠন, মানসিক বৃত্তি, সকল ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যেই যে সহজাত অধোগামী প্রবৃত্তি থাকে তাহাই সেই মানুষকে অপরাধের পঙ্কে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়।

দি তুল্লিঅ বলেন যে, যেসকল কারণ হইতে বংশানুক্রমে এই অধোগতির উৎপত্তি, তাহাকে সুপ্রজনক বিবাহ ও মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রক্রিয়া দ্বারা অনেকাংশে বাধা দেওয়া ও দূর করা সম্ভব। অপরাধ-তত্ত্বের কাজ শুধু অপরাধ ও অপরাধীর নির্ব্বিকার ও নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ করাই নয়; অপরাধ-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ কি উপায়ে করা সম্ভব সে নির্দ্দেশ দেওয়াও তাহার কাজের অঙ্গ। অতএব অপরাধতত্ত্ব ও অপরাধ-তাত্ত্বিকের কর্ত্তব্য হইল, প্রথমতঃ অপরাধীর প্রকৃতিগত দৌর্ব্বল্য ও অসামঞ্জস্য দূর করিবার উপায় নির্দ্দেশ করা; এবং দ্বিতীয়তঃ মানুষকে তাহার যোগ্য পারিপার্শ্বিকের সন্ধান বলিয়া দেওয়া; যেন সেই নির্দ্দেশ অনুসারে সে তাহার পক্ষে স্বাস্থ্য ও শুভ-দায়ক পরিবেষ্টন বাছিয়া লইতে পারে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, লম্বোসো নিজে যতখানি নৈরাশ্যবাদী

ছিলেন, আধুনিক ইতালিতে লম্ব্রোসোর শিষ্য বা নবীকৃত-ভাষ্যকার যাঁহারা আছেন তাঁহারা ততটা নৈরাশ্যবাদী নন। ইহারা অপরাধীর সংশোধন ও অপরাধ-প্রবৃত্তির উচ্ছেদকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন না। ১৯৩১ সনে প্রণীত ফাশিস্ত্ দণ্ডবিধি আইনের মধ্যে অনেকখানি উদার-নীতির আমদানি করা হইয়াছে। ইহার প্রেরণা অনেক অংশেই যোগাইযাছেন নব্য ইতালির এই সাংস্থানিক-অপরাধ তত্ত্বের পণ্ডিতেরা।

১৯৩১ সনের ফাশিস্ত্ দণ্ডবিধি আইনে যেসকল নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম প্রথা, অপরাধীদের মধ্যে প্রকৃতি-অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ করা। হঠাৎ-অপরাধী এবং অন্য তিন শ্রেণীর বিশেষ-ধরণের অপরাধীর মধ্যে অতি স্পষ্ট করিয়া বিভেদ রেখা টানা হইয়াছে। বিশেষ শ্রেণী তিনটা হইল, অভ্যাস-বশ অপরাধী, পেশাদার অপরাধী ও সাংস্থানিক অপরাধী। এই শেষোক্ত তিন বিশেষ শ্রেণীর অপরাধীরাই আসলে লম্ব্রোসো-বর্ণিত 'জন্ম-অপরাধী' বা পেন্দে-অর্ত্তোলেংখি-দি তুল্লিঅ'র বর্ণিত 'স্বভাব-অপরাধী।' এই তিন শ্রেণীর অপরাধীকে (অভ্যাস-বশ অপরাধী, পেশাদার অপরাধী ও সাংস্থানিক অপরাধী) নূতন আইনে 'সমাজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক' বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এবং এই জন্যই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে সাজা খাটিয়া বাহির হইবার পরেও, সমাজের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় হিসাবে ইহাদিগকে বিধিনিষেধ ও নজরবন্দির মধ্যে থাকিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে অন্তরীণ বা বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (পূর্ব্ব হইতে অপরাধ-নিবারণের উদ্দেশ্যে লোককে নজরবন্দী রাখা বা অন্তরীণ রাখার অনুরূপ প্রথা যে ভারতে আছে তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।)

এই সম্পর্কে আর একখানা বইয়ের নাম আসিয়া পড়ে। বইখানা ১৯৩৫ সনে ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশিত ; মার্কিণ পণ্ডিত কার্প্‌ম্যান্'-

এর লেখা। নাম 'ব্যক্তি হিসাবে অপরাধী' (দি ইণ্ডিভিজুয়্যাল্ ক্রিমিন্যাল্)। এই বইয়ে লেখক, অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি সম্বন্ধে মানসিক প্রবৃত্তির প্রভাবের উপর খুব জোর দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়, "সমাজ বা সমষ্টিগত পরিবেষ্টনের প্রভাব অপরাধীর উপরে থাকে একথাটা সত্য : কিন্তু শুধু এইটুকুই তাহার প্রকৃতি-বিশ্লেষণের সবখানি কথা নয়। যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে আছে শুধু তাহার প্রভাব ছাড়াও তাহার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই খানিকটা গঠিত ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, সাংস্থানিক কারণে। এই দিক্ হইতেও তাহার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে শুধু সমাজ-পরিবেষ্টনের দোহাই দিয়া তাহার যে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আমরা পাই তাহা বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীনই রহিয়া যাইবে, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।"

এই বইয়ে আধুনিক মার্কিণ চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ওদিকে আবার অতি-সম্প্রতি যে বইখানা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতি-নির্দ্ধারণে সামাজিক পরিবেষ্টনের প্রভাবকেই খুব বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই বইখানার নাম 'তরুণ অপরাধীর প্রকৃতি গঠনে সমাজের প্রভাব' (সোশ্যাল্ ডিটার-মিন্যাণ্ট্স্ ইন্ জুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সি)। ইহার লেখক সালেজার্। ১৯৩৬ সনে নিউইয়র্ক হইতে বইখানা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ সনে বার্লিনে আন্তর্জ্জাতিক লোকবিজ্ঞান-কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মার্কিণ পণ্ডিত লাফ্‌লিন এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির নাম-'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সুজনন-উদ্দেশ্যে বন্ধ্যীকরণ প্রথা (ইউজেনিক্যাল্ স্‌টেরিলিজেশ্যন্ ইন্ দি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্)। এই প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের আইনজ্ঞ ও আইন-কর্ত্তাদের মনে জীবতত্ত্ব ও জীবজনন সম্বন্ধে আধুনিক

মতামতের একটা খুব বড় প্রভাব ইহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে সুজননের ব্যবস্থা সমাজে করিতে হইলে বিশেষ-ধরণের কতগুলি অধোগামী ও অসুস্থ বংশের প্রজনন বন্ধ করিতেই হইবে। আধুনিক জগতে এই উদ্দেশ্যে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে তাহা হইল বিশেষ-বিশেষ রোগাক্রান্ত বা অবাঞ্ছিত-বংশ ব্যক্তির বন্ধ্যীকরণ, অর্থাৎ অস্ত্রোপচার দ্বারা তাহাকে প্রজনন-শক্তি রহিত করিয়া দেওয়া।

বন্ধ্যীকরণ-আন্দোলনের প্রথম পত্তন হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে, ১৯০৭ সনে প্রণীত একটি আইনের দ্বারা। ইহার পর ক্রমে এই আন্দোলন ও প্রথা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ২১,৫৩৯ জন লোককে অস্ত্রোপচার করিয়া প্রজনন-শক্তি রহিত করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে যেসকল লোককে প্রজননাক্ষম করিয়া দেওয়া চলে তাহার মধ্যে পড়ে দুর্ব্বলচিত্ত, পাগল, মৃগীরোগী, জড়বুদ্ধি, অভ্যাস-বশ ও সাংস্থানিক অপরাধী, যৌন-অপচারী, দুর্নীতি-আসক্ত ইত্যাদি—এক কথায় যেসকল ব্যক্তির দেহ-সংস্থানগত রোগ বা দুর্ব্বলতা বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়, তাহারা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৪৮টি প্রদেশ, ইহার মধ্যে ৩১টি প্রদেশে, আইন করিয়া বন্ধ্যীকরণ অস্ত্রোপচারকে বিধিসঙ্গত করা হইয়াছে। এইসকল আইনের মূলনীতি এক; বংশ ও জাতির পুরুষানুক্রমিক অবনতি ও অধোগতির গোড়ায় যেসকল কারণ থাকে, তাহার মধ্যে প্রধান হইল বংশানুক্রম—বংশানুক্রমে প্রাপ্ত অসুস্থ দেহ ও মানসিক প্রবৃত্তি। বিশেষ কতকগুলি দৌর্ব্বল্য, ব্যাধি ও প্রবৃত্তি বংশানুক্রমে টিকিয়া থাকে, এমন কি বাড়িয়া চলে—ইহাই বৈজ্ঞানিকদের

মত। অতএব সেই অসুস্থতা, ব্যাধি ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের বৃদ্ধি ও প্রচার হইতে ভবিষ্যৎ পুরুষকে রক্ষা করিবার সহজ ও সুষ্ঠু উপায় বিশেষ-বিশেষ দোষাক্রান্ত ও অসুস্থ ব্যক্তিকে বংশ সৃষ্টি করিতেই না দেওয়া। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে যে অসুস্থতা ও অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি বাসা বাঁধিয়াছে তাহা আর ইহাদের সন্তানসন্ততি-ক্রমে সমাজদেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; এবং এই উপায়ে ক্রমে সেই ব্যাধিটাকেই সমাজ হইতে উচ্ছিন্ন ও লুপ্ত করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে। সুজননের দিক্ হইতে যাহারা সমাজ-দেহের আবর্জ্জনা ও প্রগতির পথে বাধা, সেই দুষ্ট-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে উত্তর-পুরুষের পিতামাতা হইতে না দেওয়া—এই চেষ্টাই এই আইনগুলি করিতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, নাৎসী-শাসিত জার্ম্মাণিতে যে আইন করা হইয়াছে, মার্কিণ দেশের লোকেরা পূরা সিকি-শতাব্দী আগেই তাহার সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে।

জাতিবিচার, ধর্ম্মবিচার বা শাস্তি ও প্রতিহিংসার দিকে এই আইনের কোনো লক্ষ্য নাই। এইসব ষোলো-আনাই জীবতত্ত্বের বিশ্লেষণসমূহের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু অপরাধ-জীবতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে, অপরাধ-প্রবণতা অনেক পরিমাণে সাংস্থানিক দৌর্ব্বল্য ও বৈকল্য হইতে জন্মায়; এবং এই সাংস্থানিক দৌর্ব্বল্য ও অস্বাভাবিকত্ব অনেক সময়েই বংশানুক্রমিক হয়। অতএব সুজনন-উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত বন্ধ্যীকরণ-আইন স্বতই সমাজ-দেহ হইতে অপরাধ-প্রবৃত্তির উচ্ছেদ-সাধন-অভিযানের সহায়ক হইবে, এ আশা করা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়।

এই আশা মনে রাখিয়াই আধুনিক জগতের অপরাধ-শাস্ত্রীরা বন্ধ্যীকরণ-আইনের প্রবর্ত্তনকে সাদরে ও সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়াছেন।

(গ) দেশী-বিদেশী সমাজ-চিন্তার ইতিহাস

কৌটিল্যের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এইচ্ ডি,
সম্পাদক, "ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি",
পরিচালক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

কৌটিল্যের আদর্শ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

সাধারণত কোনও গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে গ্রন্থকারের জীবনধারার প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রও এই নিয়মের অধীন এইরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ক্রোধনস্বভাব কৌটিল্য প্রতিহিংসার প্রেরণায় নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন এবং কূট চাতুরী ও নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগে মৌর্য রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটাইয়াছিলেন। অতএব আমরা আশঙ্কা করি যে, তাঁহার গ্রন্থে ক্রূর ও হিংস্র নীতির মহিমা ঘোষিত হইবে; ছলে বলে শত্রুনাশের উপায় নির্ধারণ করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার ক্ষমাহীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিবেন। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াই কাদম্বরীকার বাণভট্ট অর্থশাস্ত্রকে নৃশংস উপদেশপূর্ণ নিষ্ঠুর কৌটিল্যশাস্ত্র বলিয়াছেন।* বর্তমানকালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, কৌটিল্যের রাষ্ট্রবাদ কোনরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অসাধুতা, বিশ্বাসভঙ্গ ও অহেতুক আক্রমণই উহার

---

* পিটারসন-শোধিত কাদম্বরী, ১০৯ পৃঃ—অতিনৃশংসপ্রায়োপদেশপূর্ণং কৌটিল্য-শাস্ত্রম্।

মূলতত্ত্ব। ইহাদের মতে বলশালী রাজা পরাক্রমের দ্বারা দেশ জয় করিয়া উত্তরোত্তর রাজ্যবৃদ্ধি করিবেন ইহাই স্পষ্টত কৌটিল্যের উপদেশ।* কৌটিল্য শত্রুনিপাতের জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন এবং যুদ্ধজয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির উপদেশ দিয়াছেন—ইহা সত্য। রাজ্যের স্থায়িত্ব ও প্রজার সমৃদ্ধির জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা নিন্দিত হউক বা প্রশস্ত হউক, রাজনীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইবেই—ইহাতে বক্তব্য কি আছে? কিন্তু কেবল ঐ নিন্দিত ব্যবস্থাগুলি বিচার করিয়া গ্রন্থকারের আদর্শ নির্ধারণ করিতে গেলে তাঁহাকে ভুল বুঝা হইবে।

কৌটিলীয়ের মূলনীতি

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে সমগ্র অর্থশাস্ত্র কেবল প্রতিপক্ষ-দমনের কথায় পরিপূর্ণ নয়। গ্রন্থের যে অংশে যুদ্ধবিগ্রহের আলোচনা স্থান পাইয়াছে, তাহাতেও পরাপকার অপেক্ষা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্পষ্টতর, আক্রমণ অপেক্ষা আক্রমণ-প্রতিরোধের বিধান অধিক। গ্রন্থের মূলনীতি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়—প্রজাবর্গের সমষ্টিগত হিতই কৌটিল্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি আবশ্যকমত যুদ্ধ, কূট ব্যবহার, শত্রুবঞ্চনা প্রভৃতি দণ্ডমূলক নীতির আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনার ফলে দেখিতে পাইব—কৌটিল্য অকারণ লোকবিগর্হিত আচরণে পক্ষপাত করেন নাই। তাঁহার মতবাদে ছল, চাতুরী এবং অনুচিত বল-প্রয়োগের নীতি শিষ্টানুমোদিত রাষ্ট্রিক আদর্শের মাত্রা অতিক্রম করে নাই।

---

* ডক্টর বেণীপ্রসাদের "থিয়োরি অব্ গবর্মেণ্ট ইন্ এনশ্যেণ্ট ইণ্ডিয়া" ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

'বিজিগীষু' শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য

কৌটিলীয় নীতির তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই 'বিজিগীষু' শব্দটির প্রকৃত অর্থ স্থির করিতে হইবে। যে রাজাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতির আলোচনা করা হয়, শাস্ত্রে তাহারই নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিজিগীষু'। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না। যে রাজা রাজ্য 'বিজয়ের ইচ্ছা করেন' তিনিই 'বিজিগীষু', এইরূপ ধারণার ফলে নানারূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অর্থশাস্ত্রে যখন যে রাজাকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনিই তখন 'বিজিগীষু' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রবল কর্তৃক আক্রান্ত দুর্বল রাজাও বিজিগীষু, আক্রমণকারী জয়েচ্ছু রাজাও বিজিগীষু।* এই গ্রন্থে পরাক্রান্ত রাজার জন্য যে পরিমাণে শত্রুজয়ের উপায় নির্দিষ্ট দেখা যায়, তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে দুর্বল রাজার আত্মরক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ লক্ষিত হয়। সবল বা দুর্বল, আক্রমণকারী বা আক্রান্ত—সকল অবস্থার রাজাই বিজিগীষু হইতে পারেন এবং ইঁহাদের সকলের পক্ষেই অর্থশাস্ত্র উপযোগী; সুতরাং পরাক্রান্ত রাজার পক্ষে রাজ্যজয়ের উপায় নির্ধারণের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এইরূপ মত বিচারসহ নয়।

অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ কৌটিল্যের অনভিপ্রেত

কৌটিল্যের কোন কোন উক্তির অযৌক্তিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে (৬।২) আছে

* অর্থশাস্ত্র, ৭।১৩ দ্রষ্টব্য।

পার্ষ্ণিগ্রাহোঽভিযোক্তা বা যাতব্যো বা যদা ভবেৎ।
বিজিগীষুস্তদা তত্র নৈত্রমেতৎ সমাচরেৎ॥

'ভূম্যনন্তরা অরিপ্রকৃতিঃ'। মনে রাখিতে হইবে, ইহা দ্বারা গ্রন্থকার পার্শ্ববর্তী রাজ্যমাত্রকেই শত্রুরূপে গ্রহণ করিতে বলেন নাই। স্বার্থ-সংঘাতের ফলে প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া স্বাভাবিক, তাহা এই বাক্যে সূচিত হইয়াছে মাত্র। আবার 'অভ্যুচ্চীয়মানো বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭।১), 'হীনেন বিগৃহ্ণীয়াৎ' (৭।৩) এইসকল উক্তির তাৎপর্য এইরূপ নয় যে, বল বৃদ্ধি হইলেই যুদ্ধ করিতে হইবে কিংবা নিজের অপেক্ষা দুর্বল রাজা পাইলেই তাহার সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। একটু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থেই অন্যত্র * ক্ষয়, ব্যয়, প্রবাস ও প্রত্যবায়ের কারণ রূপে বিগ্রহ নিন্দিত হইয়াছে এবং সন্ধি ও বিগ্রহের মধ্যে তুলনায় বিগ্রহ পরিত্যাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে কৌটিল্যের উপদেশের মর্ম এই যে, যখন অন্যান্য কারণে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিবে, তখন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর নিজেকে শত্রু অপেক্ষা অধিক বলসম্পন্ন বুঝিতে পারিলে যুদ্ধ করা যাইতে পারে। মানব ধর্মশাস্ত্রেও বিগ্রহ সম্বন্ধে অনুরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। সপ্তম অধ্যায়ের একস্থানে† আছে—"যখন প্রজাগণকে সন্তুষ্ট এবং নিজেকে বলশালী মনে করিবে, তখন বিগ্রহ করিবে। যখন দেখিবে নিজ সৈন্য হৃষ্ট-পুষ্ট এবং শত্রু-সৈন্য ইহার বিপরীত,

* অর্থশাস্ত্র, ৭।২—সন্ধিবিগ্রহয়োস্তুল্যায়াং বৃদ্ধৌ সন্ধিমুপেয়াৎ। বিগ্রহে হি ক্ষয়-ব্যয়-প্রবাস-প্রত্যবায়া ভবন্তি।

† মনু, ৭।১৭১ ও ১৭২ শ্লোক—

যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্বীত বিগ্রহম্॥
যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতং চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি॥

তখন শত্রুকে আক্রমণ করিবে।" আবার একটু পরেই মনু* বলিয়াছেন—"সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায়ের সাহায্য লইবে, কখনও যুদ্ধদ্বারা শত্রুজয়ে প্রবৃত্ত হইবে না।" এই দুই প্রকার উক্তিতে কিন্তু যথার্থ কোন বিরোধ নাই। পরবর্তী শ্লোকে † মনুর অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—উপায়ান্তর না থাকিলে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া শত্রুদমনের জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। মনুর ন্যায় কৌটিল্যের মতেও অগত্যা পক্ষেই যুদ্ধ করা বিধেয়। অথচ উল্লিখিত কয়টি কৌটিল্য-বাক্যের অপব্যাখ্যা অবলম্বনে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মত ঐতিহাসিক কিরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন! তিনি "আর্লি হিষ্টরি অব্ ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে (১৩৯ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির পক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ ভিন্ন কখনই শান্তিতে বাস করা সম্ভবপর হয় নাই। কারণ, বলশালী হইলেই যুদ্ধ করিতে হইবে, প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত শত্রুতা করিতে হইবে—ইহাই হইল ভারতীয় রাজনীতির উপদেশ।" কিন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ হইতে এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি।

অর্থশাস্ত্রে বিশ্বাসঘাতকতা নিন্দিত

স্মিথ সাহেবের কৌটিল্য সম্বন্ধীয় উক্তিতে আরও ভ্রম আছে। তিনি কৌটিলীয়ের সন্ধিকর্ম প্রকরণের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রকরণের

---

* মনু, ৭।১৯৮

সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন॥

† মনু, ৭।২০০

ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সম্পন্নো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥

প্রথমেই গ্রন্থকার পূর্ব্বাচার্যগণের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—* বিশ্বাস বা শপথের উপর প্রতিষ্ঠিত সন্ধি কখনই ভঙ্গ করা চলে না। প্রতিভূ বা বন্ধক অপেক্ষাও বিশ্বাস অধিক নির্ভরযোগ্য, কারণ উহা ভঙ্গ করিলে যেমন ইহলোকে তেমন পরলোকেও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। ইহা কৌটিল্যের নিজের অভিমত। ইহার পর প্রতিভূরূপে ন্যস্ত ব্যক্তিকে কিরূপে শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিতে হয়, তাহাও অর্থশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে।† সেই আলোচনাটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া স্মিথ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—প্রাচীন ভারতে সামর্থ্য থাকিলেই সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করা হইত।‡ কৌটিল্যের উক্তিতে কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয় না। প্রবল ব্যক্তির পক্ষে সন্ধির নিয়ম না মানার সম্ভাবনা চিরকালই আছে। সেই সম্ভাবনার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই কৌটিল্য যে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পরস্পর ব্যবহারে অসাধু আচরণের প্রশ্রয় দিয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না।

অন্যায় আক্রমণ আসুরিক কর্ম

অর্থশাস্ত্রে (১২।১) তিন প্রকার অভিযোক্তা বা আক্রমণকারীর নাম আছে—'ধর্মবিজয়ী', 'লোভবিজয়ী' ও 'অসুরবিজয়ী'। আক্রান্ত ব্যক্তি নত হইলেই 'ধর্ম্মবিজয়ী' রাজা তাঁহার অপকারের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হন, অধিকন্তু তাঁহার বিপদে সহায়তাও করিয়া থাকেন। অর্থসংগ্রহ ও দেশবিজয়ে 'লোভবিজয়ী'র লোভ; সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ

* অর্থশাস্ত্র, ৭।১৭—নেতি কৌটিল্যঃ। সত্যং বা শপথঃ পরত্রেহচ স্থাবরঃ সন্ধিঃ।

† অর্থশাস্ত্র, ৭।১৭—অভ্যুচ্চীয়মানঃ সমাধিমোক্ষং কারয়েৎ।

‡ "আর্লি হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া, ১৩৯ পৃঃ।

হইলেই তিনি আর আক্রমণ করেন না। কিন্তু 'অসুরবিজয়ী'র কিছুতে তৃপ্তি নাই। ভূমি, অর্থ, স্ত্রী, পুত্র এবং সর্বশেষে প্রাণ হরণ না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন না। এই তিন প্রকার বিভাগ হইতে বুঝা যায় যে, যিনি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য কেবল প্রয়োজনানুরূপ যুদ্ধ করেন, তিনি কৌটিল্যের মতে 'ধর্মবিজয়ী'। 'লোভবিজয়ী' এবং 'অসুরবিজয়ী' রাজারা যে কৌটিল্যের নিন্দাভাজন, তাহা উহাদের নামকরণেই প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উহাদের কথা বলিতে হইয়াছে, কারণ এই গ্রন্থ ব্যাবহারিক রাজনীতি, মতবাদের সমষ্টিমাত্র নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখ না করিলে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না।

রাজ্য রক্ষারজন্য চরনিয়োগের ব্যবস্থা চিরকালই আছে। আধুনিক কালে উহা রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। অর্থশাস্ত্রেও গুপ্তচরদিগের কর্মকলাপের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজনীতির গ্রন্থে চরের কথা না থাকিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। চরেরা সঙ্কটকালে শত্রুর অপকারের চেষ্টা করিবে—কৌটিল্য তাহা বলিয়াছেন। রণতরীর অদৃশ্য আঘাত বা বিমানের আকস্মিক বোমা-বর্ষণের মত গুপ্তচরের অতর্কিত আক্রমণ শত্রুনাশের একটি উপায়। সচরাচর এই উপায় অবলম্বিত হইত কি না তাহা জানা যায় না। কৌটিল্য তাঁহার গ্রন্থে অন্যত্র নিষ্ঠুর আক্রমণের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি; সুতরাং কেবল চরব্যবস্থার উল্লেখের ফলেই তাঁহাকে ক্রূর ও অশিষ্ট আদর্শের পরিপোষক মনে করা অনুচিত।

দুর্বলকে রক্ষার ব্যবস্থা

শক্তিহীন রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থশাস্ত্রে বহু উপায়ের

নির্দেশ আছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি*। ভীত আশ্রয়-প্রার্থী রাজাকে অভয় দিয়া পিতার ন্যায় পালন করিতে হইবে—ইহাই কৌটিলীয়ের (৭।১৬) উপদেশ। অন্যায়ভাবে কোন রাজ্যকে উৎপীড়িত করিলে অন্যান্য প্রতিবেশী রাজদের বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহাও কৌটিল্য উল্লেখ করিয়াছেন। সমগ্র রাজমণ্ডল অত্যাচারী রাজার ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।†

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কৌটিল্য অকারণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, অনুচিত বলপ্রয়োগ এবং অপরের প্রতি অন্যায্য আচরণ করিতে উপদেশ দেন নাই; বরং ঐরূপ কার্যের অপকারিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

পূর্বেই দেখিয়াছি—যুদ্ধে লোকক্ষয়হেতু পাপের (প্রত্যবায়) ভয় আছে; সন্ধিভঙ্গ-জনিত বিশ্বাসঘাতকতায় পরলোকে (পরত্র) অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। আবার নৃশংসভাবে শত্রুনাশ করিলে তাহা আসুরিক কর্ম বলিয়া নিন্দিত হয় এবং অন্যায় উৎপীড়ন করিলে 'মণ্ডলস্থ' রাজগণের বিরুদ্ধতাচরণের সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে, কৌটিল্যের রাষ্ট্রীয় আদর্শে কোন নৈতিক ভিত্তি নাই এবং তিনি পাপপুণ্য ও ধর্মাধর্মের বিচার না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার সমর্থন করিয়াছেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অপ্রমাণ।

* অর্থশাস্ত্র, ১৬।১৭—ভয়োদ্বিগ্নং মণ্ডলমভাবায়োত্তিষ্ঠতে।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩১শ ভাগ, ১৮৭ পৃঃ।

সমাজ-চিন্তায় ফরাসী ত্রিবীর
বোদাঁ, মঁতস্কিয়ো ও রুসো*

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ

গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ, সহ-সম্পাদক,
"সমাজ-বিজ্ঞান"

ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম-সংস্কার আন্দোলন (রিফরমেশন) ইয়োরোপের রাষ্ট্র-ও-সমাজ-চিন্তার অন্তরায় হইল। মাকিয়াভেল্লি (১৪৬৯-১৫২৭) রাষ্ট্র-ও-সমাজ-বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বাধা পাইল। সমাজ-চিন্তার উপর ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা আবার নূতন প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ইয়োরোপের ধর্ম্ম-সঙ্ঘ (চ্যর্চ্চ্) ও রাষ্ট্রের পরস্পরের সম্বন্ধ এই সময়ে একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

"ষড়ধ্যায়ী"

এইরূপে যখন ইয়োরোপের আবহাওয়া ধর্ম্ম-চিন্তার দ্বারা সমাচ্ছন্ন তখন সমাজ-বিজ্ঞানের উদ্ধারসাধনের জন্য ফরাসী চিন্তাবীর বোদাঁ (১৫৩০-১৫৯৬) তাঁহার লেখনী ধারণ করেন। বোদাঁর লেখার উপরে অ্যারিষ্টট্ল্ (খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) এর যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাই। কিন্তু বোদাঁর লেখা কেবল অ্যারিষ্টট্ল্এর চিন্তার প্রতিধ্বনি নয়। ইহা ইয়োরোপের নব-অভ্যুদয়ের (রেনাসাঁসের) অপূর্ব্ব আলোকে

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে পঠিত (৩ নবেম্বর ১৯৩৭)।

উদ্ভাসিত এবং ইহাতে বোদাঁর মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বোদাঁ যখন তাঁহার পুস্তকাদি রচনা করিতেছিলেন তখন ফরাসী দেশে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। অন্তর্বিপ্লব ও ভাঙ্গন-গড়নের ভিতর দিয়া ফরাসী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। এই ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার মানসে বোদাঁ দেশের সমগ্র শক্তি ফরাসী রাজ-শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বোদাঁ একজন কেবল তত্ত্বান্বেষী দার্শনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বস্তুনিষ্ঠ, করিৎকর্ম্মা ব্যক্তি। বোদাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী জাতিকে, ফরাসী রাষ্ট্রকে শক্তিমান করিয়া তোলা। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তিনি সমাজ-ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ লিখিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় 'দে রেপুব্লিকা লিব্রি সেক্স' অর্থাৎ 'রাষ্ট্র সম্বন্ধে ছয়টি অধ্যায়' নামে প্রকাশিত হয়। ইহাকে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় রাষ্ট্রসম্বন্ধে ষড়ধ্যায়ী বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির সামান্য আভাষ এখানে দেওয়া যাইতেছে।

কিরূপে সমাজের উৎপত্তি হইল বোদাঁ সর্ব্বপ্রথম এই সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বোদাঁর মতে সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণার বশে। মানুষ একলা থাকিতে পারে না। সে পাঁচজনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে চায়। মানুষের সমবেত জীবনের প্রথম বিকাশ পরিবারের মধ্যে। অনেক-গুলি পরিবার লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। সমাজ এইরূপ স্বতই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তির সহিত বল-প্রয়োগের সংযোগ আছে। কতকগুলি পরিবার বা দল অপর কতকগুলি পরিবার বা দলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া শাসন ও শাসিতের প্রভেদ সৃষ্টি

করিলে প্রকৃত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্র মানবের সমবেত জীবনের চরম অভিব্যক্তি। বোদাঁর রাষ্ট্রর ভিত্তি হইতেছে পরিবার। ইহাতে ব্যক্তি-বিশেষের স্বতন্ত্র স্থান নাই।

রাষ্ট্রের 'সভারেন্টির' বিশ্লেষণেই বোদাঁর মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সভারেন্টিকে বাংলায় রাষ্ট্রের আধিপত্য বা ঐশ্বর্য্য বা স্বামিত্ব বলা যাইতে পারে। ঐশ্বর্য্য বা স্বামিত্ব এই দুইটি শব্দই প্রাচীন হিন্দুদের রাষ্ট্রশাস্ত্রে পাওয়া যায়। হিন্দুরা ঐশ্বর্য্য বা স্বামিত্বকে রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ বিবেচনা করিতেন। এই বিষয়টি অধ্যাপক বিনয়-কুমার সরকার তাঁহার 'পোলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ অ্যাণ্ড থিওরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্ (হিন্দুদের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রতত্ত্ব) নামক গ্রন্থে (লাইপৎসিগ, ১৯২২) বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।*

এই ঐশ্বর্য্য-তত্ত্বের আলোচনা বোদাঁর পূর্ব্বেও অবশ্য কিছু হইয়াছিল। অ্যারিষ্টট্‌ল্ তাঁহার পুস্তকে প্রকারান্তরে ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। রোমীয় আইন-শাস্ত্রের আলোচনার মধ্যেও ইহার আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ঐশ্বর্য্য-তত্ত্বের আলোচনা হইতে পারে নাই দুই কারণে:—প্রথম হইতেছে দৈব বা প্রাকৃতিক নিয়মের বা ধর্ম্মের আধিপত্য; দ্বিতীয় হইতেছে রাষ্ট্রের সহিত ধর্ম্ম-সঙ্ঘের এবং ফিউদার প্রথার (ফিউড্যাল সিষ্টেম) সংঘাত।† বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

'প্রাকৃতিক ধর্ম্ম' (ন্যাচারাল্ ল) বলিতে কি বুঝায়? ইয়োরোপের সমাজ-চিন্তায় গ্রীক সভ্যতার প্রাক্কাল হইতে প্রাকৃতিক ধর্ম্মের একটা ধারণা প্রচলিত হইয়াছিল। এই ধারণার প্রথম প্রবর্ত্তন

* নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† মেরিয়ামের "রুসোর পরে ঐশ্বর্য্য-তত্ত্বের ইতিহাস" নামক ইংরেজি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করেন গ্রীক 'সোফিষ্ট'গণ।* তাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রিক আইন হইতে পৃথক এক প্রকার রীতিনীতি আছে যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। সোফিষ্ট্রা দুইটি বিরুদ্ধ অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার করেন, যথা প্রকৃতি (নেচার) এবং সামাজিক সংস্কার (কনভেন্শন্)।† রাষ্ট্রিক ধর্ম্ম সামাজিক সংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট ; প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রকৃতির চিরন্তন সত্য হইতে প্রসূত। হিন্দু দর্শনের মধ্যেও এইরূপ 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মের' উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (ইংরেজীতে "ল") এবং সত্য একই বস্তু। এই ধর্ম্মের সাহায্যে দুর্ব্বলও সবলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। এই ধর্ম্মের উপরে আর কিছুই নাই, ইহা স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট।†

মধ্য যুগে এই প্রাকৃতিক ধর্ম্মকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইত। রাষ্ট্রের 'ঐশ্বর্য্য' বা 'আধিপত্য', যাহা হইতে রাষ্ট্রিক ধর্ম্ম উদ্ভূত হয়, তাহা আদৌ স্বীকৃত হয় নাই।

রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্যের স্বীকারের দ্বিতীয় বাধা ছিল, ধর্ম্মসঙ্ঘ (চ্যর্চ্চ্) ও "ফিউদার" প্রথার প্রভাব। এখন এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ আলোচনা করা আবশ্যক।

ইংরেজী শব্দ চ্যর্চ্চ্ বলিতে আমরা গির্জ্জা বুঝিয়া থাকি। মধ্যযুগে কিন্তু চ্যর্চ্চ ছিল একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল ছিল রোম এবং ইহার অধিপতি ছিলেন পোপ। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পরে পোপ স্থানীয় শান্তি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে

* উইলোবি, নেচার অব্ দি ষ্টেট্ (রাষ্ট্রের স্বরূপ), পৃঃ ৯৬।

† বার্কার.—"প্লেটো অ্যাণ্ড হিজ প্রেডিসেসার্স" (প্লেটো এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ)।

সরকার –"পোলিটিক্যাল ইনষ্টিটিউশ্যন্স্ ও থিওরিজ অব্ দি হিন্দুজ"-(হিন্দুদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রতত্ত্ব) পৃঃ ২০৮।

লাগিলেন। ক্রমে তিনি জাগতিক কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন এবং প্রভুত ক্ষমতাও তাঁহার হস্তগত হইল। পোপ তখন ইয়োরোপের দেশগুলির উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পোপের প্রতিপত্তি বিভিন্ন জাতিগত রাষ্ট্র-গঠনের পথে একটি প্রধান অন্তরায় হইল।

'ফিউডাল সিষ্টেম্' বা ফিউদার প্রথা মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর ইয়োরোপে যে অরাজকতা দেখা দিল তাহার মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য 'ফিউদার প্রথার' জন্ম।* ফিউদার প্রথার ব্যবস্থায় সমগ্র দেশের রাজার নিম্নে ধাপে-ধাপে অনেকগুলি জমিদার-কল্প ব্যক্তি বা সামন্ত ছিল। প্রত্যেক ধাপের ব্যক্তি তাহার উপরের ধাপের ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো নির্দ্দিষ্ট জমির উপর অধিকার পাইত এবং এই অধিকারের পরিবর্ত্তে উপরওয়ালা ব্যক্তিকে সামরিক সাহায্য করিতে বাধ্যতা স্বীকার করিত। এইরূপে ধাপের উপর ধাপ করিয়া 'পিরামিডের' আকারে একটা দেশব্যাপী সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার চূড়ায় ছিলেন দেশের রাজা এবং সর্ব্বনিম্নে প্রকৃত কৃষকেরা।

সহজে বুঝিবার জন্য বলা যাইতে পারে যে, বাংলা দেশের জমিদারী ব্যবস্থা কিছু-কিছু এই ফিউডাল সিষ্টেমের অনুরূপ। যাহা হউক দেশের রাজাকে তাঁহার নিম্নস্থ সমস্ত ধাপের জমিদার বা সামন্তগুলির উপর নির্ভর করিতে হইত। কারণ যুদ্ধকালে ইহারাই তাঁহাকে সৈন্যাদির যোগান দিত। এই ব্যবস্থার অসুবিধা ছিল এই যে, রাজার সহিত জমিদারদের এবং জমিদারদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না।

---

* এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌—আউটলাইন অব হিষ্ট্রি, পৃঃ ৬৩৭।

এইরূপে ফিউদার প্রথার প্রচলনের ফলে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত শক্তির উৎপত্তি হইতে পারে নাই। কিন্তু কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের 'ঐশ্বর্য্য' বা 'আধিপত্য' কল্পনা করা যায় না।

বোদাঁ যখন তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন তখন একদিকে, 'প্রাকৃতিক ধর্ম্মে'র আধিপত্য কমিয়া আসিয়াছে, যদিও ইহার সম্পূর্ণরূপে অবসান হয় নাই, কারণ বোদাঁ নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক লেখক ইহার আলোচনা করিয়াছেন। অপর দিকে পোপের ক্ষমতাও ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলনের ফলে অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে এবং ফিউদার প্রথারও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। জাতিগত রাষ্ট্র তখন এই নূতন আবহাওয়ার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে। বোদাঁ এই সময় রাষ্ট্রের 'ঐশ্বর্য্য' বা পরিপূর্ণ ক্ষমতা স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

বোদাঁ ঐশ্বর্য্যের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিলেন:—"সমাজের সকল ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র যে পূর্ণ ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহা কোনো বিধি-নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় তাহাকেই ঐশ্বর্য্য বলা যাইতে পারে। এই ঐশ্বর্য্যই রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎসস্বরূপ। এইরূপে বোদাঁ রাষ্ট্রিক আইনেরও অতি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় বোদাঁ বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের ঐশ্বয্য কোন বিধি বা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজে মানেন নাই। তিনি ঐশ্বর্য্যের কতকগুলি সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাকৃতিক ও ঐশ্বরিক ধর্ম্ম বা নিয়ম ও রাষ্ট্রের কতকগুলি মূল নিয়ম,—যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এইগুলি রাষ্ট্রাধিপতি মানিয়া চলিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা স্বীকার করিবার পরেও বোদাঁ যে এই সীমাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কারণ হইতেছে যে, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিতে চাহিয়া-

ছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্বেচ্ছাচারী শাসক এবং প্রকৃত রাজার মধ্যে পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত ব্যক্তি এই নিয়মগুলি সন্ধান করিয়া থাকে কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাহা করে না।

রাষ্ট্র এবং শাসনতন্ত্রের প্রভেদ বোদাঁ অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য রাষ্ট্রের আয়ত্ত, কিন্তু এই ক্ষমতা যে যন্ত্রের মধ্য দিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে শাসনতন্ত্র। বোদাঁ তিন প্রকার শাসনতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা রাজতন্ত্র, আভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র। বোদাঁ নিজে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন।

নাগরিক কাহারা? এই সমস্যার সমাধানও বোদাঁ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা রাষ্ট্রের আধিপত্য মানিতে বাধ্য তাহারাই নাগরিক। মনে রাখিতে হইবে যে, বোদাঁর রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষের স্থান নাই। অতএব নাগরিক বলিতে তিনি রাষ্ট্রের যে-কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইতেছেন না। প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা হইতেছে নাগরিক। কিন্তু সে যে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে নাগরিক তাহা নয়। সে পরিবারের কর্ত্তা এবং সে রাষ্ট্রের আধিপত্য মানিয়া থাকে এই জন্যই সে নাগরিক।

এখানে বোদাঁর বিপ্লবতত্ত্বের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বোদাঁর মতে জগতের ইতিহাসে বিপ্লবের বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিপ্লবের মধ্য দিয়াই মানব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু বিপ্লবকে বিচক্ষণতার সহিত চালনা করা আবশ্যক,—যাহাতে ইহা ধ্বংসের কারণ না হইয়া গঠনের সহায়তা করিতে পারে।

বোদাঁর আর একটি মত আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বিবেচনায় ভৌগোলিক কারণ জাতীয় চরিত্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তিনি দেখাইয়াছেন দ্রাঘিমা অনুসারে উত্তরদেশবাসী

ব্যক্তিরা শারীরিক ক্ষমতা পাইয়া থাকে, দক্ষিণদেশবাসীরা মেধা ও প্রতিভা-সম্পন্ন হইয়া থাকে। মধ্যস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উভয় গুণের সমাবেশ হইয়া থাকে এবং তাহারাই রাষ্ট্রশাসনে নিপুণ। অক্ষরেখার হিসাবে বোদাঁ বলেন যে, পশ্চিমারা উত্তুরেদের সদৃশ এবং পুরবীরা দক্ষিণীদের সদৃশ।

"রীতি-নীতির মর্ম্মকথা"

বোদাঁর পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশ সমাজচিন্তায় তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই সময়ে ওলন্দাজ পণ্ডিত গ্রোসিয়ুস (১৫৮৩-১৬৪৫) এবং ইংরেজ দার্শনিকদ্বয় হব্‌স্ (১৫৮৮-১৬৭৯) ও লক্ (১৬৩২-১৭০৪) বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু দুইজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের আবির্ভাবের ফলে ফরাসী দেশ আবার সমাজচিন্তার ইতিহাসে এক উচ্চস্থান অধিকার করে। ইঁহাদের নাম মঁতস্কিয়ো ও রুসো। প্রথমে মঁতস্কিয়ো কথা বলিব।

মঁতস্কিয়োর (১৬৮৯-১৭৫৫) সময়ের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। বিলাতের গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮) স্মৃতি তখন সকলের মনে জাগিয়া রহিয়াছে। লক্-প্রচারিত স্বাধীনতা বাণী তখন ইয়োরোপে একটা নূতন সাড়া আনিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের 'জবরদস্ত' রাজা চতুর্দ্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পরে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। এই নব জাগরণে কিন্তু মঁতস্কিয়োর মন বিপ্লবীর উদ্দামতার সহিত সাড়া দিল না। সেভাবে সাড়া দিল রুসোর ভাব-প্রবণ-চিত্ত। মঁতস্কিয়ো ছিলেন সংস্কারের পক্ষপাতী, বিপ্লবের নয়।

মঁতস্কিয়োর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'এস্প্রি দে লোআ' অর্থাৎ 'রীতিনীতির মর্ম্মকথা' ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি প্রথমে

আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আইন হইতেছে 'পদার্থসমূহের স্বাভাবিক যোগাযোগ'। অর্থাৎ আইনের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে। ইহা কতকগুলি ইচ্ছামত তৈয়ারী নিয়মকানুন নয়। ইহা সামাজিক জীবনের কতকগুলি নিবিড় সম্বন্ধ বা যোগাযোগ। মানবের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির সহিত ইহা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের স্মৃতিশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা জাতীয় চরিত্রের সহিত আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

মঁতস্কিয়ো স্বাধীনতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতেছি এই বিশ্বাসই স্বাধীনতার সার বস্তু*। স্বাধীনতা দুই প্রকারের,—যথা সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। মঁতস্কিয়ো দাসপ্রথার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন কারণ ইহা সামাজিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। তাঁহার মতে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য শাসন-ক্ষমতার বিভাগ একান্ত প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র-ক্ষমতা ত্রিবিধ—আইন-প্রণয়ন-ক্ষমতা, শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা। তিনি বলেন যে, একই হস্তে এই তিন প্রকার ক্ষমতার সমাবেশ হওয়া স্বাধীনতার বিরোধী। মঁতস্কিয়ো দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিলাতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রক্ষমতা অতি সুন্দরভাবে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু মতঁস্কিয়োর এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ বিলাতের শাসনতন্ত্রে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা বিভক্ত নয় বরং উভয়ের অতি সুন্দর সংযোগই দেখা যায়। বিলাতে আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং শাসন-ক্ষমতা মন্ত্রি-পরিষদের অর্থাৎ ক্যাবিনেটের হস্তগত। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ পার্ল্যামেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র নয়—ইহা পার্ল্যা-মেণ্টের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল হইতে গঠিত হইয়া থাকে। অতএব মঁতস্কিয়োর

এস্প্রি দে লোআ—১২ অধ্যায়, ২।

বিলাত সম্বন্ধে ধারণা সমর্থন করা যাইতে পারে না। কিন্তু বিলাত সম্বন্ধে মঁতস্কিয়োর ধারণা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার তত্ত্বের মধ্যে যে এক গভীর সত্য অন্তর্নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসনতন্ত্রের তিনটি অঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা সম্ভবপরও নয় বা বাঞ্ছনীয় ও নয়, কেননা তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগসূত্র আছে। কিন্তু কিয়দংশে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র রাখা একান্তরূপে প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচারী রাজার আমলে স্বাধীনতা থাকা সম্ভব হয় না কেন? তাহার কারণ হইতেছে এই যে, সে নিজেই আইন তৈয়ারী করে, আইনভঙ্গের জন্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং নিজেই তাহার বিচার করে। কংগ্রেস-আন্দোলনের ফলে আমরা ভারতের শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-বিভাগের দাবি করিয়া থাকি এই কারণেই। বড়লাটের হাতে শাসনক্ষমতা ও আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা এই দুইয়ের সমাবেশ আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী। সেইরূপ ডিষ্ট্রিক্ট্ জজের হস্তে বিচার-ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতার সম্মিলন স্বাধীনতার চরম বাধা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মঁতস্কিয়োর চিন্তার দ্বারা আমেরিকার শাসনতন্ত্র বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আমেরিকায় আইন প্রণয়নক্ষমতা, শাসন ক্ষমতা ও বিচার ক্ষমতা পরস্পর হইতে অতি সাবধানতার সহিত পৃথক রাখা হইয়াছে।

মঁতস্কিয়ো তিন প্রকার রাষ্ট্ররূপের উল্লেখ করিয়াছেন—সাধারণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র। সাধারণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের, গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র। মঁতস্কিয়োর মতে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের এক একটা মূলনীতি আছে। সাধারণতন্ত্রের মূলনীতি হইতেছে 'রাষ্ট্রিক ধর্ম্ম' অর্থাৎ দেশ-প্রেম ও সাম্যপ্রীতি; রাজতন্ত্রের মূলনীতি হইতেছে 'মর্য্যাদা বোধ'; স্বৈরতন্ত্রের মূলনীতি হইতেছে 'ভীতি'।

বোদাঁর ন্যায় মঁতস্কিয়ো রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন।

বিপ্লব সম্বন্ধে অ্যারিষ্টট্‌ল্‌এর মত ছিল যে, ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কারণ ইহা রাষ্ট্রিক স্থিরতার বিরোধী। বোদাঁ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মঁতস্কিয়ো কিন্তু কেবল ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতে শাসনতন্ত্রের মূল-নীতির অবনতি ঘটিলেই বিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে রাজতন্ত্রে যদি ইহার মূলধর্ম্ম (মর্য্যাদাবোধ) ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে তাহা হইলেই ইহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। অবনতি বলিতে কিন্তু মতস্কিয়ো নৈতিক অবনতির কথা বলিতেছেন না।

বোদাঁকে অনুসরণ করিয়া মঁতস্কিয়ো রাষ্ট্রের উপর ভৌগোলিক কারণের প্রভাব নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মঁতস্কিয়োর মতে স্বাধীনতার সহিত আবহাওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শীত-প্রধান দেশ স্বাধীনতার অনুকূল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশ পরাধীনতার কারণ হইয়া থাকে। এশিয়া ও ইয়োরোপের তুলনা করিয়া তিনি এই মত প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই মতের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।* কারণ অনেক গরমদেশেও স্বাধীনতার প্রাধান্য দেখা যায়। আবার শীতের দেশেও পরাধীনতার প্রাদুর্ভাব হয়। দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভূমির সহিত স্বাধীনতার সম্বন্ধও মঁতস্কিয়ো দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পার্ব্বত্যভূমি স্বাধীনতার অনুকূল এবং সমতলভূমি ইহার প্রতিকূল। এই মতও ভ্রান্ত। ইহার বৈপরীত্য ইতিহাসে সর্ব্বদাই ঘটিয়াছে। ইতিহাসের "ভৌগোলিক ব্যাখ্যা" করিবার চেষ্টা বোদাঁ ও মঁতস্কিয়োর পরে অনেকেই করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা একালে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের বিষয়। এই বিজ্ঞানকে 'অ্যানথ্রপো-জিওগ্রাফি' অর্থাৎ 'নৃতাত্ত্বিক ভূগোল' বলা হইয়া থাকে। ইংরেজ বাক্‌ল্‌, জার্ম্মাণ রাট্‌ৎসেল,

* মেরিয়ম ও বার্ণস্‌—রিসেন্ট পোলিটিক্যাল থিয়োরিজ, পৃঃ ৪৫৭।

মার্কিণ সেম্পল, মার্কিণ হান্টিংটন, প্রভৃতি লেখকগণ এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন।* এই লেখকগুলি সকলেই একদেশদর্শী।

সামাজিক চুক্তি

এইবার রুসো (১৭১২-১৭৭৮) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। রুসোর নাম ভারতে সুপরিচিত। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) কথা বলিলেই রুসোর নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বস্তুতঃ, আমরা রুসোকে ফরাসী-বিপ্লবের জন্মদাতা সমঝিয়া থাকি। রুসো ফরাসী-বিপ্লবের উপর প্রভাব বিস্তার করিরাছিলেন তাঁহার সমাজচিন্তার দ্বারা। এখানে সমাজচিন্তায় তাঁহার বিপুল কীর্ত্তিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

রুসো ইতিহাসের এক রহস্যময় চরিত্র। ইংরেজ আইনশাস্ত্রী হেন্‌রী মেইন বলেন যে, রুসোর পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল, ও বিশেষগুণ না থাকা সত্ত্বেও তিনি ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ জনপ্রীতির জন্য।† ইংরেজ সাহিত্যবীর কার্লাইল বলেন:—আমি তাহার মধ্যে এক স্বর্গীয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিতে পাই।‡

রুসোর জগদ্বিখ্যাত পুস্তক 'কঁত্রা সোসিয়াল' অথবা 'সামাজিক চুক্তি' প্রকাশিত হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে। রুসো প্রথমেই এক প্রাক্-সামাজিক যুগের কথা বলিয়াছেন। এই বিষয়ে ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বীর হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯) ও লকের (১৬৩২-১৭০৪) সহিত রুসোর চিন্তার যোগাযোগ আছে। হব্‌স্ প্রাক্-সামাজিক যুগের প্রাকৃতিক অবস্থার এক ভয়াবহ ছবি আঁকিয়াছেন। হব্‌স্ মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেন যে, মানুষ চায় ক্ষমতা, আরও ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতা—ক্ষমতার ক্ষুধার তাহার তৃপ্তি নাই—ইহার নিবৃত্তি হয়

* মেরিয়াম ও বার্ণসের পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† এন্‌শ্যেণ্ট ল (প্রাচীন রীতিনীতি)—পৃঃ ৫১।

‡ হিরোস অ্যাণ্ড হিরো-ওয়ারশিপ্—পৃঃ ২৪৮।

মৃত্যুতে।* প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রত্যেক মানুষ তাহার ক্ষমতার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উন্মত্ত। ইহার ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রবল সংঘর্ষ ঘটে এবং 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' মানবজীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে। হবস্-প্রচারিত এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা প্রাচীন হিন্দুদের কল্পিত 'মাৎস্য-ন্যায়ের' জুড়িদার। 'মাৎস্য-ন্যায়'ও এক প্রাক্-সামাজিক যুগের অবস্থা-বিশেষ। এই অবস্থায় সবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে,—যেমন জলে বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে উদরসাৎ করিয়া থাকে। মহাভারত, মনুসংহিতা, রামায়ণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মাৎস্য-ন্যায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁহার "পোলিটিক্যাল ইন্স্টিটিউশ্যন্স্ অ্যাণ্ড থিওরিজ্ অব হিন্দুজ" গ্রন্থে এই বিষয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ও ভারতীয় চিন্তাধারার সৌসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। (নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

রুসো কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থার অন্যরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। এই বিষয়ে লকের সহিত তাঁহার মতের অনেকটা মিল আছে। প্রাকৃতিক অবস্থার মানব সম্বন্ধে রুসোর অতি উচ্চধারণা ছিল। তিনি 'সুমহান্ আদিমপুরুষের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। মোটের উপর রুসোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল মানবের সুখের, শান্তির ও আনন্দের অবস্থা। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এইরূপ স্বর্ণযুগেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।§ এইরূপে হবস্ ও রুসো দুই জনেরই প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনার অনুরূপ ছবি হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

কতকগুলি দুর্ঘটনার ফলে রুসোর প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান হইল। কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার এইরূপ একটি দুর্ঘটনা। চাষ করিবার জন্য মানুষের পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন হইল। তখন বলবান

* লেভিয়াথান্—একাদশ অধ্যায়।

§ সরকার—পৃঃ ১৯৯।

দুর্ব্বলের উপর প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইল এবং ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ সৃষ্ট হইল।

ইহার পরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কলহ, যুদ্ধ, অত্যাচার, অনাচারের সূত্রপাত হইল। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্র গঠিত হইল এক চুক্তির ভিত্তির উপরে। চুক্তি করা হইল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে। এই চুক্তির নাম হইল সামাজিক চুক্তি এই চুক্তি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সমাজকে দান করিল। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষ যে ইহার ফলে নিঃস্ব হইল তাহা নয়। তাহারা যাহা দান করিল তাহা পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া পাইল রাষ্ট্র-জীবনের নূতন স্বাধীনতার মধ্য দিয়া।

রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা সম্বন্ধেও রুসো বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। রুসোর পূর্ব্বে যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা পূর্ণ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন বোদাঁ ও হব্‌স্। লক্ ও মঁতস্কিয়ো স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। বরং ইহা স্বাধীনতার পরিপন্থী রিবেচনা করিয়া ইহার আলোচনা পরিহার করিয়াছিলেন। রুসো কিন্তু আধিপত্য বা ঐশ্বর্য্য তত্ত্ব নতুনভাবে আলোচনা করিলেন। বোদাঁ ও হব্‌স্‌এর ন্যায় তিনি ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দরিলেন; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা রাজতন্ত্রের সহায়ক না হইয়া গণ-স্বাধীনতার সহায়ক হইয়া উঠিল।

রুসোর মতে 'সামাজিক চুক্তির' সাহায্যে রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে সকল সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। এই চুক্তির ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি সমাজকে দান করে। এইরূপে সকল ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়ে একটি 'সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তির' (সার্ব্বজনীন

ইচ্ছার) সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য অভিব্যক্ত হয় এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তির' মধ্য দিয়া। কিন্তু রুসো বলিয়াছেন যে, এই 'সমষ্টিগত ইচ্ছাশক্তিকে' সমাজের সকল ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির একটা যোগ-ফল মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিলে ভুল হইবে। ইহার একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের প্রভেদ রুসো স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্র বলিতে সমাজের সমগ্র মানবসমষ্টিকে বুঝায়। শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় যে-কয়জন ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে তাহাদিগকে। শাসনতন্ত্র 'সামাজিক চুক্তির' ফলে সৃষ্ট হয় নাই, ইহার সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারে।

রুসো প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। প্রত্যক্ষ গণ-তন্ত্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

আমরা তিনজন শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিন্তাবীরের সমাজ-চিন্তার আলোচনা করিলাম। সমাজ-চিন্তায় এই ত্রিবীরের দানের মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের চিন্তাকে বাদ দিলে সমাজবিজ্ঞানের অনেক-কিছুই বাদ পড়ে। সমাজের ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ঐশ্বর্য্য-তত্ত্ব, স্বাধীনতা-তত্ত্ব, শাসন-তন্ত্রের স্বরূপ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-গুলি এই ফরাসী ত্রিবীরের বিশ্লেষণে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

এস্থলে একথা বলা প্রয়োজন যে, এই তিনজনের চিন্তার মধ্যে এক যোগসূত্র আছে। বোদাঁ যে সময় লিখিতেছিলেন সে সময় রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেইজন্য তিনি তাঁহার চিন্তার দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং গ্রোসিয়ুস প্রভৃতি অন্যান্য লেখকের চেষ্টার ফলে রাষ্ট্র সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক হয়। এই সমস্যার দিকে মনোযোগ দিলেন মঁতস্কিয়ো ও রুসো। এইরূপে

রাষ্ট্রতত্ত্বের দুইটি প্রধান সমস্যা—রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য ও জনসাধারণের স্বাধীনতা—এই দুইটির আলোচনা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রুসো তাহার লেখার মধ্যে এই দুইটি সমস্যার অপূর্ব্ব সমন্বয়ও করিলেন। একদিকে রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্যকে তিনি যেমন উচ্চস্থান দিলেন, অপরদিকে তিনি জনসাধারণের হস্তে ইহা ন্যস্ত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

বিলাতী শিক্ষায় সমাজ-সমস্যা*

ডক্টর শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ, ইডি-ডি (ক্যালিফোর্ণিয়া),
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক
বঙ্গ"-পরিষৎ, সহযোগী, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

এই প্রবন্ধে আমরা ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংরেজের শিক্ষাধারায় সামাজিক আদর্শের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে রিচার্ড মুল্‌কেষ্টার, জন মিল্টন, জন্ লক্ ও হারবার্ট স্পেনসার—এই চারিজন ইংরেজ মনীষীর শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সামাজিক আদর্শসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার গতি নির্দ্দেশ করিব।

"ভদ্র" ও "ইতর" সম্বন্ধে মুলকেষ্টারের শিক্ষানীতি

প্রথম রিচার্ড মুল্‌কেষ্টারের বিষয় আলোচনা করা যাক। ষোড়শ শতাব্দীতে এই মনীষীর আবির্ভাব হয়। ইনি একটি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইটন ও যৌবনে ক্যাম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। মুল্‌কেষ্টার, লণ্ডনস্থিত বিখ্যাত মার্চ্চেণ্ট টাইলর স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন। এখানে তিনি বিশ বৎসর যাবৎ অধ্যাপনার কার্য্যে রত থাকেন। তৎপরে তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বার বৎসর কাল সেণ্টপল স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মুল্‌কেষ্টার "পজিশনস্" ও "এলিমেণ্টারী" নামক দুইটি গ্রন্থ লিখিয়া যশ অর্জ্জন করেন। এইত গেল

* "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের আলোচনা (৬ নবেম্বর, ১৯৩৫)।

তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী। মুল্‌কেষ্টারকে আমরা প্রধানতঃ শিক্ষাশাস্ত্রী রূপে ধরিয়া লইতে পারি। এক্ষণে আমরা তখনকার চিন্তাধারায় তাঁহার শিক্ষানীতির স্থান নির্ণয় করিব।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় শিক্ষার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে লাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার চর্চ্চায় অধিক সময় নষ্ট করা হইত। প্রত্যেক ছাত্রকেই, তাঁহার মেধাশক্তি যাহাই হউক না কেন, প্রাচীন ভাষার অনুশীলন করিতে হইত। ইহার ফলে মাতৃভাষার চর্চ্চার বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল। মোট কথা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাঠ্যতালিকার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন ও ছাত্রদিগকে তাহাদের রুচি ও মেধাশক্তির পরিচয় না দিয়াই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা বাছাই করিতে বাধ্য করিতেন। মুল-কেষ্টারের শিক্ষাবিজ্ঞানে এই দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার অভিমত এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিত্বের অধিকার স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় নিয়া তদনুযায়ী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মুল্‌কেষ্টার, ইয়োরোপীয় শিক্ষার অধোগতির সময়ে প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিলেও উহার আদর্শের সমর্থন করিয়া-ছিলেন। তিনি তখনকার মনীষীদিগের ন্যায়, রাজ্য-সংরক্ষণের জন্য সুশাসক ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য সুনিপুণ শ্রমজীবী সরবরাহ করিবার জন্য শিক্ষার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য তদানীন্তন রাজ্য-সংরক্ষণ দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখা। মুল্‌কেষ্টারের অভিমত এই যে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে ভবিষ্যৎ শাসক ও রাজ-কর্ম্মচারী-দিগকে নানাপ্রকার কৃষ্টি ও পেশাবিষয়ক শিক্ষা দিতে হইবে। আর

শ্রমিকদিগকে নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। মোট কথা মুলকেষ্টার তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা "ভদ্র" ও "ইতর" শ্রেণীর লোকদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাহেন এবং তাঁহার মতে এই প্রকার শিক্ষাই সমাজের ও রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং শান্তিরক্ষার বিশেষ সহায়ক। তাঁহার মতানুসারে প্রত্যেক নরনারী রাজ্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে। রাজ্যের স্বার্থ নাগরিকবৃন্দের স্বার্থের চেয়ে বড়। কাজেই নাগরিকবৃন্দের শিক্ষা এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে তাহারা রাজ্যের স্বার্থরক্ষার্থ নিজের স্বার্থ অকাতরে বলি দিতে পারে। তজ্জন্যই মুলকেষ্টারের অভিমত এই যে, উচ্চশিক্ষা খুব অল্পসংখ্যক উচ্চপদস্থ পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদিগকে দিতে হইবে। আর সাধারণ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদিগকে কেবলমাত্র এলিমেণ্টারী শিক্ষা সমাপনান্তে নানাপ্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া কার্য্যকরী শিক্ষা দিতে হইবে। কাজেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের অথবা সাধারণ শ্রেণীর প্রত্যেক যুবককেই গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে। যদিও মুল্‌কেষ্টার, উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবকদিগের জন্যই উচ্চ ও পেশা-বিষয়ক শিক্ষার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলের জন্যই এলিমেণ্টারী শিক্ষা অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, জীবিকার্জ্জনের জন্য ধনী, দরিদ্র প্রত্যেকের পক্ষেই এলিমেণ্টারী শিক্ষা নেহাৎ প্রয়োজনীয়।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি,—কি ধনী কি দরিদ্র,—স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিবে। কেহ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনের জন্মগত অধিকার আছে এবং যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক পেশা শিক্ষা করিবার সুযোগ পায় ও শিক্ষাসমাপনান্তে চাকুরী করিয়া ধনোপার্জ্জনের সুযোগ পায় ইহা দেখা গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু করিবার

জন্য অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। প্রত্যেক নাগরিককে তাহার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী কাজ যোগাড় করিয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু গরীব নাগরিকবৃন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। তাঁহাদের যথেষ্ট মেধাশক্তি থাকিলেও বেশী উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবে না ও আর্থিক দুরবস্থাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

মুলকেষ্টারের শিক্ষাতত্ত্ব এই যে, নাগরিকবৃন্দের শিক্ষা তাঁহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানুযায়ী হইবে এবং উচ্চশিক্ষা কেবল মাত্র খুব অল্পসংখ্যক উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণীর যুবকযুবতীদেরই একচেটিয়া হইয়া থাকিবে। আর জনসাধারণ কেবলমাত্র এলিমেণ্টারী শিক্ষা সমাপনান্তে শিল্প ও নানাপ্রকার কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিবে। কাজেই এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন ও পৃথক থাকিবে। আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, মুল্‌কেষ্টার অভিজাত পরিবারের যুবকযুবতীদিগকে এবং জনসাধারণের ছেলেমেয়েদিগকে স্বতন্ত্র প্রকার শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যের শক্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

"অভিজাত" ও "মধ্যবিত্ত" সম্বন্ধে কবি মিল্টনের শিক্ষাবিজ্ঞান

জন্ মিল্টন বিখ্যাত ইংরেজ কবি, মনীষী ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্। তিনি ১৭শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রধানতঃ তিনটি আন্দোলন প্রচলিত ছিল। প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রজাগণ মানিয়া নিয়াছিল; কিন্তু ১৭শ শতাব্দীতে ইংরেজ মনীষীরা রাজার স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাজার একাধিপত্যের স্থলে

প্রজাদের ক্ষমতার দাবি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে রাজকীয় ক্ষমতা নিয়া রাজা ও প্রজার মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা তখন ইংলণ্ডে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই যুদ্ধে ক্রমওয়েল প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আন্দোলন ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে সংঘটিত হইয়াছিল। জন্ মিণ্টন তদানীন্তন আন্দোলনদ্বয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। মিণ্টন শুধু রাজার যথেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি পাদ্রীদিগের একাধিপত্যেরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের তৃতীয় আন্দোলন শিক্ষাবিষয়ক ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ন্যায় ১৭শ শতাব্দীতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদিগকে না বুঝিয়া শুনিয়া লাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শুধু মুখস্থ করিতে হইত।

যদিও মিণ্টন ১৭শ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় শিক্ষা-প্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের আদর্শের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা শিক্ষিত নাগরিক তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও মিণ্টন রাজশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নাগরিকবৃন্দের ক্ষমতা অধিকারের দাবি করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা বা অধিকারের দাবি কিছুই উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে মিণ্টন রাজশক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নাগরিকদিগকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেও তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সামাজিক তারতম্যেরও সমর্থন করিয়াছিলেন। মোটকথা মিণ্টন রাজতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে অলিগার্কিক্যাল গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছিলেন।

মিল্টন একজন প্রতিভাশালী কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি কেবল দৈবতুর্ব্বিপাকে পড়িয়া শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের পুরযুদ্ধের সময় লণ্ডনে একটী প্রাইভেট স্কুল খুলিয়াছিলেন এবং সাতবৎসর কাল উক্ত স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্যে লিপ্ত থাকা কালীন মিল্টন তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে নূতন নূতন শিক্ষাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ স্যামুয়েল হার্টলিবের অনুরোধে তাঁহার বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পুস্তিকা রচনা করেন। ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা মুখস্থ না করিয়া কি উপায়ে পারিপার্শ্বিক জিনিষের ভিতর দিয়া উক্ত প্রাচীন ভাষাগুলি শিক্ষা করিতে পারা যায় এই পুস্তিকায় মিল্টন তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি প্রাচীন ভাষা মুখস্থ করাইয়া ছাত্রদিগকে ভাষাবিৎ করিতে চাহেন নাই। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা পাঠ করাইয়া তাহাদিগকে সুন্দর ভাব উদ্ধার করিতে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। তজ্জন্য মিল্টনকে শিক্ষা-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা বস্তুনিষ্ঠ মানবতার উপাসক (হিউম্যানিষ্টিক রিয়ালিষ্ট) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মিল্টন অভিজাত পরিবারের যুবাদিগকে সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও নানা প্রকার পেশা-বিষয়ক শিক্ষা দ্বারা সমাজে ও রাজ্যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমাজে ও রাজ্যে আপন প্রভুত্ব বজায় রাখা এবং সুচারুরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে নৈতিক চরিত্র একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই জন্যই তিনি লাটিন গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দ্বারা অভিজাত পরিবারের যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিল্টন অভিজাত পরিবারের যুবকদিগের সুশিক্ষার জন্য বিশ্বগ্রাসী পাঠ্যতালিকার, "এন্সাইক্লোপেডিক" কারিকিউলামের,—বন্দোবস্ত

করিয়াছিলেন। মিল্টনের পেশাশিক্ষা কেবলমাত্র অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকদিগের জন্য; সাধারণ বা গরীব শ্রেণীর যুবকদিগের জন্য মিল্টন কোনরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন নাই। অভিজাত পরিবারের যুবকগণ সংস্কৃতি ও পেশা-বিষয়ক শিক্ষাদ্বারা সমাজ ও দেশের সেবা করিবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণ নানা প্রকার পেশা শিক্ষাদ্বারা নিজ জীবিকার্জ্জন করিবে। মোট কথা মিল্টন তাঁহার আদর্শ শিক্ষা দ্বারা সৎ ও উপযুক্ত নাগরিকবৃন্দ তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিল্টন পেশাশিক্ষা দ্বারা, সংস্কৃতি, ভাষা শিক্ষা, অর্থ ও সমাজসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজাত পরিবারের যুবকদিগের ধারণা জন্মাইতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য পেশাশিক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়তা করা, আর গৌণ উদ্দেশ্য সংস্কৃতি শিক্ষাদ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠন করা।

ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিল্টন সর্ব্বগ্রাসী শিক্ষাদ্বারা চরিত্র ও ধর্ম্মভাব গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই শিক্ষা ১২ হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কাল চলিত। শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রাচীন ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ও নানাপ্রকার পেশা ও কারিগরি বিষয়ক ছিল। সংস্কৃতি শিক্ষায় লাটিন ও গ্রীক, বিজ্ঞান শিক্ষায় গণিত জ্যোতিষ, অস্থিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল, খনিজতত্ত্ব, প্রাকৃতিক দর্শন, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ত্রিকোণমিতি, প্রাণিতত্ত্ব এবং পেশা ও কারিগরি শিক্ষায় কৃষি, স্থাপত্যবিদ্যা, ঔষধ প্রস্তুতকরণ মাছ ধরা, বাগান করা, নৌচালনা, শিকার করা ইত্যাদি বুঝা হইত।

মিল্টনের শিক্ষা-বিজ্ঞানে এই পাঠ্যতালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পেশা শিক্ষা বিশেষভাবে দেওয়া হইবে। পেশাশিক্ষা সংস্কৃতি শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ হইবে ও একই বিদ্যালয়ে উহা দেওয়া হইবে।

১৮ বৎসর বয়সে অভিজাত পরিবারের তরুণ যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি ও পেশাবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিবে।

ফরাসী পণ্ডিত রাবেলের ন্যায় মিল্টনও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা এবং পেশাবিষয়ক আবহাওয়ার ভিতর দিয়া পেশা শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি নানাপ্রকার কার্য্যকরী বিদ্যায় অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তরুণ যুবকদিগকে নানা প্রকার পেশা শিক্ষা দিবার প্রথা সমর্থন করিয়াছিলেন।

মিল্টনের মতে মধ্যবিত্ত যুবকদিগকে পার্টটাইম স্কুলে পেশা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। মিল্টনের শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি শুধু অভিজাত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ যুবকদিগের জন্য পেশা ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উচ্চপদস্থ পরিবারের যুবকগণ বিশ্বগ্রাসী শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের নৈতিক চরিত্রগঠন করিবে যাহাতে তাঁহারা সমাজ ও গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যুবকগণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য পেশা শিক্ষা লাভ করিবে। উভয় শ্রেণীর যুবকগণকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

"ধনী" ও "দরিদ্রে"র পেশা-শিক্ষায় জন লক্

লক্ ১৭শ শতাব্দীর আর একজন ইংরেজ মনীষী। তিনি প্রতিভাশালী লেখক ও তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া যশ অর্জ্জন করিলেও রাজনীতি এবং শিক্ষাবিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিপ্লবে লিপ্ত থাকার দরুণ জন লক্ ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক হল্যাণ্ডে বাস করিতে বাধ্য হন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর লক্ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। মিল্টনের শিক্ষাতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৭শ শতাব্দীতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে নাগরিকবৃন্দ তাহাদের অধিকার দাবি করিয়াছিল। যদিও লক্ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রজাশক্তির দাবি অগ্রগণ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মিল্টনের ন্যায় রাজশক্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রজাতন্ত্র সংস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। লক্ কেবলমাত্র রাজক্ষমতার হ্রাস করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পার্লিয়ামেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, রাজার ক্ষমতা প্রজাসম্ভূত এবং প্রত্যেক পরবর্ত্তী রাজা তাহার ক্ষমতার জন্য প্রজার অনুমতি গ্রহণ করিত বাধ্য। ইহাকে রাষ্ট্রনৈতিক "কন্‌ট্রাক্ট" বা চুক্তির ব্যবস্থা বলা হয়। এই মতবাদে ব্যক্তিত্বের অধিকার অল্প বরং ষ্টেটের প্রাধান্যই বেশী। কাজেই লক্ তাঁহার আদর্শ শিক্ষা দ্বারা রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শুধু রাজশক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লক্ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তখনকার শিক্ষা-প্রণালীরও সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শুধু ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য লাটিন গ্রীক পড়িবার প্রয়োজন নাই। নাগরিকবৃন্দের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীর সহিত শিক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ থাকিবে। তজ্জন্য যে শিক্ষা কি ধনী কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর প্রজাদিগকে পৌর অধিকারের জন্য উপযুক্ত করিতে পারে লক্ সেই শিক্ষারই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিমতের জন্য তিনি শিক্ষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে বস্তুনিষ্ঠ সামাজিকতার উপাসক (সোশ্যাল রিয়ালিষ্ট) নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অভিজাত পরিবারের যুবকদিগকে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য লক্

মাতৃভাষা, ফরাসী ও লাটিন ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হাতের কাজ ও নানাপ্রকার পেশার প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে এই প্রকারে সর্ব্ববিদ্যায় সাধারণভাবে জ্ঞান জন্মিলে পর সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকগণ রাজ্যে নেতৃত্বের জন্য উপযোগী হইবেন। সাধারণ গরীব শ্রেণীর যুবারা নানাপ্রকার ব্যবসা ও শিল্পকলা শিক্ষা করিবে, যাহাতে তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমাজে সসম্মানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। জন্ লকের শিক্ষাতত্ত্বে আমরা মধ্যবিত্ত যুবকদের শিক্ষাবিষয়ে কিছুই জানিতে পারি না। তিনি কেবল ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর যুবকদিগের শিক্ষার বিষয়ে লিখিয়াছেন।

জন লকের মতে মন ও দেহের সুস্থতা একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। তিনি, ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হাতের কাজ ও নানাপ্রকার পেশাবিষয়ক পাঠ্য-তালিকার সাহায্যে মন ও দেহের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন ইয়োরোপীয় নবযুগের অবনতির সঙ্গে শিক্ষারও অধোগতি দেখা দিয়াছিল তখন স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রীদিগকে কেবলমাত্র লাটিন ও গ্রীক ভাষা মুখস্থ করান হইত। তাহাদিগকে ভাষার পারিপাট্য শিক্ষা দিবার জন্য ও প্রাচীন ভাষাবিদ্‌দিগের ভাষার ভঙ্গী অনুকরণ করাইবার জন্য কেবল লাটিন ও গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাতে মস্তিষ্কের পরিচালনা হইত মাত্র কিন্তু স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইত। এই রীতির প্রতিবাদস্বরূপ জন্ লক্ স্কুলের ছাত্রদিগকে হাতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্কুলে ব্যবসা ও কার্য্যকরী শিক্ষা অভিজাত পরিবারের যুবককে কেবলমাত্র তাহাদের চিত্তবিনোদন ও অবসাদ দূরীকরণের জন্য দেওয়া আবশ্যক। এই

কার্য্যকরী শিক্ষা দ্বারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকরা তাহাদের সুস্থতাও বজায় রাখিতে পারিবে এই ছিল লকের বিশ্বাস।

লাটিন্ গ্রীক্ ও বিজ্ঞান শিক্ষার অব্যবহিত পরেই ছাত্রগণের পক্ষে ব্যবসা ও কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। কেননা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পাঠাভ্যাসের পর মন স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই মানসিক অবসাদ দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় পেশা শিক্ষা দেওয়া। অভিজাত পরিবারের যুবকগণ কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায় স্বহস্তে কাজ করিয়া কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিবে। ইহাতে তাঁহারা কার্য্যে শুধু দক্ষতা লাভ করিবে তাহা নহে, মনের স্ফূর্ত্তিও লাভ করিবে। তদতিরিক্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকগণ আইন-কানুন, সওদাগরি হিসাব ও শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি পেশা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানশিক্ষার অঙ্গস্বরূপ শিক্ষা করিবে। আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিসহায়ক হিসাবে পেশা শিক্ষা করিতে হইবে।

অভিজাত পরিবারের যুবকদিগের পক্ষে দেওয়ানী আইন বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করিতে পারিবে ও সমগ্র জগতের লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিবে। আইন-কানুন পড়িতে যাইয়া তাঁহারা বিশেষভাবে সমাজের উৎপত্তি, ও সমাজে লোকের অধিকার ও কর্ত্তব্যের বিষয় পড়িবে। যাহাতে তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তর্জ্জাতিক আইন পড়িতে হইবে। গ্রোসিয়ুস্ ও পুফেন্ডরফ্ প্রভৃতি প্রাচীন "আন্তর্জ্জাতিক" আইন লেখকদিগের গ্রন্থ পড়িতে হইবে। লকের মতে আইন অতি প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়। উচ্চাভিলাষী অভিজাত পরিবারের যুবকগণ, যাঁহারা জাষ্টিস অথবা রাজ্যের মন্ত্রী হইতে চাহেন তাহাদিগকে আইন পড়িতে হইবে। ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে হইলে আইন অবশ্য পঠিতব্য। আইন শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে

বিলাতের শাসনপ্রণালী বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিতে হইবে। তদ্রূপ অভিজাত পরিবারের যুবারা নিজ নিজ সম্পত্তির হিসাব রাখিবার জন্য হিসাব-বিদ্যা ও শর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা করিবে।

জন্ লকের শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনার ফলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, পেশা শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষাদ্বারা মনের অবসাদ দূর করা ও স্বাস্থ্য গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ, নানাপ্রকার পেশা শিক্ষা দ্বারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকদিগকে পৌর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার উপযোগী করা।

ভিক্ষুকদিগকেও পেশা শিক্ষা দ্বারা কার্য্যক্ষম করিতে হইবে। ষ্টেট তাহাদিগের অভিভাবক। ভিখারীদিগকে নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা দিয়া দেশ হইতে দুঃখ দৈন্য দূর করা ষ্টেটের একান্ত কর্ত্তব্য। রাজ্যের প্রত্যেক নরনারীকে কার্য্যক্ষম করিতে হইবে। সৎ নাগরিক হইতে হইলে প্রত্যেককেই ব্যবসা ও নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা করিতে হইবে।

গরীবদিগের শিল্প শিক্ষা ষ্টেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে হইবে ও গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শ্রমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করিবেন। তিন হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক গরীব বালকদিগকে শ্রমিক বিদ্যালয়ে পড়িতে ষ্টেট বাধ্য করিবেন। এই বিদ্যালয়ে বয়ন, শেলাই, পশমী কাপড় নির্ম্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের অনুরূপ হইবে। উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ হইলে পর স্থানীয় গরীবদিগের সরকারী অভিভাবক তাহাদিগকে কোন কারিগরের কারখানায় শিক্ষানবিশরূপে ভর্ত্তি করাইয়া দিবেন।

শিক্ষাবিজ্ঞানে স্পেন্সারের দান

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের বিজ্ঞান-আন্দোলনের একজন

বিশিষ্ট মনীষী হারবার্ট স্পেন্সার। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিদ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধের বিপুল স্তম্ভ। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতির কিছুই লক্ষণ দেখা যায় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্পেনসার স্কুলের পাঠাভ্যাসে অসমর্থ হওয়ায় বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর তিনি তাঁহার পিতার অধীনে বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে স্পেনসার কতিপয় বৎসর এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় অতিবাহিত করিলেন ও তৎসময়ে গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৪১ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি নানাপ্রকার বিজ্ঞানপাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আর্থিক পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন ও সমাজবিজ্ঞান, সংখ্যাবিজ্ঞান ও চিত্তবিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ তৈরী করিয়াছিলেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার "হোয়াট নলেজ ইজ মোষ্ট ওয়ার্থ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। স্পেন্সার তখনকার বিলাতী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি মাধ্যমিক স্কুলে শুধু লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি সংস্কৃতিবিষয়ক শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একদল মনীষী মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। হারবার্ট স্পেনসার এই দলের একজন নেতা ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য তীব্র আন্দোলন চালান। তাঁহার মতে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষের সহিত প্রকৃত শিক্ষার নিবিড় সম্বন্ধ থাকিবে। স্কুলের পাঠ্যতালিকা তৈয়ার করিতে হইবে। স্পেনসার সামাজিক কাজকর্ম্মকে

প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—১। আত্মরক্ষা, ২। পরোক্ষ আত্মরক্ষা, ৩। সন্তানপালন, ৪। পৌর অধিকার, ৫। জীবনের অবসর সময়ের সদ্‌ব্যবহার। হারবার্ট স্পেনসারের মতে যেসকল কার্য্যকলাপ আত্মরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক উহারই প্রাধান্য বেশী। আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে খোরাক, পোষাক ও শুইবার সংস্থান করিতে হয়। এইসকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ করিবার জন্য নানাপ্রকার পেশা ও শিল্প-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। কাজেই বিদ্যালয়গুলিকে সমাজের ও রাজ্যের সহায়ক করিতে হইলে তাহাতে পেশা ও শিল্পবিষয়ক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

কাণ্ট্-দর্শনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্যবোধ

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, এম-এ (কলিকাতা), বি-এ
(অক্সফোর্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেম্বার
লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল, কলিকাতা,
সহযোগী, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষৎ

বিষয় ও বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া জার্ম্মাণ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট্ (১৭২৪-১৮০৪) সংযোজক সার্ব্বভৌম বাক্যের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু যান্ত্রিকতার সঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীনতার যে সংঘর্ষ, তাহার কোন সন্তোষজনক বিবরণ ইহাতে মেলেনা। বিষয়ীকে অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে বিষয়ী দেশ-কালজ হইয়া পড়িতে বাধ্য, এবং তাহা হইলে দেশকালের স্বভাবের যে ঐক্য, তাহা বিষয়ীর প্রতিও প্রযোজ্য। তাহা হইলে কিন্তু বিষয়ীর স্বাধীনতার কোন অর্থ থাকেনা, কারণ বুদ্ধি দেশকালের যে ঐক্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজিয়া পায়, তাহাব মধ্যে স্বাধীনতা বা আকস্মিকতার কোন অবকাশ নাই। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য কেবলমাত্র দেশকালজ নহে বলিয়াই সে বৈচিত্র্যের উপলব্ধি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা না হইলে পর্য্যায়ের সংবেদনা এবং সংবেদনার পর্য্যায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। ফলে অভিজ্ঞতায় যে আত্মপ্রকাশ করে, সে বিষয়ীর বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অবস্থাই পূর্ব্ব অবস্থার কার্য্যফল

মাত্র, কিন্তু তাহা হইলে কর্ত্তব্য অথবা নৈতিক স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। স্বভাবের নিয়মে যাহা ঘটে, তাহা তথ্য, কাজেই তাহাকে ভাল অথবা মন্দ বলা সমান অর্থহীন, স্বভাবের নিয়ম-শৃঙ্খলে কর্ত্তব্যের কোন স্থান নাই। বিষয়ীকে দেশকালাধীন ভাবিলে তাই বিষয়ীর স্বাধীনতাকেও অস্বীকার করা হয়।

মানুষের দায়িত্ববোধ রক্ষা করিতে গিয়া কাণ্ট তাই বলিয়াছেন, অভিজ্ঞতার যে জগৎ আমাদের নিকট প্রকাশিত, তাহার সর্ব্বত্রই পৌর্ব্বাপর্য্যের অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খল, তাই বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েই সেখানে কার্য্যকারণের সম্বন্ধাধীন, কিন্তু সে জগতের পারমার্থিক কোন সত্তা নাই বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যাবহারিক। অভিজ্ঞতার এ জগৎ যে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক তাহার স্বপক্ষে কাণ্ট অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দুইটী যুক্তি আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি। কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করিয়াই আমাদের জ্ঞান, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও কিন্তু অভিজ্ঞতার সামগ্রী, তাই দেশ ও কাল অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। অভিজ্ঞতার সর্ব্বত্রই দেশকালের ব্যবহার, সমস্ত অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে তাহাদের ব্যাবহারিক সত্তা তাই নিঃসন্দেহ, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের পারমার্থিক সত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা। কিন্তু কাণ্ট তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন তাহাদের স্বভাব স্ববিরোধী বলিয়া দেশ কালের পারমার্থিক সত্তা নাই। দেশকালের কথা ভাবিলেই তাহাদিগকে অসীম অথচ সম্পূর্ণ ভাবিতে হয়, তাহাদের স্বভাবের দুইদিকের এই বিরোধই প্রমাণ করে যে, তাহারা পারমার্থিক নহে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক।

দ্বিতীয়তঃ, অনিয়ন্ত্রিত কল্পনাও দেশকালজ বলিয়া কেবলমাত্র

দেশকাল দিয়া আমরা বাস্তব অবাস্তবের পার্থক্য বুঝিতে পারিনা। তাহার জন্য কল্পনাও প্রত্যক্ষের পার্থক্য বোধ প্রয়োজন, অথচ কেবলমাত্র বিষয় বিচারে তাহা সম্পন্ন হয় না। মাতাল যখন বলে, গোলাপী ইঁদুর রাস্তা ভরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, তখন অভিজ্ঞতা হিসাবে তাহা প্রত্যক্ষ না কল্পনা সে কথা বলিবার কোন উপায় নাই। গোলাপী ইঁদুর বাস্তব কি অবাস্তব তাহা জানিবার একমাত্র উপায় অন্যান্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধবিচার। আমাদের অভিজ্ঞতায় যে নিত্য পরিবর্ত্তন তাহার মধ্যে কোনগুলির জন্য বিষয়ী নিজে দায়ী, কোনগুলি বিষয়জ, তাহা স্থির না করিতে পারিলে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের পার্থক্যবোধ অসম্ভব। তাই সংবেদনার পর্য্যায় ও পর্য্যায়ের সংবেদনার প্রভেদ-বোধকেই বস্তু-বোধ বলা যাইতে পারে, এবং কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে সত্য মিথ্যাও এই পার্থক্য বোধের সঙ্গে জড়িত, কারণ বস্তুবোধ না থাকিলে কল্পনার সঙ্গে জ্ঞানের প্রভেদও লক্ষ্য করা যায় না। ফলে বস্তুবোধ বুদ্ধির এ পার্থক্য-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই জন্য অভিজ্ঞতার জগৎও বুদ্ধি-তান্ত্রিক বলিয়া ব্যাবহারিক। তাহাতে কিন্তু জগতের পারমার্থিক সত্তার আমরা পরিচয় পাই না, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সমপ্রসার এবং সে অভিজ্ঞতার মূলে রহিয়াছে বুদ্ধির বস্তুবোধ।

অভিজ্ঞতার জগৎ ব্যাবহারিক বলিয়া তাহার শৃঙ্খলাও কেবলমাত্র ব্যাবহারিক। কর্ত্তব্য-বোধে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে, মানবাত্মার স্বাধীনতা কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাবহারিক নয়। বিজ্ঞান যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমরা আদর্শ রচনা করি। বিজ্ঞান আমাদের পর্য্যবেক্ষণকে প্রসারিত করে, কিন্তু পৃথিবীর পারমার্থিক সত্তাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সৃষ্টির সেই পারমার্থিক সত্তা কর্ত্তব্যবোধে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, কারণ কর্ত্তব্যবোধ

ব্যক্তির প্রবৃত্তিজাত বা কল্পনাপ্রসূত নহে, তাহা ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির স্বকীয় স্বভাবের আবির্ভাব। কথাটীকে ঘুরাইয়া বলা চলে যে বিষয়ীর মানস ইতিহাসে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ, সেই বিভিন্ন বিষয়ীর মানস-ইতিহাস বিচিত্র। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি, তাই আমাদের কাজকর্ম্ম, আমাদের পছন্দ অপছন্দের মধ্যেও বিভিন্ন স্বভাবের প্রকাশ। মনস্তত্ত্বে মানুষের যে প্রকৃতির পরিচয় মেলে, তাহাকে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া ভাবা যায়। ভিন্ন লোকের ভিন্ন কর্ম্ম-পদ্ধতি, ভিন্ন চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তাই আমাদের বোধগম্য। মানুষের চরিত্র-বিচারেও তাই অতীত ইতিহাস, বংশ-পরিচয়, অবস্থা-সংস্থান প্রভৃতিকে ভোলা যায় না।

বিষয়ী কার্য্যকারণ-সূত্রের অধীন বলিয়া ব্যাবহারিক। তাহা হইলে আত্মার স্বাধীনতার সম্ভাবনা কোথায়? বিজ্ঞান ব্যাবহারিক। তাই বিজ্ঞানের কার্য্যকারণ সূত্রের প্রয়োগও অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিষয়ী ও বিষয় উভয়ই যদি ব্যাবহারিক বলিয়া প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার কি কোন অর্থ থাকে? থাকিলেও কি আমরা তাহার কল্পনা করিতে পারি?

কর্ত্তব্যবোধের মধ্যে কাণ্ট এই পারমার্থিক সত্যের আভাস দেখিয়াছেন। অভিজ্ঞতায় কর্ত্তব্যবোধের মত অপূর্ব্ব বা আশ্চর্য্য কিছুই নাই; কারণ প্রকৃতির সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে মানুষের স্বভাবের সহস্র বিভিন্নতার মধ্যেও কর্ত্তব্যবোধ এক এবং অদ্বিতীয়। কর্ত্তব্যপালনে আমাদের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে, বহুস্থলে ঘটিয়াও থাকে, কিন্তু সমস্ত চ্যুতিবিচ্যুতির মধ্যেও কর্ত্তব্যবোধ চিরজাগরূক। পদস্খলনের মুহূর্ত্তেও আমরা জানিলাম পদস্খলন হইতেছে, কর্ত্তব্য পালন না করিলেও কর্ত্তব্য কী তাহা সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করি।

আমাদের পচ্ছন্দ অপচ্ছন্দ বা কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সঙ্গে কর্ত্তব্য-

বোধের কোন সম্বন্ধ নাই। ভালই লাগুক অথবা মন্দই লাগুক, কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যই থাকিয়া যায়। অতীতের কৃতকর্ম্মের বিষয় ভাবিলেও আমরা কেন যে তাহা করিয়াছি তাহা হয়তো বুঝিতে পারি, কেন প্রলোভন এড়াইতে পারি নাই, তাহা হয়তো স্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়, তবু কর্ত্তব্য যে কী, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

কর্ত্তব্যবোধে তাই মানবাত্মার স্বাধীনতার প্রকাশ, কারণ যাহা করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য কিছু করাও যে সম্ভব ছিল ইহাই কর্ত্তব্য-বোধের ভিত্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিলে কর্ত্তব্যবোধের কোন অর্থ থাকে না, কারণ বিভিন্ন কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনভাবে একটিকে বাছিয়া লইতে পারিলেই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা উঠে। গাছে উঠা অথবা না উঠা আমার ইচ্ছাধীন, তাই গাছে চড়ার বেলা কর্ত্তব্যের কথা বোধগম্য, কিন্তু গাছ হইতে পড়িয়া গেলে কাহারও আঘাত লাগা না লাগা আমার ইচ্ছাধীন নহে, সে ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের কথা উঠেই না।

কর্ত্তব্যবোধ তাই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, অথচ মানবাত্মার স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের জগতে স্বাধীনতার অবকাশ নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের জগৎ ব্যাবহারিক, তাই ব্রহ্মের সত্তা বিজ্ঞানের সূত্রে প্রকাশিত হইতে পারে না। অন্য পক্ষে কর্ত্তব্যবোধ মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতি—সে অনুভূতিকেও অস্বীকার করা চলে না, তাই বলিতে হয় যে, কর্ত্তব্যবোধে মানুষ ব্যাবহারিক জগতের সীমানা অতিক্রমের আভাস পায়। বিষয়ী হিসাবে মানুষও জগতের অংশ; তাহার মানস ইতিহাসেও কার্য্যকারণ-সূত্রের একচ্ছত্র অধিকার, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে মানুষ কেবলমাত্র বিষয়ী নহে, বিষয়ীর অতীত সত্তার পরিচয় কর্ত্তব্যবোধে প্রকাশিত।

বাস্তব জগতের কার্য্যকারণ-সূত্র বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের বেলায়ই

প্রযোজ্য, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে কার্য্যকারণ-সূত্রের একাধিপত্য অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতার আভাস মেলে, তাই কর্ত্তব্যবোধকে ব্যাবহারিক জগতের নিয়ম দিয়া বুঝা যায় না। স্বাধীনতা বা কর্ত্তব্যবোধ তাই বোধাতীত, কারণ ব্যাবহারিক সত্যের কেন্দ্রেই বুদ্ধির প্রয়োগ। স্বাধীনতা বা কর্ত্তব্যবোধ বোধাতীত, কিন্তু তাই বলিয়া অজ্ঞেয় নহে। বোধাতীত বলিয়া সে জ্ঞানকে সূত্রে প্রকাশ করা যায় না—মানবাত্মার সাধনায় উদ্ভাসিত।

কর্ত্তব্যবোধকে তাই ব্যাবহারিক জগতের শৃঙ্খলার মধ্যে মানবাত্মার ব্রহ্মরূপের আবির্ভাব বলা চলে। কর্ত্তব্যবোধ আছে বলিয়া মানুষ নিজেকে কেবলমাত্র বস্তু বলিয়া ভাবে না, বিশ্বের বস্তু-বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। অন্য মানুষের কাছেও তাহার সেই দাবি, এবং তাই নিজের কর্ম্মের জন্য মানুষ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লয়, অন্যের কাছেও তাহার কার্য্যের জন্য যুক্তি খোঁজে। এক কথায় মানুষ আপনাকে আপনার কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া দাবি করে, আপনাকে স্বাধীন বলিয়া জানে।

কর্ত্তব্য-পালনে মানুষ তাই স্বাধীন, কারণ স্বেচ্ছায় মানুষ কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লয়। তাই কর্ত্তব্য বিচারে ফলাফলের স্থান নাই—ফলাফল হিসাব করিয়া যে কাজ আমরা করি, তাহাতে ভবিষ্যতের দুঃখ সুখের আকর্ষণ আমাদের ইচ্ছা-শক্তিকে অভিভূত করে বলিয়া আমাদের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। কর্ত্তব্য স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ, তাই কেবল মাত্র আত্মার স্বাধীনতা হইতে যে কর্ম্মের উদ্ভব, তাহাই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশও তাই সার্ব্বিক এবং সার্ব্বভৌম—তাহার ব্যত্যয় নাই, থাকিতে পারে না। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য, সমস্ত দেশে সমস্ত কালে সকলের জন্য তাহা এক এবং অদ্বিতীয়।

সাংসারিক বুদ্ধির সঙ্গে কর্ত্তব্য বোধের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। সাংসারিক বুদ্ধি দিয়া আমরা সুখ পাই, এবং সুখ পাইতে হইলে যাহা করা দরকার, তাহাকে সমীচীন মনে করি। নীতির সূত্রেও বহু-স্থলেই এই সাংসারিক বুদ্ধিই প্রকাশ পায়। ব্যবসায় উন্নতি করিতে হইলে সততা না হইলে চলে না। কিন্তু তাহার অর্থ ই এই যে, উন্নতির জন্যই সততার প্রয়োজন। তেমনি বলা চলে যে, গরম দেশে পরিষ্কার থাকিতে হইলে প্রত্যহ স্নান করা দরকার, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদের কর্ম্মের উদ্দেশ্য কর্ম্মের মধ্যেই নিহিত নয়, বাহিরের অন্য কোন উদ্দেশ্য বা আদর্শের জন্যই বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতির আদর। কর্ত্তব্যের বেলায় কিন্তু কাণ্ট ঠিক সেই কথাই অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য যে, কর্ত্তব্যের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য—বাহিরের অন্য কোন লক্ষ্যের জন্য যে কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহাকে আর যাহাই বলি না কেন, কর্ত্তব্য বলা চলে না।

কর্ত্তব্য মানুষের ব্রহ্মরূপের প্রকাশ, অর্থাৎ মানুষের চরম সত্য কর্ত্তব্যে ব্যাবহারিক জগতে আবির্ভূত হয়। ব্রহ্মরূপের প্রকাশ বলিয়া কর্ত্তব্যবোধে ব্যাবহারিক জগতের কোন কিছুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। এককথায় মানুষের ব্যাবহারিক সত্তা কর্ত্তব্যবোধকে অনুপ্রাণিত করে না। বিষয়ীর স্বভাব বা মানস ইতিহাস, সংসার ও সমাজের ঘটনা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে তাই কর্ত্তব্যের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যাবহারিক জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য হইতে তাহা মুক্ত, তাই কর্ত্তব্যবোধ স্বয়ম্ভূ এবং আপনার মধ্যে পূর্ণ। কর্ত্তব্যবোধের তাই কোন বৈচিত্র্য নাই—কর্ত্তব্য এক অনাদি এবং সার্ব্বিক।

মানুষের কর্ত্তব্যবোধ তাই কেবলমাত্র স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যাবহারিক জগতে তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার ঐক্য ব্যতীত আর কিছুই ধরা পড়ে না। তাই কাণ্ট বলিলেন যে, আমাদের

কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য পালন করা। কর্ত্তব্য সার্ব্বিক, তাই যে কর্ম্মকে আমরা সার্ব্বিক বলিয়া ভাবিতে পারি, কেবলমাত্র তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছায় সমস্ত মানুষের করণীয় বলিয়া যাহা বরণ করিয়া লওয়া যায়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যে মানবাত্মার স্বাধীনতার পরিচয় মেলে, স্বাধীনতা মানুষের ব্রহ্মরূপের আভাস, তাই সংসারে মানুষের স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছুরই মর্য্যাদা নাই। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা সমস্ত তথ্য, তাহার সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণ-সূত্রের একাধিপত্য, কাজেই তাহার মধ্যে কোথাও আদর্শ বা মর্য্যাদার অবকাশ নাই। কর্ত্তব্যবোধে মানবাত্মা আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করে, সৃষ্টিলীলার অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খল অতিক্রম করিবার দাবি করে,—তাই সেখানে আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়।

এই স্বাধীনতাকে বুদ্ধি দিয়া প্রমাণ করা চলে না,—তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। স্বাধীনতা বোধাতীত, কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা যায় না। কর্ত্তব্যবোধে আমরা জানি যে, আমাদের অন্তরতম সত্তা স্বাধীন এবং সক্রিয়। জগৎ প্রপঞ্চের মধ্যে আত্মা আদর্শ নির্দ্দেশ করিয়া সাধনা করিতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের কর্ম্ম জগৎ-বহির্ভূতও নহে। কর্ম্মের ধারা ও ফলাফল ব্যাবহারিক জগতে প্রকাশিত, তাই ব্যাবহারিক জগতের কার্য্যকারণ-সূত্রের আধিপত্য আমাদের কর্ম্মে বিরাজমান। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যবোধে আমরা জানি যে, ব্যাবহারিক জগতের সমস্ত নিয়মাতীত সত্তাও আমাদের আছে—সেখানে আমরা স্বাধীন।

এ সমাধানে কিন্তু সমস্যার সমাপ্তি হয় না। এক পক্ষে জ্ঞানের বিষয়ী হিসাবে ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং সেই কারণে যান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অন্য পক্ষে কর্ম্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তি সমস্ত অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক সত্যস্বরূপ।

কিন্তু কর্ত্তব্যের রঙ্গভূমিও এই পৃথিবী, কাজেই ব্যক্তির পারমার্থিক সত্তা প্রতি মুহূর্ত্তেই ব্যাবহারিক জগতে ক্রিয়াশীল। এই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিকের মধ্যে পার্থক্য রক্ষাও অসম্ভব। সমস্যাকে অন্যভাবে দেখিলেও এই একই ফল। জ্ঞানের বিষয়ীকে ব্যাবহারিক ও কর্ম্মের অধিকারীকে পারমার্থিক মনে করিবার অর্থ এই যে, জ্ঞানের জগতের সঙ্গে কর্ম্মের জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার ফলে জ্ঞানহীন কর্ম্ম ও কর্ম্মহীন জ্ঞান উভয়ই সমান অর্থহীন দাঁড়ায়।

অন্য দিক্ দিয়া বিচার করিলেও কর্ত্তব্যবোধের যে পরিকল্পনা কাণ্ট দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের চিত্ত তৃপ্তি পায় না। কর্ত্তব্যবোধ সার্ব্বিক একথা স্বীকার করিয়া লওয়া সহজ, কারণ যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালনে যখনই আমরা অবহেলা করি, তখন আমরা জানি যে, আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে সার্ব্বিক করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। এক কথায় দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমরা চাই যে, পৃথিবীর অন্য সকলেই কর্ত্তব্য পালন করুক, কেবল আমরা নিজে যেন সময় সময় কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পাই!

কর্ত্তব্যপালন বা লঙ্ঘনের বেলায়ই একথা উঠে, কিন্তু জীবনে এমন সন্ধিস্থলও বিরল নহে যখন কর্ত্তব্য যে কি, সে সম্বন্ধেই আমাদের মনে সন্দেহের অন্ত থাকে না। কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য বলিয়া জানিলে তাহা পালনই করি আর লঙ্ঘনই করি, তাহাকে সার্ব্বিক বলিয়া ভাবা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যেখানে কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই আমরা অজ্ঞ, সে স্থলে কেবলমাত্র সার্ব্বিকতার বিচারে কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্ভব নহে। মিথ্যা কথা বলা অন্যায় তাই মিথ্যা কখন সার্ব্বিক হইতে পারে না। সকলেই মিথ্যা কহিলে কেহই আর কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। কাজেই মিথ্যা কথাই আর টিঁকিবে না—একথাও সত্য। কিন্তু আততায়ীর কবল হইতে

নিরাপরাধীকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলা ন্যায় কি অন্যায়—তাহা লইয়া মতভেদ প্রবল। আসল কথা এই যে, কাণ্ট প্রত্যেকটী কর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, কর্ম্মকে সার্ব্বিক ভাবিতে পারিলে তাহা কর্ত্তব্য, না পারিলে তাহা অন্যায়। কিন্তু বস্তুত পক্ষে কোন কর্ম্মই বিচ্ছিন্ন নয়—বিচ্ছিন্নভাবে কর্ম্মের বিচার করিতে বসিলে ন্যায়-অন্যায়ের কোন অর্থ থাকে না। চাবি দিয়া আমি আমার বাক্স খুলি—চোরও চুরি করিবার জন্য চাবি দিয়া আমার বাক্স খুলিতে পারে। কেবল মাত্র শারীরিক কর্ম্ম হিসাবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনোবৃত্তি, উদ্দেশ্য, অতীত ইতিহাস—এক কথায় ব্যাবহারিক জগতের জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদানকে যদি আমরা অবহেলা করি, তবে কর্ম্ম হিসাবে দুইই এক।

ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা তুলিয়া কাণ্ট উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যের কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কর্ত্তব্যবোধের উদ্দেশ্যে যাহা সাধিত, কেবল-মাত্র তাহারই মর্য্যাদা আছে, অন্যথায় কোন কাজকে কর্ত্তব্য বলার কোন অর্থ থাকে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, সওদাগর যখন ব্যবসায় উন্নতির জন্য সততা অবলম্বন করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য ধনলাভ—কাজেই তাহার কর্ম্ম বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, কর্ত্তব্য নহে। মানুষের আত্ম-মর্য্যাদার আহ্বানে যে সততা কেবল মাত্র তাহাকে কর্ত্তব্য বলা চলে।

উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য স্বীকার করিয়া লইয়াও কর্ম্মফলের তাৎপর্য্য স্বীকার করেন নাই বলিয়াই কাণ্টের বিবরণে তৃপ্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মবিচারে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য বা কেবলমাত্র ফলাফল ধরিলে নানারূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী—উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সমস্ত লইয়াই কর্ম্ম, কাজেই কর্ম্মের সমগ্রতাকে ভুলিলে চলিবে না। বিশ্লেষণের খাতিরে কখনও উদ্দেশ্য, কখনও ফলাফলের বিষয় বিচার চলিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্য বোধের বেলায় সমস্ত লইয়াই আমাদের কারবার।

তাই কেবলমাত্র সার্ব্বিকতার বিচার করিয়া কর্ত্তব্যনির্ণয় চলে না। বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কথা ভুলিয়া গেলে কর্ত্তব্য যে করণীয় সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, থাকিতে পারে না। জীবনে কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে বিশেষ কর্ত্তব্য নির্ণয়ই আমাদের সমস্যা, সেখানে সম্বন্ধমুক্ত সাধারণ কর্ত্তব্যবোধ কোন কাজেই আসে না, অথচ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কর্ত্তব্য যে কী, সে বিষয় মতভেদের অন্ত নাই। সুন্দর বরণীয়, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, কিন্তু কী যে সুন্দর তাহা লইয়া সৃষ্টির আদিম দিবস হইতে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতান্তর।

মানুষের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তাকে পৃথক করিয়া দেখিবার ফলেই এ সমস্ত সমস্যার উদয়। কর্ত্তব্যবোধে মানুষ কর্ম্মের অধিকারী এবং সেই জন্য পারমার্থিক সত্যস্বরূপ। অন্য পক্ষে মানুষের ব্যাবহারিক সত্তাকেও অস্বীকার করা চলে না—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই ব্যাবহারিক মানুষকেই আমরা জানিতে পারি। অথচ পারমার্থিকের সঙ্গে ব্যাবহারিকের সম্বন্ধ নির্ণয় আমাদের কল্পনাতীত—সে সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টাই স্ববিরোধী। তাই স্বতন্ত্র সম্বন্ধহীন ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকের লীলাভূমি হিসাবে অভিজ্ঞতাও অর্থহীন হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্যবোধের যে মর্য্যাদা কান্টীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য, তাহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সমস্ত কর্ম্মই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কার্য্যকারণ-সূত্রের অধীন, তাই সে হিসাবে সমস্ত কর্ম্মই ব্যাবহারিক। অন্য পক্ষে, সমস্ত কর্ম্মেই মানুষের স্বাধীন আত্মা আত্মপ্রকাশ করে, তাই সমস্ত কর্ম্মই কর্ত্তব্যবোধের প্রকাশ। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মেই যদি কর্ত্তব্যবোধ আত্মপ্রকাশ করে, তবে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না, এবং মানুষের ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার পার্থক্যও নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানাতীত পারমার্থিক জগতে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা স্থাপনের প্রয়াস তাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

জাতীয়তার ঋষি হার্ডার*

শ্রীমন্মথনাথ সরকার, এম এ
গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ

হার্ডার ও বঙ্গ-চিন্তা

১৯৩২ সনে "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই গবেষণাধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত পরিষদের অন্যতম গবেষকরূপে আমার পরিচয় ঘটিতে আরম্ভ করে। পরিষদের বিভিন্ন বৈঠকে এবং নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে বিনয়বাবুকে প্রায়ই জার্ম্মাণির দার্শনিক-প্রবর হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) মহত্ত্ব প্রচার করিতে শুনিয়াছি। "ফোল্‌কৃস্‌-জেলে," "ফোল্‌কৃস্‌-গাইষ্ট," জাতীয় আত্মা, লোক-আত্মা, দেশের প্রাণ প্রভৃতির আলোচনা বিনয়বাবুর মুখে শুনিতে শুনিতে সমাজ-দর্শনের অন্যতম জন্মদাতারূপে হার্ডারকে চিনিতে পারিয়াছি।

হার্ডার-কথা বাঙালী সুধীবর্গ ও সমাজের কাছে নূতন নয়। গত ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া বিনয়বাবু বঙ্গবাসীদের সহিত পাশ্চাত্যের অদ্বিতীয় চিন্তাবীর হার্ডারের পরিচয় ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ১৯০৭ সনে তাঁহার উদ্যোগে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সাহিত্যালোচনা বিভাগে লোক-সাহিত্য, লোক-নৃত্য, সামাজিক উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সমস্ত গবেষণা উপলক্ষে এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের "আদ্যের

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে পঠিত, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

গম্ভীরা" নামক পুস্তকের আবহাওয়ায় (১৯১২) মহামতি হার্ডারের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

১৯১২-১৪ সনে "গৃহস্থ" মাসিকের সম্পাদকরূপে বিনয়বাবু বিশ্বশক্তি বিশ্লেষণের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যেরও অবতারণা করেন। রুশ সাহিত্য, জার্ম্মাণ সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনার প্রতি তিনি বাঙালী জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই আবহাওয়ায় জনসাধারণের নিকট হার্ডারের কীর্ত্তিও প্রচারিত হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১৯১৪) বিনয়বাবু "দেশের লোক," "জনসাধারণ" "জনসাধারণের যুগ", নৃতত্ত্ব ইত্যাদির উপর বিশেষ জোর দিতেন। "বিশ্ব-শক্তি" (১৯১৪) গ্রন্থেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে বিশ্বসাহিত্য প্রচারক, নৃতত্ত্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয়তার ঋষি হার্ডার তাঁহার সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতে থাকেন।

বিনয়বাবুর "বর্ত্তমান জগৎ" (১৯১৪-১৯২৪) গ্রন্থাবলীতে সাহিত্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে হার্ডারের নাম ও কৃতিত্ব দেখিতে পাই। তাঁহার "পরাজিত জার্ম্মাণি" গ্রন্থেও (১৯১৪) হার্ডারের সম্বর্দ্ধনা যথাযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে।

১৯২৭-২৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় "ক্যাটিগরিজ্ অব্ সোসিয়েট্যাল স্পেকিউলেশন ফ্রম হার্ডার টু সোরোকিন" অর্থাৎ "হার্ডার হইতে সোরোকিন পর্য্যন্ত সমাজ-চিন্তার ধারা" শীর্ষক বিনয়বাবুর ৯।১০টা প্রবন্ধ বাহির হয়। দেখা যাইতেছে যে, এইসমস্ত প্রবন্ধে তিনি সমাজ-বিষয়ক চিন্তাক্ষেত্রের যুগস্তম্ভরূপে হার্ডারের অবদান ও কৃতিত্ব বিবৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সমাজবিজ্ঞানের গোড়ায় হার্ডারকে রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ ফরাসী পণ্ডিত কঁৎকে এই স্থানে রাখা হয়। কিন্তু কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) হার্ডারের বেশ-কিছু পরবর্ত্তী লোক।

১৯২৮ সনে "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ সিন্স নাইনটিন ফাইভ" অর্থাৎ "১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী রাষ্ট্রদর্শনের পরিচয়" নামক গ্রন্থে বিনয়বাবু জার্ম্মাণ রোমাণ্টিক রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে আলোচনার সময় ফিখ্‌টে (১৭৬২-১৮১৪) ও হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে হার্ডারের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত-সমাজ ফরাসী সমাজ-দার্শনিক কঁৎকেই (১৭৯৮-১৮৫৭) আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের জনয়িতারূপে প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইতেছে যে, সন-তারিখ হিসাবে হার্ডারের পরে আসিয়াছেন কঁৎ।

সকলেই জানেন যে, জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিখ্‌টেই আধুনিক জাতীয়তা-বোধকে রূপ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিনয়বাবুর মতে এই আদর্শের *প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন দার্শনিক-প্রবর হার্ডার*। এই সঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) হার্ডারের সমসাময়িক এবং অগ্রবর্ত্তী। মহাকবি গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২) হার্ডারের কয়েক বৎসরের ছোট।

১৯৩৩ সনের জানুয়ারি মাসে হিট্‌লার-রাজ কায়েম হয়। সেই বৎসরই বিনয়বাবু "হিট্‌লার ষ্টেট" শীর্ষক একটী পুস্তিকা লিখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি জার্ম্মাণ সংস্কৃতিকে—'ফ্রম হার্ডার টু হিট্‌লার' অর্থাৎ 'হার্ডার হইতে হিটলার পর্য্যন্ত' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বিনয়বাবুর বিশ্বাস যে, হিট্‌লার-শাসিত বর্ত্তমান জার্ম্মাণির স্বরূপ বুঝিতে হইলে, আর জার্ম্মাণ সংস্কৃতির বিশেষত্ব পাকড়াও করিতে হইলে হার্ডারের মতবাদের সহিত সম্যক পরিচয়ের প্রয়োজন। বিনয়বাবু এই প্রবন্ধে সেই কথাটাই খোলাখুলি বলিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা ও সমাজদর্শনের ঋষি হার্ডারের এইরূপ পরিচয়-প্রাপ্তির পর বাঙালী জাতির নিকট এই পাশ্চাত্য মনীষীর সামান্য কিছু পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধটীর অবতারণা

করা হইল। হার্ডার সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থাবলী বিরল। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিণ পণ্ডিত আর্গাঙ-প্রণীত "হার্ডার অ্যাণ্ড দি ফাউণ্ডেশন্‌স্ অব্ জার্ম্মাণ ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" (নিউ ইয়র্ক ১৯৩১) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলাম।

হার্ডার বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। "ইডেয়েন ৎসুর ফিলোজোফী ড্যর গেশিষ্টে" (ইতিহাস-দর্শন বিষয়ক চিন্তা) বোধ হয় সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। ১৭৮৪-১৭৯০ সনের ভিতর গ্রন্থটা বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯) মনে রাখিতে হইবে।

এই সঙ্গে বলা প্রাসঙ্গিক যে, কঁৎ প্রণীত "ফিলোজোফী পোজিটিভ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ১৮৩০ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। অর্থাৎ হার্ডারের বই কঁৎ-এর বইয়ের প্রপ্রকাশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

মানবতা ও জাতি

হার্ডার লিখিয়াছেন, " মানবতার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যাহাই হউক না কেন, সমস্ত রাষ্ট্র ও সমস্ত সমাজে মানবতাই তাহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল।" "মানবতাই মানব-প্রকৃতির চির উদ্দেশ্য"—এই ভাব-ধারাটা হার্ডার ইতিহাস-দর্শনের মূল ভাব-ধারা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তাধারাও এই ভাব-ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত, মানবতার ভাব-ধারাটা পরিস্ফুট করিয়া তোলাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। তবে এ-বিষয়ে তিনি বোধ হয় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

মানবতা শব্দটা সম্বন্ধে হার্ডারের ধারণা কিরূপ ছিল, কোন্ কোন্ অর্থে তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব না হইলেও রীতিমত শক্ত। মোটামুটিভাবে মানুষের

নিজস্ব মানসিক শক্তি ও বৃত্তিসমূহের সমন্বয়রূপে ইহাকে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ মানুষের দেবত্বের দিক্‌টাই মানবতারূপে পরিচিত। হার্ডার বলিয়াছেন—"মানুষকে মানুষ হইতে হইবে। আপনার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তাহাকে নিজের অবস্থার চরম উন্নতি সাধন করিতে হইবে।" হার্ডার কিন্তু খৃষ্টের স্বমুখ-নিঃসৃত রচনাবলীর মধ্যে খাঁটী মানবতার সন্ধান পাইয়াছেন। যীশু খৃষ্টের এই সমস্ত রচনা সংরক্ষিতও হইয়াছে। হার্ডার বলেন—"যীশুখৃষ্ট তাঁহার নিজের জীবনেই মানবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন, এবং মৃত্যুদ্বারা তাহা পূর্ণরূপে প্রাতপন্ন করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি মানুষের পুত্ররূপেই আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।" হার্ডার আরও লিখিয়াছেন "ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মানবতা"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হার্ডার মানবতাকে ইতিহাস ও ধর্ম্মের চরম লক্ষ্যস্থলরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

মানবতার বিকাশলাভের কেন্দ্র কিন্তু ব্যক্তি নয়। দল বা সঙ্ঘই বিকাশ-প্রাপ্তির একমাত্র উপকরণ। একটা নির্দ্দিষ্ট ও বিশেষ সঙ্ঘকে অবলম্বন করিয়াই মানবতা বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। এই সঙ্ঘ জাতীয় দল এবং সঙ্ঘ-নীতি জাতীয়তা নামে পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোনো ধর্ম্মীয় বা উপাসক সম্প্রদায় হার্ডারের মতে মানবতার বিকাশলাভের উপযোগী সঙ্ঘ-পদবাচ্য হইতে পারে না। হার্ডারের নিকট এই জাতীয় সঙ্ঘ রীতিমত প্রাণবন্ত বস্তু। সেইজন্য জীবন্ত বস্তু মাত্রেরই প্রধান প্রধান লক্ষণ—জন্ম, পরিণতি ও অবনতি বা মৃত্যু-তিনি জাতীয় সঙ্ঘেও আরোপ করিয়াছেন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি, নিকৃষ্ট হইতে উত্তম, উত্তম হইতে শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উন্নীত হইয়া আবার শ্রেষ্ঠ হইতে নিকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হয়। কলা এবং বিজ্ঞানের বেলাতেও এই কথা খাটে। এইসমস্ত জন্ম গ্রহণ করে, মুকুলিত হয়, পূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং ঝরিয়া পড়ে।

জাতিগত চিত্ত

প্রত্যেক জীবন্ত জাতির মধ্যেই সৃষ্টি-ধর্ম্মী ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাযুক্ত জাতীয় চিত্ত নিহিত আছে। হার্ডারের মতে এই জাতীয় চিত্ত বা সৃষ্টি-শক্তিই "পৃথিবীর সমস্ত সংস্কৃতির জনয়িতা"। অন্য কথায় সমস্ত সংস্কৃতি এই জাতীয় চিত্তেরই অভিব্যক্তি। দেহ ও চিত্তবিশিষ্ট এক একটা জাতীয় সঙ্ঘ বা দল যেন পৃথক সত্তাযুক্ত একটা ব্যক্তি। এই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের এক একটা অধ্যায়ের ভিতর দিয়া, ভাষায় সাহিত্যে, ধর্ম্মে, দেশাচারে, কলা-বিদ্যায়, বিজ্ঞানে ও আইনে আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। আত্মপ্রকাশ ও অভিব্যক্তির এইসমস্ত ধারা জাতীয় কৃষ্টিরূপে পরিচিত। কৃষ্টি বা সংস্কৃতির আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, ব্যক্তির মতো এইগুলার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। দুনিয়ায় এমন দুইটা কৃষ্টির অস্তিত্ব নাই যে দুটাকে পরস্পরের সমকক্ষ বা জুড়িদাররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জাতিরই এমন একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে যাহা হার্ডারের মতে "ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।"

এখন জিজ্ঞাস্য, কেমন করিয়া এইসমস্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি-যুক্ত জীবন্ত মানব-সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক জাতির বিশেষ ধরণের সংস্কৃতিই বা কেন? হার্ডারের মতে সমস্ত মানুষ একটামাত্র রক্তগত জাতি হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। হার্ডার মানবজাতিকে বিভিন্ন রক্তগত জাতিতে বিভক্ত রূপে কল্পনা করার বিরোধী। তিনি লিখিয়াছেন—"অনেকে চার-পাঁচটা বিভিন্ন বিভাগকে রক্তগত জাতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বিভিন্ন দেশ বা বিভিন্ন বর্ণ অবলম্বন করিয়াই এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু এইরূপ শ্রেণীভেদের যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাই না। রক্তগত জাতি সৃষ্টিগত পার্থক্যেরই

পরিচায়ক।" হার্ডারের মতে সৃষ্টির দিক্ হইতে জাতিগত কৃষ্টির পার্থক্য ঘটে নাই।

জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে হার্ডারের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :— (১) কতকগুলি পারিপার্শ্বিক শক্তি ও প্রভাবই বিভিন্ন কৃষ্টি বা সংস্কৃতিকে রূপপ্রদান করিয়াছে। প্রাকৃতিক আবেষ্টন ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে হার্ডার খুব জোর দিয়াছেন। (২) শিক্ষাও এই বৈশিষ্ট্যকে রূপ প্রদান করিয়া থাকে। হার্ডার লিখিয়াছেন—"শিক্ষা, উপদেশ ও স্থায়ী দৃষ্টান্ত মানুষকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। (৩) অন্যান্য জাতির সহিত যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান বা তাহাদের সহিত অসহযোগিতাও জাতীয় বিশেষত্বের পথ পরিষ্কার করে। হার্ডার ইহাকে বাহিরের প্রভাবরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (৪) সংস্কার এবং ঐতিহ্যও জাতীয়-কৃষ্টি গঠনে সহায়তা করে। ভাষা এই ঐতিহ্যের একমাত্র বাহন। ভাষার সাহায্যেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং এক পুরুষের সহিত অন্য পুরুষের ভাবের অদান-প্রদান সম্ভবপর হয়। মানুষের ভাব-ধারণা, মনোভাব ও কার্য্য-কলাপ প্রচার ভাষার সাহয্যেই সম্পন্ন হয়; ভাষার সাহায্যেই অতীতের সম্পদ্ পরবর্ত্তী যুগের বংশধরদের নিকট উপনীত হয়। ভাষার সাহায্যেই জাতি শিক্ষালাভ করে এবং গঠিত হয়। (৫) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছাড়া বংশানুক্রম ও জন্মগত উত্তরাধিকারও জাতীয় বৈশিষ্ট্য গঠনের আর একটী উপাদান। জাতীয় চিত্তের উপর বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের ফলে জাতীয় চরিত্র গড়িয়া উঠে। হার্ডার লিখিয়াছেন—"আমাদের যাহা কিছু মহান্, তাহার জন্য আমাদের নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই; আমাদের পিতৃভূমিই আমাদের চিন্তা, কাজ ও জীবনযাত্রার প্রণালী দান করিয়াছে।"

জাতির সংগঠনে মানুষের অবদান অস্বীকার করা যায় না। হার্ডার

কিন্তু জাতিকে প্রকৃতিলব্ধ রূপেই কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং জাতীয় বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। ফরাসী চিন্তাবীর রুসো প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছেন, হার্ডার তাহা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। সামাজিক চুক্তির বিপরীত পথেই কৃষ্টির বিকাশলাভ ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হার্ডারের চোখে 'জাতীয়' ও 'প্রাকৃতিক' ঠিক একই ধরণের বস্তু। রুসো কিন্তু তাঁহার 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, আইনের কল্যাণেই মানুষের মধ্যে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও মিলিয়া-মিশিয়া চলিবার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। হার্ডার প্রকৃতির মধ্যেই এই শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতিরূপী স্থাপত্য-শিল্পীই মানবসঙ্ঘের পরিকল্পনা স্থির করিয়া উহা গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ, প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত জাতীয় বিশেষত্বসমূহকে আমল দিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন বিশ্বজনীনতার প্রচারক। কিন্তু হার্ডার প্রকৃতিনিষ্ঠ। আংশিক ভাবে এই কারণবশতঃ তিনি তাঁহার সমসাময়িক বিশ্বজনীনতার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। "আউখ আইনে ফিলোজোফী" (আর একটা দর্শন) গ্রন্থে তিনি বিশ্বজনীনতার বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রাম ঘোষণা করেন। গোটা পৃথিবীর জন্য একই ধরণের সভ্যতা যাঁহারা প্রচার করিতেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট ঘৃণা ও বিদ্রূপের সহিতই লেখনী সঞ্চালন করেন।

প্রত্যেক জাতিই প্রকৃতি-গঠিত। মানুষ সেইজন্য উহার বিকাশ লাভের পথ সীমাবদ্ধ করিতে অক্ষম। কিন্তু মানুষ প্রকৃতি-নির্দ্দেশিত

সীমা বা গণ্ডীর মধ্যেই জাতির বিকাশ সাধন করিতে পারে। এই ভাবে চলা মানুষের কর্ত্তব্যও বটে। কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তিই জাতীয় দল গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং ঐসমস্ত শক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই জাতিকে বিকাশ লাভ করিতে হইবে। একমাত্র মৌলিক ও স্বতঃপ্রণোদিত উপায়গুলিই জাতীয় সঙ্ঘকে মানবতার পথে অগ্রসর করিতে পারে। কৃত্রিম নিয়ম-কানুনের বশবর্ত্তী হইয়া চলা বা প্রাচীন যুগের লোকজনের এবং অন্যান্য জাতির অনুকরণ করা প্রকৃত উন্নতিলাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়; কারণ এইরূপ ব্যবস্থায় জাতীয় চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এক একটী সঙ্ঘবদ্ধ জাতিকে প্রকৃতি কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। ঐসমস্ত শক্তি ও যোগ্যতার উপরেই জীবন্ত ও স্থায়ী সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে সক্ষম।

হার্ডার ছিলেন প্রগতিবাদের পয়গম্বর। মানবতা নিতান্ত শৈশব অবস্থায় রহিয়াছে, এবং জাতীয় ও বিশ্বজনীন সুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তোমার চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর; দেখিবে দুনিয়ায় অধিকাংশ জাতিই এখনও শৈশব অবস্থায়; তাহাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার ও কার্য্যকলাপে শৈশবের ভাবই পরিস্ফুট।" এইজন্য হার্ডার তাঁহার সমসাময়িকদের নিকট হাঁকিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতির কার্য্য-শক্তির বিলোপ ঘটিতে এখনও বহু বিলম্ব; কাজেই প্রত্যেক জাতির পক্ষে এখনও অনেক-কিছু করার প্রয়োজন।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য-গুলার বিকাশ সাধনের পক্ষে হার্ডার জোর প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইলেও তাঁহার আদর্শ ছিল মূলতঃ বিশ্বজনীন। হার্ডার-প্রচারিত ইতিহাস-দর্শন অনুসারে, প্রত্যেক জাতির আপন-আপন বিশেষ ধরণের জাতীয় অভিব্যক্তি দ্বারা মানবতার বিকাশ সাধনেই

সহায়তা করিতেছে। এক-একটী জাতির পৃথক ধরণের সংস্কৃতি বিশ্ব-সভ্যতার এক-একটী বিশেষ ধরণের অবদান ছাড়া আর কিছু নয়। হার্ডার লিখিয়াছেন—"আমাদের জগতে অগণিত বৈচিত্র্যের সমাবেশ মনকে বিস্ময়রসেই আপ্লুত করিয়া ফেলে ; কিন্তু এই দুর্জ্ঞেয় বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য-সূত্র রহিয়াছে, তাহা আরও বেশী বিস্ময়কর।"

রুসো প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলার বিকাশলাভের মধ্যেই মানবজাতির সুখ-শান্তি ও পূর্ণতা-প্রাপ্তির উপায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিবারকেই তিনি একমাত্র স্বাভাবিক সমাজরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যখনই সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করার প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়, তখন আর উহা স্বাভাবিক সঙ্ঘ থাকে না ; উহা স্বেচ্ছাকৃত সঙ্ঘে পরিণত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির উপরে মানবজাতির পূর্ণতা-প্রাপ্তি নির্ভর করে,—জার্ম্মাণ সুধী লেস্‌সিং এইরূপ অভিমত প্রচার করিয়াছেন। মানবজাতিকে তিনি বিভিন্ন জাতি বা রক্তগত সঙ্ঘের সমাবেশরূপে মনে না করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির সমাবেশরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। জার্ম্মাণ কবি শিলারও জাতীয়তার সহিত মানবতার খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, তিনি "আউফক্লেয়ারুং" অর্থাৎ "আলোক-বিস্তার" নামক যুগ-মাফিক মনোভাবেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তখনকার দিনে এই ধরণের মতবাদের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

মানবজাতির প্রতি বিশ্বজনীন প্রেম অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্ডিতদিগকে এমন পাইয়া বসিয়াছিল যে, তাঁহারা পৃথিবীর জাতিনিচয়কে খাঁটী মানবতার অন্তরায়রূপেই বিবেচনা করিতেন। বিশ্বজনীন-ভাবাপন্ন পণ্ডিতদের পক্ষে জাতীয়তার পরিপোষক ধ্যানধারণার বিলোপ-সাধনই চরম লক্ষ্য থাকিত। হার্ডার তাঁহার ইতিহাস-দর্শনে ব্যক্তির পরিবর্ত্তে জাতিকেই মানবতার উপাদানরূপে মানিয়া লইয়াছেন। জাতীয়তা ও

মানবতার মধ্যে তিনি কোনও রূপ বিরোধ দেখিতে পান নাই। তাঁহার মনে উভয় বস্তুই স্থানলাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে তিনি জাতীয়তার ভাব-ধারণা ও বিশ্বজনীন আদর্শের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধেরই সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহার ইতিহাস-দর্শন অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ব-জনীনতা ও উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের যোগসূত্র স্বরূপ।

হার্ডারের প্রভাব

হার্ডারের জাতীয়তাবাদের ভাব-ধারণা ফিখ্‌টের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক একটী জাতি ও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ আন্তরিক আধ্যাত্মিক বন্ধনেই একত্রে সমাবিষ্ট হয়। খুব সম্ভব ফিখ্‌টে এই ভাব-ধারণা হার্ডারের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। হেগেল ও শ্লেগেল হার্ডারের অনুসরণ করিয়া জাতিকে ব্যক্তিত্ব বিশিষ্টরূপে এবং জাতীয় সংস্কৃতিকে প্রাণশক্তির অধিকারিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। হার্ডারের "ফোল্‌কস্‌-গাইষ্ট" অর্থাৎ "জাতীয় চিত্ত" কথাটী এবং ইহার ভিতরকার আদর্শ দর্শন, আইন-বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং রাষ্ট্র-তত্ত্বে স্থান লাভ করিয়াছে। সাহিত্য ও দর্শনক্ষেত্রের রোমান্টিকপন্থীরা "জাতীয় চিত্তে"র ভাব-ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষাশাস্ত্রী গ্রিম, ও আইনশাস্ত্রী সাভিনির লেখার মধ্যেও এই জাতীয় চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় চিত্তের ভাবধারণা অন্যান্য বহু বিষয়েও স্থান লাভ করিয়াছে। ফিশার সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানে, ভাকারনাগেল কাব্যে, ষ্টাইন্‌থাল ভাষা-বিজ্ঞানে, রশার ধনবিজ্ঞানে, লাজারুসও ভুণ্ট্‌ চিত্তবিজ্ঞানে হার্ডার-প্রচারিত জাতীয় চিত্তের তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। জাতীয় চিত্ত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম-জীবনে জাতীয় চিত্তের প্রভাব-বিশ্লেষণ মানব-চিন্তার ইতিহাসে হার্ডারের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই অবদান

দ্বারা তিনি দুনিয়ার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। জগতের চিন্তাক্ষেত্রে হার্ডার অন্যতম যুগাবতার বিশেষ।

হার্ডারের সুপ্রসিদ্ধ "ইডেয়েন" (চিন্তা) গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের ভাব-ধারণা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে মহাকবি গ্যেটে বলিয়াছেন, "অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হার্ডারের ভাব-ধারণা এত বেশী প্রয়োগ করিয়াছেন যে, অল্পকাল মধ্যে ইহা সাধারণ জ্ঞানসম্পদে, এমন কি নিতান্ত আটপৌরে কথায় পরিণত হয়।" গ্যেটে স্বয়ং পুস্তকখানি বহুবার পাঠ করিয়া ইহাকে "অতি উপাদেয় বাইবেল"রূপে বিবৃত করিয়াছেন। ১৮২৮ সনে ফরাসী পণ্ডিত কিনে-কৃত ফরাসী অনুবাদ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্যেটে মূল পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "জাতির কৃষ্টির উপর এই গ্রন্থ অসম্ভব রকমের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিত মেকলে ১৮৩০ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখে নেপিয়ারের নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তিনি বলেন—"আধুনিক ইয়োরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইডেয়েন এক নবযুগের পত্তন করিয়াছে।"

মানবতার বিকাশ-সাধনের জন্য জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলার পরিণতি সাধনের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। এই কারণবশতঃ হার্ডার এই বৈশিষ্ট্যগুলার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস এত বেশী প্রয়োজনীয় যে, এ সম্বন্ধে কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করা চলে না; রীতিমত হুঁসিয়ার হইয়া এইগুলির বিশ্লেষণের প্রয়োজন। হার্ডারের মতে, কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যের খাঁটী পরিচয় লাভ করিতে হইলে, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পূরাবৃত্ত, এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে গবেষণা করা কর্ত্তব্য। জাতীয় ভাষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় ঐতিহ্য, এককথায় গোটা জাতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান-সম্পদ্ যাহাতে

বর্দ্ধিত হয়, সেই জন্য বড় বড় পণ্ডিতদিগকে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য হার্ডার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

হার্ডার বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক গবেষণার প্রতিষ্ঠাতারূপেও কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। হার্ডারের মতে, বিভিন্ন জাতির সাহিত্য পাঠ করিলে সেইসমস্ত জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও জ্ঞান-বাড়িয়া যাইবে। বিভিন্ন জাতির চল্‌তি লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তিনি তুলনা-মূলক সাহিত্য-গবেষণার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। তুলনা-মূলক সাহিত্য-গবেষণার ভিত্তি-মূল রূপে বিভিন্ন জাতির রূপকথা, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যও তিনি উপদেশ প্রদান করেন।

নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা দ্বারাও ব্যক্তি ও জাতির বৈশিষ্ট্যগুলার পরিচয় পাওয়া যায়। হার্ডার তাঁহার সমসাময়িকদের নিকট এই কথা জোর গলায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঐ যুগে মানুষের সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা নিতান্ত নিকৃষ্ট অবস্থায় ছিল। হার্ডার তাহা বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। "ইডেয়েন" গ্রন্থের পাদ-টীকাগুলি পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে হার্ডারের জ্ঞান খুব প্রগাঢ় ছিল। লোকে এসব বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই পৃথিবীর লোকজন, জাতি প্রভৃতির জ্ঞান সংগ্রহ করিত বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ আদৌ নির্ভরযোগ্য ছিল না।

জাতীয়বাদের স্রষ্টা ঋষি হার্ডারের আহ্বানে সাড়া প্রদান করিয়া এবং তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তিকালে বিস্তর জড়-বিজ্ঞান-সেবী, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌, এবং নৃতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ মানুষের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য ধরাপৃষ্ঠকে তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণে ব্রতী হইয়াছেন। হার্ডারের ভাব-ধারণাসমূহ সম্প্রসারিত করিয়া অনেক-গুলি গ্রন্থও রচিত হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ আলেকজাণ্ডার ফোন

হুমবোল্ড প্রণীত "কসমস", রাট্‌সেল-প্রণীত আন্থ্রোপোগেওগ্রাফী" এবং লট্‌স-প্রণীত "মাইক্রো কসমস" গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম্ম ও কলাবিদ্যার আধুনিক তুলনামূলক গবেষণার পথও তিনি পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। সহকর্ম্মী পণ্ডিত-সমাজ ও শিষ্য-সেবকদের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা-প্রীতি জাগাইয়া তুলিয়া হার্ডার জাতি ও সংস্কৃতি-ঘটিত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সকলকেই সচেতন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বাংলায় জাতীয়তার আন্দোলন

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে বিনয়বাবু যেসব কথা বলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

এতদিনে বাংলা ভাষায় হার্ডার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রণীত হইল, ইহা আনন্দের কথা। হার্ডার সম্বন্ধে কোনো ভারত-সন্তান আজ পর্য্যন্ত ইংরেজিতে অথবা অন্য কোনো ভাষায় কিছু লিখিয়াছেন কিনা জানি না। আমি নানা স্থানে বাংলায় ও ইংরেজিতে হার্ডারের নাম আর দু'একটা শব্দ বা বাণী ব্যবহার করিয়াছি মাত্র। বহু উপলক্ষ্যেই,—বিশেষতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পিটাইবার পেশা চালাইতে গিয়া,—হার্ডারকে লইয়া আলোচনাও করিতে হইয়াছে। কিন্তু হার্ডার সম্বন্ধে একটা সুসম্বদ্ধ রচনা আজ পর্য্যন্ত এই হাতে বাহির হয় নাই। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের বৈঠকে একটা প্রবন্ধের উৎপত্তি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। প্রবন্ধটা ছোট, কিন্তু ইহার ভিতর হার্ডারকে কিছু-কিছু পাকড়াও করা সম্ভব।

রচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, হার্ডারের আসল কথাগুলা সবই বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের রপ্ত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ১৯০৫ সনে যখন স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয় তখনই জাতীয়তা, জাতীয় চিত্ত ইত্যাদি বুখ্‌নি আমাদের আটপৌরে চিজ ছিল। ঠিক যেন হার্ডারের বাণী হইতেই আমরা এইসব ধারণা পাইয়াছিলাম। কিন্তু সেই সময় হার্ডারের নাম বাংলা দেশে অথবা ভারতের আর কোথাও প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। ১৯০৫ সনের সম-সমকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর,—এমন কি যৌবন-আন্দোলনের জন্মদাতা, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার বাণীমূর্ত্তি, কর্ম্মময় জাতীয় আন্দোলনের ধুরন্ধর, জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিখ্‌টেও জাতীয়তার ঋষি বা স্বাদেশিকতার অবতাররূপে ভারতীয় সমাজে পরিচিত ছিলেন না। কাণ্ট্‌-হেগেলের সমসাময়িক, অন্যতম জবরদস্ত্‌ দার্শনিকরূপে ফিখ্‌টে ভারতীয় সুধীমহলে সম্বর্দ্ধনা পাইতেন মাত্র। কিন্তু গৌরবময় বাঙালী-বিপ্লবের যুগে যে যুবক বাংলা ও যুবক ভারতের জন্ম হয় সেই যুবকমণ্ডলীও ফিখ্‌টেকে জাতীয়তার ও স্বাধীনতার মহাপুরুষরূপে চিনিত না।

আসল কথা,—জাতীয়তা, জাতীয় চিত্ত, জাতীয় চৈতন্য, স্বদেশাত্মা, দেশাত্মবোধ, ভারতাত্মা, ভারতের বাণী, ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি শব্দের পশ্চাতে যে দর্শন আছে তাহার "অনেক-কিছুই" ভারতীয় নর-নারী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন এবং রাষ্ট্রিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে লাভ করিয়াছিল। "সাধারণ পাশ্চাত্য" মালরূপেই জাতীয়তার বাণী ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করে। অনেক পরিমাণে,—যদিও পুরাপুরি নয়,—এই বাণী বিদেশ হইতে আমদানি করা মাল। এই বাণীটা যে জার্ম্মাণ মগজের সৃষ্ট মাল, এই কথা সেকালে বোধ হয় জানা ছিল না। জানা থাকিলেও খোলাখুলি

জার্ম্মাণ মুড়োর ইজ্জৎ প্রকাশ করিবার অবসর হয়ত ঘটিয়া উঠে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইয়োরামেরিকার যেসকল নৃতত্ত্ব-সেবী, ভাষাশাস্ত্রী, আইনশাস্ত্রী, শিল্প-শাস্ত্রী, সাহিত্য-সমালোচক, রাষ্ট্র-শাস্ত্রী, ধর্ম্মশাস্ত্রী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের রচনা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মারফৎ ভারতসমাজে প্রচারিত ছিল তাঁহাদের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর হার্ডারের শিষ্য। হার্ডার-প্রচারিত "চিন্তা"সমূহ তাঁহারা গুলিয়া খাইয়া মানুষ হইয়াছিলেন। ইংরেজ পণ্ডিত মেইন ও মিল সেকালের ভারতে অতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারাও হার্ডার-মণ্ডলের অন্তর্গত। কাজেই হার্ডারের নাম না জানিয়াও অথবা অল্পমাত্র জানিয়াও ভারতীয় সুধীরা হার্ডারের কাজ সম্বন্ধে সকলেই বেশ-কিছু ওয়াকেব্‌হাল ছিলেন। এই জন্যই ১৯০৫ সনের ভাব ও চিন্তারাশির ভিতর জাতীয় চিত্ত, ভারতীয় আদর্শ, ভারতাত্মার বাণী "দু-দুগুণে চারের মত" ছেলেখেলা মনে হইত। অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, ১৯০৫ সনের বঙ্গদর্শনের অন্যতম জন্মদাতা ছিলেন জার্ম্মাণ সমাজশাস্ত্রী হার্ডার।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগাইয়াছেন ইতালির স্বদেশ-সেবক মাৎসিনি (১৮০৮-৭২)। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রবীর বিস্‌মার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) আর ইতালিয়ান স্বাদেশিকতার অবতার মাৎসিনি সমসাময়িক। দুইয়ের প্রভাবই উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতীয় কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতাদের জীবনে (১৮৭৫-১৯০০) প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু বিস্‌মার্ককে লোকেরা "কেজো" নেতা বলিয়া জানিত। এই হিসাবে ইতালির কাভুর তাঁহার সমান গোত্রের লোক। কিন্তু সেই যুগের ভারতসন্তান মাৎসিনিকে পূজা করিত জাতীয়তার দর্শন, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ধর্ম্ম, স্বার্থ-ত্যাগের নীতি, স্বাদেশিকতার গীতা ইত্যাদি বস্তুর

প্রচারক ও জলন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে। কাজেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে পাশ্চাত্য চিন্তা-সম্পদের ঠাঁই বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা ইতালিয়ান মাৎসিনিকে খুব উঁচু ইজ্জৎ দিতে বাধ্য। সেই সময়কার ভারতের আত্মা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় চিত্তের স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি শব্দের ভিতর প্রধানভাবে মাৎসিনির দিগ্‌বিজয়ই দেখিতে হইবে।

ঘটনাচক্রে মাৎসিনি আবার উনবিংশ শতাব্দীর চেক, পোল, হাঙ্গারিয়ান ইত্যাদি অন্যান্য ইয়োরোপীয়ান সুধী, স্বদেশসেবক ও স্বাধীনতার পুরোহিতদের মতন পূর্ব্ববর্তী জার্ম্মাণ জাতীয় আন্দোলনের আদর্শে (১৭৮৫-১৮১৫) অনুপ্রাণিত ছিলেন। অর্থাৎ ফিখ্‌টে আর হার্ডার ইত্যাদি জার্ম্মাণ ঋষিরা মাৎসিনিরও গুরুস্থানীয় দার্শনিক। ফলতঃ মাৎসিনির মারফৎ রাষ্ট্রিক জাতীয়তা আর স্বাদেশিকতা পাইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক্‌কার আর বিংশশতাব্দীর প্রথম কয় বৎসরের যুবক ভারত পরোক্ষভাবে হার্ডারের খাইয়াই মানুষ।

এইসকল কথা মনে রাখিলে হার্ডার সম্বন্ধে গবেষণা ও পঠন-পাঠন ভারতীয় সমাজশাস্ত্রী ও রাষ্ট্রশাস্ত্রীদের পক্ষে যারপরনাই মহত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমান আলোচনায় সামান্য সূত্রপাত করা গেল মাত্র।

এইখানে এক কথায় বলিয়া রাখিতেছি যে, হার্ডারের জাতীয়তাতত্ত্ব আমার চিন্তায় টেঁকসই নয়।

হার্ডার-দর্শনের প্রথম কথা জাতীয় চিত্ত। কিন্তু জাতিগত চেতনা, দেশের প্রাণ, সমূহের আত্মা ইত্যাদি বস্তু প্রমাণ করা কঠিন। এই সব প্রধানতঃ কবি-কল্পনার জিনিষ। শুনায় ভাল। কাজেও লাগানো যায়। কিন্তু যুক্তিতে পাওয়া যায় না। হার্ডারের দ্বিতীয় কথা জাতীয় বিশেষত্ব। এই দুই কথা ১৯০৬—১৯১২ সনের যুগে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ লইয়াছিলাম।

বাংলার প্রাণ, ভারতবাসীর চিত্ত ইত্যাদি তখনকার দিনে খুব সহজ মনে হইত। আর ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ হাতের পাঁচ স্বরূপ ভাবিতাম। কিন্তু এইরূপ খেয়াল বেশী দিন বজায় ছিল না। ১৯১২ সনে সংস্কৃত শুক্রনীতি গ্রন্থের ইংরেজি তর্জ্জমা সুরু করি। তখন হইতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, প্রভেদ ইত্যাদি বিষয়ক ধারণাগুলার বিরুদ্ধে আমার মত পুষ্ট হইতে থাকে। পরবর্ত্তী কালে,—আজ পর্য্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ বিষয়ক মতগুলা খণ্ডন করাই আমার পক্ষে বিজ্ঞান-সাধনার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য রহিয়াছে। অতএব হার্ডারের গুণগ্রাহী হইয়াও হার্ডার-মতের ধ্বংসসাধন করা আমার সমাজশাস্ত্রের স্বধর্ম্ম। এ এক বিচিত্র অবস্থা।

"কথামৃতে"র সামাজিক কিম্মৎ*

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"বাঙালী যুগে"র প্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণের ধর্ম্মে দেবদেবীর হাঙ্গামা নাই। ইহাই ঠাকুরের বিশেষত্ব। কোনো বিশেষ দেবতার পূজা প্রচার করা রামকৃষ্ণ নিজের ধান্ধা বিবেচনা করেন নাই। যার যা খুসী সে সেই দেবতা পূজা করিতে পারে। এমন কি অহিন্দুও দেব-দেবীর তোআক্কা না রাখিয়া রামকৃষ্ণের আওতায় আসিলে ধর্ম্মের খোরাক যথেষ্ট পায়। একজন বাঙালী-হিন্দুর পক্ষে এইরূপ দেবতা-নিরপেক্ষ ধর্ম্ম প্রচার করা ধর্ম্মের ইতিহাসে পূরাদস্তুর যুগান্তর। ধর্ম্ম-জীবনকে দেবদেবীর প্রভাব হইতে মুক্তিদান করিয়া রামকৃষ্ণ সত্যসত্যই যুগাবতার হইতে পারিয়াছেন। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে এইরূপ মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা যারপর নাই গৌরবজনক।

রামকৃষ্ণ কোনো জাতপাঁতের ধার ধারিতেন না। তাঁহার কথা-বার্ত্তায় বর্ণাশ্রমের বোল্‌চাল নাই। রামকৃষ্ণ বামুনশূদ্দুর-সমাজের ভেদাভেদমূলক পাঁতি বুঝিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার বিলকুল জাতপাঁত-নিরপেক্ষ, শ্রেণী-নিরপেক্ষ সমাজ-নিরপেক্ষ। যে-কোনো জাতের যে-কোনো নরনারী, যে-কোনো সমাজের যে-কোনো

* রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬) উপলক্ষে লিখিত। 'আনন্দবাজার", "উদ্বোধন" "সোণার বাংলা" (ঢাকা), "পাঞ্চজন্য" (চট্টগ্রাম), "দীপিকা" (কুষ্টিয়া), "পূর্ব্বাচল" ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত।

লোক রামকৃষ্ণের নিকট জীবনগঠনের সাহায্য পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ সমাজবিহীন, শ্রেণী-বিহীন, জাতপাঁত-বিহীন নরনারীর দীক্ষাগুরু। তাঁহার উপদেশাবলীর ভিতর সমাজ-সংস্কারের ঝাণ্ডা খুঁজিয়া পাই না। জাতপাঁতগুলাকে ভাঙিতে হইবে কি না সে কথা রামকৃষ্ণ আলোচনা করেন নাই। জাতপাঁতগুলাকে নূতন কোনো গড়ন দিতে হইবে কি না, সে বিষয়েও রামকৃষ্ণ কোনো প্রকার আলোচনা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এইখানেই বাঙলার নরনারী রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মে চরিত্রগঠনের নূতন শক্তি পাইয়াছে। সমাজ-সংস্কারের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যেসকল লোকের মাথা খেলে না, সেইসব লোকও রামকৃষ্ণের নিকট মনুষ্যত্ব-গঠনের অসংখ্য মালমশলা পায়। রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশের ইহা একটা প্রকাণ্ড বিশেষত্ব।

ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে যাঁহারা দেবদেবীর যোগাযোগ অতি নিবিড় বিবেচনা করেন, তাঁহারা সহজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কালীসাধক রাম-প্রসাদে আর একালের রামকৃষ্ণে প্রভেদটা পাকড়াও করিতে পারিবেন। আর যাঁহারা হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত তাঁহারাও রামকৃষ্ণের পথ হইতে অন্যান্য আধুনিক সংস্কারপন্থীদের কার্য্যপ্রণালীর প্রভেদ সমঝিতে পারিবেন। রামকৃষ্ণ যে প্রণালীতে আধ্যাত্মিক জীবন চালাইয়া গিয়াছেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কেন, গোটা দুনিয়ার ধর্ম্মেতিহাসেই যারপরনাই বিশেষত্বপূর্ণ। ঠিক এই ধরণের ধর্ম্মপ্রচারক বা দীক্ষাগুরু বা নীতিস্রষ্টা জগতে বিরল।

রামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষকেই নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে উপদেশ দিয়াছেন। সংসারের দুর্ব্বলতা, বিপদ, শত্রুতা, হিংসাদ্বেষ ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষের পক্ষে নিজ চরিত্রবল ছাড়া আর কোনো মন্ত্র নাই। এই কথাটা রামকৃষ্ণ যখন-তখন যেখানে-

সেখানে নানা আকারে বলিয়া গিয়াছেন। এই মন্তর পৃথিবীর সকল দেশেই,—সকল ধর্ম্মের এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেক নরনারীর পক্ষেই জীবনের মন্ত্র হইবার উপযুক্ত। যেসকল লোক ভগবানে বিশ্বাস রাখে তাহাদের পক্ষেও আত্মশক্তির চাষই সংসারের জীবনসংগ্রামে আসল সম্পদ্। আর যাহারা ভগবান নামক বস্তুর অস্তিত্ব বা প্রয়োজন স্বীকার করে না, তাহাদের পক্ষে ত নিজ চরিত্রবলই ব্যক্তিত্ববিকাশের একমাত্র বনিয়াদ। কাজেই রামকৃষ্ণ ভারত-অভারত, হিন্দু-অহিন্দু, এশিয়া-ইয়োরামেরিকা-আফ্রিকা ইত্যাদি সকল ভূখণ্ডের নরনারীরই আধ্যাত্মিক গুরু। বাঙালীর ধর্ম্মের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-ধর্ম্মের জন্ম ও বিকাশ বাঙালী জাতিকে এই কারণে জগদ্বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে পূজা করিয়া অথবা ভগবানের আসন দিয়া আমরা মনে করি যে, আমরা বুঝি রামকৃষ্ণের চরম গৌরব করিলাম। ইহা রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে গৌরবের পরাকাষ্ঠা সন্দেহ নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণকে এই আসনের চেয়েও মহত্তর আসন দেওয়া সম্ভব। সেই দিকেও বাঙলার নরনারীর নজর ফেলা আবশ্যক। রামকৃষ্ণ বিশ্বসভ্যতার "বাঙালী যুগে"র প্রবর্ত্তক। বাঙালী জাত জগতের ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্যযুগে জগৎ-প্রসিদ্ধ অথবা এমন কি ভারত-প্রসিদ্ধ কীর্ত্তির অধিকারী ছিল না।* মানবজাতির যথার্থ পূজা পাইবার যোগ্য কোনো কাজ কোনো বাঙালী-সন্তান দেখাইতে পারে নাই। এতদিনে,—ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে বোধ হয় বাঙলার নরনারী একমাত্র ভারতে নয়, গোটা দুনিয়ায়ই দাগ ফেলিবার উপযুক্ত কর্ম্মরাশি দেখাইতে সুরু করিয়াছে; পৃথিবীর ইতিহাসে হয় ত এতদিনে "বাঙালী-যুগ" প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই "বাঙালী-যুগে"র আসল স্রষ্টা বিবেকানন্দ। আর সেই বিবেকানন্দ যে-ব্যক্তির নিকট নিজ

* পৃষ্ঠা ৩২ ও ১০৬ দ্রষ্টব্য।

কৃতিত্বের, কর্ম্মরাশির ও কীর্ত্তির জন্য খোলাখুলি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যক্তির নাম রামকৃষ্ণ। কাজেই বিংশ শতাব্দীতে জগতের সভ্যতায় বাঙলার নরনারী দুনিয়ার শ্রদ্ধাযোগ্য যেসকল কৃতিত্ব দেখাইতে ছুটিয়াছে সেইসকল কৃতিত্বের গোড়ায় যিনি বসিয়াছেন, সেই রামকৃষ্ণ বাঙালী জাতের পক্ষে ভগবানের চেয়েও মহত্তর।

প্রাচীন ভারতীয় মহেঞ্জোদড়োর যুগে কোনো বাঙালীর টিকি দেখা যাইত না। বৈদিক ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণ ইত্যাদির "মাড়োয়ারী" (অ-বাঙালী) ঋষিগণ সদানীরা দরিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী বিহার ও বাঙলার লোকজনকে "পক্ষিজাতীয়" নরনারী অর্থাৎ "ছোটলোক" সমঝিতে অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শাক্যসিংহ যখন দিগ্‌বিজয়ী হইতে সুরু করেন তখন নেপালী-বিহারীরা মাথা চাঁড়িয়া চলিতে থাকে। কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙলার নরনারী তখনও অনেকটা নিষ্কর্ম্মা। তাহারা "পশ্চিমা" বৈদিক ও বৌদ্ধ অবতারদের "চরৈবেতি" অর্থাৎ দিগ্‌বিজয়ের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ সেই "পশ্চিমা" ঋষিদের শিষ্যত্ব করিয়াই পরবর্ত্তী কালে বাঙলার নরনারী কিঞ্চিৎ-কিছু মুড়ো খেলাইতে অভ্যস্ত হয়। মৌর্য্য ভারতেও বাঙালীরা "ম্যাড়াকান্ত"। এমন কি তাহারও পাঁচ-সাতশ' বৎসর পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগেও কালিদাস-বরাহ-মিহিরের আমলে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙালী জাতের সাড়া একপ্রকার পাওয়া যায় না।

তাহারও দু'তিন শ' বৎসর পর বাঙালী বাদশা' ধর্ম্মপাল, বাপ্‌কা বেটা দেবপাল, আর ধর্ম্মপালের বাপ বীর গোপাল সর্ব্বপ্রথম ভারতে বাঙালী জীবনের চিহ্নোৎ ফেলিতে সমর্থ হন। কিন্তু পালগুষ্ঠি সমগ্র ভারতীয় সভ্যতায়,—এমন কি উত্তর ভারতেও,—"বাঙালীর ইজ্জৎ

সুপ্রতিষ্ঠিত" করিতে পারিয়াছিল কি না পরিষ্কাররূপে বলা যায় না। পালবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা শশাঙ্ক আর্য্যাবর্ত্তে কতটা কল্কে পাইতেন তাহা আজও জরীপ করা সম্ভব নয়। পরে বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেনের যুগে বাঙালী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত চর্চ্চা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙালী পণ্ডিতদের সৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিপুল ভারতীয় সংস্কৃত বিদ্যা-কলাবিশ্বকোষে বড় বেশী ঠাঁই পায় নাই,—এইরূপ বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে কিনা সন্দেহ। অ-বাঙালী পাণিনি, চরক-সুশ্রুত, পতঞ্জলি, নাগার্জ্জুন, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য ইত্যাদি সুধীদিগের পাণ্ডিত্যই সেকালের বঙ্গসমাজে সমাদৃত হইত। বস্তুতঃ, এইসব অ-বাঙালী মাল খাইয়াই বাঙলার নরনারী "মানুষ" হইয়াছিল।

বাঙালী দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক-সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনাবলী না জানা থাকিলে অ-বাঙালী (মান্দ্রাজী, মারাঠা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি) ভারতীয় সুধীদের "লেখাপড়া", বিদ্যানুশীলন বা সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ থাকিত কি না সন্দেহ, অথবা কতটা অসম্পূর্ণ থাকিত তাহা বলা সুকঠিন। এইরূপে যুগের পর যুগ ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে,—বাঙালীর কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রতিভা বিশাল জগৎ ত দূরের কথা, এমন কি বাঙলার বহির্ভূত ভারতটুকুও বিশেষ কিছু প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সকল যুগ বিশ্লেষণ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার ফলাফল ভবিষ্যতে খতাইয়া দেখা যাইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর মোগল-বাঙলায় কী দেখিতে পাই? এমন কি বাঙালী-মুসলমানও ভারতীয় মুসলমান সমাজে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী একপ্রকার ছিল না। সেকালের হিন্দু-বাঙলায় শ্রীচৈতন্য অবতার-বিশেষ। কিন্তু ধর্ম্ম ও দর্শন ইত্যাদি সাধনার ইতিহাস খুঁজিলে দেখা যায় যে, তিনিও অ-বাঙালী প্রভাবে বেশ-কিছু

গঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে দক্ষিণ ভারতের মধ্বাচার্য্য যারপর নাই প্রতাপশালী। অপরদিকে তাঁহার প্রচারিত ভক্তিযোগ বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যা ছাড়া ভারতের অন্য কোনো জনপদে ঢেউ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এইসকল কথা মনে রাখিলে সহজেই আমরা বুঝিতে পারি যে, বাঙালী জাত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর সর্ব্বদা-স্মরণযোগ্য অথবা সর্ব্বথা-সম্মানযোগ্য কর্ম্ম বা চিন্তার স্রষ্টারূপে পরিচিত ছিল না বলিলেই চলে। ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন জনপদে দাগ রাখিবার উপযুক্ত কোনো কাজ বাঙালী যদি করিয়া থাকে তাহার কিছু-কিছু উনবিংশ শতাব্দীতেই ঢুঁড়িতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে নয়।

উনবিংশ শতাব্দীই সৃষ্টিমূলক বঙ্গশক্তির পক্ষে আসমুদ্র-হিমাচল "ভারতীয়" কর্ম্মক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য যুগ। ঘটনাচক্রে ইহা বাঙালীর পক্ষে "তুনিয়ায়" প্রভাববিস্তারের যুগও বটে। এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি দিগ্‌বিজয়ী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সনে মার্কিণমুল্লুকের শিকাগো শহরে ত্রিশ বৎসর বয়সের বাঙালী যুবার মূর্ত্তি লইয়া বিবেকানন্দ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুনিয়ায় বাঙালী জাত এইবার কাজ সুরু করিবে। সেই কাজের এক অপূর্ব্ব বিকাশ ১৯০৫ সনের যুবক বাঙলা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের কর্ম্ম ও চিন্তারাশি। তাহার নাম "বাঙ্গালী বিপ্লব"। যে-সময়ে জাপানী জাত তুনিয়ায় দেখাইল যে, যুবক এশিয়া বিশ্ব-সভ্যতায় একটা নয়া অধ্যায় খুলিতে চলিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বাঙলার নরনারীও ভারতকে আর সঙ্গে-সঙ্গে এশিয়াকে এবং ইয়োরামেরিকাকে বুঝাইয়া ছাড়িল যে, বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে বাঙালীর ঠিকানাও কায়েম হইতে চলিল। আজ বৎসর ত্রিশেক ধরিয়া বাঙালীজাত ভারতে, এশিয়ায়, ইয়োরামেরিকায় এবং আফ্রিকায় অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্রে

অসংখ্য প্রকার ব্যক্তিত্বের, কর্ম্মনিষ্ঠার ও চরিত্র-শক্তির পরিচয় দিয়া চলিতেছে।

বাঙালীর পুঁজি-শক্তি, বাণিজ্য-শক্তি, ফ্যাক্টরী-শক্তি, আজ পর্য্যন্ত জবরদস্ত আকার-প্রকার পায় নাই। ভারতের আধুনিক যন্ত্রনিষ্ঠায় এবং শিল্পনিষ্ঠায় যুবক বাঙলা আজও খানিকটা নিষ্প্রভ। তাহা সত্ত্বেও ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, কোনো প্রান্তেই বাঙালীকে অস্বীকার করা অথবা বাঙালীকে ভুলিয়া থাকা কোনো করিৎকর্ম্মা বা চিন্তাশীল ভারত-সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ বাঙালীর বাচ্চা ইতিমধ্যেই ভারতীয় নরনারীর পর্দ্দায়-পর্দ্দায় দাগ ফেলিতে পারিয়াছে। ভারতীয় সমাজের নানা মহলে বাঙালীরা নিজেদের কৃতিত্ব-ঠিকানা কায়েম করিয়া ছাড়িয়াছে। এই ধরণের "আসল" ঠিকানা-কায়েম পাঁচ-ছয় হাজার বৎসরের ভারতীয় ইতিহাসে বাঙালীর পক্ষে প্রথম।

ভারতের বহির্ভূত এশিয়ার নানাদেশে এবং আফ্রিকার জনপদে-জনপদে আজও বহুসংখ্যক নরনারী অবনত ও অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। এইসকল দেশেও নতুন-নতুন স্বদেশী আন্দোলন কায়েম হইতেছে অথবা শীঘ্রই কায়েম হইতে থাকিবে। এশিয়ার ও আফ্রিকার এইসকল অনুন্নত দেশের নরনারী ইতিমধ্যেই বাঙালী জাতের কর্ম্ম ও চিন্তারাশিকে নিজ-নিজ সাধনার অন্যতম প্রেরণারূপে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় যুবক বাঙলার "চরৈবেতি" বা দিগ্বিজয় ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সুরু হইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকা বাঙালী জাতকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না। এশিয়ান ও আফ্রিকান নরনারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক "বড়্দা" হিসাবে বাঙালীর ইজ্জৎ-প্রতিষ্ঠা বিংশ শতাব্দীর জগৎ-সভ্যতায় গৌরবময় ঘটনা।

অধিকন্তু চীন-জাপানে আর ইয়োরামেরিকার নানা ঘাঁটিতে বাঙালীর নাম-ডাক দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আর বাঙালীর

মারফৎ গোটা ভারতের নামও জগতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিশ্ব-মজলিশে ভারতমাতাকে চিনাইয়া দিবার কাজে যুবক বাঙলা বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ক্রমশঃ অবাঙালী-ভারতীয় নরনারীও বিশাল জগতের এইসকল কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে দেখা দিতেছে। যুবক বাঙলা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মার্কামারা নর-নায়ক।

বিবেকানন্দকে এই বাঙালী দিগ্বিজয়ের প্রথম সেনাপতিরূপে আমি বাইশ-তেইশ বৎসর পূর্ব্বে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি। বিবেকানন্দ যদি রামকৃষ্ণকে তাঁহার জীবনদেবতারূপে পূজা না করিয়া যাইতেন তাহা হইলে বাঙালী জাত রামকৃষ্ণকে কতটা পূজা করিত সে কথা আজ ঠাওরানো অসম্ভব। কিন্তু বাঙালী জাতকে জগতের ইতিহাসে অন্যতম সভ্যতা-স্রষ্টা হিসাবে দিগ্বিজয় চালাইবার জন্য যে কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীর খাড়া করিয়া গিয়াছেন, আর বিশ্বসভ্যতায় বাঙালীর কৃতিত্ব-ধারা বহাইতে পারিয়াছেন সেই বিবেকানন্দের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দুনিয়ার নরনারীর পক্ষে অসামান্য যুগাবতার।

রামকৃষ্ণের শক্তিযোগ

আমাদের অনেকের বিশ্বাস,—রামকৃষ্ণ বাঙালীকে আর দুনিয়াকে স্বর্গের পথ বাৎলাইয়া গিয়াছেন। আর বেলুড় মঠে বুঝি স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা আছে। কাজেই অনেকে হয়ত ভাবিতে পারে যে, যাহারা বেলুড়-যাত্রী বা রামকৃষ্ণ মিশনের মক্কেল তাহারা বুঝি স্বর্গ-লোভী মানুষ, মোক্ষ-পাগ্‌লা নরনারী। সুতরাং দূর হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাণে পাঠাইয়া সংসারের লোকেরা নিজনিজ ঘরকন্না চালাইতে অভ্যস্ত।

আসল কথা, মোক্ষ-লোভী, স্বর্গ-পাগলা লোক দুনিয়ায় এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। স্বর্গ এমন-কিছু লোভনীয় দুনিয়া নয় যে, তাহার পেছনে-পেছনে ছুটিয়া পৃথিবীর নরনারী নিজকে হয়রাণ-

পরেষাণ করিয়া ছাড়িবে। আমাদের এ-পাড়ার রামা-শ্যামা আর আব্দুল-ইসমাইলও মুক্তি, নির্ব্বাণ বা মোক্ষের বেপারী নয়। আর ও-পাড়ার ফিশার, হুভার, আঁদ্রে, জ্যুসেপ্পে ইত্যাদিও মোক্ষ, স্বর্গ, নির্ব্বাণ লইয়া মস্‌গুল নয়। মোক্ষের সঙ্গে যাহাদের অসহযোগ, স্বর্গের সিঁড়ির যাহারা তোআক্কা রাখেনা তাহাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সহযোগ সম্ভব কি? আলবাৎ সম্ভব। রামকৃষ্ণ আবদুল-যদুরই সেবক, আঁদ্রে-হুভারেরই সহায়ক, আমার-তোমারই পরম বন্ধু।

তুমি-আমি কি চাই? চাই বাঁচিয়া থাকিতে। রামা-ইসমাইল কি চায়? চায় তারা বড় হইতে। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় সকলেরই আসল ধান্ধা জীবন, জীবনের বাড়্‌তি। আমার জীবনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার ক্ষমতা যে রাখে সেই আমার বন্ধু, সেবক, গুরু, অবতার। মানুষকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে বাড়াইয়া তুলিতে যে পারে সে-ই বড়-লোক, মহাপুরুষ, পরমহংস। যাহার সে ক্ষমতা নাই সে বড়-লোকের তপ্‌সিলে ঠাঁই পাইবে না।

অবতার বা মহাপুরুষ বা দেবতুল্য ব্যক্তি ইত্যাদি জরীপ করিবার যন্ত্রপাতি অতি সোজা। দেখিতে হইবে, লোকটা মানুষের অভাব পূরণ করিতে পারে কি না। লোকটা কতগুলা লোকের অভাব পূরণ করিতে ওস্তাদ। লোকটা কতদিন বা কত বৎসর ধরিয়া নর-নারীর অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। লোকটা কোন্ কোন্ জনপদের বা কোন্ কোন্ জাতির অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা রাখে। এই মামুলি বাটখারায় ফেলিয়া রামকৃষ্ণকেও ওজন করা সম্ভব। রামকৃষ্ণের কিম্মৎ কষিয়া বাহির করিবার জন্য একটা অস্বাভাবিক, অতীন্দ্রিয়, ধরা-ছোঁআ-যায়-না এমন-কোনো কষ্টি-পাথর কায়েম করিবার দরকার নাই। সংসারী লোকের অভাব পূরণ করিবার ওস্তাদি দিয়াই রামকৃষ্ণকে যাচাই করা যাইতে পারে। তাহাই করিব।

সকলেরই জানা আছে যে, রামকৃষ্ণ পাটের দালাল ছিলেন না। গরু-ঘোড়া-কুকুর-বিড়ালের হাঁসপাতাল কায়েম করা তাঁহার কাজের অন্তর্গত ছিল না। কোনো ইস্কুল-পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা অথবা ইন্‌স্পেক্‌টর রূপে রামকৃষ্ণ পরিচিত ছিলেন না। লাখ-লাখ টাকা দান করিয়াও তিনি নামজাদা হন নাই। অধিকন্তু লম্বা-চৌড়া বিশ্বকোষ তাঁহার মাথা হইতে বাহির হইয়া আসে নাই। আর বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের একটা জবরদস্ত্ স্রষ্টাও তিনি ছিলেন না।

আজকালকার বাজারে এই অতিমাত্রায় জানা কথাগুলা ভাল করিয়া জানিয়া রাখা দরকার। কেন না এইসকল কর্ম্মক্ষেত্রে যে লোকটার নাম নাই তাহাকে বড়-লোক, বীর, দেশপূজ্য ইত্যাদি রূপে বিবৃত করা একালে যারপর নাই কঠিন। যেসকল চিহ্নোৎ থাকিলে নয়া বাঙলার নরনারী কোনো ব্যক্তিকে ধাঁ করিয়া "বাপকা বেটা" ঠাওরাইতে পারে সেইসকল চিহ্নোৎ রামকৃষ্ণের বিলকুল নাই। তাহা হইলে রামকৃষ্ণের পক্ষে রামা-ইস্‌মাইল, আঁদ্রে-হুভার ইত্যাদি যে-সে লোকের অভাব পূরণ করা সম্ভব হইল কি করিয়া। রামকৃষ্ণ-জীবনের কোন্ কোন্ লক্ষণগুলা দুনিয়ার সংসারীদের কাজে লাগিতেছে? রামকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার-আমার জীবন-বাড়্‌তির যোগাযোগ কোথায়?

রামকৃষ্ণ "কথা"র বেপারী। তাঁহার মুখ হইতে কতকগুলা কথা বাহির হইয়াছে। ব্যস্। এই কথাগুলাই তাঁহার দান। এই কথা-গুলাই মানুষকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেছে। দুনিয়ার নর-নারীকে বাঁচাইয়া রাখিতে, বাড়াইয়া তুলিতে, বাড়তির পথ দেখাইয়া দিতে এই কথাগুলার ক্ষমতা অসীম। রামকৃষ্ণের কথাগুলাই বিপুল অমৃত।

কোন্ ল্যাবরেটরিতে বসিয়া রামকৃষ্ণ এই বাণীগুলা আবিষ্কার করিলেন তাহার সন্ধান লইতে যাওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই আহাম্মুকি। সেদিকে পথ না মাড়ানোই সংসারের অধিকাংশ

৩২

নরনারীর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। রামকৃষ্ণের বিজ্ঞানশালা বা দার্শনিক টোল বাহির হইতে দেখিয়া রাখা চলিতে পারে। দেখিয়া রাখা মন্দ নয়। কিন্তু তাহার "ভিতর" প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করাই ভাল। রামকৃষ্ণের মগজ, হৃদয়, আত্মা কিছু-না-কিছু পরীক্ষায়, কিছু-না-কিছু বিশ্লেষণে, কিছু-না-কিছু কাটা-ছিঁড়ায় অভ্যস্ত ছিল সন্দেহ নাই। এইসব পরীক্ষা, এইসব বিশ্লেষণ, এইসব কাটা-ছিঁড়ার আকার-প্রকার তুনিয়ার কোনো-কোনো মিঞা যদি "সত্যি-সত্যি" পাকড়াও করিতে পারে ভালই। আমাদের মত মামুলি লোকেরা দূর হইতে তাহার বিবরণ শুনিয়া আনন্দিত হইবে বলিতে পারি। কিন্তু আমরা মোটের উপর রামকৃষ্ণের মুখের কথা-গুলাই চিনি। তাঁহার ল্যাবরেটরির কর্ম্মগুলায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার অনুষ্ঠিত পরীক্ষা-বিশ্লেষণ-কাটা-ছিঁড়াগুলার ফলসমূহই আমাদের সম্পদ্।

রামকৃষ্ণের বচনগুলা বহরে দেড়গজী লম্বা নয়। বিশাল সন্দর্ভ বা নিবন্ধের আকারে তাঁহার বাণীসমূহ দেখা দেয় নাই। পুরাণা সেকেলে কথার টীকা-লেখক, ভাষ্যকার বা তর্জ্জমাকারিরূপেও রামকৃষ্ণের সঙ্গে মোলাকাৎ হয় না। রামকৃষ্ণের বাণীর বহর দেড়-তুই লাইন মাত্র। কখনো বা দেড়-তুই শব্দেই তাঁহার বাণী পরিপূর্ণ মূর্ত্তি লাভ করে। কথাগুলা সহজ-সরল মন্ত্রের মতন ছোট্ট; ঠিক যেন কানে ফুঁকিয়া দিবার জন্য তৈয়ারী। মামুলি রাস্তার লোকের ভাষায় এই বচনগুলা গড়া। মামুলি রাস্তার লোকের মগজে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা লইয়া এই সবের জন্ম। লোকের মুখে-মুখে এই সব চলিতে পারে। কোনো টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, ভাষ্য ইত্যাদির দরকার হয় না। এই জন্যই মানুষের জীবনে এই কথাগুলার কিম্মৎ এত বেশী। মান্ধাতার আমল হইতে আমাদের এই কলিকাল পর্য্যন্ত যতগুলা কথার বেপারী

অবতাররূপে পূজা পাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের বচনই এইরূপ দেড়-দুই শব্দের বা দেড়-দুই লাইনের সূত্র ছাড়া আর কিছু নয়। লম্বা-লম্বা প্রবন্ধ ঝাড়িয়া বা ঢাউস বইয়ের গ্রন্থকার সাজিয়া আজ পর্য্যন্ত জগতে প্রায় কোনো মিঞাই যুগান্তর সৃষ্টি করিতে পারে নাই। যুগপ্রবর্ত্তক বাণীপ্রচারকেরা একপ্রকার সকলেই দেড়-দুই লাইনে বা দেড়-দুই শব্দের মন্ত্র গড়িয়া অবতার। রামকৃষ্ণেরও দেড়-দুই শব্দের দৌলতেই যদু-ইস্মাইল-আঁদ্রে-হুভার জীবনের বাড়তি সাধন করিতেছে।

রামকৃষ্ণের কথাগুলা বাঙালী সমাজের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। আজ-কাল ইংরেজিতেও এইসব পাওয়া যায়। অধিকন্তু ফরাসী আর জার্ম্মাণ তর্জ্জমাও হইয়াছে। এমন কি স্পেনিশ, পোলিশ, চেক ইত্যাদি ভাষায়ও "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" মূর্ত্তি পাইয়াছে। মানুষের কাজে লাগে এই কথাগুলার ভিতর এমন কী চিজ আছে? এক কথায় বলিব যে, এইসকল মন্তরের ভিতর আছে সাহসের কথা। ডাইনে-বাঁয়ে সর্ব্বত্রই শুনিতে পাই এক কথা,—"ওরে মানুষের বাচ্চা, ভয় নাই। বিনা ভয়ে চলাফেরা কর্।" অভয় আর সাহস, সাহস আর অভয়,—এই হইতেছে রামকৃষ্ণ-বাণীর মুদ্দা।

বলা বাহুল্য, মানুষ মাত্রেরই কোনো-না-কোনো সময়ে পেটে ভয় ঢুকিয়া থাকে। প্রত্যেক লোকই কোনো-না-কোনো বয়সে কেনো-না-কোনো অবস্থায় পড়িয়া ভয়ে অস্থির হইয়া যায়। ঘটনাচক্রে পড়িয়া আঁৎকিয়া উঠে নাই এমন লোক মানুষের দুনিয়ায় দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। কাজেই যদি জোর্‌সে কোনো লোক আসিয়া বলে যে, "কুছ পরোআ নাই। দাঁড়া। খাড়া হ'। তুই ছোট নস্। তুই ফেল মারতে জন্মাস্‌নি। তুই বড়। তোকে বড় হতে হবে। অসাধ্য সাধন কর্‌তে তুই জন্মেছিস্। তোকে কেউ কাবু কর্‌তে পার্‌বে না। তুই দেবতা,—" তাহা হইলে তাহার কথাগুলার প্রত্যেকটারই কিস্মৎ

দাঁড়াইয়া যায় লাখ টাকা। রামকৃষ্ণের "কথামৃত" সবই মানুষকে সাহস আর অভয় বাঁটিবার জন্যই পয়দা হইয়াছে। মানুষ মাত্রেরই এক মস্ত অভাব রামকৃষ্ণ পূরণ করিয়াছেন। এইরূপ সাহসী পুরুষ-নারীই নয়া শক্তিশালী সমাজ বা দেশ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ।

তাহা ছাড়া এই অমৃতের আর এক কিনারায় দেখিতে পাই শক্তি। রামকৃষ্ণ মানুষকে শক্তিযোগী রূপে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী। দুর্ব্বলের কথা এইসব বাণীর ত্রিসীমানায় নাই। যে-লোকটা নিজেকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিতেছে সেই লোকটা রামকৃষ্ণের দেড়-দুই শব্দে শক্তি-শালী হইতে বাধ্য। মামুলি গৃহস্থদের কথা বলিতেছি। এইসকল "কথা"র ভিতর চাষী, কেরাণী, উকিল, কুলি, ডাক্তার, পয়সাওয়ালা, নির্ধন—সকলেই নিজ-নিজ অবস্থা-মাফিক শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ। এই শক্তির জোরে কেহ চালাইতেছে মাত্র দুবেলা ভাত, আবার কেহ চালাইতেছে দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়। কাজেই রামকৃষ্ণ কাজে লাগিতেছে মুদী-তাঁতী-ছুতারেরও, আর উকিল-হাকিম-বণিকেরও। তাহা ছাড়া সংসারের বিবেকানন্দগুলাও রামকৃষ্ণ-বাণীর ভিতর হইতেই বিশ্বদখলের শক্তি দখল করিতে পারিয়াছে। শক্তিযোগ "রামকৃষ্ণকথামৃতে"র অপূর্ব্ব সামাজিক কিস্মৎ।

কাপুরুষতা, ভয়-বিহ্বলতা সনাতন আর সার্ব্বজনিক। সেকালে-একালে-সবকালে, এখানে-ওখানে-সেখানে নরনারী কোনো-না-কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে কাপুরুষ,—কোনো-না-কোনো কর্ম্মক্ষেত্রে ভীরু। এই-সকল দুর্ব্বলতা মানুষের হাড়মাসের সঙ্গে গাঁথা। কাজেই চাই অভয়-বাণী। অভয় আসিবে কোথা হইতে? পুরুষকার হইতে, পৌরুষ হইতে। মানুষ জানোআর ছাড়াও আর-কিছু। সেই আর-কিছুই হইল মানুষের পুরুষত্ব, পৌরুষ। দিগ্‌বিজয়ের গোড়ায় এই পৌরুষ। রামকৃষ্ণ মানুষগুলাকে গরু-ভেড়ার মতন বিনয়ী অর্থাৎ আহাম্মক

হইতে উপদেশ দেন না। তিনি বলেন সকলকে পুরুষ হইতে। ভয়-বিজয়ী, দুর্ব্বলতা-বিজয়ী, সাহসশীল, পুরুষকারশীল নরনারী গড়িয়া তুলিবার জন্মই এইসকল কথোপকথন। "রামকৃষ্ণ-কথামৃতে"র আসল অমৃত ঢুঁড়িতে হইবে পৌরুষ-প্রচারে,—চিত্ত-শক্তির উদ্বোধনে। প্রকৃতির উপর চিত্তের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা রামকৃষ্ণ দর্শনের বনিয়াদ। এই-খানেই "কথামৃতে"র অন্যতম সামাজিক কিম্মৎ।

পৌরুষ চাই অহরহ। কেননা মানুষের সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ব্বলতার আর ভীরুতার বাথান। তোমার প্রতিবেশী কাপুরুষ, ভীরু। আমার প্রতিবেশী কাপুরুষ, ভীরু। রামের নিকট হইতে যদু সাহস পাইতেছে না। ইস্‌মাইলকে দেখিয়া আবদুল শক্তিশীল হইতেছে না। অপর দিকে যদুর হিংসায় পদার প্রাণ অস্থির। হুভারের আক্রোশে আঁদ্রে "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে। যাহাকে তুমি তোমার পরম মিত্র বলিয়া জান, সে-ই তোমার চরম শত্রুতা করিতেছে। মানুষের পারিবারিক জীবন অতিমাত্রায় মধুময় হাতী-ঘোড়া কিছু নয়। ইহার ভিতর ঘৃণ্য নীচাশয়তা পুরা-দস্তুর বিরাজ করিতেছে। পাড়ার লোকেরা অমৃত সমাজ গড়িয়া তোলে নাই। তাহাদের গঞ্জনায় তুমি অস্থির, জ্যুসেপ্পে অস্থির, আবদুল অস্থির। পরিবারে, পল্লীতে, শহরে, সমাজে সুখের ঠাঁই, সৌহার্দ্দ্যের দঙ্গল, প্রীতির বন্ধন একদম নাই এরূপ নিষ্ঠুর তত্ত্ব প্রচার করা হইতেছে না। তবে মানুষের জগতে,—পূর্ব্বে-পশ্চিমে,—একালে-সেকালে নীচাশয়তা, পরশ্রী-কাতরতা, পরস্পর-বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত কোঁদল, দলগত লড়াই, শ্রেণী-বিবাদ ইত্যাদি চিজের বহর বেশ পুরু। তাহার উপর অন্যান্য দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা, ভয়-বিহ্বলতা ত আছেই। ইহারই নাম সমাজ। এই সমাজে আত্মরক্ষা করিতে হইলে চাই পৌরুষ। এই সমাজে মানুষকে বাড়্‌তির পথে চলিতে হইলে চাই পৌরুষ। এই পৌরুষেরই

পরিবেষক রামকৃষ্ণ। সংসারের দুর্ব্বলতা আর নীচাশয়তাগুলার ভিতর থাকিয়া কেমন করিয়া রামা-শ্যামা দৃঢ়পদে জীবন চালাইবে তাহার পাঁতি দিয়াছেন রামকৃষ্ণ।

কাজেই "রামকৃষ্ণ-কথামৃতে"র কেন্দ্র-কথা ব্যক্তি। রামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আরে যদু, আরে আবদুল, আরে হুভার, আরে আঁদ্রে, চাচা, আপন বাঁচা। পরিবার কি কর্‌ছে দেখ্‌বার দরকার নাই। পাড়ার লোক কি কর্‌ছে না কর্‌ছে খবর নিবার দরকার নাই। তুই তেল দে তোর নিজের চরকায়।" রামকৃষ্ণের বাণীর ভিতর "পারিবারিক প্রবন্ধ"ও নাই, "সামাজিক প্রবন্ধ"ও নাই। পরিবার মেরামৎ করিতে হয় কি করিয়া, সমাজ-সংস্কারের প্রণালী কিরূপ এইসব আলোচনা রামকৃষ্ণকথামৃতের বড় জিনিষ নয়। এমন কি তাহার ভিতর এই সম্বন্ধে এক প্রকার কোনা কথাই নাই বলা চলে। জাতপাঁতগুলাকে ভাঙিতে হইবে কি পুনর্গঠিত করিতে হইবে তাহার ইসারাও রামকৃষ্ণ দিয়া গিয়াছেন কিনা সন্দেহ। শাসন-প্রণালী কি বস্তু, রাষ্ট্রগঠনের মালমশ্‌লা কিরূপ তাহাও রামকৃষ্ণের বচনের ভিতর নাই। রামকৃষ্ণ চিনেন ব্যক্তিকে, এক একটা হাত-মাথা-হৃদয়ওয়ালা পুরুষনারীকে। তাঁহার কথাবার্ত্তায় পাওয়া যায় ব্যক্তিগুলিকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া তুলিবার হদিস। প্রত্যেক মানুষ রামকৃষ্ণকথামৃত হইতে নিজ-নিজ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া-পিটিয়া তুলিবার সঙ্কেত পায়। নিজেকে গড়িয়া তুলিবার পর অথবা সঙ্গে-সঙ্গে যার যেমন মর্জ্জি বা দৌড় সে তেমন পরিবার, পল্লী, শহর, সমাজ, রাষ্ট্রের সঙ্গে বুঝা-পড়া চালাইতে থাকুক। ইহাই রামকৃষ্ণের দর্শন-নীতি ও সমাজ-তত্ত্ব।

সমাজ সাধারণতঃ ব্যক্তিকে দাবিয়া রাখিতে অভ্যস্ত,—পূর্ব্বে-পশ্চিমে সর্ব্বত্র, একালে-সেকালে সর্ব্বদা। উঠিতে-বসিতে, চলিতে-ফিরিতে

মানুষ সর্ব্বত্রই আর সর্ব্বদাই অন্যান্য লোকের মত ও পথ সমঝিয়া জীবন চালাইতে বাধ্য হয়। বাপ-দাদাদের মত ও পথগুলা এই উপায়ে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীকে পাইয়া বসে। ব্যক্তির উপর সমাজের দৌরাত্ম্য অসীম। সমাজের নিকট ব্যক্তির দাসত্ব অতি জবরদস্ত্। এই দৌরাত্ম্য আর দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করা রামকৃষ্ণবাণীর অন্যতম কীর্ত্তি। "চল্ তুই আপন মতে," "বেছে নে তুই আপন পথ" এই হইল "রামকৃষ্ণকথামৃতে"র স্বাধীনতা-ঘোষণা। রামকৃষ্ণের আবহাওয়ায় আসিলে মানুষ সমাজের তোআক্কা না রাখিয়া নিজ ব্যক্তিত্ব জাহির করিতে অভ্যস্ত হয়। সমাজের উপরে উঠা, সমাজকে অস্বীকার করা সমাজের বুকে নিজের আধিপত্য কায়েম করা এই হইল রামকৃষ্ণপন্থী মানুষমাত্রের স্বধর্ম্ম। জগতে নিজ-নিজ চিত্তশক্তির ঝাণ্ডা খাড়া করিবার অধিকার পাইয়াছে মানুষ রামকৃষ্ণের সমাজ-দর্শনে।

কাজেই রামকৃষ্ণকে গুরু, পরমহংস, অবতার, ভগবান্ বলিবে না কোন্ মানুষ? রক্তমাংসের যে-কোনো লোকই এই দুনিয়াকে পুন-র্গঠিত করিবার ক্ষমতাওয়ালা, প্রকৃতির অতীত, সমাজকে অতিক্রম-কারী, সমাজ-নিরপেক্ষ স্বাধীনতার ভিখারী। নিজ ব্যক্তিত্বের, নিজ সৃষ্টিশক্তির, নিজ জীবন-ধারার পরিপূর্ণতা,—নিজ চিত্তের জয়-জয়কার চায় না দুনিয়ায় এমন মানুষের বাচ্চা কোথায়? দুনিয়ায় যে-লোকই রামকৃষ্ণের বাণীর স্পর্শে আসিবে সে-ই বুঝিবে যে, দেড়-দুই লাইনের জোরে এই ব্যক্তি ব্যক্তিমাত্রকে আত্মার পরিপূর্ত্তির পথ দেখাইতে সমর্থ। ফলতঃ, রামকৃষ্ণ বাঙালী অবতার মাত্র নন, হিন্দু অবতার মাত্র নন। দুনিয়ার পৌরুষকামী, ব্যক্তিত্ব-পন্থী, স্বাধীনতানিষ্ঠ, চিত্ত-যোগী মানুষ মাত্রেই রামকৃষ্ণকে অবতাররূপে পূজা করিতে বাধ্য।

সমাজ-শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র*

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম-এ,
গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, কলিকাতা,
সহ-সম্পাদক, "সমাজ-বিজ্ঞান"

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস,—মুসলমান আমলের পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাঙ্গালীর বিভিন্নমুখী কৃতিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তারা তখন জবরদস্ত একটা জাতি বলেও পরিচিত হয়নি। বঙ্কিমবাবুর মত নিম্নরূপ:—"বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি পালবংশ, সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালার রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি, কেন না সেন, পাল ও বক্তিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোনও রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোনও নামান্তরও ছিল না। সেন ও পালেরা

---

*বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের সভায় পঠিত (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)। কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি ভবনে বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অ্যাড্‌ভোকেট কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতার পর অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, নৃতত্ত্ববিৎ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সভাপতি মহাশয় এবং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গৌড়ের রাজা ছিলেন, বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোনও জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত তাহারা অন্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটী রাজ্য ছিল, তেমনি আরও কতকগুলি পৃথক রাজ্য ছিল। সেগুলি বাঙ্গালার অংশ ছিল না, সকলই পৃথক পৃথক স্ব-স্ব-প্রধান, সকলই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য্য জাতির বাসভূমি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি; কিন্তু সর্ব্বত্র প্রায় আর্য্যপ্রধান। এই আর্য্যেরাই ভিন্ন দেশগুলি একীভূত করিবার মূল কারণ। যে দেশে যে জাতি থাকুক না কেন, তাহারা আর্য্যদিগের ভাষা গ্রহণ করিল, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আগে এক ধর্ম্ম, এক ভাষা তারপর শেষে একচ্ছত্রাধীন হইয়া আধুনিক বাঙ্গালায় পরিণত হইল।"

(বঙ্গদর্শন ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ। বিবিধ প্রবন্ধ। গ্রন্থাবলী ১৭৩)

এইত হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙ্গালার পূর্ব্ব ইতিহাস। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী বল্‌তে আমরা যে জাতটিকে বুঝি তা কতকগুলি জাতির সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছে। বিভিন্নরূপ সভ্যতা, বিভিন্নরূপ বৈষম্যের মধ্য থেকেই বাঙ্গালীর উৎপত্তি।

বাঙ্গালীর ভাব-ধারার মধ্যেও বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও ভাব-ধারার একটা সমন্বয় দেখা যায়; বাঙ্গালাও একটা বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয়স্থানে পরিণত হয়েছে। বাঙ্গালী বল্‌তে এখন আর আমরা হিন্দু বাঙ্গালী বা বৌদ্ধ বাঙ্গালী বুঝি না, বাঙ্গালী এখন একটা সার্ব্বজনীন জাতি। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করেছেন,—যথা :—

"লোক-সংখ্যা গণনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলা যায়, যাহারা বাঙ্গালা দেশে বাস করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান।"

(বঙ্গদর্শন ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থাবলী ১৯৫)

বাঙ্গালী হিন্দুর ভিতরও যদি আমরা দেখতে চেষ্টা করি তা হ'লে দেখতে পাই যে, ইহাও কতকগুলি আর্য্য ও অনার্য্য বংশের সংমিশ্রণ। বঙ্কিমবাবু বলেন, "বাঙ্গালী যে কয়েকটী জাতিতে গঠিত হইয়াছে তাহার কেহ আর্য্য কেহ অনার্য্য···ভারতীয় আর্য্যদিগের বর্ণ-ধর্ম্মিত্ব হেতু বাঙ্গালায় তিনটি পৃথক স্রোত—কোল-বংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য্য, তারপর আর্য্য মিশিয়া একটি প্রবল প্রবাহে পরিণত হয় নাই। আর্য্যবংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ অনার্য্য সম্ভূত অন্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রহিয়াছেন। যদিও কোনও স্থানে আর্য্য ও অনার্য্যে বৈধ বিবাহ বা অবৈধ সংসর্গের দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সেই সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য্য অনার্য্য হইতে আর একটি পৃথক জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ।"

পুনশ্চ, "বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালী বলি তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকার বাঙ্গালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের পর এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালী মুসলমান।"

(বঙ্গদর্শন ১২৮৪ জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থাবলী ১৯৬)

অনার্য্য সভ্যতার ন্যায় মুসলমান সভ্যতা নীতিগত পার্থক্য হেতু হিন্দু ধর্ম্মের কোন একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে না পড়লেও পরস্পরের কৃষ্টির দ্বারা পরস্পরে প্রভাবান্বিত; বাঙ্গালী মুসলমান অন্য প্রদেশের

মুসলমান হ'তে বিভিন্ন হয়ে গেছে এবং তারা একটা অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি সৃষ্টি করতে চলেছে।

বাঙ্গালী মুসলমান সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই যে, "বাঙ্গালার অর্দ্ধেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।"

পুনশ্চ, "দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ।"

(বঙ্গদর্শন ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থাবলী ১৭৩)

বাঙ্গালী মুসলমান হিন্দু ও বাঙ্গালী উপাদানে গঠিত। উভয়ে উভয়ের সংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত ইহাই অখণ্ড জাতির সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপাদান। বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের মত।

বিদেশীয় প্রভাব

মুসলমান রাজত্বের পর ইংরেজ রাজত্বের সময়ে রাজা রামমোহন রায় হ'তে একটি নূতন ভাব-বন্যা সারা বাঙ্গালা দেশকে আলোড়িত করে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের নূতন ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাজা রামমোহন রায় এক নূতন বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করেন। তারপর থেকেই বাঙ্গালীর ভাবরাজ্যের সীমা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। দুইটি সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁহার 'স্রষ্টা ভারত' (ক্রীয়েটিভ ইণ্ডিয়া, লাহোর, ১৯৩৭, ৪৫৯—৬১ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে—'ভারতের দ্বিবিধ অনুসন্ধান' নামক অধ্যায়ে বর্ত্তমান ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশী ও বিশ্বজনীন এই দুইটি ভাবের যে সমাবেশ হয়ে একটা নূতন কৃষ্টি গড়ে উঠেছে সে কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রামমোহনের

পর থেকেই দেশবিদেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী বাঙ্গালীর চর্চ্চার বিষয় হয়ে পড়ে। এই সমস্ত জিনিষ আয়ত্ত করে বাঙ্গালীর ছেলে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উদারভাবে প্রত্যেক বিষয় বিচার করতে শিখে। কোনও জাতি যখন জাগ্রত হয়, তার জ্ঞানপিপাসাও বর্দ্ধিত হয়, তখন সে সব দিক্ দিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠে। তখন সে বুঝতে পারে যে, জগতের সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে হলে ভাবের আদান-প্রদান ব্যতীত তা হতে পারে না। তারপর আবার ভিন্নদেশীয় ভাষা থেকে কোনও ভাব গ্রহণ কখনই সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজের মাতৃমন্দিরে তার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বাহন ও আসনের সৃষ্টি হয়। এইরূপে বিদেশী ভাব সম্যক রূপে আয়ত্ত করবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা বল্‌লে কিছুই অত্যুক্তি করা হবে না। যে সমস্ত বিদেশীয় লেখকের ভাবসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে নাম করতে হয় ফরাসী পণ্ডিত রুসোর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জীবনে রুসোর প্রভাব এত অধিক যে, তিনি ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে সাম্যশীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে রুসোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহু কালান্তরে তিন দেশে তিন জন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের মূল মর্ম্ম, মনুষ্য সকলেই সমান।"

পুনশ্চ, "প্রথম শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব। যখন বৈদিক ধর্ম্ম-সঞ্জাত বৈষম্যে ভারত বর্ণপীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন।—পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর

বৈষম্য কখনও কোনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই।—তখন বিশুদ্ধ আত্মা শাক্যসিংহ অনন্তকালস্থায়ী মহিমা বিস্তারপূর্ব্বক ভারত আকাশে উদিত হইয়া দিগন্ত-প্রধাবিত রবে বলিলেন, 'আমি উদ্ধার করিব। আমি তোমাদিগকে উদ্ধারের বীজ মন্ত্র বলিয়া দিতেছি, তোমরা সেই মন্ত্র সাধন কর। তোমরা সবাই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান, মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান, সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণ বৈষম্য মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্য ধর্ম্ম পালন কর।' দ্বিতীয় সাম্যাবতার যীশুখ্রীষ্ট। যে সময়ে যীশুখ্রীষ্টের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইয়োরোপ ও এশিয়া রোমক রাজ্যভুক্ত।"

"রোমক সাম্রাজ্যে চিরদাসত্ব-জনিত বৈষম্য সাঙ্ঘাতিক রোগ-স্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যক্তির সহস্র সহস্র চিরদাস থাকিত।" "এই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল......তিনি বলিয়াছিলেন—মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সমক্ষে তুল্য। বরং যে পীড়িত, দুঃখী ও কাতর সে ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অঙ্গহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল।" 'তৃতীয় সাম্যাবতার রুশো'। রুশোর মূল কথা সাম্য প্রাকৃতির নিয়ম (সাম্য ২১৭...... গ্রন্থাবলী ২৩৬)। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তিনি প্রথম জীবনে রুসোর মতাবলম্বী হয়ে পড়েন এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধেও উক্ত মত সমর্থন করেন। কিন্তু পরজীবনে তিনি রুসোর প্রভাব হ'তে সম্যকরূপে মুক্তি লাভ করেন। আমরা যখনই দেখি তাঁহার বেশীর ভাগ নায়ক এবং নায়িকা উচ্চবংশ-সম্ভূত এবং সমৃদ্ধিশালী জমিদার, তখনই মনে হয় যে, সাময়িকভাবে ভিন্ন ওতপ্রোতভাবে রুসোর প্রভাব তাঁহার মনকে অধিকার করতে পারেনি। এবং উক্ত মতের সমর্থনকল্পে আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় ভাগে, তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীশবাবুর লিখিত কথায়

নির্ভর করতে পারি। তিনি শ্রীশবাবুকে বলেছিলেন, "সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" রুসোর পর আর কোনও পাশ্চাত্য লেখক যদি বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন, তা' হলে ডারউইন ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের নাম করা যেতে পারে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সমালোচনা, সূক্ষ্ম তর্কজাল এবং বিচার বুদ্ধির প্রখরতা দ্বারা উভয় লেখককেই বহু স্থানে আক্রমণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি, তা' হ'লেও তাঁহাদের প্রভাব হ'তে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তাঁর তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত বুদ্ধি অন্ধ ভাবে কোনও মত গ্রহণ করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' নামক প্রবন্ধে (লোকরহস্য। গ্রন্থাবলী ৫৬) তিনি ডারউইনের মতবাদকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। উক্ত প্রবন্ধে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, "চতুষ্পদের মধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য।" পণ্ডিতেরা বলেন যে, "কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে, এক অবয়বের পশু অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদি বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।" (গ্রন্থাবলী ২৮)

'মিল ও ডারউইন এবং হিন্দুধর্ম্ম (বঙ্গদর্শন ১২৮২ বৈশাখ। ত্রিবেদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে? বিবিধ প্রবন্ধ, গ্রন্থাবলী ১০৯) নামক প্রবন্ধে তিনি উভয় লেখকের মতবাদের সহিত হিন্দুদর্শনের মতবাদের তুলনা করেন। এবং মিল ও ডারউইনের মতবাদ স্থানে স্থানে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেও সর্ব্বশেষে বলেন, "খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।' তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক প্রবন্ধে কঁৎ ও বার্কলের প্রভাব বেশ অনুভব করা যায়, কিন্তু এই উভয়

বিদেশীয় মতবাদকে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা নিজের একটি অভিনব মতবাদে পরিণত করেছেন। এইভাবেই বৈদেশিক মতবাদকে তিনি একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। তাঁর কৃষ্ণ প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের একটি সমন্বয়।

আইন ও বিচার

এইসমস্ত বিভিন্ন বৈদেশিক স্বাধীন-চেতা লেখকের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়াতে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণায় তীক্ষ্ণ সমালোচকের দৃষ্টিতে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে কশাঘাত কর্‌তে ছাড়েন নি। আইন ও বিচার বিভাগের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকার জন্য তিনি আইনের অসারতা ও যুক্তিহীনতা এবং বিচারের শৈথিল্য ও অন্যান্য দোষগুলি অতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পেরেছেন। আইন ও আদালত থেকে যে সব সময় সুবিচার পাওয়া যেতে পারে না এ কথা তিনি অনেক জায়গায়ই উল্লেখ করেছেন।

সুবিচার পেতে হ'লে বর্ত্তমান আইন ও আদালতকে ন্যায়-পরায়ণতার কষ্টিপাথরে ঘষে আবর্জ্জনাটুকু বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সারটুকু নিয়ে নূতন করে গড়ে তুল্‌তে হবে, এ অভিমত তিনি স্পষ্ট না দিলেও অনেক স্থানেই তাই যে তাঁর অভীপ্সিত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রচলিত আইনের ফাঁকে যে কত বড় অন্যায় করা যেতে পারে, সে সব দৃষ্টান্তও তাঁর লেখনীমুখে বহু স্থানে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিচারের অন্যায়ের ভিতর আইন-প্রণেতার যে অন্তর্নিহিত প্রকাণ্ড দোষ-ত্রুটি রয়ে গেছে তা তিনি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। যে অন্যায় ও বৈষম্য সমাজের প্রত্যেক স্তরে স্তরে রয়েছে, সে অন্যায়টুকু আইনের ভিতরেও রয়ে গেছে, এই তাঁর অভিমত। কমলাকান্তের দপ্তরের ত্রয়োদশ

সংখ্যায় 'বিড়াল' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মার্জ্জারীর মুখ দিয়ে এই বৈষম্য ও আইনের যুক্তির অসারতাটুকু দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রকৃত ত্রুটি যেখানে তা সংস্কারের চেষ্টা না করে যেসব প্রাণী দুর্ঘটনাবশতঃ উক্ত ত্রুটীর নিকট উৎসর্গীকৃত, আইন তাহাদের উপর শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দেয়। কমলাকান্তের দপ্তরে মার্জ্জারীর মুখনিঃসৃত বাণীই তাহার প্রমাণ। "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতেও যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে না ইচ্ছা করে তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।" (কমলাকান্তের দপ্তর। গ্রন্থাবলী ৩৮)

কমলাকান্তের জবানবন্দী নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আইনের যুক্তির অসারতা ও বৈষম্য স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। "অন্যের উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনামাত্র। ইহাই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের হিন্দু আইন, তাহাই এখনকার ইয়োরোপের আন্তর্জ্জাতিক আইন, যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্কর-ভোগ্য, সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। রাইট অফ কন্‌কোয়েষ্ট যদি একটা রাইট হয় তবে রাইট্ অফ থেপ্ট কি একটা রাইট্ নয়?"

বঙ্গদেশের 'কৃষক' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিচার বিভাগের যেসব ত্রুটির জন্য দরিদ্র লোকেরা অসুবিধায় পতিত হয় তার একটা তালিকা করেছেন। আইন আদালতে কৃষকদের যে কোন উপকার হয় নাই তার পাঁচটি কারণ তিনি দেখিয়েছেন। প্রথম মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়-সাধ্য। দ্বিতীয়, আদালত প্রায় দূরস্থিত, যাহা দূরস্থিত তাহা

কৃষকদের পক্ষে উপকারী হ'তে পারে না। কৃষক ঘর, বাড়ী, চাষ প্রভৃতি ছেড়ে দূরে গিয়ে বাস করে মোকদ্দমা চালাতে পারে না। তৃতীয়, সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হ'তে বিলম্ব হয়। বিলম্বে যে প্রতীকার সে প্রতীকারকে প্রতীকার বলে বোধ হয় না। চতুর্থ, বর্ত্তমান আইনের অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা এবং পঞ্চম কারণ বিচারকবর্গের অযোগ্যতা।

(বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আইন। গ্রন্থাবলী ১৪২-৪৪)

তাঁহার সময়ের উক্ত কারণগুলি এখনও যে বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান তাহা বর্ত্তমান বিচার-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে। বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল একথা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সেই বৈষম্য যে দূরীভূত করা যেতে পারে এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। কিন্তু সে সংস্কার বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লবের দ্বারা যে সম্ভব তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁহার ধারণা এই যে, সুবিচার এবং বর্ত্তমান আইনের সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের দ্বারা এই বৈষম্য দূরীভূত করা যেতে পারে এবং এইরূপ ব্যবস্থা করাই রাজপুরুষদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহাই গেল বঙ্কিমচন্দ্রের আইন ও বিচার সম্বন্ধীয় অভিমত।

মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও বিবাহ

সামাজিক যেসব সমস্যার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন, তা হচ্ছে বিবাহ ও সামাজিক জীবনে মেয়েদের স্থান ও অবস্থা। সামাজিক জীবনে মেয়েদের স্থান ও অবস্থা যে বরাবরই হীন হয়ে এসেছে, তার সত্যতা পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে একবার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান সভ্য দেশগুলি সর্ব্ব সময়েই মেয়েদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা পেয়েছে। ইণ্ডো-জারমাণিক,

সেমিটিক, মঙ্গোলিয়ান—যাহাদেরই ইতিহাস আলোচনা করা যাক না কেন, কতকগুলি অসভ্য জাতি ব্যতীত সব স্থানেই দেখা যায় যে, পিতার আধিপত্যই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের বৈদিকযুগের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, পিতাই সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি ইচ্ছা করলেই তাঁর কন্যাকে বিক্রয় পর্য্যন্ত করতে পারেন। তবে পিতা বিবাহদানে সমর্থ না হলে মেয়েরা স্বামী পছন্দ করে নিতে পারত। বিবাহ হলেই স্বামী তার সর্ব্বময় দেবতা, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে প্রহার পর্য্যন্ত করতে পারেন, তবে পৃষ্ঠদেশ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে নয়। ব্রাহ্মণরাও মনুর যুগে মেয়েদিগকে যত অধঃপতনের কারণ বলেই একরকম ঠিক করে ফেলেছিলেন। তবে স্থানবিশেষে এ মতের প্রতিবাদও যে হয়নি তা নয়। বৈদিকযুগে স্বামী অক্ষম হ'লে অন্যের দ্বারা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনও জোর করে করবার অধিকার স্বামীর ছিল। চীন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, আজ অবধি সামাজিক জীবনে মেয়েদের অবস্থার পূর্ব্ব থেকে বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি। বিবাহের সম্বন্ধ সাধারণতঃ বাপ-মাই করে থাকেন। স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হলে স্বামী ইচ্ছামত তাকে মেরে ফেল্‌তে পারেন। মেন্‌সিয়াস্‌ মেয়েদের মেনে চলবার জন্য তিনটি আইনের উল্লেখ করেন। প্রথম, বাল্যাবস্থায় বাপ-মাকে মেনে চলবে, দ্বিতীয়, বিবাহিত অবস্থায় স্বামীকে মেনে চলবে এবং তৃতীয়, বিধবা অবস্থায় ছেলের সম্পূর্ণ অধীন। সিকিং গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই মেয়েদেরই সর্ব্ব দোষের জন্য দোষী বলা হয়েছে। এই জন্যই বোধ হয় বর্ত্তমান চীনে মেয়েদের প্রগতি মাত্রা ছাড়িয়ে চলবার উপক্রম করেছে।

প্রাচীন হিব্রু সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, সেখানে স্ত্রী ক্রয় করা যেত ও বহু বিবাহও প্রচলিত ছিল। মেয়েদের

সর্ব্বদোষের আকরও বলা হত। মহম্মদের সময়ের আরবদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করলেও সেই একই ইতিহাস চোখে পড়ে। মেয়েরা তখন পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ব্যবহৃত হতো। মেয়েদের সয়তানের দণ্ড বলে ধরা হতো। মহম্মদ মেয়েদের অবস্থার কিছু উন্নতি করতে চেষ্টা করেন। তিনি কোন লোককে চারিটির অধিক স্ত্রী গ্রহণে নিষেধ করেন। স্বামী স্ত্রীর আইন-গত বিচ্ছেদ প্রথাও তিনি সমর্থন করেন। মেয়েদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবার ওকালতিও তিনি করেছিলেন। পূর্ব্ব-কালীন গ্রীক সমাজ পর্য্যবেক্ষণ করলেও সেই এক ব্যবহারই দেখতে পাওয়া যায়।

এথেনসে একজন স্ত্রীকে দুই ভাইয়ে উপভোগ করবার প্রথা ছিল। স্ত্রী কর্জ্জ দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। এরিষ্টট্ল্ বলেন, রাজপুরুষ যেমন রাজ্য শাসন করেন পুরুষেরাও সেইরূপ মেয়েদের শাসন করবে। প্লেটো মেয়েদের অধিকারের কথা না বলে তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন। এথেনসে ভাল গৃহকর্ত্রীই আদর্শ স্ত্রী বলে পরিচিত হতো। রোমক সভ্যতা একটি স্ত্রী গ্রহণের পক্ষেই প্রথম থেকে মত প্রকাশ করেছে। কিন্তু আইন-গত বিচ্ছেদের পক্ষে প্রথমে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করা হতো। পরবর্ত্তী যুগে বিচ্ছেদের পক্ষে সেই সব অসুবিধা দূরীভূত করা হয়। ইয়োরোপে মেয়েদের পরাধীনতার নাগ-পাশ থেকে মুক্তি খুব সম্প্রতিই ঘটেছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ম্যারেড উয়োম্যানস প্রপার্টি এক্টএর সূচনা থেকেই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সামাজিক জীবনে সমপর্য্যায়ে স্থান দেবার চেষ্টা চলে আসছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা মধ্যযুগের ইয়োরোপের মেয়েদের অবস্থার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। দুর্ব্বল ও অত্যাচারিত এদেশের মেয়েরা সর্ব্ব সময়েই পুরুষের কাছে দেবীত্বের

দাবী আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু এই আদর্শবাদটুকু তাদের অনাচার অত্যাচার থেকে কখনই রক্ষা করতে পারে নি। না পারার কারণ বহুদিনের কুসংস্কার এবং উদার ও সংস্কার-মুক্ত চিন্তার অভাব। এই অভাব পূরণ করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা। বর্ত্তমান সভ্যতা স্ত্রী-স্বাধীনতা ও মেয়েদের সামাজিক অবস্থা উন্নত করবার দাবী সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভারত-বর্ষে এখনও কোনও কোনও অন্যায় ও অবিচার সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র মেয়েদের অবস্থা উন্নততর করবার জন্য যে কত চেষ্টিত ছিলেন তা তাঁর লেখনীমুখে বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ব্ব-কালীন অধিকার ও অত্যাচারগুলি তাঁহার সময় সম্পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান ছিল। তিনি এইসব অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে প্রতিবাদ করতে কোন দিনই ভীত বা বিচলিত হন নাই। সমাজের বহুতর সমস্যা তাঁহার হৃদয়কে অলোড়িত করেছিল। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ করতে হবে, আইনের দ্বারা বহু বিবাহ বন্ধ করতে হবে, শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা মেয়েদের মানুষ করে তুলতে হবে এবং সুবিধা মত বিধবা বিবাহ প্রচলিত করতে হবে। তাঁহার মতে এইভাবে সমাজের সংস্কার না করলে কোনও জাতি সভ্য বলে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না। বহু বিবাহের কুফল সম্বন্ধে এবং বিধবা বিবাহের সমর্থনে তাঁহার মত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে 'বিষবৃক্ষে'। নগেন্দ্রের সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন, কেননা এইরূপে সমাজ সংস্কার প্রয়োজন, কিন্তু কুন্দের বিষভক্ষণ ছাড়া উপায় নাই—কেননা সূর্য্যমুখী যে বর্ত্তমান। কুন্দ যদি বিষ না খায় তাহলে সূর্য্যমুখীর বিষ খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। বহু বিবাহের কুফল অবশ্যম্ভাবী। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, মানুষে মানুষে সমান

অধিকার-বিশিষ্ট, স্ত্রীগণও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকার-শালিনী।…………কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু, ইত্যাদি ইত্যাদি"…পুনশ্চ, "ইহার দুইটী উত্তর সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। দেখ, স্ত্রী পুরুষে যেরূপ স্বভাব-গত বৈষম্য, ইংরাজ বাঙ্গালীতেও সেইরূপ। ইংরাজ বলবান, বাঙ্গালী দুর্ব্বল, ইংরাজ সাহসী, বাঙ্গালী ভীরু, ইংরাজ ক্লেশ-সহিষ্ণু, বাঙ্গালী কোমল ইত্যাদি ইত্যাদি………যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু এটী বিচার-সঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালী দাস, ইংরাজ প্রভু এটীও বিচার-সঙ্গত হইবে। (সাম্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। গ্রন্থাবলী ২৩৪)। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বাস্তবিক বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে বলিলেও হয়—স্ত্রীগণকে পুরুষের মত লেখাপড়া শিখাইবার উপায় নাই। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত। সেই উপায়ও দ্বিবিধ। প্রথম স্ত্রীদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়, পুরুষ বিদ্যালয়ে স্ত্রীগণের শিক্ষা।" (বঙ্গদর্শন, চতুর্থ খণ্ড)

স্ত্রীগণের সুশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন, "স্ত্রীগণ সুশিক্ষিত হইলে তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই অর্থ উপার্জ্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।

(সাম্য। গ্রন্থাবলী ২৩৬)

বহুবিবাহ, অবরোধ-প্রথা ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও বহুস্থান থেকে তাঁহার মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'বিধবা বিবাহ—' নামক প্রবন্ধে

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই সে প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতি-বিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলেই পুনঃ পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।" বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজমত প্রকাশ করেন, "বহু বিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে—।" অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, "স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই।" (সাম্য)

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের বৈষম্য এখন অনেক পরিমাণে দূরীভূত হলেও তাঁর জীবিত অবস্থায় বিশেষ কিছুই হয় নাই। তাঁহার সুচিন্তিত অভিমতসমূহ এখনও সম্যকরূপে কার্য্যে পরিণত না হলেও—সমাজ সংস্কারের পথে বাঙ্গালী অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। তাঁহার শক্তি-শালী লেখনী সংস্কার বিষয়ক সাহিত্য সৃষ্টি করতে যে কত সাহায্য করেছে তা সমাজ-বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য করবার বিষয়।

সম্প্রদায়গত সম্বন্ধ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, ইহারা একত্রিত হয়ে একটা জাতি গঠনে সমর্থ কিনা এবং সম্প্রদায়-গত বিভিন্ন কৃষ্টি একটী কৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে কিনা এইসব প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট কিছু না বল্‌লেও তাঁহার উপন্যাসসমূহ এবং অন্যান্য লেখার ভিতর হতে, তাঁহার অভিমত অবগত হওয়া যায়।

বর্ত্তমানকালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বলতে সাধারণতঃ আমরা হিন্দু মুসলমান সমস্যাই বুঝে থাকি। আমরা ভুলে যাই যে, হিন্দু মুসলমান ব্যতীত আরও কয়েকটী সম্প্রদায় আছে। এক বাঙ্গালা দেশের কথা

বলতে গেলেই আমরা দেখতে পাই যে, অন্যূন পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে ছয়টী সম্প্রদায় বিরাজমান এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট।

হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খ্রীষ্টান, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ইয়োরোপিয়ান, এবং বৃটিশ সরকারের কৃপায় সৃষ্ট নবজাত অনুন্নত—এই ছয়টী সম্প্রদায় প্রত্যেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় না দিলেও এবং পরিচিত না হলেও বাঙ্গালার অধিবাসী ও বাঙ্গালার অর্থেই পুষ্ট। এই সমস্ত সম্প্রদায় পরস্পরের স্বার্থসংঘাতের আশঙ্কায় যে যার নিজের কৃষ্টি ও মতামতকে যতদূর সম্ভব স্বতন্ত্র রাখতে চেষ্টিত।

কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিষ তখন বাংলা দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করে নাই। সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি তখন সমাজের ঘৃণার পাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে গেলে বলতে হয় তিনি সম্প্রদায়গত মনোভাবের বহু উর্দ্ধে ছিলেন। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ ভাব তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তিনি সমগ্র অধিবাসীদিগের মধ্যে কেবল দুইটী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব দেখতে পেতেন, একটি অত্যাচারিত বুভুক্ষু নর-নারীর দল, আর একটি সুখী এবং আজন্ম-ভোগ-বিলাস-পরায়ণ শক্তিশালী সমাজ-শোষকের দল। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দোষ-গুণ উদার মানবতা দ্বারা বিচার করেছেন এবং যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকু কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন। তোষামুদে চাটুকার বাক্য প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন এবং যেখানে যে সম্প্রদায়ের দোষ দেখেছেন, সেখানেই তাকে আঘাত করতে ছাড়েন নি। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান যে একই মনুষ্য-জনোচিত স্বভাব ও গুণাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত তা তিনি সম্যক রূপে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্ম্ম এবং কৃষ্টিগত বিদ্বেষ তাঁহার মতবাদকে

কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মমতের সংমিশ্রণে একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতির কল্পনা যে তাঁর মনে উঁকি মেরেছিল তা তাঁর দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করলে বেশ বুঝা যায়। কালে যে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বর্ণের মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধের দ্বারা একটা পরিবর্ত্তন আসবে তা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন বলেই বোধ হয় ব্রাহ্মণ পিতা ও বিধবা ক্ষত্রিয় মাতার গর্ত্তজাত তিলোত্তমাকে তিনি নির্ব্বিকার-চিত্তে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতার গর্ত্তজাত জারজ কন্যা ক্ষত্রিয় চূড়ামণি রাজা বিক্রমজিতের বিবাহিতা পত্নী। মুসলমান কন্যা আয়েষার হিন্দু জগৎসিংহের প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন ইত্যাদি উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের গোঁড়া সামাজিক শাসনের প্রাবল্য হেতু বোধ হয় তিনি আয়েষার সহিত জগৎসিংহের বিবাহ পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন নি। বস্তুতঃ প্রেমের বন্ধনে নরনারী যখন আবদ্ধ হয় তখন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত ও কৃষ্টিগত বৈষম্য আপনা আপনিই সরে দাঁড়ায়। ফল হয় এই যে, তাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা আর সেই সঙ্কীর্ণ মতের দ্বারা শাসিত হয় না। একটা বিশ্বজনীন উদার ভাবে তাহাদের হৃদয় পরিপ্লুত হয় এবং ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণতা ও সামাজিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় হতে একটি অখণ্ড জাতি উদ্ভূত হয়। নূতন জাতির কৃষ্টি হয় উভয় জাতির কৃষ্টির সমন্বয়ে। পরস্পরের সঙ্কীর্ণতাটুকু বাদ পড়ে উদার ভাবটুকুই সংগৃহীত হয়ে থাকে। এই সব ধারণা যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারেনি তারই বা নিশ্চয়তা কি? 'রাজসিংহ'তে তিনি ঔরঙ্গজেবের সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য হলেও আজকালকার যুগে অনেকে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থকারের নিবেদনে তিনি যেসব কথা বলেছেন তা পড়লে এই সঙ্কীর্ণ ধারণার অবসান

হতে পারে। তাঁর বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; "গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোনও প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না; মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না; মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমান কয়েক শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে, মুসলমান রাজাসকল, হিন্দু রাজাসকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক স্থলে মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ, অনেক স্থলে হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা রাজকীয় গুণে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক মুসলমান হউক সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হউক মুসলমান হউক সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।"

(গ্রন্থাবলী ৬৬৩)

উপরোক্ত "ধর্ম্ম" কথা দ্বারা তিনি কোনও ধর্ম্মমত বুঝাতে চাননি। উদার ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার প্রতিপাদ্য।

"আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষদের কোনও কোনও সভায় বিনয়বাবুকে বলতে শুনেছি যে, আনন্দ মঠে 'বন্দেমাতরম্' গানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু এবং মুসলমান তফাৎ করে দেখেন নি। সেখানে বাঙ্গালী বলতে তিনি উভয়কে বুঝেছেন—বস্তুতঃ

'সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে'

—ইহার দ্বারা কোন একটি সম্প্রদায় বুঝায় না, বাঙ্গালার হিন্দুরা সপ্তকোটি নয়, ইহার দ্বারা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই বুঝায়।

এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ মোটেই নেই। বস্তুতঃ ঠিক এর উল্টোটাই স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মতে সম্প্রদায়গত সম্বন্ধ উদার মতামতের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

শ্রেণী ও বর্ণ

সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় মতামতের পর শ্রেণী ও বর্ণ সম্বন্ধীয় মতামতের আলোচনা করা যাউক। হিন্দুদের মধ্যে বর্ত্তমান অন্যান্য সমস্ত বৈষম্যের চাইতে শ্রেণীগত বৈষম্য ও বর্ণবৈষম্য তাঁকে সব চেয়ে বেশী বিচলিত করেছিল। একথা বললে তিনি যে বর্ণ বিভাগের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন তা ঠিক বুঝায় না। তবে বর্ণ-বিভাগ হতে যে অধিকার-বিভাগ এসে পড়ে এবং সেই অধিকার বিভাগ থেকে যে সামাজিক বৈষম্য উপস্থিত হয় একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। দুর্ঘটনা-প্রযুক্ত কাহারও গৃহে জন্মগ্রহণ করার জন্য যে কাহাকেও আজন্ম অধিকারগত অসুবিধা ভোগ করতে হবে এরকম যুক্তি তিনি কোন দিনই বরদাস্ত করতে পারেন নি; এই বর্ণগত বৈষম্যের জন্যই যে ভারতের অবনতি একথা তিনি বার বারই উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলতে হলে তাঁরই ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন:—

"পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন বর্ণ বৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখনও কোনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। অন্য বর্ণ অবস্থানুসারে বধ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ শত অপরাধেও অবধ্য।

"ব্রাহ্মণে তোমার শতপ্রকার অনিষ্ট করুক, তুমি ব্রাহ্মণের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণ রেণু শিখর দেশে গ্রহণ কর, কিন্তু শূদ্র অস্পৃশ্য, শূদ্র-স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত অব্যবহার্য্য। এ পৃথিবীতে কোনও সুখে শূদ্র অধিকারী নহে। কেবল নীচ বৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। জীবনের জীবন যে বিদ্যা, তাহাতে তাহার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রে বধ্য, অথচ শাস্ত্র যে কি তাহা তাহার স্বচক্ষে দেখিবার অধিকার নাই, তাহার নিজ পরকালও ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ যাহা বলিবেন, তাহা করিলেই পরকালের গতি, নহিলে গতি নাই। ব্রাহ্মণকে দান করিলেই পরকালের গতি, কিন্তু শূদ্রের সেই দান গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ পতিত। ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই পরকালের গতি, অথচ শূদ্রও মনুষ্য ব্রাহ্মণও মনুষ্য।"

(সাম্য। গ্রন্থাবলী ২১৭—১৮)

এই বর্ণগত অধিকার-ভেদের পর শ্রেণীগত বৈষম্য তাঁর নিকট ভীষণ বলে বোধ হয়। শ্রেণীগত বৈষম্যের মূলে অর্থগত বৈষম্য। এই অর্থগত বৈষম্য আজ পৃথিবীর একটী প্রধান সমস্যা। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে তিনি শ্রেণীগত বৈষম্যের একটী জাজ্জ্বল্যমান চিত্র অঙ্কিত করেছেন। উহা উদ্ধৃত করা গেল, যথা :—"যে বসুন্ধরা কাহারও নহে তাহা ভূম্যধিকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে তাহা কিছু বলিতে হইল। যতক্ষণ জমিদার বাবু সাড়ে সাতমহল পুরীর মধ্যে রঙ্গীন সার্সী প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্র সহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায় খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মসার বলদে ভোঁতা হালে তাহার ভাগের জন্য চাষ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের এই ভাদ্রের

রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। তাহা নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না। এই চাষের সময়, সন্ধ্যা বেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুণ লঙ্কা দিয়া আধ-পেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, নয় ভূমে গোয়ালের এক পাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে। যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমি মাটী কাড়িয়া লইবে, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস।"

(সাম্য। গ্রন্থাবলী ২২৪)

বস্তুতঃ, এই সব উক্তি থেকে বেশ স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতি স্বাভাবিক তারতম্য যে অবস্থার তারতম্য আনয়ন করতে বাধ্য—তা তিনি স্বীকার করতেন; কিন্তু কাহারও শক্তি থাকলে অধিকার নেই বলে তাকে বিমুখ করবার পক্ষে তিনি ছিলেন না এবং এই শ্রেণীগত ও বর্ণগত পার্থক্যের একটা পরিবর্ত্তন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

দারিদ্র্য ও ধনদৌলত

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি পর্য্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের তিনটী পরিষ্কার স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, আমরা দেখতে পাই পৃথিবী হ'তে উৎপন্ন দ্রব্য সকলেই ভোগ করতে অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায়,

সমাজ অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ, এবং দাস ও প্রভু ইত্যাদি সম্বন্ধের সৃষ্টি এবং সমাজে শৃঙ্খলা বর্ত্তমান, কিন্তু স্বাধীনতা নাই এবং তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন হ'লেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তরাধিকারের প্রভাবে সমগ্র মানবজাতি দুইটী ভাগে বিভক্ত।

একটী অন্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য উপভোগে অধিকারী আর একটি বিরাট দল যাহাদের কিছুই নাই। এই দুইটী দলই বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিমযুগের লোকের মধ্যে সামান্য কিছু জমি ও দুই চারটী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহের বিশেষ কিছু সুবিধা ছিল না। সামান্য যা-কিছু ছিল তা ব্যবহার ও জীবিকাসংস্থানের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সে সংগ্রহ করত। যেসব আদিম যুগের লোক শীকার করে খেত তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা আত্মীয়স্বজনের দ্বারা গঠিত কোনও পরিবারের দ্বারা জমি অধিকারের প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু দল-বদ্ধভাবে জমি অধিকার করে তা' উপভোগ করা এবং খাদ্যদ্রব্য নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবার রীতি তাদের ছিল। কালক্রমে চাষবাস করতে শিখবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর জমিগুলি নিজেদের অধিকারে রাখবার প্রথা গজিয়ে উঠ্‌ল এবং বেশীর ভাগ জমি দলের সর্দ্দারদের হাতে গিয়ে পড়ল। আর তারা নামমাত্র সামন্ত থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তায় পরিণত হ'ল। এর সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে অধিকারশূন্য কৃষকদলের উৎপত্তি হ'ল।

এখনও আদিম জাতিদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যতই তারা শীকারের কার্য্য পরিত্যাগ করে চাষবাসের দিকে মন দিয়েছে ততই সঙ্ঘ ও দলের হাতের অধিকৃত সম্পত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সর্দ্দার ও জমিদারের দল বর্দ্ধিত হলেও তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হচ্ছে না। আদিম যুগে দলগত শাসনাধিকার

ক্রমে পরিবারভুক্ত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে থাকে এবং এর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সূচনা হতে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি আদান প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিতে থাকে। তার ফলে আস্তে আস্তে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠতে থাকে। বাণিজ্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করার প্রথা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

বাণিজ্য ও সম্পত্তি বৰ্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও গরীব এই দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং গরীবদের সঙ্গে সমাজ কিরূপ ব্যবহার করবে তার প্রশ্নও এসে পড়ে।

দুৰ্দ্দশাগ্রস্ত লোকদের অস্তিত্ব একটা নৈতিক মনোভাবেরও সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আদিম যুগের লোকাচারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, দুৰ্দ্দশাগ্রস্তের সাহায্য এবং অতিথি সৎকার এই দুইটী সমাজ হিতকর কার্য্য খুব বেশী রকমই প্রচলিত। পুরাকালীন সভ্যতার পারিবারিক সঙ্ঘবদ্ধতা ও পূৰ্ব্ব পুরুষদের পূজার প্রথা বৃদ্ধ ও সামর্থ্যহীনদের সাহায্য করে। মিসর দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বৃদ্ধ ও দুৰ্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্যদান ধৰ্ম্মকার্য্য বলে ধরে লওয়া হতো। ব্যাবিলনেও গরীবদিগের সাহায্য না করাকে পাপ করার সমতুল্য বলে স্বীকার করা হয়েছিল। চীনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, বৃদ্ধদের সাহায্য ও ভরণ-পোষণ সেখানকার সামাজিক এবং পারিবারিক নীতির একটি অঙ্গ। ভারতবর্ষে মুষ্টি ভিক্ষার নিয়ম এবং বৃদ্ধ পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনদের ভরণ পোষণের প্রথা এখনও বৰ্ত্তমান; হিব্রু আইনে গরীবদের নিকট হইতে সুদ নেওয়ার প্রতিবন্ধকতা করতে চেষ্টার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের আইনে ভিক্ষাদান সমর্থন করে এবং সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এইরূপে সমগ্র সমাজেই গরীবদের সাহায্য করা একটি সামাজিক নীতি বলে স্বীকৃত হয়।

গ্রীস্ দেশের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, পুরাকালে ক্রীট্ ও স্পার্টার দরিদ্র ও ধনী অধিবাসীরা একই স্থানে সাধারণের অর্থে অন্ন গ্রহণ করত। এথেন্‌সে সোলোনের সময় পর্য্যন্ত পুত্রকন্যাবিহীন লোকদের সম্পত্তি পিতৃমাতৃহীন ছেলেদের মানুষ করবার জন্য ব্যয় করা হতো। হিপোক্রেটাস্ একটি আইনে লিপিবদ্ধ করেন যে, সহরে প্রবেশ করে চিকিৎসকদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে দরিদ্রদের রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা।

রোমের ইতিহাসে জানিতে পারি যে, এক হাতে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা হেতু দরিদ্রদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। এই অবস্থার প্রতিকারার্থ আইন লিপিবদ্ধ করে অধিক দামে রোমের নাগরিকবর্গের মধ্যে শস্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। পরে শস্যের দাম গ্রহণ প্রথাও লোপ পায়, এবং এই ব্যবস্থা আলেকজান্দ্রিয়া, এন্‌টিওক, কনষ্টান্টিনোপল্ প্রভৃতি স্থানেও প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, এসব দেশের নাগরিকবৃন্দ একটি প্রকাণ্ড কর্ম্মবিমুখ জাতির সৃষ্টি করে।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রোমে গরীবদিগের জন্য দাতব্য চকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের দুঃখ মোচন করার ভার খ্রীষ্টান পাদরী সম্প্রদায়ের উপর পড়ে। তাহার পর খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিভিন্ন আইন লিপিবদ্ধ করে এই সাহায্যের ব্যবস্থা ক্ষুণ্ন করতে চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ রাজা ষষ্ঠ এডোয়ার্ডের সময় ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষুকদের দাসরূপে ব্যবহার করবার প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু ১৬০১ খৃষ্টাব্দে এই বর্ব্বর প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয় এবং গরীব ও দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্য করা যে সমাজের কর্ত্তব্য একথাও স্বীকার করা হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে 'পুয়োর ল' বিধিবদ্ধ হয় এবং তারপর থেকেই গরীব ও দুঃস্থদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বহুবিধ চেষ্টা চলে আসছে।

এইত গেল সারা জগতের দারিদ্র্য ও ধনদৌলতের কথা। মানুষের সামাজিক অবস্থা যে কতকগুলি বৈষম্যপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে তা ইতিহাস পাঠ করলেই বুঝা যায় এবং এই বিষয়ে দার্শনিক ও সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ একটা স্পষ্ট অভিমত গড়ে তুলেছেন। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয় চিন্তা করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কোন নির্দ্দিষ্ট মতামত ছিল সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না। আর তিনি সমাজের ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির কথা কোথাও বিচার করতে প্রবৃত্ত হন নি। অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক দুই চারিটী প্রবন্ধ প্রকাশ করলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোন গবেষণা করবার অবসর যে তিনি পাননি তা বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে স্পষ্টকরে বলা হয়েছে। তিনি তার লেখা সম্বন্ধে বলেছেন, "যেমন কুলী মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"

(বিবিধ প্রবন্ধ ২য় খণ্ড, বিজ্ঞাপন। গ্রন্থাবলী ৯৪)

তিনি বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দ্দশার কথা বিস্তৃতভাবে সেখানে বিচার করেন! তবে উক্ত প্রবন্ধের মতামত সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছিলেন এবং অর্থশাস্ত্র-ঘটিত কতকগুলি ভ্রম যে তিনি উক্ত প্রবন্ধে করেছেন তাও স্বীকার করেন। সেই জন্য উক্ত প্রবন্ধের মতামতের উপর বিশেষ জোর দেওয়া যায় না। তবে উক্ত প্রবন্ধের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার। 'বঙ্গদেশের কৃষক'এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি লোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাঁর মতামত তুলে দেওয়া গেল। বঙ্কিম-চন্দ্র বলেন :—

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম ; যে পরিমাণে লোকবৃদ্ধি সে পরিমাণে ধনবৃদ্ধি প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না এবং অবস্থার প্রতিকারার্থ মানুষ উপায়ান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য।

এখনকার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দুইটী প্রতিষেধকের উল্লেখ করেন। প্রথম, যে দেশে খাদ্যদ্রব্যের এবং সংগ্রহের উপায়ের অভাব সে দেশ হ'তে যে দেশে জিনিষ এবং জিনিষ সংগ্রহের উপায়ের প্রাচুর্য্য সে দেশে গমন ; দ্বিতীয়, বিবাহ প্রবৃত্তির দমন এবং এইটীকেই তিনি প্রধান প্রতিষেধক বলে মনে করেন।

ভারতের শ্রমোপজীবীদের দুর্দ্দশার কারণও তিনি উক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। প্রথম, দারিদ্র্য হেতু শ্রমের বেতনের অল্পতা। দ্বিতীয়, মূর্খতা। বেতনের অল্পতা হেতু শ্রমিকেরা অর্থাভাবে অধিকক্ষণ শ্রম করতে বাধ্য হয় এবং অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার সময় পায় না। তৃতীয়, দাসত্ব—বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচার বৃদ্ধি, ইহার নামান্তর দাসত্ব। দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বই ইহাদের অবনতির কারণ, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত। এইত গেল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রমিকদের সম্বন্ধে অভিমত। কৃষকদের সম্বন্ধে এবং জমিদারদের সম্বন্ধে অভিমত রুসোর মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তার বিশেষ কোন অভিনবত্ব নাই। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে, তাঁর সময়ে বাঙ্গালা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনকার মত প্রভাবশালী হয়ে উঠেনি এবং তাদের অবস্থা এক রকম লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গিয়েছিল। সেইজন্য তিনি তাদের বিষয় বলবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখ্‌তে পান নি।

লোকশিক্ষা ও ধর্ম্ম

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর মতামতের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান কোথাও ছিল না। তাঁর ধর্ম্মমত ছিল

উদার। বিলাতে গেলে কিংবা কোন কিছু খেলেই যে ধর্ম্ম যায় তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, শারীরিক ধর্ম্ম বজায় রেখে প্রবৃত্তি অনুসারে আহার বিহার করতে হবে। ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার তিনি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবকে তিনি যে পত্র লিখেন তাতে বলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের কিংবা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথার বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।" এ বিষয় তিনি তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলতেন যে, সমাজ দেশাচারের অধীন; শাস্ত্রের অধীন নহে এবং দেশাচার পরিবর্ত্তনের জন্য ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি দরকার।

মহাভারতে কৃষ্ণের উক্তি :—

ধারণাদ্ধর্ম্ম নিত্যাহ ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

"ধর্ম্ম সকল লোককে ধারণ (রক্ষা) করেন, এইজন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।' ইহাকেই বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ উক্তি বলে মনে করতেন। লোক-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই যে, এখনকার শিক্ষাপ্রণালী লোক-শিক্ষার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। তিনি বলেন যে, ইংরাজ দেশ অধিকার করার পর শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাওয়া ত দূরের কথা যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। তার প্রথম কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে, বিদেশী ভাষায় শিক্ষা ও বক্তৃতা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। দ্বিতীয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোনরূপ সহযোগিতা নাই— লোকশিক্ষার প্রধান উপায় সম্বন্ধে তিনি 'লোক-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে

বলেন, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সমবেদনাই দেশের নিরক্ষরতা দূর করতে সমর্থ।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ-চিন্তা

সমাজ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের ভিতর প্রথমেই মনে হয় ক্রম-বিবর্ত্তনবাদের কথা। সমাজ-বিজ্ঞানকে ক্রমবিবর্ত্তনবাদের একটি শাখা বল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে পৃথিবী সম্বন্ধে কোনও একটি ধারণা যে করা যেতে পারে এবং সেই ধারণাই যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যেতে পারে, এই মত নিরীশ্বরবাদী হিউম্‌ ও মিল এবং বস্তুনিষ্ঠ (পজিটিভিষ্ট) কঁৎ প্রচার করেন।

এই ধারণার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যুক্তিতর্কের একটি সৌধ গড়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেন হারবার্ট স্পেন্‌সার। তাঁর দর্শন সমন্বয়ে (সিন্‌থেটিক ফিলসফি) বিবর্ত্তন বাদের চারিটি পরিষ্কার স্তর দেখান হয়েছে। প্রথম নিহারিকা (নেবুলা) হ'তে নিহারিকা জগৎ (কস্‌মস্‌), দ্বিতীয়, পদার্থ হ'তে জীবন, তৃতীয় জীবন হ'তে ব্যক্তিগত মন; চতুর্থ, ব্যক্তিগত মন হ'তে সমাজ। এই চতুর্থ স্তরটিই সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যক্তি-বিশেষকে পরস্পর সাহায্য ও আত্মরক্ষার জন্য একত্র হয়ে বাস করতে হয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গড়ে উঠে আচার ও ব্যবহার, নৈতিক বিধি ও স্বভাব, রাজ্য শাসন প্রণালী ও ধর্ম্ম, এবং সাহিত্য কলা ও বিজ্ঞান।

ইহাদের যে কোনও একটির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে তার গোড়াপত্তন। তারপর একটিকে ছেড়ে আর একটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা চলবে না। প্রত্যেকটির সহিত

সবগুলি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, স্বতন্ত্রভাবে দেখ্তে চেষ্টা করলে কোনটাকেই বুঝা যাবে না। সাহিত্য কিংবা আচারের কথা বলতে গেলে ধর্ম্ম ও নৈতিক বিধিকে বাদ দিলে চলবে না, তারা আপনাআপনিই এসে পড়বে। তা ছাড়া মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে যতটা সাহায্য করে ততটা বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। সেই কারণে সমাজবৈজ্ঞানিক হিসাবে কোনও লোককে বিচার করতে হলে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা—যেটা তার মনকে গড়ে তুল্তে সাহায্য করেছে, তার সম্বন্ধেও বিশেষ সজাগ থাকতে হবে। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, স্পেন্সারের সকল কথাই বর্ত্তমানে স্বীকার্য্য নয়।

ডারউইন ও স্পেনসারের আমলের ধারণা ছিল যে, মানুষ, কারণ ও তার ফল এই দুইটীর প্রভাবে চালিত হয়ে যন্ত্রবৎ চলে থাকে; সে ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। 'প্রকৃতির নিয়মে বাছাই', 'বলীয়ানের অস্তিত্ব রাখিবার দাবী,' কোনটাই আর পুরাপুরি বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না।

একালের ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী এবং দার্শনিক হবহাউস ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাজের অভ্যুদয়ের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতার প্রভাব সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত মঙ্গল ও সামাজিক মঙ্গল এই দুইটিকে যখন একই জিনিষের দুইটী দিক্ বলে বোধগম্য হয় তখনই উন্নতি ও অগ্রগমন আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে সকলেই চান ঐক্যতান। ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে আবার ঐক্যতান সম্ভব নয় যতক্ষণ না সমষ্টিগত জীবনে আমরা ঐক্যতান দেখ্তে পাই, সমষ্টির জীবনেও আবার ঐক্যতান সম্ভব হয় না যতক্ষণ না সর্ব্ব মানবে এই সুর ধ্বনিত হয়। হবহাউসের মতে

চল্‌তে হলে আমরা বুঝতে পারি সমাজ গঠনে ব্যক্তিত্বের প্রভাব কত এবং সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঐ ব্যক্তিত্বটুকুও মাপবার দরকার হয়ে পড়ে।

অপরপক্ষে তাঁহার সমসাময়িক ফরাসী সমাজ-বৈজ্ঞানিক ডুর্খাইম্‌ ব্যক্তিত্ব জিনিষটি যে সমাজ জীবনের একটা অভিব্যক্তি মাত্র এইরূপ বিশ্বাস করতেন। এই জন্য তিনি সামাজিক অবস্থাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান বিবেচনা করতেন। ইঁহাদের অন্যতম সমসাময়িক আর একজন ফরাসী দার্শনিক বার্গসেঁা ব্যক্তিত্ব জিনিষটি যে সমাজের স্থিরীকৃত কোনও বিষয় একথা ভাবতে পারেন নি। তাঁহার 'জীবনের অনুপ্রেরণা' ও 'এলঁা ভিতাল' ডুর্খাইমের সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতই প্রকাশ করে। বস্তুতঃ ব্যক্তিত্ব সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধনে যে কাজ করে তার তুলনাই হয় না। এই ধরণের মত বিবেচনা করলে সমাজ বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত দানের পরিমাণ ও সার্থকতা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলব্ধি হয়।

বাংলায় সমাজ-বিজ্ঞান

ইয়োরোপীয় ভাষা সমূহে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক এবং লেখার পরিমাণ প্রচুর। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কিংবা বই লেখা একরূপ হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশে প্রকৃত সমাজ বৈজ্ঞানিক বলে কোন লেখককেই ধরা যেতে পারে কিনা সন্দেহ। জগতের ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় যে, কৃষ্টি, সভ্যতা, জ্ঞান, শিল্প, প্রত্যেক জিনিষই আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। একদিনের মধ্যে কোন-কিছুই একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। হয়ত কালে বাংলাদেশেও সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে উঠবে। সূত্রপাত হয়েছে মাত্র।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যা কিছু বলা হ'ল তা তাঁর প্রবন্ধাবলী ও উপন্যাসগুলির তথ্যের উপর নির্ভর করেই বলা হয়েছে। উপসংহারে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন ঠিক সমাজ-শাস্ত্রী বা সমাজ-বৈজ্ঞানিক বলে ধরা যায় না। তবে তাঁর সমাজ সম্বন্ধীয় মতামতগুলি সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করে নেওয়া যেতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি বাঙ্গালা ভাষায় অদূর ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড সাহিত্য গড়ে উঠে তবু এ বিষয়ে তাঁর দান সামান্য হলেও কিছু কৃতিত্বের দাবী তিনি করতে পারবেন।

তাঁর সুনাম তাঁর মতামতের মূল্যামূল্যের উপর যতটা নির্ভর করে তার চাইতে বেশী করে তাঁর গবেষকসুলভ মনোবৃত্তির উপর।* উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে নব্য বাঙ্গালার স্বাধীন চিন্তার অন্যতম পথ-প্রদর্শক হিসাবে তিনি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, সমালোচনা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন। এই হিসাবে বাংলার সমাজ-বিজ্ঞানে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম প্রবর্ত্তকরূপে সম্বর্দ্ধনার যোগ্য সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজশাস্ত্রী হিসাবেও বাংলার নরনারী ইজ্জদ্ দিতে ছাড়িবে না।

* বিনয় সরকারের "দি অ্যাক্‌সেপ্টেব্‌ল্ অ্যাণ্ড দি আন-অ্যাক্‌সেপ্টেব্‌ল্ ইন বঙ্কিম্‌স্ সোশ্যাল ফিলজফি" (ক্যালকাটা রিভিউ, আগষ্ট ১৯৩৮) দ্রষ্টব্য।

সভাপতি অ্যাড্‌ভোকেট্ কেশবচন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুত সুবোধ ঘোষালের নূতন ভাবের বঙ্কিম-সমালোচনার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্কিমের উপন্যাসসমূহের বিভিন্ন ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের নরনারীর ভিতর যে ভালবাসার চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য দেখিতে না চেষ্টা করাই ঠিক। বঙ্কিমের মধ্যে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ভালবাসা স্কটের রোমান্টিক ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী বলেন, বঙ্কিম একজন যুক্তিবাদী লেখক ছিলেন এবং তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র"কে ফরাসী পণ্ডিত রেণা প্রণীত "খৃষ্ট-জীবন" গ্রন্থের চাইতে জার্ম্মাণ দার্শনিক ফয়ারবাখের "খ্রীষ্টধর্ম্মের সার" গ্রন্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ডাঃ ভূপেন দত্তের মতে বঙ্কিমকে সমাজ-চিন্তায় অগ্রগামী লেখকদের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। তিনি বলেন যে, বঙ্কিমের সময়ের প্রধান সমাজ-সংস্কারক হইতেছেন কেশবচন্দ্র সেন।

পরিষদের সভাপতি ও গবেষণাধ্যক্ষ ডাঃ বিনয়কুমার সরকার শ্রোতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, যুবক বাংলা যে, আজ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তাহার অন্যতম উদাহরণ বঙ্কিম সম্বন্ধে স্বাধীন ও তীব্র সমালোচনা। তিনি বলেন যে, বন্দেমাতরমের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে আজকালকার সমালোচনায় মামুলি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কোঠায় ঠাঁই পাইতেছেন ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বঙ্কিমের সময় হইতে বাঙ্গালী জাত কতদূর সরিয়া আসিয়াছে।

স্বদেশী যুগের বঙ্গ-সমাজ ও শিক্ষা-বিপ্লব

অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি এস্, সি-এইচ্ ই (ইলিনয়, আমেরিকা), রাসায়নিক এঞ্জিনীয়ার, কলেজ অব্ এঞ্জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি, যাদবপুর, কলিকাতা (জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ), বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষক-গণের পরামর্শদাতা

সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতর বোধ হয় শিক্ষার স্থানও আছে। প্রথমতঃ, সমাজের নানা প্রকার অবস্থার উপর শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, অপর পক্ষে শিক্ষা-ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজের উন্নতি সাধন করা হয়। বাংলা দেশের স্বদেশী-যুগে। (১৯০৫) সমাজের সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের সেবকগণের পক্ষে অন্যতম গবেষণার বস্তু হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের বিবেচনায় সেই যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে একটি বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেই বিপ্লবের একটি চিহ্নস্বরূপ অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকারের সেইসময়কার অন্যতম রচনা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। তখন আমরা মালদহের সদরে সরকারী জেলা স্কুলে ছাত্র ছিলাম। সেই সময়ে "মালদহ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রে বিনয়বাবুর "বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ বাহির হয় (১৯০৬ সনের জুন মাস)। সেই প্রবন্ধ কলিকাতার পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকন্তু স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে রচনাটি প্রচারিত হইয়াছিল। পরে সেই বৎসরই

জুলাই মাসের শেষে ও আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে সেই প্রবন্ধের ইংরেজি সংস্করণ কলিকাতার "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় বাহির হইয়াছিল। এই সূত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পর বৎসর ১৯০৭ সনের জুন মাসে বিনয়বাবু মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবন্ধটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ"

হুজুগ-পর্ব্ব শেষ হইল। এইবার কাজের পালা। অনেক গণ্ডগোল, অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক দলাদলি, আর অনেক আন্দোলনের পর বাংলার নরনারী বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ খাড়া করিয়াছে। অধিকন্তু জুলাই মাসের (১৯০৬) দ্বিতীয় সপ্তাহে এই পরিষদের অধীনে পরীক্ষাও গৃহীত হইয়া গেল। এক্ষণে এই পরিষৎকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক বাঙালীর,—সমগ্র বঙ্গ-সমাজের—উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। পয়সাওয়ালা লোকেরা ছাত্রবৃত্তি এবং ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য দানের ব্যবস্থা করুন। বাপ-মা ও অভিভাবকেরা পরিষদের অন্তর্গত ইস্কুল-কলেজে নিজ-নিজ সন্তানদিগকে ভর্ত্তি করিতে অগ্রসর হউন। আর বাংলার ছাত্রসমাজও হুজুগের সময়কার উৎসাহ ও উন্মাদনা কাজের সময়েও রক্ষা করিয়া চলুন। তাহা হইলেই বাঙালী জাতির শিক্ষা-বিপ্লব ফলপ্রসূ হইতে পারিবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়িত্ব ও উন্নতি কোনো একশ্রেণী বা এক সম্প্রদায়ের নরনারীর উপর নির্ভর করিতেছে না। এই জন্য চাই গোটা বঙ্গ-সমাজের সমগ্র বাঙালী জাতির সকল শ্রেণীর লোকের ধীর, স্থির ও নীরব কাজ। সকল

* এইখানে ১৯০৬ সনে প্রকাশিত বিনয়বাবুর "বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ" প্রবন্ধের আরম্ভ।

প্রকার বাঙালীর সহযোগিতা পাইলেই পরিষৎ খাঁটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিবে।

বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎকে প্রত্যেক বাঙালীর কেন সাহায্য করা উচিত তাহা বুঝিবার জন্য বেশী বেগ পাইতে হয় না। কয়েকটা কথা মনে রাখিলেই বাংলার নরনারী বুঝিতে পারিবে যে, জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন ছাড়া বাঙালী জাতির "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়-নায়"!

অন্নসংস্থান ও অর্থকরী বিদ্যা

যে-কোনো বাঙালীই আজকাল বেশ জানে যে, পেট চালানো দিন-দিন কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনের সম্মুখে আয়ের পথ হইতেছে মাত্র দুই। প্রথমতঃ সরকারী চাকুরী আর দ্বিতীয়তঃ, উকিলি-ডাক্তারি ছাড়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালীরা রোজগারের কোনো পথই ঢুঁড়িয়া পায় না। এইসকল বাঁধা পথের বাহিরে তাহাদের পক্ষে স্বপ্নেও চলা সম্ভবপর নয়। সাধারণতঃ কেহই এইসকল বাঁধা পথ স্বাধীন খেয়ালে ছাড়িয়া দিতে চায় না। আর নতুন একটা পথ আবিষ্কার করার দিকেও কেহ বড় একটা ঝুঁকে না। ফলতঃ ডাল-ভাতের যোগাড় করা ক্রমশই যারপরনাই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। যথোচিত ভাত-কাপড়ের অভাবে অনেক শিক্ষিত বাঙালী পরিবারকে কষ্ট পাইতে হইতেছে। এইসকল দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে চাই নতুন-নতুন আয়ের পথ। বাঙলার নরনারীর চোখের সামনে নতুন-নতুন টাকা রোজগারের উপায় দেখাইয়া দিতে না পারিলে বাঙালীকে জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইতে হইবে। খাওয়া-পরার উপায় উদ্ভাবন করাই বাঙালী জাতির পক্ষে মস্ত সমস্যা। এই জরুরি অভাব

মোচনের জন্য, অন্নসংস্থানের নতুন-নতুন পথ সৃষ্টি করিবার জন্য বঙ্গ-দেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের ব্যবস্থায় যে শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার ফলে বাংলার জনসাধারণ নব-নব প্রণালীতে আর্থিক অভাব মোচন করিবার সুযোগ পাইবে। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের গোড়ার কথাই এই অর্থকরী বিদ্যা, ভাত-কাপড়-বিষয়ক বিদ্যার ব্যবস্থা। কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা কর্ম্মের দিকে যুবক বাংলার মাথা ও হাত-পা তৈয়ারী করিয়া দিবার জন্য জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের ভিতর যেসকল প্রাকৃতিক শক্তি, সুযোগ ও সম্পদ্‌ আছে সেইগুলাকে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রণালীতে পুষ্ট করার দিকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধানতম নজর থাকিবে। দেশের ধনসম্পদ্‌ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, জাতীয় ধনভাণ্ডার যে-যে কর্ম্মকৌশলে পরিপুষ্ট হইতে পারে, সেইসকল দিকে শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্ম।

অতএব বাংলা দেশের জেলায়-জেলায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত যেসকল "জাতীয় বিদ্যালয়" আছে তাহাতে ভর্ত্তি হওয়া বাঙালী ছাত্রদের আসল স্বার্থ। বাপ-মা ও অভিভাবকেরা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামের কথা ভাবিলে জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতে পারিবেন। এইসকল ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার ভিতর ভাবুকতা, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি কিছুই নাই। আছে নিজ-নিজ অন্নসংস্থানের আশা, ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা। ছেলেদেরকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিলে কোনো পরিবারের আর্থিক লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং লাভই আছে ষোল আনা। এইসকল বিদ্যালয় হইতে যেসকল ছেলেরা বাহির হইয়া আসিবে,

তাহারা দেশের ভিতর নতুন-নতুন সম্পদ্ সৃষ্টি করিতে পারিবে। তাহারা যে কেবল দেশ বা সমাজকে ঐশ্বর্য্যশালী বা ধনী করিয়া তুলিবে তাহা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের নিজের পেট-পূজার ব্যবস্থাও হইতে থাকিবে। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ট্যাঁকেও রোজগারের টাকা আনিয়া জমাইতে পারিবে। অন্নবস্ত্রের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাতীয় শিক্ষা ষোল আনা বৈষয়িক আদর্শে গঠিত।

তবে যেসকল উকিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেদেরকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠানো বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করিবেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পাওয়ার উপর অন্যান্য যে-সকল শ্রেণীর লোকের মানসম্ভ্রম, টাকাপয়সা নির্ভর করে, তাঁহারাও নামজাদা উকিল-দের মতই জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাইবার বিরোধী হইবেন,—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের স্বার্থহানি ঘটিতে পারে এইরূপ বিবেচনা করা তাঁহাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহাদেব পক্ষেও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, একমাত্র অতি-নিকট বর্ত্তমানের ব্যক্তিগত স্বার্থ আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকা আসল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। গোটা দেশের আর্থিক স্বার্থ যাহাতে পুষ্ট হয় আর দূর ভবিষ্যতের উপকার সাধিত হয়, সেই দিকে নজর রাখিয়া সাংসারিক ব্যবস্থা করা পয়সাওয়ালা উকিল ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকের কর্ত্তব্য। নেহাৎ দুদিন-চারদিনের স্বার্থ আর নেহাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিয়াও খাঁটি পারিবারিক স্বার্থ পুষ্ট হইতে পারে। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আর সার্ব্বজনিক সম্পদ্-বৃদ্ধির কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানের ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা সত্যি-সত্যি স্বার্থত্যাগ নয়। এইসকল ছোটখাট ত্যাগের ভিতরই আসল স্বার্থসিদ্ধি নিহিত থাকে। একদিকে দেখিতেছি যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা-

প্রণালীর ভিতর সমগ্র দেশের লোকের ভবিষ্যৎ জাতিগত সম্পদ্‌বৃদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অপর দিকে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এমন কি মামুলি অভাব মোচনের সুযোগও নেহাৎ কম। সকল দিকে বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, যেসকল পরিবারের কোনো বাঁধা পথ নাই, তাহাদের পক্ষে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলেদেরকে তৈয়ারী করিয়া লওয়া ত সম্পদ্‌বৃদ্ধির উপায় বটেই। অধিকন্তু যেসকল পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতেছে তাহাদের পক্ষেও ভবিষ্যতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের আশ্রয়ে ছেলেদেরকে হাত-পার কাজে, আর যন্ত্র-ব্যবহারের কাজে গড়িয়া তোলা কর্ত্তব্য।

স্বদেশী আন্দোলন ও ছাত্র-নির্য্যাতন

আজও প্রত্যেক বাঙালীর মনে আছে যে, রংপুর, মাদারিপুর, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের ছাত্রেরা সরকারী ইস্কুল বর্জ্জন করিতে ও জাতীয় বিদ্যা-লয় প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যস্বরূপ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার কারণও সকলেরই মনে আছে। ছাত্রদিগকে জন্মভূমির সেবা হইতে জোর করিয়া বিরত করিবার জন্য সরকারী আইন জারি হইয়াছিল। সেই আইনের ফলে বাংলার ছাত্রগণ যথেষ্ট নির্য্যাতিত হইতে থাকে। কিন্তু ছাত্রেরা সরকারী বিদ্যালয়ে প্রচলিত এইরূপ অমানুষিক ও নীতিবিরুদ্ধ আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া লেখাপড়া বর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। যে লেখাপড়ার আবহাওয়ায় স্বদেশসেবা বে-আইনি বিবেচিত হয়, সেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়াই তাহারা মনুষ্যত্ব গঠনের সোপান-রূপে গ্রহণ করে। সরকারী ইস্কুল আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বদেশ-সেবার মন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য

তাহারা ব্রতবদ্ধ হইয়াছিল। যুবক বাংলার এই পুণ্যকাহিনী বাঙালী জাতি কোনো দিনই ভুলিতে পারিবে না।

সেইসকল স্বদেশ-সেবক ছাত্রদের কাজে সহযোগিতা করা ও সহানুভূতি দেখানো কি আজ বাঙালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য নয়? ভবিষ্যতের জাতীয় স্বার্থপুষ্টির জন্য যেসকল বাঙালী যুবা আত্ম-বলিদান করিয়াছে বঙ্গ-জননীর সেই সমুদয় সর্ব্বপ্রথম ত্যাগ-বীরগণের সঙ্গে যোগদান করিতে কি প্রত্যেক পরিবার হইতে দলে-দলে ছেলেরা গিয়া ভিড়িবে না? আর এই সমুদয় স্বার্থত্যাগী কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ স্বদেশ-ব্রতধারী যুবাগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য কোন্ বাঙালী পরিবার আজ অগ্রসর হইবে না? ত্যাগ-মন্ত্রের এই-সকল উপাসকদিগকে অসহায় ও সঙ্গীহীনরূপে ফেলিয়া রাখিবার জন্য বাংলাদেশের কোন্ পিতামাতা ও অভিভাবক নিজ নিজ ছেলেদেরকে পরামর্শ দিবে? নিজের ছেলেদিগের জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা আর কোনো সরকারী চাকুর্য্যে হিসাবে বড় হইবার ব্যবস্থা করিয়া কোন্ বাঙালী পরিবার আজ এইসকল স্বার্থত্যাগী যুবকবৃন্দের কর্ম্ম-রাশিকে অপমানিত করিতে সাহসী হইবে? সেই সাহস আর সেই হৃদয় কোনো বাঙালীরই নাই। যদি বাংলাদেশে এমন কোনো লোক থাকে তবে সে রক্তমাংসের মানুষ নয়। মানুষের কলিজা, মানুষের হৃদয়, মানুষের চিত্ত-প্রবৃত্তি তাহার নাই। সে নরাধম।

স্বার্থত্যাগের অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক যুবারা বাংলাদেশের মফঃস্বলে যেসকল জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্বরূপ সেইসকল বিদ্যালয়ের কলিকাতাস্থ কলেজকেন্দ্রে ভর্ত্তি করিবার জন্য প্রত্যেক খাঁটি বঙ্গ-সন্তান তাঁহার পরিবারস্থ ছাত্রদিগকে পাঠাইবে এইরূপ আশাকরা বাঙালী জাতির পক্ষে স্বাভাবিক। দেশের সম্মুখে একটা মস্ত জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত। এই সঙ্কটের সময় কোন্ বাঙালী তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ-

সিদ্ধি বা স্বার্থনাশের কথা অতিমাত্রায় বিবেচনা করিবার জন্য বসিয়া থাকিবে? সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহে ছেলে পাঠাইলে কোনো-কোনো লোকের স্বার্থ মোটা আকারে পুষ্ট হইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, অন্যান্য অনেক ছাত্রেরই এইরূপ স্বার্থপুষ্টির সুযোগ ছিল। তাহারা স্বেচ্ছায় এইসকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া গোটা বাঙালী জাতির সম্পদ্ বৃদ্ধির আর শিক্ষাসংস্কারের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। আমাদের গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলন হইতে কি শিখিলাম, যদি আমরা আমাদের জাতির সেই কর্ম্মঠ অংশকে ভুলিয়া থাকিতে দ্বিধাবোধ না করি? এই বিরাট স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া আমাদের কি লাভ হইল যদি আমাদের স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকগণকে বর্জ্জন করিয়া নিজ-নিজ ক্ষুদ্র টাকা-পয়সা আর সরকারী সম্মানলাভের মোহে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়ি? স্বেচ্ছা-সেবকদের সঙ্গে যোগ দিতে যদি অপারগ হই, তাহা হইলে স্বদেশী আন্দোলন বাঙালী জাতিকে বেশী দূর লইয়া যাইতে পারিবে কি? আমাদের মনুষ্যত্ব যদি সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত লাভালাভের চিন্তায় অস্থির হইয়া যায়, আর দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য যাহারা নিজ পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাদের সুখদুঃখে পূরামাত্রায় সহানুভূতি দেখাইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে বৃথা আমাদের স্বদেশী আন্দোলন, বৃথা আমাদের স্বদেশ-সেবার আস্ফালন। এই অবস্থায় লোক-দেখানো স্বদেশ-সেবা, লোক-দেখানো স্বজাতি-নিষ্ঠা, আর লোক-দেখানো স্বদেশী আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া নিজ-নিজ ভাত-কাপড় আর ট্যাঁক সামলাইতে লাগিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর। স্বদেশী আন্দোলনকে যাহারা ভালবাসে তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য স্বার্থত্যাগী এবং সরকারী ইস্কুল বর্জ্জনকারী ছাত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে এইরূপই আশা করা যায়। স্বদেশী

আন্দোলনের সেবক ও পরিপোষকেরা জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে সকল উপায়ে পুষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইবে বিশ্বাস করিতেছি।

বঙ্গ-ভঙ্গ ও জাতীয় ঐক্য

এই গেল ভাত-কাপড়ের কথা আর আত্মসম্মানবোধের কথা। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত কলিকাতার কলেজে ছাত্র পাঠানো অন্যান্য কারণেও প্রত্যেক খাঁটি বাঙালী পরিবারের পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য। আজ বাংলাদেশের আবহাওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে জাতীয়তা, স্বদেশ-প্রেম, ঐক্য-বন্ধন, সমষ্টিগত কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি বস্তু প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশকে দুই টুক্‌রা করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বাঙালী জাতি এক, বাংলার চিত্ত এক, বাংলাদেশ এক, বঙ্গসমাজ এক। এই ঐক্যবদ্ধ বাংলার নরনারী একরূপ আদর্শে জীবন গঠন করিতেছে এবং একই ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া জগতে অগ্রসর হইতেছে। এই ধরণের ভাবধারা ও চিন্তা-প্রণালী বাংলা-দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তরে-অন্তরে কাজ করিতেছে। এই একতার আদর্শ, এই জাতীয় ঐক্যের চিন্তা যাহাতে বাংলার নরনারীকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করিতে পারে যাহাতে বাঙালী জাতির হৃদয়ে এই ঐক্য বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী ঘর করিয়া বসিতে পারে, সেই লক্ষ্য সাধনের জন্যই বাংলাদেশের জননায়কগণ এই জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই পরিষদের অন্তর্গত কলেজে ও ইস্কুলসমূহে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ, পুরাতন বঙ্গ ও নূতন বঙ্গ (এবং অন্যান্য যেসকল বঙ্গ সরকারী শাসন-ব্যবস্থার জন্য পরবর্ত্তিকালে সৃষ্ট হইতে পারে), সকল বঙ্গের ছাত্রেরাই একরূপ শিক্ষা পাইতে পারিবে, সকল বঙ্গের ছাত্র-জীবন একরূপ আদর্শ ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে, সকল

বঙ্গের যুবারা একরূপ নৈতিক ও মানসিক আবেষ্টনে গড়িয়া উঠিতে পারিবে। ঐক্যকে শক্তির উপায় বিবেচনা করিতে যে-সকল বাঙালী অভ্যস্ত তাহারা বঙ্গ-সমাজের শিক্ষা-নায়কগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ঐক্য-কেন্দ্রে শিক্ষালাভের জন্য নিজ সন্তান পাঠাইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ সত্ত্বেও দুই-টুক্‌রা-করা বাংলাদেশকে ঐক্য-গ্রথিত করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হইবে। একতা-বিধায়ক জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজ ও ইস্কুল-সমূহ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ, পুরাতন বঙ্গ ও নূতন বঙ্গ এই দুই বঙ্গের ছাত্রদিগকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে। সরকারী বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে কোন্ বাঙালী আজ আন্দোলন চালাইতেছে না? যে-কোনো লোকই সহজে দেখিতেছে যে, এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থায় সরকারী বঙ্গ-ভঙ্গের কুফলকে ষোল আনা উৎপাটন করিবার যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। সরকারী বঙ্গ-ভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া বাঙালী জাতির ঐক্যগ্রথিত সমাজ ও ভবিষ্যৎকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বঙ্গ-জননীর প্রত্যেক খাঁটি সন্তান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে রাজি হইবে। এই পরিষদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো বাঙালীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

জাতীয় উন্নতি আর সার্ব্বজনিক কর্ম্মের সফলতা কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের কার্য্যাবলীর উপর নির্ভর করে না। তাহার জন্য চাই দেশসুদ্ধ লোকের সমবেত চেষ্টা এবং পূর্ণ হৃদয়ের আজীবন কর্ম্ম-সাধনা। প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম্ম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় এই দিকে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে অর্থাৎ তাহার দ্বারা দেশের সম্পদ্ বাড়াইতে হইলে চাই প্রত্যেক ব্যক্তির কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কাজে লাগিয়া যাওয়া। সেইরূপ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে, অর্থাৎ তাহার সাহায্যে দুই-টুক্‌রা-করা বাংলাদেশকে ঐক্য-গ্রথিত বঙ্গ-

সমাজরূপে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে চাই প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ-নিজ সাধ্যমত প্রয়াস। এইজন্য ধনীদের নিকট হইতে চাই ধনদান, উচ্চশিক্ষিতদের নিকট হইতে চাই অল্প বেতনে বিদ্যাদান, বাপ-মা ও অভিভাবকদের নিকট হইতে চাই এইসকল প্রতিষ্ঠানে ছাত্রপ্রেরণ, আর ছাত্রদের নিকট হইতে চাই এই সমুদয়ে দলে-দলে ভর্ত্তি হওয়া। এই অবস্থায় নিজ-নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের হিসাব করিয়া কোন্ বাঙালী নিজ-নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইবে? যদি কেহ এইরূপ থাকে তাহা হইলে সে দেশের শত্রু। কেন না সে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রমাণ করিয়া ছাড়িবে যে, সরকারী বঙ্গভঙ্গে বাঙালী জাতির কোনো ক্ষতি হয় নাই, আর দুই-টুক্‌রা-করা বাংলার নরনারীকে জোড়া লাগাইয়া এক বাংলার নরনারীতে পরিণত করিবার কোনো আবশ্যকতা নাই। এই ধরণের ঐক্যবিরোধী, অনৈক্য-প্রয়াসী বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষীয়, দেশদ্রোহী লোক-জনের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন খাঁটি বঙ্গ-সন্তানদের ভিতর হিন্দুমুসলমান সকলেই বিশ্বাস করে যে, যে উপায়েই হউক না কেন, ভাঙা বাংলাকে জোড়া লাগাইতে হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে এমনসব ছাত্র অগ্রসর হইয়া আসিবে যাহারা নিজের লাভ-লোকসানের কথা না ভাবিয়া জাতীয় মঙ্গলের নয়া-নয়া পথে বিচরণ করিতে সাহসী। তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবহাওয়ায় প্রবেশ করিয়া তাহারা ভগবানের আদেশই প্রতিপালন করিতেছে। তাহারা অপর কোনো যুবার দিকে না তাকাইয়া নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে উৎসাহী হইবে। জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সফলতা লাভ করিবে কিনা তাহার সম্বন্ধে বিচার না করিয়াও তাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে এই নবীন শিক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত হইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িবে। তাহারা

ভবিষ্যতের বাঙালী জাতির গঠন-কর্ত্তারূপে ইতিহাসে স্থান পাইবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

উচ্চ শিক্ষার সর্ব্বনাশ

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল দেখিয়া সকলের মনেই কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এই ব্যবস্থা হইতে তাহাদের বেশী-কিছু আশা করিবার নাই। প্রতি বৎসর সকল প্রকার পরীক্ষায় হাজার দশেকের বেশী ছাত্র উপস্থিত হয়। কিন্তু মোটের উপর হাজার তিনেক উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অবশিষ্ট হাজার সাতেকের অবস্থা কি হইবে? এইসকল ছাত্র যে নেহাৎ অপদার্থ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। তথাপি তাহারা পরীক্ষায় ফেল হইতেছে কেন? তাহার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী ও পরীক্ষা-প্রণালীর দোষ। তাহা ছাড়া এই সকল ফেল-হওয়া যুবাদের সাংসারিক ভবিষ্যৎ কিরূপ? তাহারা উকিল-ডাক্তারও হইতে পারে না, সরকারী চাকুরীও পায় না। এই অবস্থায় বাপ-মা আর অভিভাবকদের কর্ত্তব্য কি? তাহারা কি তাহাদের ছেলেদিগকে হাল ছাড়িয়া দিবার পরামর্শ দিবে? যদি কোনোমতে ছেলেরা কপালের জোরে পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে পারুক আর তাহা না পারিলে হা-হুতাস করিয়া মরুক্, এইরূপ চিন্তাই কি বাঙালী সমাজের আবহাওয়ায় ছড়াইয়া পড়া উচিত? না অন্য কোনো উপায় উদ্ভাবন করিবার দিকে সমাজের মাথা ঘামাইতে লাগিয়া যাওয়া উচিত? যেরূপ ব্যবস্থা করিলে বাঙলার যুবাদের অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষার সুফল ভোগ করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টিত হওয়া সকল বাঙালী পরিবারের কর্ত্তব্য নয় কি? সমগ্র ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ সাংসারিক সুখ যাহাতে পুষ্ট হয় এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য

আজ বাঙালী জাতির নিকট সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিলে এই অভাব পূরণের কোনো সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অভাব পূরণের জন্যই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যাদান প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আরও এক কথা। লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-কমিশনের কুফল আজও পূরাপূরি দেখা দেয় নাই। অনতিদূর ভবিষ্যতে সেই কুফল-সমূহ প্রবল আকারে দেখা দিবে। তাহার বিধানে শিক্ষালাভের খরচ খুব বেশী বাড়িয়া যাইবে। কাজেই অনেক যুবা শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত হইবে। অধিকন্তু পরীক্ষায় পাশের সংখ্যাও কমিতে থাকিবে। কেন না পরীক্ষার ব্যবস্থায় কতকগুলা অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি হইবে। বহুসংখ্যক বিষয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা দিতে যাইয়া অনেককেই বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এইসকল দুরবস্থা হইতে বাঙলার ছাত্রসমাজকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করা এখন হইতেই বঙ্গসমাজের মস্ত কর্ত্তব্য নয় কি? যুবারা কি নিরক্ষর ও অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় জীবন ধারণ করিতে থাকিবে? দেশের সম্মুখে এক বিরাট সঙ্কট উপস্থিত। এই বিশাল জাতীয় সঙ্কট হইতে বাংলার নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য শিক্ষাপ্রণালীর ও পরীক্ষা-প্রণালীর সংস্কার-সাধন আবশ্যক। বহুসংখ্যক ছাত্রেরা যাহাতে নিজ-নিজ পছন্দসই বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা যাহাতে বেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করা বাঙালী জাতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে শীঘ্রই অর্দ্ধ শিক্ষা ও নিরক্ষরতার প্রভাবে বাঙলার নরনারী অধঃপাতে যাইতে থাকিবে। এই সঙ্কটের সময় ব্যক্তিগত ও সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির কথা না ভাবিয়া বঙ্গ-জননীর যথার্থ সন্তানগণ ভবিষ্যৎ বাঙালী সমাজের সমষ্টিগত শিক্ষা-স্বার্থ-পুষ্টির জন্য সকল উপায়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহায়তা করিতে

অগ্রসর হইবে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটিসমূহ এই পরিষৎ হইতে নিবারিত হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় বাঙলার যুবাগণের অনেকেই উচ্চ শিক্ষার সুফল ভোগ করিতে সমর্থ হইবে।

সাময়িক ও সাম্প্রতিক ঘটনা-সমাবেশ

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র সাময়িক কারণসমূহের উল্লেখ করা গেল। যেসকল সাম্প্রতিক ঘটনার কথা মনে রাখিলে যে-কোনো খাঁটি বঙ্গ-সন্তান জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কলেজে নিজ-নিজ ছেলে পাঠাইতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে সেইসকল সাময়িক অবস্থাপুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলাম। এই সাময়িক ঘটনা-সমাবেশ ভুলিয়া থাকা কোনো বঙ্গ-সন্তানের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যেক বাঙালীরই সহানুভূতি-সম্পন্ন হইবার অন্যান্য কারণও আছে। সেইসকল যুক্তি অতিমাত্রায় গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানকালে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর যেসব গলদ আছে, সেই সকল সাময়িক গলদের কথা ভুলিয়া গেলেও জাতীয় শিক্ষার জন্য বাঙালী মাত্রের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ধরা যাউক যেন, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান সহজেই ঘটিতেছে, আর দেশের ভিতর সম্পদবৃদ্ধির সুযোগও পুষ্ট হইতেছে। তাহা সত্ত্বেও বাঙলাদেশে একটা বে-সরকারী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আবশ্যকতা থাকিবে। ধরা যাউক যেন, সরকারী বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছাত্রেরা নির্য্যাতিত হইতেছে না, অথবা নির্য্যাতিত ছাত্রদিগকে সরকারী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে রাজি। তাহা সত্ত্বেও বঙ্গ-সমাজের পক্ষে জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ধরা যাউক যেন বঙ্গ-ভঙ্গ ঘটে নাই অথবা

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র বাঙালী জাতি ঐক্যশীল বঙ্গদেশে বসবাস করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও বাংলার নরনারীর জন্ত চাই একটা স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। ধরা যাউক যেন সরকারী বিশ্ববিত্থালয়ে শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রদিগকে কম খরচ করিতে হয়, ছাত্রেরা দলে দলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে ইত্যাদি। তাহা সত্ত্বেও বাঙলাদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি।

পৃথিবীর সকল দেশের লোকই জাতীয় শিক্ষা চায়। বাঙলার নরনারীও জাতীয় শিক্ষার অভাব বোধ করিতেছে। এই সময়ে বাঙালী মাত্রের পক্ষেই সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগা কর্ত্তব্য।

জাতি-স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় চরিত্র

বাঙলার নরনারী পৃথিবীর ভিতরকার একটা স্বতন্ত্র জাতি। বাঙালী জাতির স্বতন্ত্র ভাষা আছে, স্বতন্ত্র সাহিত্য আছে, স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, স্বতন্ত্র চরিত্র আছে, স্বতন্ত্র আদর্শ আছে, স্বতন্ত্র সংস্কার আছে, স্বতন্ত্র সভ্যতা আছে। অথচ সরকারী ইস্কুল-কলেজে বাংলা ভাষার ইজ্জৎ নাই, বাংলা সাহিত্যের গৌরব নাই, বাঙালী চরিত্র-সংস্কার-আদর্শ-সভ্যতা ইত্যাদির নাম-গন্ধ নাই। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি নিজ-নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলে। সেই স্বতন্ত্র চরিত্র পুষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক জাতিই নিজ-নিজ বিত্থালয়ে যথোচিত শিক্ষা-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ব-বিত্থালয়ে বাংলার যুবারা মাতৃভাষায়—বাংলায় শিক্ষা পাইবার সুযোগ পায় কি? বাংলার যুবারা ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো ভারতীয় গ্রন্থকারের রচনার সহিত পরিচিত হইতে পারে কি?

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় কোনো ভারত-সন্তান ভারতীয় সংস্কার, সভ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বই লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন কি? ভারতের ঐতিহাসিক দার্শনিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কিম্বা শিক্ষকেরা কোনো গৌরবসূচক সংবাদ পায় কি? এই সকল প্রশ্নের জবাব দিতে সুরু করিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জন্য যে-ধরণের, যে-আদর্শের বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভারতের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সেই ধরণের ও সেই আদর্শের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নয়। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগরিত করিবার জন্য, জাতীয় গৌরব পুষ্ট করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থা বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই। এই অভাব সম্বন্ধে বাংলার নরনারী অল্পদিন আগেও বেশী সজাগ ছিল না। বর্ত্তমানে এই অভাব সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির চৈতন্য বিশেষভাবে জাগরিত হইয়াছে।

বাংলার জন-নায়কগণ বাংলা ভাষার সাহায্যে উচ্চতম শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সভ্যতা—ইত্যাদির উপর শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি যাহাতে বিশেষভাবে নিক্ষিপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। এইজন্য একদিকে সংস্কৃত ও পালি ভাষার সাহায্যে সকল প্রকার অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরবী ফারসীর ইজ্জৎও দেওয়া হইয়াছে। অপরদিকে হিন্দী, মারাঠি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার আয়োজন এই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম বিশেষত্ব। সমগ্র ভারতের মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে জ্ঞান পুষ্ট করা হিন্দী, মারাঠি ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দিবার প্রধান উদ্দেশ্য। সকল দিক্

হইতেই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় বাংলার যুবারা জাতীয় চরিত্র ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চৈতন্যশীল হইতে পারিবে। পৃথিবীর যেসকল বিদ্যালয়ে জাতীয় বিশেষত্ব সম্বন্ধে বিদ্যাপ্রচারের ব্যবস্থা নাই, সেইসকল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারে না, বস্তুতঃ যথার্থ মানুষ গড়িয়া উঠে না। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে ভারতবর্ষের সরকারী ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ফেল মারিতে বাধ্য। বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ-স্রষ্টা ও ব্যক্তিত্ব-গঠনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বসমূহের দিকে বাংলার নরনারীর দৃষ্টি টানিয়া আনিয়াছে।

সুতরাং জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কলেজে বাংলার নরনারী কেন তাহাদের ছেলেদিগকে পাঠাইতে উৎসাহী হইবে তাহা আর নতুন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বাঙালী জাতির জন্য চাই বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ইহাই হইল বঙ্গীয় শিক্ষা-বিপ্লবের মূলমন্ত্র! জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে টান বাড়াইবার জন্য, জাতীয় আদর্শ পুষ্ট করিবার জন্য, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য, জাতীয় অতীত সম্বন্ধে গৌরববোধ জাগাইবার জন্য, জাতীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা সঞ্চারিত করিবার জন্য বাঙালী জাতি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপন করিয়াছে। ইহার সঙ্গে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা সাধন করিতে বসিলেও বাংলার জাতীয় মঙ্গলকে অপমান করা হইবে।

স্বরাজ ও স্বাধীনতা

এইবার আর একটা মহত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ করিতে চাই। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ বাঙ্গালার নরনারীর সর্ব্বপ্রথম স্বরাজ-প্রতিষ্ঠান।

আজকাল বাংলার নরনারী স্বরাজ লাভের জন্য ব্যগ্র। স্বাধীনভাবে দেশ-শাসনের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের চিত্তে প্রধান স্থান অধিকার করিতেছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-ব্যবস্থার বহির্ভূত আর সম্পূর্ণরূপে দেশের লোকের অধীন জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ সেই স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনেরই প্রতিমূর্ত্তি। এই পরিষৎকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য বাংলার নরনারী যাহা-কিছু করিবে তাহাতে স্বরাজ-ভোগেরই স্বাদ পাওয়া যাইবে। আর এই পুষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী জাতি স্বরাজ, আত্মশাসন, আত্মকর্তৃত্ব ইত্যাদির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে থাকিবে। কাজেই জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কলেজে ছাত্র পাঠাইয়া বঙ্গজননীর যথার্থ সন্তানগণ বঙ্গসমাজকে, বাঙালী জাতিকে স্বরাজ-শক্তিতে বর্দ্ধিত করিতে ব্রতবদ্ধ হইবে এই বিষয়ে সকলেই আশান্বিত হইতে পারি।*

"শিক্ষা-বিজ্ঞান" গ্রন্থাবলী ও স্বদেশী বিপ্লব

এই রচনার ভিতর সেই সময়কার (১৯০৬) বঙ্গ সমাজের শিক্ষা-বিষয়ক অসম্পূর্ণতাসমূহ পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। কোনো-কোনো অসম্পূর্ণতা ইতিমধ্যে কিছু-কিছু বিদূরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

১৯০৬ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত সময়ের বিনয়বাবুর বাংলা গ্রন্থাবলী "যুবক বঙ্গের জীবন-প্রভাত" নামে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। "বাংলার জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ" প্রবন্ধ এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইবে। তাহার পরবর্ত্তী বিনয়বাবুর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় রচনাবলী নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

* এইখানে বিনয়বাবুর ১৯০৬ সনের "বাংলার জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ", প্রবন্ধ সমাপ্ত।

১। বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা (১৯০৭), ৫০ পৃষ্ঠা।

২। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির কার্য্য পরিচালনা (১৯০৭) ১৬ পৃষ্ঠা।

৩। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০), ৫৬ পৃষ্ঠা।

৪। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (১৯১০), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫। ভাষাশিক্ষা (১৯১০), ১২০ পৃষ্ঠা।

৬। সংস্কৃত শিক্ষা, চার ভাগ (১৯১১), ৩২০ পৃষ্ঠা।

৭। ইংরাজি শিক্ষা, দুই ভাগ (১৯১১), ২২০ পৃষ্ঠা।

৮। ষ্টেপ্‌স্ টু এ ইউনিভার্সিটি (শিক্ষা-সোপান), ১৯১২, ৬৪ পৃষ্ঠা।

৯। শিক্ষা-সমালোচনা (১৯১২), ১৫০ পৃষ্ঠা।

১০। দি পেডাগজি অব দি হিন্দুজ্ (১৯১২), ৪৮ পৃষ্ঠা।

১১। ইণ্ট্রোডাক্‌শন টু দি সায়েন্স অব্ এডুকেশন (লংম্যান্‌স গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানী, লণ্ডন, ১৯১৩), ১৭৩ পৃষ্ঠা।

১২। নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর (১৯১৪), ২৮০ পৃষ্ঠা।

এইসকল গ্রন্থের কয়েকখানার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।*

সেসকল সুধী সমাজ-চিন্তার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে শিক্ষা-বিষয়ক এইসকল গ্রন্থ কাজে লাগিতে পারে। স্বদেশী যুগের সামাজিক অবস্থা বুঝিবার জন্য "শিক্ষা-বিজ্ঞান" গ্রন্থাবলী বোধ হয় মূল্যবান্ বিবেচিত হইবে। অধিকন্তু বঙ্গসমাজে শিক্ষা-বিপ্লবের সূত্রপাতও কিছু-কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

* প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, বিনয় বাবুর শিক্ষাবিষয়ক আর একখানা বই ১৯২৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার নাম "কম্পারেটিভ্ পেডাগজিক্‌স্ ইন্ রেলেশন টু পাব্‌লিক ফিনান্স্ অ্যাণ্ড ন্যাশন্যাল ওয়েল্‌থ" (কলিকাতা)।

দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকার" ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। প্রেসেডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা"র ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। জজ কবি বরদাচরণ মিত্র "শিক্ষা-সমালোচনা" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। "ইণ্ট্রোডাক্‌শন ইত্যাদি" গ্রন্থ ৩নং গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। এলাহাবাদের পাণিনি আফিসের পরিচালক মেজর ডাক্তার বামনদাস বসু অনুবাদক। এই গ্রন্থে মেজর বসুর ভূমিকাও আছে।

"শিক্ষাবিজ্ঞান"-বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কলিকাতার ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন (জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ) কর্ত্তৃক ১৯০৭ হইতে ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীর ভিতর ধারাবাহিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির অধীনে মালদহ জেলার সদরে ও বিভিন্ন পল্লীতে এগারটা নৈশ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা ১০০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত "কলেজিয়ান" নামক ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকায় এইসকল গ্রন্থে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী এবং মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির শিক্ষা-প্রচেষ্টা সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছিল (১৯১১-১৯১৪)।

১৯১০ সনের "আর্য্যাবর্ত্ত" মাসিকে সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "শিক্ষা-বিজ্ঞান" গ্রন্থমালা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা :—

"গ্রন্থকার যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতি-দর্শনে, কোমত (কঁৎ) তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণী বিভাগে যে একটি ভাব-সমগ্রতা

প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও এশ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা, প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। অবশ্য শিক্ষা বিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই।

"সমস্ত জড় বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি-ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। শিক্ষা বিজ্ঞান আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। * * * এ আদর্শটি মহান, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্ন সত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * * *

"গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের কামনা তিনি নিজ ব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।"

এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক অভিমত ১৯১০ হইতে ১৯১৫ সন পর্য্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসকল উক্তি হইতে ১৯০৬ সনে প্রকাশিত "বাংলার জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ ও বঙ্গ-সমাজ" রচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। যাঁহারা শিক্ষা-তত্ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ-তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, অথবা শিক্ষা-তত্ত্বকেই স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়রূপে বাছিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ১৯০৬ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং "শিক্ষা-বিজ্ঞান" ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর (১৯০৬-১৯১৪) পরবর্ত্তী বাঙালী গবেষকগণের শিক্ষাবিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি রচনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে স্বদেশী যুগের বঙ্গ-সমাজ ও শিক্ষা-বিপ্লব সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত ও তুলনা-মূলক আলোচনার ব্যবস্থা হইতে পারে।

গিডিংসের স্বজাতি-চেতনা*

অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম এ, বি এল,
সম্পাদক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ ও বঙ্গীয়
সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী গিডিংসের মতে সমাজ বলিতে মূলতঃ বুঝায় সঙ্গ অথবা সঙ্ঘ। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত যে, সমাজ হইল কতকগুলি ব্যষ্টির সমষ্টি মাত্র। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-গণ পরস্পর মেলামেশা করে এবং একত্রিত হইয়া একটি অনুষ্ঠান গঠিত করিয়া তোলে কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সমাজ নানা-কিছুর জটিল সমন্বয়। ইহাতে সাময়িক বৈপরীত্য, স্থায়ী অনুষ্ঠান, স্বাধীন চুক্তি, এবং চুক্তিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য বাধ্যতামূলক শক্তি, কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, জাতি, ধর্ম্ম, নগর প্রভৃতি বহু জিনিষই একত্রিত হইয়া থাকে। সমাজকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া গিডিংসের দস্তুর, যথা "প্রাকৃতিক" এবং "রাজনৈতিক"। গিডিংস আরও বলেন যে, সমাজকে কেবল মানবের সমষ্টি বলিয়া দিলে চলিবে না, অথবা সমাজে মানুষ কোনো একটা বিশেষ স্বার্থোদ্ধারের জন্য মিলিত হইয়াছে এরূপ বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝা হইবে না। বৈজ্ঞানিক মতে সমাজ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের একটা সচেতন সমষ্টি যাহা স্বাভাবিক বৃদ্ধির দিকে অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছে, যেখানে বিরোধমূলক সম্বন্ধ সহযোগিতায় পরিণত হয় এবং ক্রমে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

*বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে আলোচিত (১৫ আগষ্ট, ১৯৩৮)।

গিডিংস সমাজের সহিত মানবদেহের তুলনামূলক গবেষণা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, যদিও দেহের সহিত সমাজের কিছু-কিছু মিল থাকিতে পারে তাহা বলিয়া উভয়ই পুরাপুরি একরূপ এ কথা বলা যাইতে পারে না। সমাজান্তর্ভুক্ত ব্যক্তিনিচয় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক আত্মীয়তায় আবদ্ধ নহে; তাহারা স্বার্থ, সহানুভূতি এবং ভাবধারা-প্রযুক্ত বন্ধনে নিবদ্ধ থাকে। যদি সমাজকে একান্ত দেহের সহিত তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে দেহাত্মক বলিয়া গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ দেহ মূল কিন্তু তাহাতে আত্মিক বা মানসিক যোগাযোগ অবশ্য দ্রষ্টব্য। শুদ্ধ দেহ বলিলে সমাজকে ছোট করিয়া ফেলা হইবে। সেইজন্য দেহাত্মক বা ফিজিও-সাইকিক্ বলা বাঞ্ছনীয়। সমাজ যে প্রতিষ্ঠান তাহা কতকটা ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে এবং কতকটা বৈপরীত্য-বিমিশ্রিত সমন্বয় হইতেও উৎপন্ন হইয়াছে।

সমাজের কর্ত্তব্য হইল চেতনাশীল জীবনের ক্রমোন্নতির সাধন করা এবং মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুপ্রকাশ করিবার অবকাশ দেওয়া। মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয় পরস্পরের সহিত সচেতন সংস্পর্শে এবং মেলা-মেশায়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মের জ্ঞান এবং লৌকিক নীতি এ সমস্তই মানুষের সচেতন যোগাযোগ হইতে উৎপন্ন। সাহিত্য, ধর্ম্ম ইত্যাদি বস্তু নতুন-নতুন মানবীয় যোগাযোগ সৃষ্টি করে এবং নব-জাগরণ আনিয়া নূতন ধরণের মানব গঠন করে। মোট কথা সামাজিক অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিত্বের ক্রম-বিকাশের দিকে সাহায্য করা যত-দিন পর্য্যন্ত না মনুষ্যত্বের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

ফরাসী সমাজ-শাস্ত্রী কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রথমে "সোসিঅলজি" এই শব্দ ব্যবহার করেন (১)। গিডিংস বলেন যে, কঁৎ সমাজের ক্রম-

---

১। "লা ফিলোজোফী পোজিতিভ্" গ্রন্থে (১৮৩০)।

বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলা নিয়ম প্রচার করেন। তাঁহার মতে সমাজ-বিজ্ঞান হইল সামাজিক ঘটনাবলীর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যার পদ্ধতি হইল মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া, অঙ্গাঙ্গীর সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং শক্তির উপচয়ের মধ্য দিয়া। বিনয় সরকার বলেন যে, কঁৎ-এর বহুপূর্ব্বেও সমাজ-বিষয়ক নিয়ম আলোচিত হইয়াছে। এমন কি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সম্বন্ধেও কঁৎ হইতে আরম্ভ করিলে ভুল হইবে, কেননা সমাজ-চিন্তার সূত্রপাত প্লেটোর পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক সাহিত্যের মধ্যে ধরিতে হইবে। অধিকন্তু প্রাচ্যকে যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে চীনের চাও-লি, মিশরের "বুক অব দি ডেড্", ভারতের বৈদিক ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং মনুসংহিতা প্রভৃতির যে দান তাহা উপেক্ষা করিলে ভুল হইবে (১)। সাধারণতঃ সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক যে-সকল গ্রন্থাদি দেখা যায় তাহাতে পাই সমগ্র সমাজ-বিষয়ক যতকিছু বিজ্ঞান আছে তাহাদের একত্রিত একটা সংমিশ্রণের ফল—একটা খিচুড়ী বিশেষ। কিন্তু মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী সোরোকিণ বলিয়াছেন যে, সমাজ-বিজ্ঞান হইল একটা বিশেষ বিদ্যা। তাহা সমাজের "সাধারণ" ঘটনাবলীর বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে।

গিডিংসের মতে সামাজিক বস্তুসমূহকে অসামাজিক ঘটনাবলী হইতে পৃথক্ করিবার লক্ষণ কিংবা উপায় হইল "কন্‌শাস্‌নেস্ অব্ কাইণ্ড" অর্থাৎ স্বকীয়, সুপরিচিত ও আত্মীয়তাসূচক আকার-প্রকারের চেতনা বা চৈতন্য আছে কিনা দেখা। এই আত্মীয়তার চৈতন্য বা জ্ঞান গড়নবিষয়ক চেতনা, জীবনপ্রণালী-বিষয়ক বোধ বা চেতনা।

১। অধ্যাপক বিনয় সরকারের লিখিত "সোসিয়লজি অব্ পপিউলেশন"—পৃঃ ১ হইতে ৯।

এই আলোচনায় কোন্ "রকমের" জীব এই কথাটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করা গেল। প্রথমতঃ, নিজস্ব রকম-চেতনা, স্বকীয় গড়ন-চেতনা বা স্বজাতি-চেতনা বলাও যাহা আর পরস্পরের "সহানুভূতি" বলাও তাহা। কাজেই নতুন কিছু বলা হইল না। এ সম্বন্ধে গিডিংসের উত্তর,—"জাতি-চেতনা" বা জাতি-বোধ বা স্বজাতি-জ্ঞান হইল সমাজগঠনের ভিত্তি। ইহাকে "সহানুভূতির" সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায় যদি ঠিক 'শব্দের' প্রকৃত মানে গ্রহণ করা হয়, লৌকিক ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া। গিডিংসের মতে আডাম স্মিথ হইলেন সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান স্রষ্টা। তাঁহার লিখিত "থিওরি অব্ মরাল সেন্টিমেণ্টস" হইতেই গিডিংস "স্বজাতি-চেতনা" সম্বন্ধে ধারণা প্রাপ্ত হন। কিন্তু আডাম স্মিথের সঙ্গে গিডিংসের তফাৎ হইল,— কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে। তাঁহার "সহানুভূতি" নামক যে নীতি তন্মধ্যে কয়েকটী অসম্পূর্ণ স্থানকে "স্বজাতি-চেতনা" নামক নীতির দ্বারা পূর্ণতা দেওয়ায়। এখানে গিডিংস আনিয়াছেন মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ। তিনি বলেন যে, প্রভেদ বা সাদৃশ্য কি এ ধারণা জানোআরদের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু তাহার বিষয় সচেতনত্ব হইল মানুষের চিত্তের অঙ্গ। সমাজ-বিজ্ঞান যে চিত্ত-বিজ্ঞানের জমজ ভগ্নী এ কথাই হইল তাঁহার আসল কথা। তাঁহার মতে মনোবিজ্ঞানকে সমাজ-বিজ্ঞান হইতে পৃথক করাই অসম্ভব।

মনের সামাজিক অবস্থা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন আচরণ, একজন ব্যক্তির সহিত আর একজন ব্যক্তির সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা হইল মনের সামাজিক কার্য্যকলাপ ("সোশ্যাল ফেনমেনা অব্ মাইণ্ড")। এই যে মনের বা চিত্তের সামাজিক দিক্ ইহা মনোবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান উভয়ের আলোচনার মধ্যেই পড়ে। আত্ম এবং

অনাত্মের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার জ্ঞান বা চেতনা হইল চিত্ত-বিজ্ঞানের বস্তু, কিন্তু আত্ম এবং অনাত্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য তাহার চেতনা হইল চিত্তবিজ্ঞানের বিষয়ও বটে আবার সমাজতত্ত্বের বিষয়ও বটে।

"স্বজাতি-চেতনা" হইল দৈহিক বস্তু। উহা সমাজতত্ত্বের সহিত বিমিশ্রিত হইতে পারে না বলিয়া দ্বিতীয় সমালোচনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গিডিংসের উত্তর হইল,—যৌনবোধ বা চেতনা হইতে স্বজাতি-চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক। জীবজগতে কোন এক শ্রেণী তাহার নিজের শ্রেণী ব্যতিরেকে মিলিত হয় না। সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গীকে বিবাহ করিতে চাহে না। "ভদ্রলোকেরা" তথাকথিত ছোটলোকের সহিত উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত হয়। মানুষের "স্বজাতি-চেতনা" যৌন সম্বন্ধ স্থাপন সম্বন্ধে যত বাধা সৃষ্টি করে এত অন্য কোন্ বিষয়ে দেখা যায় না।

গিডিংস বলেন, যে স্বজাতি-চেতনা হইল অনুভূতি এবং চেতনা বা বোধ দুইই। যদি ইহাকে না মানা যায় তাহা হইলে মানুষের স্ব-শ্রেণীর প্রতি আকর্ষণ এবং পরজাতি-বিরুদ্ধতা উভয় ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে হয়। স্বজাতি-চেতনা নামক অনুভূতি এবং বোধ উভয়ের মধ্যে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা চলন্ত, স্থিতিশীল নহে। "স্বজাতি-চেতনা" চির-চঞ্চল মানসিক অবস্থা। ইহার স্থায়িত্ব অতি অল্প। ইহা কোন একটী বিশেষ শ্রেণী, রকম বা সম্প্রদায়ের সহিত সমানভাবে চিরদিন থাকে না। ইহা "ক্রম" বা ডিগ্রি মানিয়া চলে এবং ক্রমের গুণ অনুসারে সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। বিভিন্ন অবস্থায় "স্বজাতি-চেতনা" বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইহাকে গিডিংস্ বলেন "সোশ্যাল ফোর্স" বা সামাজিক শক্তি।

"সোশ্যালাইজিং ফোর্স" বা সামাজীকরণ শক্তি এবং "সোশ্যাল ফোর্স" বা সামাজিক শক্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজের একটা

বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনে যে শক্তি নিয়োজিত হয় তাহাকেই সামাজীকরণ-শক্তি বলা যায়—উহার দ্বারা সঙ্ঘ গঠিত হয়, অনুষ্ঠানের পূর্ণতা হয় এবং সমাজের প্রকৃতির উন্নতিবিধান হয়। দেশের আবহাওয়া এবং মাটী, লোকের ব্যক্তিগত ক্ষুধা এবং রাগ-দ্বেষ-কাম প্রভৃতিকে সামাজীকরণ শক্তি বলা চলে। অপরদিকে "সোশ্যাল ফোর্স" বা সামাজিক শক্তি হইল সমাজ হইতে সৃষ্ট কোনো শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। একক ব্যক্তির প্রতি একটা মিলিত লোকবলের যে ভাব অথবা জনমত তাহাকে সামাজিক শক্তি বলা যায়।

সমাজ সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে গিডিংস বলেন যে, সামাজিক কার্য্যাবলী প্রথমে বাহ্যিক কারণ সম্ভূত বলিয়া মনে হয়, যেমন খাদ্য, জলবায়ু, সংস্পর্শ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধতা প্রভৃতি কারণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, সমজাতি-সংমিশ্রণের যে অজ্ঞাত চেতনা তাহা সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। লোকেরা যখন দলবদ্ধ হইয়া গিয়াছে তখনও দেখা যাইবে যে এই "স্বজাতি-চেতনাই" কার্য্য করিতেছে। তাহারই প্রেরণায় সঙ্ঘ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি আবার ব্যক্তিগত জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই প্রভাব সম্বন্ধে যখন ব্যক্তিগণ সচেতন হয় তখনই "ভোলিশন্যাল প্রোসেস" বা স্বতঃ-প্রবৃত্ত গতির কার্য্যাবলী আরম্ভ হয়। তখন হইতে অনুষ্ঠান বা সমাজ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সকল স্থলে সম্প্রদায়, সামাজিক নিরাকরণ, সমাজের ইচ্ছা সমস্তই স্বজাতি-চেতনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রাম প্রতিনিয়ত চলিয়াছে তাহাতে হয়তো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত পছন্দ শেষ অবধি টিকিয়া নাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া স্বজাতি-চেতনাকে সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিবার কারণ নাই।

সমাজ-শাস্ত্রের ফরাসী শিক্ষালয় *

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল, এম-এ, গবেষক,
বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, সহ-সম্পাদক, "সমাজ-বিজ্ঞান"

সমাজবিজ্ঞানে প্যারিসের আবহাওয়া

ফরাসী দেশে সমাজশাস্ত্র নিয়ে চর্চ্চা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। তবে সমাজ শাস্ত্র চর্চ্চা করার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার ব্যবস্থা ফরাসী দেশে খুব সম্প্রতিই হয়েছে। সমাজশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গোটা কয়েক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করেছে, এবং এই সব প্রতিষ্ঠানে জন কয়েক নামজাদা সমাজশাস্ত্রীর অধীনে প্রকাণ্ড একটা সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে। যেকয়টী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে নিম্নে তাদের সম্বন্ধে একটু ধারণা দেবার চেষ্টা করা গেল। মার্কিণ অধ্যাপক আর্ল ইউব্যাঙ্ক (সিন্সিনাটী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রণীত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি।

লা সর্ব্বন (প্যারিস) প্রতিষ্ঠানটি ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও সমর্থিত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগ,—যেমন (১) আইন (রাজনীতি ইহার অন্তর্ভুক্ত), (২) চিকিৎসা, (৩) ভেষজতত্ত্ব (৪) বিজ্ঞান, এবং (৫) দর্শন ও সাহিত্য। শেষোক্ত দুইটীকে লইয়া লা সর্ব্বন গঠিত হইয়াছে।

---

* মার্কিণ সমাজশাস্ত্রী অধ্যাপক আর্ল ইউব্যাঙ্কের ইংরেজি হইতে অনূদিত এবং বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে পঠিত (১২ জুন ১৯৩৮)। ইউব্যাঙ্কের প্রবন্ধ "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকার ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল।

ইহার সহিত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় গুলির কলা বিভাগের সামঞ্জস্য আছে। ১৮৯০ খৃঃ সর্ব্বন ডুরখাইমকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম ডক্টোরেট উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল 'লা দিভিজিওঁ দু ত্রাভাই (শ্রম বিভাগ)। তিনি 'বর্দো' বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং এই বিষয়ে তিনিই প্রথম অধ্যাপক।

এখানে তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন শিক্ষক আলফ্রেড্ এসপিনা ও ডাঃ লুসিয়াঁ লেভিব্রুলের সহিত এক সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। ১৯০২ সালে সর্ব্বনে শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ তাঁহাকে দেওয়া হয়। ১৯০৬ সালে তাঁহাকে সমাজশাস্ত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক এই আখ্যা দেওয়া হয়। প্যারিসে তিনিই প্রথম সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নামে অভিহিত হন। এখানেও তিনি এসপিনা ও লেভিব্রুলের সঙ্গে কাজ করেন। এস্পিনা ও লেভিব্রুল তাঁহার পূর্ব্বেই এখানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এস্পিনা ১৯০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং লেভিব্রুল সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও নৃতত্ত্ব-পরিষদের সভাপতি রূপে বিরাজমান। ১৯১৭ সালে ডুরখাইমের মৃত্যুর পর ডাঃ ফোকোনে সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে বৃত হন। তাঁহার সহিত তাঁহার সহকর্ম্মি রূপে ডাঃ বুগ্লে সর্ব্বনে নিযুক্ত হন। কিন্তু "লেকল" নামক শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত থাকায় সেখানকার অত্যধিক কাজের চাপে তাঁহাকে উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। বর্ত্তমানে স্ত্রাস্বুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মরিস হালভাক্স্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

লেকল্ নর্ম্মাল স্যুপেরিয়র (প্যারিস) এই প্রতিষ্ঠানটি সর্ব্বন কর্ত্তৃক অনুমোদিত একটি সমৃদ্ধশালী প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদেরকে

এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইহার অধ্যাপনা বিভাগে ২৫ জন বাহাল আছেন।

লে দুইটি বিভাগ। প্রথম লেকলের নর্ম্মাল; আমেরিকার নর্ম্মাল কল স্কুলের অনুরূপ, প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির জন্য শিক্ষক তৈয়ারী করা ইহার কাজ। যাহারা শিক্ষা বিভাগে যাইতে চায় তাহাদের এখানে শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়। 'শিক্ষাবিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান' নামক একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা আছে। ছাত্র সংখ্যা ৪০ হইতে ১০০ জন পর্য্যন্ত হয়। শিক্ষকের সংখ্যা যাহাতে বেশী না হয় তাহার জন্য সরকার ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করেন। দ্বিতীয় বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা হইতে বিভিন্ন। উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য শিক্ষক তৈয়ারী করা ইহার কাজ। এই প্রতিষ্ঠান বৎসরে ২৮টী ছাত্র গ্রহণ করিতে পারে এবং ইহার উপর দুইটী কিংবা তিনটী ছাত্রেক শিক্ষা দেয়। সাঁতর্ দ্য দকুমাঁতাসিয়ঁ সোসিয়াল' নামক একটি গবেষণা-বিভাগ আছে। ইহা অধ্যাপক বুগলের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। এখানে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য পাওয়া যায় এবং ইহার একটি পুস্তকাগার ও আছে।

১৯৩৫ সালে এই বিভাগের পরিচালনা বুগ্‌লের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসায় তাঁহাকে সর্ব্বন পরিত্যাগ করিতে হয়। কলেজ দ্য ফ্রাঁস (প্যারিস) শিক্ষা, দর্শন ও সাহিত্যের জন্য একটি স্বায়ত্বশাসনশীল প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। এখানে ছাত্রদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা হয় না। যে কোনো ছাত্র বক্তৃত শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এখানে যে সব লোক বক্তৃতা করেন তাঁহারা সকলেই এই দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি। যদিও সমাজ-বিজ্ঞান নামটি দেওয়া হয় না তাহা হইলেও দুরখাইমের ভাইপো মোস্ ধর্ম্মের ইতিহাসের অধ্যাপক থাকার জন্য এবং তাঁহার মৃত্যুর পর

সিমিয়াঁ শ্রমের ইতিহাসের অধ্যাপক হওয়ার জন্য সমাজ-বিজ্ঞান প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগ সমাজ-বিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষা-কেন্দ্র। লুসিয়াঁ লেভিব্রুলের পুত্র আঁরি লেভিব্রুল আইন সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজ-তত্ত্বের একটি প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কঁজার্ভাতোআর নাসিওনাল দেজ আর্জ্ এ মেতিয়ে (প্যারিস) এই প্রতিষ্ঠানকে যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না এবং এখানে বক্তৃতার ব্যবস্থাও আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি এখন সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ-কিছু আলোচনা করিতেছে এবং সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণাও ইহার একটি প্রধান বিষয়। 'কলেজ দ্য ফ্রাঁস'-এ যাইবার পূর্ব্বে সিমিয়াঁ এই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন কিন্তু তাঁহার পর তাঁহার পদে আর কেহই নিযুক্ত হন নাই। কলেজ দ্য সাঁ জর্মাঁ প্রতিষ্ঠানে (প্যারিসের নিকটস্থ) সমাজ-বিজ্ঞান নাম দিয়া কিছু না হইলেও আঁস্তিতিউ আঁতারন্যাসানাল দ্য সোসিওলজির (অন্তর্জ্জাতিক সমাজবিজ্ঞানপরিষদের) সদস্য উই থাকার জন্য সমাজ-বিজ্ঞান অন্যতম চর্চ্চার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

প্যারিসের বাহিরে

স্ত্রাসবুর বিশ্ববিদ্যালয়। সর্ব্বন ব্যতীত কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং মরিস হালভাক্স্ ইহার অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি সর্ব্বনে বুগলের পদে গিয়াছেন। তাঁহার সহিত শার্ল ব্লঁদেল সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক রূপে কয়েক বৎসর এখানে কাজ করেন এবং এখানে সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে।

বার্দো বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী সমাজ-বিজ্ঞানের আঁতুর-ঘর বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। এখানে থাকিয়াই দুর-খাইম প্রথম সমাজ-শাস্ত্র আলোচনা করেন ও শিক্ষা দেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া গাস্তঁ রিশার এখানে কাজ করিয়াছেন। ইনি অ্যাস্তিতিউ অ্যাতারন্যাসলাল ছ সোসিওলজির (অন্তর্জ্জাতিক সমাজবিজ্ঞান পরিষদের) অন্যতম ধুরন্ধর। তাঁহার পর লেভিব্রুলের ছাত্র বোনাফু দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে বৃত হন এবং তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থানে গুরভিচ নিযুক্ত হইয়াছেন।

রান বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও রেক্টর হইতেছেন সমাজশাস্ত্রী মেসে-এর ছাত্র জর্জ্জ দাভি। ইনি যে কেবল সমাজ-বিজ্ঞান চর্চ্চার সমর্থক তাহা নহে ইনি একজন সমাজ-বৈজ্ঞানিকও বটে। তাঁহার 'সোসিওলোগ্ দি য়্যার এ দোজুর্দ্ধুই (কালকের ও আজকের সমাজশাস্ত্রিগণ) নামক পুস্তক ফরাসী সমাজ-শাস্ত্রীরা বহু জায়গায় আত্মপক্ষ্য সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করেন,—এবং তাহার পুস্তকটিকে দুরখাইম ও লেভিব্রুলের মতবাদের শ্রেষ্ঠ চুম্বক বলিয়া মনে করেন।

ফ্রান্সে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হইতেছে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহা কর্ত্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি। সর্ব্বনে সমাজ-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে অন্তত পক্ষে ৩ হইতে ৪ শত ছাত্র ভর্তি হয়। স্ত্রাসবুরের ছাত্র সংখ্যা ইহার প্রায় ⅓ ভাগ। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে ফ্রান্সে সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফ্রান্সের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণত ৬ বৎসর পড়িতে হয়। ইহার পর তিন বৎসর লাগে কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিতে। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিলে যে উপাধি দেওয়া হয় তাহার নামে লিসঁসিয়ে। ইহা আমেকিার ব্যচিলার ডিগ্রির কিছু উচ্চে। লিসঁসিয়ের পর আরও তিন বৎসর

লেখাপড়া করার পর আগ্রেজে উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই ডিগ্রির দর আমেরিকার মাষ্টার অফ আর্টস্ হইতে কিছু উচ্চে।

ইহার পর হইতেছে ডক্টোরেট উপাধি এবং দক্ত্যয়র দে লেত্‌র্ আমেরিকার পি এইচ ডি উপাধির সমতুল্য। এই উপাধি প্রাপ্ত না হইলে কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদলাভ করিতে পারে না। সর্ব্বনে প্রতি বৎসর সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যায় তিন হইতে চারিটি ডক্টোরেট প্রদত্ত হয়। পাঁচ কিংবা ছয়টার বেশী কখনও দেওয়া হয় নাই। সমস্ত প্রবন্ধ (থিসিস) ফোকোনে, বুগলে, হালভাক্‌স্, মোস, ও বঁদেল এবং এখন সিমিয়াঁর তদবিরে লেখা হয়। এই সমস্ত অধ্যাপকের অনেকেই দুরখাইমের মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেই জন্য এখানে যেভাবে গবেষণা হয় তাহাতে ফ্রান্সে অন্যান্য মতবাদ সেরূপ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না এবং দুরখাইমের দৃষ্টিতেই সমস্ত বিচার করা হয়।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কিন্তু ইউব্যাঙ্ক-প্রচারিত উপরোক্ত মতের সমর্থন করেন না।

"ক্যালকাটা রিভিউয়ে"র যে সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৩৭) ইউব্যাঙ্কের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সেই সংখ্যায়ই বিনয় বাবু বলিয়াছেন যে, দুরখাইমের মতবাদের এখন আর ফ্রান্সে সেরূপ দর দেওয়া হয় না। তাঁর মতের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন গাসতোঁ রিশার। বার্গসোঁর 'এলাঁভিতাল', এস্‌পিনার 'আঁপুলসিয়ঁ ভিতাল এবং 'আকৃসিওঁ স্পনতানে এ ক্রেয়াত্রিচে' দুরখাইমের মতবাদের সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত সমর্থন করে। বর্ত্তমানে লাবার মতবাদও দুরখাইমের মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। রিশার বর্দো-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর লাবা ক্ল্যার্ম-ফের়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লাবা আন্তর্জ্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষদের এবং ফরাসীতে প্রকাশিত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক। রিশার ও লাবা সামাজিক জীবনে গঠনমূলক ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তির সৃষ্টিশক্তি ইত্যাদির উপর জোর দিয়া থাকেন।

(ঘ) পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

প্রতিষ্ঠিত ১৪ এপ্রিল, ১৯৩৭

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি

চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি।

চলিয়া-চলিয়া যে-লোকটা হয়রান হয় না সে কখনো শ্রীলাভ করে না।

চল, চল, চল।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৫)

পরিষদের উৎপত্তি

১। ১৯৩২ সনের ৯ এপ্রিল "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার অন্যতম শাখার নাম ছিল সমাজ-বিজ্ঞান শাখা। কিন্তু এই পরিষদের কর্ম্মগণ্ডী অতি-বিস্তৃত এবং বিশ্বগ্রাসী। তাই সমাজ-বিজ্ঞানের জন্য একটা স্বতন্ত্র পরিষৎ প্রতিষ্ঠার কথা পরিচালকগণকে অনেকবার ভাবিতে হইয়াছে।

২। ১৯৩৬ সনের ২৬ ডিসেম্বর "এডুকেশন গেজেট" নামক দ্বৈভাষিক সাপ্তাহিকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "সোশিঅলজি ইন্ বেঙ্গল" (বঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞান) নামক ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সকলেরই জানা আছে যে, পূর্ব্বে "এডুকেশন গেজেট" উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালী সমাজশাস্ত্রী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৮৬৬ সনে তিনি প্রথম এই পত্রিকার সম্পাদক হন। বিনয়বাবুর রচনা প্রকাশের পর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের

পরিচালকগণ স্বতন্ত্র সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে থাকেন।

৩। পরে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ ১৯৩৭ সনের ১৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৪। বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ আর "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ দুই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই দুই পরিষদেরই পরিচালকবর্গ এক।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-তালিকা

১। সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা চালানো।

২। এইসকল অনুসন্ধান-গবেষণার জন্য বাংলাভাষাকে মুখ্য বাহন-রূপে ব্যবহার করা।

৩। গবেষক ও গবেষণা-সহায়ক নিযুক্ত করা এবং তাঁহাদের রচনাবলীর দ্বারা সমাজ-বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে বাঙালীর চিন্তাসম্পদ ও বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করা।

৪। বাংলাভাষায় সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করা।

৫। সমাজ-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তিকা-পত্রিকা-গ্রন্থাদি সম্বন্ধে সার্ব্বজনিক সভায় বক্তৃতার এবং ক্ষুদ্রায়তন পাঠ-চক্রে আলোচনা-তর্কপ্রশ্নের ব্যবস্থা করা।

৬। ভারতীয় বিভিন্ন জনপদের এবং দেশ-বিদেশের নানাকেন্দ্রের সমাজশাস্ত্রী এবং সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ সমূহের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করা।

৭। ভারতীয় সমাজশাস্ত্রীদের সঙ্গে বিদেশী সমাজশাস্ত্রীদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা।

সমাজ-বিজ্ঞানের সূচীপত্র

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের ব্যবস্থায় সমাজ-বিজ্ঞান বিদ্যাকে নিম্নরূপ দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইল :—

প্রথম বিভাগ

সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ

১। প্রাতিষ্ঠানিক বা সংস্কৃতি-বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান। পরিবার (বিবাহ-প্রথা), সম্পত্তি, আইন-কানুন, রাষ্ট্র, শ্রেণী, জাতপাঁত (বর্ণ), রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য দলগঠন, ধর্ম্মব্যবস্থা, দেবদেবী, অপরাধ, আইনভঙ্গ, সমাজবিরোধ, সুকুমার শিল্প, বিদ্যা-কলা, রীতিনীতি, ভাষা ইত্যাদি মানুষের সৃষ্টিসমূহ সংস্কৃতির বা কৃষ্টির অন্তর্গত। মানবীয় সংস্কৃতির এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু। প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংস্কৃতিক সমাজ-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সমাজ-বিবৃতি বা সমাজ-চিত্রণ। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকারের আলোচনা ও গবেষণা উল্লেখ-যোগ্য,—(১) রক্তগত জাতিনির্দ্দেশ, গোষ্ঠী, রক্তগত জাতি-সংমিশ্রণ, রক্তগত জাতি-লোপ, বর্ণ-সঙ্কর, জাতপাঁতের উঠানামা ও ভাঙা-গড়া ইত্যাদি শারীরিক দলসমূহের বৃত্তান্ত, বিশ্লেষণ এবং সংখ্যার সাহায্যে মাপাজোকার ব্যবস্থা, (২) রক্তগত ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জাতি-সমূহের শারীরিক গড়ন ও সংস্কৃতিমূলক জীবনভঙ্গীর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা।

(খ) সামাজিক দর্শন ও দর্শনমূলক ইতিহাস। এই বিদ্যার ক্ষেত্রে

দুই শ্রেণীর গবেষণা উল্লেখযোগ্য,—(১) সামাজিক জীবনে ক্রমবিকাশ, বিবর্ত্তন, উন্নতি-অবনতি, যুগ-পরম্পরা, যুগপরিবর্ত্তন, যুগান্তর, গতি, উঠা-নামা, ভাঙা-গড়া, উৎরাই-চড়াই, সাম্য, সামঞ্জস্য, স্থিতি, বিরোধ, বৈষম্য, দূরত্ব, নৈকট্য, সাদৃশ্য ইত্যাদি বস্তু কি তাহার বিশ্লেষণ, (২) বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাসমূহ বা কার্য্যাবলীর ভিতর পরস্পর যোগা-যোগ ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা। এই দুই প্রকার বিদ্যার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জনপদের ও বিভিন্ন যুগের মানবীয় সৃষ্টি ও কৃষ্টিসমূহের তুলনামূলক পরীক্ষা প্রধান কথা। সামাজিক স্থিতি ও সামাজিক গতি এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী।

২। চিত্ত-বিষয়ক সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়-গুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে :—

(ক) সামাজিক চিত্তবিজ্ঞান ও চিত্ত-বিকার বিষয়ক গবেষণা। মানুষের চিত্ত সামাজিক কার্য্যাবলী ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর কিরূপ গড়ন প্রাপ্ত হয় তাহার আলোচনা এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ঝোঁক, প্রকৃতি, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, স্বভাব, দলগত চিত্তের মূর্ত্তি, লোকমত, অনুকরণ, সামাজিক শাসন, নির্জ্ঞান, গুপ্ত চেতনা, চিত্তদমন, চিত্তদৌর্ব্বল্য, চিত্ত-বিকৃতি, চিত্ত-বৈষম্য, চিত্ত-ব্যাধি ইত্যাদি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক, সুস্থ ও অসুস্থ চিত্তের সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত এই বিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(খ) সামাজিক চিন্তাপদ্ধতি ও কর্ম্মপ্রণালী এবং সামাজিক গড়ন ও রূপাবলী। এই বিদ্যার আলোচ্য বস্তু দ্বিবিধ,—(১) একাধিক মানুষের ভিতর ব্যবহার ও লেনদেন-সমূহের বিশ্লেষণ,—মানুষের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং মানুষ হইতে মানুষের অপসারণ ইত্যাদি আন্তর্মানুষিক আচরণ ও যোগাযোগের নানা আকারপ্রকার সম্বন্ধে

পরীক্ষা, (২) ভিড়, সমিতি, সভা, দল, সঙ্ঘ, পল্লী, শহর, উপনিবেশ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সামাজিক গড়নের কাঠাম ও কর্ম্মপ্রণালী বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয় ভাগ

সমাজ-বিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড

মানুষকে পুনর্গঠিত করিবার, সমাজকে কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে চালিত করিবার এবং দুনিয়াকে নয়া রূপ দিবার যতপ্রকার চেষ্টা ও আন্দোলন চলিয়াছে বা চলিতে পারে সেই সমুদয়ের অনুসন্ধান-গবেষণা কর্ম্মমূলক সমাজ-বিজ্ঞানের ভিতর পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের ভিতর নিম্নলিখিত দফাগুলা এই বিদ্যার অন্তর্গত,—(১) জীবনযাত্রার মাপকাঠি, জাতিগত বা দেশগত আয়, চাষীদের আর্থিক অবস্থা, খাদ্য ও পুষ্টি, ঘরবাড়ী, আরাম-বিরাম, দারিদ্র্য, পেশা, বেকার, লোক-চলাচল, সার্ব্বজনিক স্বাস্থ্য, লোকবল, দণ্ড-ব্যবস্থা, শিক্ষাপদ্ধতি, সমাজ-বীমা, রাষ্ট্রিক দলাদলি, নারীত্বের আন্দোলন, মজুরদের দাবী, আন্তর্জ্জাতিকতা ইত্যাদি, (২) আইন-কানুন, শাসন-প্রণালী, আর্থিক সংগঠন, বিবাহ, শাস্তি, নৈতিক জীবন, উপনিবেশ-গঠন, আন্তর্ধার্ম্মিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ক সংস্কার ও পরিবর্ত্তনসমূহ।

এই দুই বিভাগের বিভিন্ন দফায় সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিদ্যাসমূহের নিকট আত্মীয়তা ও নিবিড় যোগাযোগ পরিস্ফুট—(১) প্রাণ-বিজ্ঞান, (২) জলবায়ু-তত্ত্ব ও ভূগোল, (৩) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, (৪) লোকবিদ্যা, (৫) সুপ্রজনন-বিদ্যা, (৬) যোনিশাস্ত্র, (৭) রক্তগত জাতি-তত্ত্ব, (৮) ভূ-রাষ্ট্রবিদ্যা, (৯) চিত্ত-বিজ্ঞান, (১০) চরিত্র-বিজ্ঞান, (১১) শিক্ষা-বিজ্ঞান, (১২) অর্থশাস্ত্র, (১৩) রাষ্ট্র-তত্ত্ব, (১৫) অপরাধ-বিজ্ঞান, (১৬) পল্লী-নগর-বিজ্ঞান, (১৭) সংখ্যাশাস্ত্র,

(১৮) ইতিহাস, (১৯) দর্শন, (২০) তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সকল বিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বসমূহের সঙ্গে যোগ না রাখিলে সমাজ-বিজ্ঞান এক পা ও অগ্রসর হইতে পারে না।

পরিষদের পরিচালনা-প্রণালী

১। প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে প্রচলিত সমাজ-বিজ্ঞানের কোনো নির্দ্দিষ্ট মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা কেন্দ্রের সঙ্গে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিনিধি, অনুবর্ত্তী বা শাখা ইত্যাদিরূপে স্বাতন্ত্র্যশূন্য-ভাবে কর্ম্ম করিবে না। পৃথিবীর সকল প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক মত, পথ, রীতি, পদ্ধতি, দল বা কেন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম্ম স্বাধীনভাবে এই পরিষদের আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

২। আর্থিক, সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি কোনো প্রকার সাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে,—বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ লিপ্ত থাকিবে না। অতীত ও বর্ত্তমান সকলপ্রকার আন্দোলনই এই পরিষদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু থাকিবে।

৩। একমাত্র বাংলা দেশ অথবা একমাত্র ভারতবর্ষ বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের গবেষণা-ক্ষেত্র থাকিবে না। গোটা দুনিয়া আর অবিকশিত, অর্দ্ধবিকশিত, পূর্ণবিকশিত এবং অতি-বিকশিত সকল প্রকার মানবীয় কৃষ্টি বা সংস্কৃতি হইতে এই পরিষৎ তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিবে।

৪। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ কোনো নির্দ্দিষ্ট মত, পথ ও আলোচনা-প্রণালীর প্রচারক থাকিবে না। সভাপতি, পরিচালক ও গবেষকদের ভিতর কেহই কোনো প্রকার মত, পথ ও গবেষণা-প্রণালী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন না।

সভাস্থল

১। গবেষকদের জন্য,—বিনয়বাবুর বাসগৃহ (৪৫ পুলিশ হস্পিটাল রোড, কলিকাতা)।

২। পরিচালক, সহযোগী ও গবেষকদের জন্য,—ইণ্ডো-স্থইস ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেডের অফিস, ২, চ্যর্চ্চ লেন, কলিকাতা।

৩। সার্ব্বজনিক লোক-সমাগমের জন্য। প্রাতঃকালীন অধিবেশন :—ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার ভবন (৯৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট), সান্ধ্য অধিবেশন :—মহাবোধি হল (৪এ কলেজ স্কোয়ার)।

ঠিকানা

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা (ফোন,—বড়বাজার ১৯১৮)।

সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কোষাধ্যক্ষ

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান্ হিস্‌টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি।

গবেষণাধ্যক্ষ ও "সমাজ-বিজ্ঞান" পত্রিকার সম্পাদক

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার।

পত্রিকা*

"সমাজ-বিজ্ঞান"।

পত্রিকার সহ-সম্পাদক

শ্রীশচীন দত্ত এম্-এ, গবেষক, বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ

শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এম্ এ, গবেষক, বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ।

* পত্রিকার পরিবর্ত্তে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গবেষকবর্গ

১৯৩৭ :—শ্রীঅমল সেন এম্ এ, শ্রীনবেন্দু দত্ত-মজুমদার এম্-এ, বি-এল, শ্রীরামকৃষ্ণ সরকার এম্-এ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, শ্রীস্থধীরেন্দ্র-মোহন কর, এম্-এ, শ্রীস্থশীলেন্দু দাশগুপ্ত বি-এস্-সি, বি-এল্, শ্রীহেমেন্দ্র-বিজয় সেন এম্-এ, বি-এল্ ; ১৯৩৮ :—শ্রীঅসিতকুমার সরকার এম্-এ।

গবেষকগণের পরামর্শ-দাতা

১। অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, বি-এস্, সি-এইচ-ই, কেমিক্যাল এন্‌জিনিয়ার, কলেজ অফ্ এন্‌জিনিয়রিং অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজি, যাদবপুর কলিকাতা।

২। শ্রীসতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি-এস-সি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইণ্ডো-স্থইস ট্রেডিং কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা।

পরিষদের সম্পাদক

১। ডক্টর মণীন্দ্রমোহন মৌলিক, ডি-এস্-সি, পল (রোম)

২। অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

পরিচালকবর্গ

(সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, গবেষণাধ্যক্ষ, সম্পাদকদ্বয় এবং গবেষকগণের পরামর্শদাতা সমেত)।

অধ্যাপক কিরণকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এস-সি, বি-এস-সি. মাইনিং (কলিকাতা), এম-এস-সি. (বারমিংহাম), এফ-জি-এস (লণ্ডন), সম্পাদক কোয়ার্টারলি জারনাল অফ জিয়লজিক্যাল মাইনিং এবং মেটালারজিক্যাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, অ্যাডভোকেট নলিনচন্দ্র পাল, কাউনসিলর, কলিকাতা করপোরেশন, অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লেফটেন্যান্ট নলিনীমোহন রায়চৌধুরী, পরিচালক, এন্. এম্.

রায় চৌধুরি এণ্ড কোং (পুস্তক প্রকাশক), কলিকাতা, ডক্টর রফিদ্দিন আমেদ ডি. ডি. এস. (আইওয়া, আমেরিকা), কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ, সম্পাদক "ডেণ্টাল জারনাল", শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বি. এস. ই. ই, (প্যাডু, আমেরিকা) ইলেক্‌ট্রিক্যাল এন্‌জিনিয়ার, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইণ্ডো-ইয়োরোপা ট্রেডিং কোং (হামবুর্গ, দিল্লী, বম্বে) এবং ইণ্ডো-সুইস ট্রেডিং কোং লিঃ., কলিকাতা, শ্রীসত্যসুন্দর দেব, সেরামিক এনজিনিয়ার (তোকিও), ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিহার পটারিজ লিমিটেড, অধ্যাপক সাহেদুল্লা, ডি. লিট্ (প্যারিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডাক্তার সুবোধ মিত্র, এম. বি. (কলিকাতা, ডক্‌টর মেড (বার্লিন), এফ. আর. সি. এস. (এডিনবরা), এম. সি. ও. জি (ইংলণ্ড), সহযোগী অধ্যাপক, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ।

সহযোগিবর্গ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, সম্পাদক "এডুকেশন গেজেট"।

ডাঃ অমূল্যচন্দ্র উকিল, এম. বি., টিউবারকুলোসিস ইনকোয়ারি, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড এসোসিয়েসন, সিনিয়র ভিজিটিং ফিজিসিয়ন মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।

ডাঃ অসিত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পি-এইচ. ডি (লণ্ডন), বেঙ্গল পাবলিসিটি কোং।

অ্যাডভোকেট কেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম. এ., বি. এল।

ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম. এ., ইডি. ডি. (ক্যালিফোর্ণিয়া) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক, "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ।

অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., স্কটিশচার্চ্চ কলেজ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ. (নর্থওয়েষ্টার্ণ ইউনিভারসিটি শিকাগো), সম্পাদক "আন্তর্জ্জাতিক বঙ্গ" পরিষৎ।

ডাঃ পরিমল রায়, এম্. এ. (কলিকাতা) পি. এইচ . ডি. (লণ্ডন)।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস, এম. এস্. সি (কলিকাতা), ডাঃ. ফিল্ (বার্লিন)।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম. এ. (কলিকাতা) ডি. লিট. (প্যারিস), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যক্ষ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, কলিকাতা।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এ. এম্. (ব্রাউন. বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা) ডাঃ ফিল (হামবুর্গ)।

শ্রীমৃণালকান্তি বসু, এম. এ., সম্পাদক, "অমৃত বাজার পত্রিকা" কলিকাতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্. এ., বি. এল. গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম. এ., বি. এল., বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল্ সিভিল সারভিস্ (বিচার বিভাগ), গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সম্পাদক, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'।

ডাঃ সরসীলাল সরকার, এম. বি., সিভিল সার্জ্জন অবসরপ্রাপ্ত কলিকাতা।

শ্রীসুধাকান্ত দে, এম. এ., বি. এল., গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, এম. এ., বঙ্গবাসী কলেজ।

অধ্যাপক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম. এ., ডি. ফিল (লাইপসিগ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীমতী সুষমা সেনগুপ্ত, এম. এ., বালিগঞ্জ গার্লস্ স্কুল, কলিকাতা।

শ্রীহরিদাস পালিত, মালদহ-জাতীয় শিক্ষা সমিতি, গবেষক, "আন্ত-র্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, এম. এ. (কলিকাতা), বি. এ (অক্স্-ফোর্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মেম্বার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল।

নির্ঘণ্ট

SAMAJ-VIJNAN

(SOCIOLOGY)

VOL. I

A work in Bengali

By Prof. BENOY KUMAR SARKAR

President, Bengali Institute of Sociology

AND OTHERS

600 pages. **Price Rs. 3/-**

The contents of the present work entitled *Samaj-Vijnan* (Sociology), vol. I., are derived in the main from the discussions held or papers read at the *Bangiya Samaj-Vijnan Parishat* (Bengali Institute of Sociology), established 1937, "Antarjatik Banga" Parishat ("International Bengal" Institute), est. 1932, and *Bangiya Dhana-Vijnan Parishat* (Bengali Institute), of Economics as directors, research fellows, or associates. The appendix describes the constitution of the Bengali Institute of Sociology.

CONTENTS

PART I

The Origins and Milieu of the Bengali Institute of Sociology

PART II

Analysis of Social Processes, Social Relations and Social Forms

The Sociology of Poverty (The God in the Poor): By Prof. Benoy Kumar Sarkar.

The Social Bearings of Demographic Density: By Prof. Benoy Kumar Sarkar.

The Religion and Society of World-Conquest: By Prof. Benoy Kumar Sarkar.

The Types and Forms of Progress and Transformations: By By Prof. Benoy Kumar Sarkar.

The Varieties of Society and Culture: By Haridas Palit, Research Fellow, "International Bengal" Institute, Associate, Bengali Institute of Sociology.

The Individual and the Society: By Nagendra Nath Chaudhury, M.A., (Northwestern University, Chicago), Secretary, "International Bengal" Institute, Associate, Bengali Institute of Sociology.

The Sociology of Prisons and Prisoners: By Advocate Pankaj Kumar Mukherjee, M.A., B.L., Secretary, "International Bengal" Institute, and Bengali Institute of Sociology.

The Scare of Overpopulation: By Rabindra Nath Ghose, M.A., B.L., Research Fellow, Bengali Institute of Economics, Associate, Bengali Institute of Sociology.

The Brain of Calcutta: By Sachindra Nath Dutta, M.A., Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

The Caste Journals of Bengal: By Sushilendu Das-Gupta, B.Sc., B.L., Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

The Social Aims of the Student Movement: By Prof. Humayun Kabir, M.A., (Cal.), B.A., (Oxon.), Calcutta University, Bengal Legislative Council, Associate, Bengali Institute of Sociology.

Changes in Vocational Education: By Dr. Debendra Chandra

Das-Gupta, M.A., Ed. D. (Calif., U.S.A.), Calcutta University, Research Fellow, "International Bengal" Institute, Associate, Bengali Institute of Sociology.

Educational Reform and Social Reform: By Binod Behari Chakravarti, Author of *Regulus*, *Leonidas*, *Garfield* and *Lincoln*.

The Forms of Crimes and Punishments: By Prof. Benoy Sarkar.

PART III
History of Social Thought at Home and Abroad

The Political Ideal of Kautalya's Arthasastra: By Dr. Narendra Nath Law, M.A., B.L., Ph.D., Editor, *Indian Historical Quarterly*, Director, Bengali Institute of Sociology.

The French Triumvirate in Sociology,—Bodin, Montesquieu Rousseau: By Sachindra Nath Dutt, M.A., Research Fellow, Bengali Institute of Sociology.

Social Problems in British Education: By Dr. Debendra Chandra Das-Gupta, M.A., Ed. D. (Calif.), Associate, Bengali Institute of Sociology.

Individual Freedom and the Sense of Duty in Kant's Philosophy: By Prof. Humayun Kabir, Associate, Bengali Institute of Sociology.

Herder, the Prophet of Nationalism: By Manmatha Nath Sarkar, M.A., Research Fellow, "International Bengal" Institute.

The Social Values of Ramakrishna's Sayings: By Prof. Benoy Kumar Sarkar.

Bankimchandra as Sociologist: By Subodh Krishna Ghosal, M.A., Research Fellow, Bengali Institute of Economics.

Bengali Society and Educational Revolution in the Swadeshi Epoch (1905-1912): By Prof. Banesvar Dass, B.S. Ch.E. (Illinois, U.S.A.), College of Engineering and Technology, Jadabpur, Calcutta, Adviser to the Research Fellows, Bengali Institute of Sociology.

PART IV

Appendix

Bengali Institute of Sociology

INDEX

বাংলায় ধনবিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

১৫০ পৃষ্ঠা, ছয়খানা ছবি, মূল্য ৪॥০

লেখকগণের নাম ঃ—অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার, লেডী অবলা বসু, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল রায়, ইন্দ্রকুমার চৌধুরী, জগজ্জ্যোতি পাল, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (মেম্বার, লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লি), সুধাকান্ত দে, নরেন্দ্রনাথ রায়, তাহেরউদ্দিন আহম্মদ, জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শিবচন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্রনাথ অধিকারী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, সুষমা সেনগুপ্তা, মন্মথনাথ সরকার, অ্যাড্‌-ভোকেট ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুধীশরঞ্জন বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার অধ্যাপক বাণেশ্বর দাশ।

Advance (Calcutta) :—A pioneering work ... ... an excellent instance of the efforts that are being made to rationalize the study of economics through the medium of Bengali.

সোনার বাংলা (ঢাকা)—"পুস্তকখানিতে দেশের আর্থিক দুর্গতি ও তাহার প্রতীকার, শিল্প-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ, রেলওয়ে, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক, সমবায়-নীতি ইত্যাদিতে জাতীয় সম্পদ্‌ কিভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং পরস্পরের সহযোগিতায় বেকার সমস্যা সমাধান করিয়া আর্থিক প্রগতিকে কিরূপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তাহা খুবই সহজ ও সরলভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ধনবিজ্ঞানের কতক-গুলি ইংরেজি শব্দের পরিভাষাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

ধনবিজ্ঞানে সাক্রেতি

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত

৩৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲

Prabuddha Bharata (Ramkrishna Mission) :—"Mr. Dutt has got the art of making the dry bones of economics instinct with life and his book is an interesting reading throughout."

টাকাকড়ি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্

পৃষ্ঠা ২২০, মূল্য ১৷৹

"বঙ্গশ্রী', বলেন—

"..."রবি বাবুর পুস্তকখানি নিরপেক্ষতার সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লেখা। কোন মতবাদকে তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। বইটী এমনভাবে লেখা যে, বি-এ ক্লাসের ইকনমিক্সের ছাত্রেরা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে ; কিন্তু তাহা বলিয়া বইখানি শুধুই টেক্‌ষ্ট বুক নয়"..."

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন—

"...The author's aim has been to give the readers a clear idea of the theories of Currency and to say the least he has been more than successful,......The book reveals its author's dispassionate and scientific outlook. The book is very up-to-date. Such terms as Purchasing Power Parity, Exchange Control, Quota System etc. have been adequately explained with appropriate equivalents. The book will have an important place in the economic literature of Bengal..."

দেশ-বিদেশের ব্যাঙ্ক

ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত,

এম-এ, বি-এল

৩০০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০

বিনয় সরকারের বাংলা বই

(১৯২৬ সনের পর প্রকাশিত)

১। একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

২। নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন

প্রথম ভাগ :—তত্ত্বাংশ, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, ২॥০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকৌশল, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। বাড়তির পথে বাঙালী, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩।০।

৪। স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৫। ধনদৌলতের রূপান্তর (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০

৬। পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০।

৭। হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

৮। "বর্ত্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)।

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ২৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ৭০৭ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সাল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, ৸০।

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১৷০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, ২৲।

Bangiya Dhana-Vijnan Parishat

(Bengali Institute of Economics)

PUBLICATIONS (in English)

Economic Development: Studies in Applied Economics and World-Economy. By Prof. Benoy Sarkar, M.A., Vidyavaibhava (Benares), Dr. Geog. h. c. (Teheran).

Vol. I. **Post-War World-Movements in Commerce, Economic Legislation, Industrialism and Technical Education** (2nd edition). Demy 8vo 464 pages. Rs. 8.

Vol. II. **Comparative Industrialism and its Equations** with special reference to Economic India (2nd edition), Demy 8vo 320 pages. 9 charts. Rs. 6.

Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought. By Shib Chandra Dutt, M.A., B.L., Royal 8vo 234 pages. Rs. 5.

Labour Legislation in British India. By Advocate Pankaj Kumar Mukherjee, M.A., B.L., Demy 8vo 242 pages. Rs. 3.

The Politics of Boundaries and Tendencies in International Relations. By Prof. Benoy Sarkar.

Vol. I. **Analysis of Post-War World Forces** (2nd edition), Double Crown 340 pages. Rs. 2-8-0

Greetings to Young India: Messages of Cultural and Social Reconstruction. By Prof. Benoy Sarkar. Part I. (2nd edition), Double Crown 190 pp. Re. 1/-

The Political Philosophies Since 1905. By Prof. Benoy Sarkar. Double Crown 404 pages. Rs. 4

The Sociology of Population with special reference to optimum, standard of living and progress: A study in societal relativities. By Prof. Benoy Sarkar. Royal 8vo 150 pages. Six charts. Rs. 3.

Social Insurance Legislation and Statistics: A study in the labour-economics and business organization of neo-capitalism. By Prof. Benoy Sarkar. Demy 8vo. 460 pages. 9 charts. 2 portraits. Rs. 8.

Imperial Preference vis-a-vis World-Economy in relation to the international trade and national economy of India. By Prof. Benoy Sarkar. Royal 8vo 170 pages. 15 charts. Rs. 5.

Indian Currency and Reserve Bank Problems. By Prof. Benoy Sarkar. 2nd Edition Royal 8vo. 94 pages. 14 charts. Re. 1-8-0.

The Economic Services of Zamindars to the Peasants and the Public. By P. K. Mukherjee. Royal 8vo 26 pages. Annas 0-8-0.

CHUCKERVERTTY CHATTERJEE & CO. LTD.

15, COLLEGE SQUARE, CALCUTTA.